গৌরীহর মিত্র সঙ্কলিত

বীরভূমের ইতিহাস

সম্পাদনা

অরুণ চৌধুরী

ন্যাশানাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

Birbhumer Itihaas by Gourihar Mitra
Editor · Arun Chowdhury

প্রথম অখন্ড সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০০
গ্রন্থস্বত্ব প্রীতি চৌধুরী
শব্দবিন্যাস প্রজ্ঞা কম্পিউটার, সিউড়ী, বীরভূম।
প্রচ্ছদ হুমায়ুন কবীর
বাঁধাই শ্যামল দে, রামপুরহাট, বীরভূম।

উ ৎ স র্গ

বীরভূমের গৌরব
গৌরীহর মিত্র মহাশয়কে

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

চিত্রসূচী

মূলগ্রন্থের মানচিত্রসমূহ ২৮২

মূলগ্রন্থের চিত্রসমূহ ২৮৬

চিত্র সংযোজন ৫৩৫

সম্পাদকের কথা

কথামুখ

বাঙালীর ইতিহাস নেই। বাঙালী ইতিহাস বিস্মৃত জাতি। এমর্মে বেদনা প্রকাশ করেছেন বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৩৮-১৮৯৪)। তিনি শুধু ঔপন্যাসিক ছিলেন না। তিনি বাংলা ভাষায় অনেক চিন্তামূলক প্রবন্ধও লিখেছেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মূল লক্ষ্য তাই ছিল। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাকে উপজীব্য করে উপন্যাস লেখার কাজও শুরু করেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) থেকে আরম্ভ করে 'সীতারামে' (১৮৮৭) তাঁর পরিসমাপ্তি। 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) প্রভৃতি গ্রন্থে বঙ্কিম চন্দ্রের ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ ও ইতিহাসের গুরুত্ববোধের নিদর্শন পাই আমরা।

অদ্বৈতবাদী চিন্তা

বঙ্কিমচন্দ্রের এই আক্ষেপের প্রেক্ষাপটে রয়েছে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদী দর্শনের প্রভাব। খৃষ্টীয় ও ঐশ্লামিক একেশ্বরবাদকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তিনি অদ্বৈতবাদী দর্শনের প্রবর্তণ করলেন। ঐ চিন্তাধারায় জগৎ সংসার সবকিছুকেই নস্যাৎ করা হল। 'কা তব কান্তা, কস্তেপুত্র—তোমার কান্তা কে, কে বা তোমার পুত্র'—কেউ তোমার নয়। সংসার অনিত্য। সবই মায়া। মায়াবাদী চিন্তার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে ভারতবর্ষের 'হিন্দু' নামধারী ও পরিচয় প্রদানকারীরা অনেক কিছুই হারিয়েছি। যেহেতু ঐ চিন্তায় ইহকাল নেই। ইহজীবনও অনিত্য একটা মায়াপুঞ্জ। সেখানে সেই অনিত্য জীবনের কথা লিখে রেখে কী হবে ? তাতো অবান্তর। তাই, বন্ধ হল ইতিহাস রচনা। বৌদ্ধ, জৈন্যদের বেদবিরোধী চিন্তাযে অনেকাংশে বস্তুবাদী ভাবধারার প্রবর্তন করেছিল, তাতে ইহজীবনকে বাস্তব ধরে নিয়ে তা থেকে মুক্তির কথা বলা হল। কিন্তু ইহজীবনকে নস্যাৎ করে নয়। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ তাকেও আঘাত করল। বন্ধ হল বহির্বাণিজ্য, কালাপাণি পার নিষিদ্ধ হল। অদ্বৈতবাদের সূত্র ধরে জেঁকেবসা ব্রাহ্মণবাদীরা গোটা সমাজের গতিবেগ স্তব্ধ করে দিল। জীবন হল কূপের পরিধিতে সীমিত। তৈরি হল কূপমণ্ডুক ভাবনার জীবনচর্যার।

বন্ধ দুয়ার খুলল

মধ্যযুগে একে আঘাত করলেন নানক কবীর—রামানন্দরা। আঘাত করলেন

শ্রী চৈতন্য ও নিত্যানন্দ গোস্বামী। মানবকের জীবন কাহিনী লেখা হল। চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি লেখা শুরু হল। বৌদ্ধ চিন্তাধারার বিলীয়মান আলোর ক্ষীণ রশ্মির বিচ্ছুরণ পেলাম, চণ্ডীদাসের কন্ঠে (চতুর্দশ শতক) মানবিক চিন্তার প্রথম প্রকাশ 'সবার উপরে মানব সত্য, তাহার উপরে নাই'।

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রতিরোধ

কিন্তু ঐ চিন্তাও ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে। বৈষ্ণবরা 'নেড়া নেড়ির' দল। অথচ ব্রাহ্মণরা যে পিতামাতার 'পারলৌকিক' ক্রিয়া করেন, তাতে মস্তক মুণ্ডণ করণীয়। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম বা বেদবিরোধী চিন্তাধারার প্রভাবের স্মারক, তা ক'জন ব্রাহ্মণ জানেন ?

ওরা জানে না

বীরভূমের ব্রাহ্মণরা মৃতব্যক্তির অশৌচ পালনের জন্য মৃত্যুর পরবর্তী তৃতীয় দিবসে ঘাটে যান বা শবদাহ করে বাড়িতে ফেরার পরে গাদুঁই বা গঙ্গাযাত্রীরা যে আগুনে হাত সেঁকেন বা নিমপাতা চিবান, তাতো অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর আচরণীয় সংস্কার একথা ব্রাহ্মণরা জানেন কিনা জানিনা। যাঁদের 'অনার্য' বা 'শূদ্র' বলা হয়, তাঁদের জীবন ধারা ও ভাষা থেকে অনেক কিছুই নিয়েছে যে উচ্চবর্ণের সমাজ। সর্পদেবী মা মনসা, ধর্মঠাকুর ভূতপ্রেত তাদের অন্যতম।

কিন্তু ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজ তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলে।

নবযুগের শঙ্খধ্বনি

সেখানে নতুন চিন্তা, যুগান্তরের ছন্দ, যুক্তিবাদী ভাবধারা, অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের শিকল খুলে বিশ্বে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যা সূচনা হয়েছে ১৭৯১ এর ফরাসী বিপ্লবে, তার ডাক শুনলেন ও ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন দেশবাসীদের শোনালেন রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। তিনি কালাপানিতে পাড়ি জমালেন। অবশ্য, কিছুটা সংস্কারকে কৌশলগত কারণে তিনি মেনে নিলেন। সাথে নিলেন রান্নার বামুন।

আত্মানুসন্ধানের সূচনা

এরপর থেকেই শুরু হল জাতির আত্মানুসন্ধান। কবিজীবনী লিখলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯)। ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় লিখলেন অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০- -১৮৮৬) প্রথম 'বাঙ্গালার ইতিহাস' লিখলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-৮৬)। স্বয়ং ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও (১৮২৭-১৮৯৪) লিখলেন বাঙ্গালার ইতিহাস।

তৃণমূলের দিকে

জাতির আত্মানুসন্ধান বাঙ্গালা থেকে পৌঁছাল জেলাতেও। জেলার ইতিহাস বা আঞ্চলিক ইতিহাস লেখার কাজ শুরু হল। হয়ত এরমধ্যে কিছুটা জাত্যাভিমান

বা এলাকাগত গৌরববোধের চিন্তাধারার অঙ্কুর লুকানো আছে। কিন্তু ঐ অভিমান কী একটা পরাধীন জাতির সর্ববিধ জীবন যন্ত্রণার উপশমে কোনো ওষধির কাজ করেনা ? করে। অবশ্য, এর বাড়াবাড়ি ভালো নয়। বাড়াবাড়ি থেকে জন্ম নেয় আঞ্চলিকতাবাদ। গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়তুতো, জাত তুতো, পরিবারতুতো, পাড়াতুতো, জেলাতুতো বা প্রদেশতুতো অথবা রাজ্যতুতো মনোভাব। যার নিদর্শন হল 'আমরা বাঙালী'। এরই চরমরূপ জাত্যাভিমানে ভরপুর ফ্যাসিবাদ, হিটলারের আর্যগৌরব তার নিদর্শন। ভারতে হিন্দুত্ববাদী চিন্তা তার ভারতীয় সংস্করণ। আর বলা হচ্ছে, আর্যরা নাকি ভারতের আদিম অধিবাসী। বলছেন বড় বড় ডিগ্রিধারী আচার্য, উপাচার্য থেকে আরম্ভ করে বিজ্ঞানে সুপন্ডিত প্রাক্তন মানব সম্পদ মন্ত্রি ডঃ যোশী পর্যন্ত।

ইতিহাস রচনার দৃষ্টিকোণের বিবর্তন

প্রসঙ্গত বলা দরকার, ইতিহাস কি এসম্পর্কিত চিন্তারও বিবর্তন ঘটেছে। ইতিহাস রচনায় রাজা-রাজড়াদের স্থানে ঠাঁই পেয়েছেন সাধারণ মানুষ। তাঁদের জীবনচর্যার কথা ও তার বিভিন্ন দিক আজ ইতিহাসের উপজীব্য বিষয়বস্তু হয়েছে। ঐ চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত ইতিহাস চর্চাকারীরা নিজেদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি ঐ দিকে ফিরিয়েছেন। সবাই পুরোপুরি তা অনুসরণ না করলেও ঐ ইতিহাস--চিন্তার প্রভাব আজ পুরোপুরি কেউ এড়িয়ে যেতে পারছেন না।

বাংলার ইতিহাস চিন্তায় এর সূচনা বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বলা যায়। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করলে হয়ত উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই তার নিদর্শন পাওয়া যাবে। 'কবিজীবনী' বা 'ভারতের উপাসক সম্প্রদায়'-এর বৃত্তান্ত রচনায় ঐ বস্তুবাদী ইতিহাস দর্শনের ইঙ্গিত ও ছাপ সুস্পষ্ট। এক্ষেত্রে সরকারী আমলাদেরও কিছুটা ভূমিকার কথা অবশ্য স্বীকার্য। বীরভূমের ইতিহাস রচনায় 'সান্তাল ও সান্তালিয়া' গ্রন্থের (১৮৬৭) রচয়িতা ই জি. ম্যান আই সি. এস, বীরভূমের জেলাশাসক আর. ডি. হাইম রচিত লাভপুর-সাকুলিপুর ও বরোঞা থানার বিবরণ (ঐ থানা তখন বীরভূমের জিলা প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীন ছিল) (১৮৬৮), হান্টারের অ্যানালস্ অব রুরাল বেঙ্গল, ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ডবুক ব্রাডলে বার্টের রচিত স্টার অব অ্যান আপল্যাণ্ড কান্ট্রি (১৯০৫), এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐক্ষেত্রে ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের আরও কিছু বিবরণমূলক গ্রন্থ এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবী রাখে।

জেলার ইতিহাস ঃ অসম্পূর্ণ খতিয়ান

বাংলার বিভিন্ন জেলা ও এলাকাগত ইতিহাসের তালিকা সুদীর্ঘ। সবগুলির যে হদিশ এ লেখকের কাছে আছে, সে দাবী আমার নেই বরং তা অবশ্য স্বীকার্য যে অনেক আঞ্চলিক ইতিহাস অপ্রকাশিত বা পাণ্ডুলিপি আকারে থেকে গিয়েছে।

আবার কালপ্রবাহে তারা লুপ্ত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা বিলুপ্ত হওয়া কোনো সাময়িকীর পাতাতেই আবদ্ধ থেকে গিয়েছে, তা গ্রন্থায়িত হয়নি। আজ আর ঐ জাতীয় লেখার গ্রন্থায়নের প্রয়োজন অনেকাংশে ফুরিয়ে গিয়েছে। ধনতান্ত্রিক বিকাশের যুগে তার গতিবেগ সম্পন্ন অশ্বখুরে এমনি অনেক জিনিষ পিষ্ট ও বিনষ্ট হচ্ছে, আগামীতে আরও বেশি হবে। এটাই স্বাভাবিক। কালান্তরে এটাই অবশ্য ঘটবে। তবু, ঐসব সম্পদকে কতখানি ধরে রাখা যায়।

ঐসব ইতিহাস, আঞ্চলিক বিবরণের মধ্যে লুকায়িত আছে একটা জাতির ঐতিহ্যধারা, তার জীবনচর্যার ইতিকথা, তার প্রাণপ্রবাহের গতির ছন্দ। বলা যায়, তার নাড়ীর স্পন্দন। ঐ স্পন্দনের সাথে যোগসূত্রহীন কোনো কালান্তর ঘটলে, তা অনেকক্ষেত্রেই হয় প্রাণঘাতী।

জেলা বা অঞ্চলের ইতিহাসে ঐ স্পন্দনের প্রতিটি পল-অনুপলের তথ্য পাওয়া যায়। অবশ্য, সবগুলিতে নয়। কোনো কোনো জেলার ইতিহাসকার বা বিবরণদাতারা অমুক রাজা তমুক রাজার ইতিবৃত্ত রচনা করেন। ঐ রাজা বা রাজবংশের গুণগানকারী পটের দায়িত্ব পালন করেন। যেমন, কিশোরী লাল সরকারের রচিত 'হেতমপুর রাজবংশ' নামক গ্রন্থ।

কিন্তু সব আঞ্চলিক ইতিহাসকে ঐ পর্যায়ে ফেললে তাদের প্রতি সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ণ হবে না। অনেকেই নিজ নিজ জেলা বা অঞ্চলের জনবৃত্তান্ত দিতে সচেষ্ট থেকেছেন। হয়ত, ইতিহাস লেখার রীতি-পদ্ধতি তার ক্রম ও সাজানোর পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসৃত হয়নি। কিছুটা কিম্বদন্তীর প্রভাব থেকে গিয়েছে। সে যুগে তা থাকতেই পারে। যে স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যবোধের প্রভাবে ঐ সব ইতিহাসকাররা লেখনী ধরলেন, তাতেও যে মাকালী থেকে আরম্ভ করে বজরংবলীদের ভজনা, শিবাজি বন্দনা, গণেশ বন্দনার নিদর্শনের প্রাবল্য, সেখানে ঐসব কাল্পনিকতা, কিংবদন্তীর উপর জোর প্রভৃতি থাকবেই।

কিংবদন্তীর খোলস ছাড়ালে অনেক সমাজসত্য ও ইতিহাসের অনেক উপাদানের কাঁচামাল পাওয়া যায়। একথাও মনে রাখা দরকার, আজকের ইতিহাস গবেষণায় কিংবদন্তীও একেবারে বর্জ পদার্থ নয়। সমাজের অভ্যন্তরে যে নানা দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তারই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ঐসব কিংবদন্তী, জনশ্রুতি প্রবাদ প্রবচনের জন্ম। মগের মুল্লুক কথাটি কি অনৈতিহাসিক ? বামুন কায়েত হদ্দ হল ফার্সি পড়ে তাঁতি, কাল হল তাঁতির এড়ে কিনে, বামুন গেল ঘর, লাঙল তুলে ধর, আল চকচক ভুঁয়ে ঘাস, একেই বলে বামুনে চাষ, পানপাতা, বাউড়ি, তিন নিয়ে সিউড়ি, ধনে আর বেনের দেশ সাঁইথিয়া—এর প্রতিটি প্রবচনের মধ্যেই গূঢ় সমাজসত্য বা সামাজিক ইতিহাস লুকানো আছে।

আঞ্চলিক ইতিহাস

এবার জেলার ও অঞ্চল বিশেষের কিছু সংখ্যক ইতিহাসের নাম উল্লেখ

করছি। আগেই বলেছি যে, এ কোনো পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়।

বগুড়াবৃত্তান্ত (১৮৬১) কালী কমল সার্ব্বভৌম, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (১৮৬৪) - শ্যামধন মুখোপাধ্যায়, দার্জিলিং-এর ইতিহাস (১৮৮০)-হরিমোহন সান্যাল, বীরভূম রাজবংশ (১৩১৫)-কিশোরীলাল সরকার ঢাকার ইতিহাস-২ খণ্ড (১৩১৯,১৩২২) - যতীন্দ্রমোহন রায়, তমলুকের ইতিহাস (১৩১৯)-সেবানন্দ ভারতী, বাকলা বা বাখরগঞ্জের ইতিহাস (১৯১৫)-রোহিনী কুমার সেন, কালীঘাট ইতিবৃত্ত (১৩৩২)-উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যশোর-খুলনার ইতিহাস-সতীশ চন্দ্র মিত্র, গৌড়ের ইতিহাস - দুইখণ্ড-রজনীকান্ত চক্রবর্তী, ফরিদপুরের ইতিহাস-আনন্দময় রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী-নিখিল নাথ রায়, হুগলী জেলার ইতিহাস-সুধীর কুমার মিত্র, আরামবাগের ইতিকথা-চুনীলাল বসু, গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী (১৯৩৪)-সতীশ চন্দ্র দে, বিক্রমপুরের ইতিহাস-যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, চট্টগ্রামের ইতিহাস মহবুব-উল-আলম, বগুড়ার ইতিহাস-প্রভাস চন্দ্র সেন, হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস-বিভূভূষণ ভট্টাচার্য, হিজলীর ইতিহাস-মহেন্দ্রনাথ কর, মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশ চন্দ্র বসু, নদীয়া কাহিনী—কুমুদ চন্দ্র মল্লিক, সন্দীপের ইতিহাস-—রাজকুমার চক্রবর্তী, চাকমা জাতি সতীশ চন্দ্র ঘোষ, ত্রিপুরার ইতিহাস—কৈলাস চন্দ্র সিংহ, পাবনা জেলার ইতিহাস—রাধারমণ সাহা, পাকুড় রাজবংশের ইতিহাস (অপ্রকাশিত)—দিগম্বর চক্রবর্তী ও বিনোদ গোপাল পাণ্ডে, বল্লভপুরের ইতিবৃত্ত—অধ্যাপক হরিপদ সেনগুপ্ত, মাহেশ মঙ্গল—লেখকের নাম স্মরণ হচ্ছে না, ভাণ্ডীর বনের ইতিহাস--(অপ্রকাশিত)-গোলোক বিহারী দাস।

সরকারী গেজেটিয়ার

এর সাথে যোগ করা যেতে পারে সরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত বিভিন্ন জেলার গেজেটিয়ার। এক্ষেত্রে হান্টার ও ও-মেলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ও-মেলির বীরভূম জিলার গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৫১ সালে যে প্রথম আদমসুমারি হয়, তার বিভিন্ন বিবরণ সম্পাদক অশোকমিত্র, আই সি. এস প্রকাশ করেছেন। এরাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তরফ থেকেও বিভিন্ন মন্দির মসজিদ গির্জা সহ এ রাজ্যের অনেকগুলি ভাস্কর্যের নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোও জেলার কারু ও চারু শিল্পের ইতিহাসের সাথে একাত্মভাবে জড়িত।

আগেই উল্লেখ করেছি উনিশ শতকে ও বিশ শতকে বহু পত্র পত্রিকা ও সাময়িকীতে বিভিন্ন জেলার কৃষি শিল্প ও ইতিহাসের নানা উপাখ্যান সম্বলিত বিভিন্ন প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলি গ্রন্থিত হয়নি, এখনও ঐসব লেখা সাময়িকীর পাতায় আবদ্ধ আছে।

বীরভূম বৃত্তান্ত

'বীরভূমের ইতিহাস' সম্পর্কিত বিভিন্ন বিবরণ মধ্যযুগে মুসলিম রচয়িতারা

ফার্সি ভাষায় লিখেছেন। ব্রিটিশ যুগেও ড্রেক ও অন্যান্যরা লিখেছেন, হান্টার তাদের অন্যতম। 'ইতিহাস' রচয়িতা গৌরীহর মিত্র (১৯০১-১৯৪৭) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকায় বীরভূম জেলার প্রাচীন শিল্পাদি সম্পর্কে কিছু নিবন্ধ লিখেছিলেন। যা এখনও অগ্রন্থিত।

হেতমপুর রাজবংশ লিখলেন কিশোরীলাল সরকার। তা কোনো পূর্ণাঙ্গ নয়। এরপরেই গঠিত হল বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি (১৩২১)। তার হেতমপুরের রাজা ও পরে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত জমিদার চক্রবর্তী পরিবার, আঠারো শতকের মধ্যভাগে পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পরে রাধানাথ চক্রবর্তী (১৭৬২-১৮৩৫) প্রতিষ্ঠিত ঐ পরিবারের অর্থনৈতিক জীবনে বৃটিশ শাসকদের আনুকূল্যে ও অনুগ্রহে পালে প্রবল হাওয়া লাগে রাজনগর রাজ পরিবারের। রাধানাথ চক্রবর্তী হলেন রাতারাতি প্রভূত অর্থের মালিক। রাজনগরের রাজপরিবারের ব্রিটিশদের দ্বারা নিযুক্ত দেওয়ান। নীলামে ঐ পরিবারের বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ প্রাপ্ত (১৭৬৫) ব্রিটিশ বণিকদের সংগঠন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ধার্য রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঐ পরিবারের জমিদারি নীলামে ওঠে। আর সেই নীলামে ওঠা জমিদারির দশ আনা অংশ কিনে নেন নবনিযুক্ত দেওয়ান রাধানাথ চক্রবর্তী (১৭৬২-১৮৩৫) সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) দমনে ব্রিটিশ প্রভূর পাশে দাঁড়াবার ইনাম স্বরূপ জমিদার বিপ্রচরণ চক্রবর্তী (১১৯৩-১২৬৪) পেলেন রায়বাহাদুর পুরস্কার। পরে তাঁর উত্তর পুরুষ হলেন রাজা ও মহারাজা।

ঐ পরিবারের মহিমারঞ্জন চক্রবর্তীর অর্থানুকূল্যে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত তথ্যে রচিত হল তিনখণ্ড 'বীরভূম বিবরণ'। ১৩২৩ সন থেকে আরম্ভ করে ১৩৩৪ সন এই তিনখণ্ড প্রকাশিত হল। সমঝদাররা, বিশেষত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮) প্রমুখ ব্যক্তিরা, ঐ সংকলনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শাস্ত্রী মশাই তাঁকে সাহিত্য রত্ন উপাধি দেন। তাঁর নামের সাথে ঐ উপাধি একাত্ম হয়ে গিয়েছে।

গ্রামবাংলার জন ইতিহাস

বীরভূমের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরেছেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯০--১৯৭৭) পায়ে হেঁটে, জল কাদা ভেঙে, ধূলিধূসরিত জঙ্গল পেরিয়ে তিনি উত্তরে ঝাড়গ্রাম সংগৃহীত রাজগাঁও-গোড়শা থেকে আরম্ভ করে, পাইকর-জাজিগ্রাম-মিত্রপুর মুর্শিদাবাদ সীমান্তের এইসব গ্রাম, যা বাংলার প্রাচীন অতীতের অনেকাংশে অনুদ্‌ঘাটিত আকর, পশ্চিমের রাজনগর দুর্গের ভগ্নাবশেষ, কনকপুর কোন্ এলাকায় তিনি পরিক্রমা করেননি, তা বলা দুরূহ। অপরিসীম ধৈর্য্য ও অধ্যাবসায় তিনি বীরভূমের তৎকালীন চৌদ্দটি থানার গ্রামগুলি তিনি পরিক্রমা করেছেন। হিন্দু জনসংখ্যা অধ্যুষিত গ্রাম, মুসলিম জনবসতিওয়ালা জনপদ বারা-বড়তুরিগ্রাম,

মাড়গ্রাম, ইলামবাজার ও দুবরাজপুর থানার অনেক জনপদ, কীর্তনের একধারার উৎপত্তিস্থল ময়নাডাল, অজয়তীরবর্তী বড়া গ্রাম, নাকড়াকোন্দা, রূপুসপুর, গোপালপুর, খয়রাশোল প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রাম, ভীমগড়, বোলপুর, সিউড়ি, লাভপুর, কীর্ণাহার, নানুর, রামপুরহাট, মল্লারপুর (দামড়া), মলুটি এসব গ্রামেই তিনি গিয়েছেন। তার জনজীবন, ইতিহাস, কিংবদন্তী, পাথুরে প্রমাণ ও মানবিক প্রমাণ, শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মকর্ম, ভাষাগত দিক—সব কিছুই তিনি নজর করেছেন। তাঁর সংগৃহীত ও সংকলিত গ্রন্থের তিন খণ্ডে তিনি তার আহরিত তথ্যাদি খুব যত্নের সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন। এভাবেই তাঁর সংকলিত ও মহারাজা মহিমা রঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত অধুনা-বিলুপ্ত বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত বীরভূম বিবরণ বাংলার পশ্চিম প্রান্তস্থিত তথা দক্ষিণ রাঢ়ের অন্যতম ভূখণ্ড জেলা বীরভূমের এক অমূল্য আকরগ্রন্থ। সেদিন পর্যন্ত ঐ জাতীয় গ্রন্থ ছিল অনন্য ও অতুলনীয়। পরবর্তীকালে বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০) কর্তৃক রচিত 'পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থে (প্রকাশ ১৯৫৬) বাংলাভাষা ভাষী পাঠক সমাজ কেবল একটি জেলা নয়, তাবৎ পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্ত মফস্বল এলাকার জনজীবনের বিভিন্ন দিকের এক আরশি পেলেন।

বলা বাহুল্য, আজকের দিনের গবেষণা হল চরমভাবে খণ্ডিত এবং অল্পায়াসের নিদর্শন। কাটিং এণ্ড সার্টিং এর অংশগুলিকে সংগৃহীত ও সংকলিত করে গবেষক তাঁর কাজ সমাপ্ত করেন। নানা তুকতাকের মাধ্যমে জ্ঞানের বাজারে সঞ্চরণশীল অভিজ্ঞ গুণীদের কাছ থেকে তাবিজ-কবচ কিনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে ও অনুগ্রহে ডকটরেট উপাধি করায়ত্ত করেন। দেবী বীণাপাণিকে দেওয়া-অঞ্জলির মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় কমলা দেবীরও প্রোজ্জ্বল হাসির ভান্ডারের চাবি খুঁজে পান। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শিবরতন মিত্র, গৌরীহর মিত্র, দিগম্বর চক্রবর্তী প্রভৃতির কাছে কমলা ছিল বহুলাংশেই অধরা তাঁদের ছুঁতেও মানা ছিল।

শিবরতন মিত্রের অবদান

বীরভূমের সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক, তার লোককথা, তার নানা রূপকথা, ইতিহাসের নানা উপাদান, ভাষাগত বৈচিত্র্য ও ভাষার ক্রম বিবর্তন, বাংলাভাষার মধ্যযুগীয় উদাহরণ, বাংলা পদ্যের আদিরূপ প্রভৃতি সংগ্রহে, পুঁথি সংগ্রহে শিবরতন মিত্র (১২৭৮-১৩৪৫) ছিলেন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আত্মস্মৃতিমূলক রচনায় জানা যায় যে তিনি যৌবনে বীরভূম সম্পর্কিত তথা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা দিক সংক্রান্ত বিষয়ে পড়াশুনা করার জন্য শিবরতন মিত্র প্রতিষ্ঠিত ও রচিত ব্যক্তিগত পাঠাগার 'রতন লাইব্রেরি'তে আসতেন। তাঁর গ্রাম থেকে প্রায় পনেরো—কুড়ি মাইল দূরবর্তী সিউড়ি শহরে এসে তিনি নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তিনি কোর্টে চাকুরি করতেন, খুব অর্থবান মানুষ ছিলেন না। তথাপি এই সংগ্রহের নেশারঘোরে তিনি বীরভূম

সংলগ্ন সাঁওতাল পরগণার বহু গ্রামেও গিয়েছেন। তথ্যাদি ও উপকরণাদি সংগ্রহ করে এনেছেন। শিবরতন মিত্র বীরভূমি (১৩০৭) পত্রিকায় 'বীরভূমির ইতিবৃত্ত' লিখতে শুরু করেছিলেন। ঐ পত্রিকা বন্ধ হওয়ায় ঐ লেখাও বন্ধ হয়ে যায়। তার আগে তিনি মুর্শিদাবাদের জুলুটি ও পরে কীর্ণাহার থেকে প্রকাশিত 'সৎসঙ্গ' ও 'ধরণী' পত্রিকাতেও বীরভূমের ইতিহাস সংক্রান্ত নিবন্ধ লিখেছিলেন।

তবে, তাঁরও আগে গুরুলাল গুপ্ত রুরাল স্কেচেস্ নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে এন্টিকুইটিজ অব বীরভূম এই প্রবন্ধে বীরভূমের ইতিহাস সম্পর্কিত কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে শিবরতন মিত্রের প্রচেষ্টা দ্বিতীয়, তৃতীয় কিশোরীলালের হেতমপুর রাজবংশ (১৩১৬) কে গণ্য করে চতুর্থ প্রচেষ্টা হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের।

এর পরবর্তীকালে বীরভূমের ইতিহাসের প্রথম পর্ব থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত ইতিহাস লেখেন শিবরতন মিত্রের তৃতীয় পুত্র গৌরীহর মিত্র। তাঁর রচিত বীরভূমের ইতিহাসই হল এ জেলার সর্বপ্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস। যা পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ।

গৌরীহর ও বীরভূমের ইতিহাস

গৌরীহর মিত্রের জন্ম ১৩০৮ সালের ১লা ভাদ্র। জন্মস্থান সিউড়ি। রতন লাইব্রেরীর কথা আগে উল্লেখ করেছি। শিবরতন মিত্রের বসতবাটিতেই ঐ গ্রন্থাগার অবস্থিত ছিল। তাঁর বাল্যশিক্ষান্তে তিনি ভর্তি হলেন সিউড়ির বঙ্গ বিদ্যালয়ে। ১৮৫৬ সনে ঐ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। সম্ভবত তখন ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে রামপ্রসন্ন পণ্ডিত। দশমিক প্রথা প্রবর্তিত হল বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে। তার আগে রামপ্রসন্ন পতিত ধারাপাত ছিল এ জেলার পাঠশালার পাটীগণিতের প্রথম পাঠ। এখন যাঁরা বৃদ্ধ তাঁরা পাঠশালায় ঐ ধারাপাত পড়েছেন। যতদূর জানা যায় বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও সাঁওতাল পরগণাতেও ঐ ধারাপাত চালু ছিল। তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার অনুকূলে ছিলেন। ১৮৯৬ সালে এডুকেশন গেজেটে তাঁর লেখা এক প্রবন্ধে তিনি দেশ বিদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে পর্যালোচনা করেন। জাপানের কথাও উল্লেখিত হয়। তারপর তিনি আমাদের দেশেও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার পক্ষে অভিমত দেন। গৌরীহর মিত্রের পারিবারিক ঐতিহ্যে ছিল ইতিহাস চর্চার অভ্যাস। তাঁর সাথে রামপ্রসন্ন পন্ডিত কী তাঁর প্রাণে জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুসন্ধান তথা শিকড়ের সন্ধানের স্পৃহা জাগিয়ে দিয়েছিলেন? আমার মতে, বিষয়টি ভেবে দেখার মত।

সেখানে ছিল ফিফ্‌থ ক্লাস (বর্তমান ষষ্ঠ শ্রেণী) পর্যন্ত। ফোর্থ ক্লাস বা বর্তমান সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন জিলা স্কুলে (১৮৫৯)।

দেশ উত্তরঙ্গ স্বাদেশিকতার ঢেউ-এ। অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ (১৯২১)। গান্ধীজির ডাক। গৌরীহর ভাসলেন সেই তরঙ্গে। তখন তিনি দশম শ্রেণীর বা ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র। সঙ্গী আরও তিনজন, কারা তাঁরা ? নাম জানা যায়নি। বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হলেন ঐ চারজন 'স্বদেশি' করা ছাত্র। তখন সিউড়িতে নতুন এক উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাম-বেণীমাধব ইনস্টিটিউশন (১৯১৭)। স্বদেশি করার অভিযোগে বিতাড়িত গৌরীহরের ঠাঁই হল ঐ স্কুলে।

এর একটা পূর্বসূত্র এখানে স্মরণীয়। সিউড়ির উকিল, মোক্তার, সাধারণ সরকারি কর্মচারী বা ছোট ব্যবসায়ীদের সন্তানদের প্রবেশাধিকার ছিল না জিলা স্কুলে। সেখানে উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা, জমিদার ও অভিজাত পরিবারের নন্দনদের ঠাঁই হত। সাধারণ ঘরের মাধ্যমিক শিক্ষালাভেচ্ছু সন্তানেরা পড়বে কোথায় ? বাংলা স্কুলে তো ষষ্ঠ শ্রেণীতেই পড়া শেষ তাই, নগরবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারের সন্তানদের জন্য গদাধর চৌধুরী ওরফে গদাধর মাষ্টার এক 'জাতীয় বিদ্যালয়' খুলল তাঁর বাড়িতে। সে বাড়ি শহরের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী প্রায় ভগ্নদশা এক মাটির ঘর সেদিনের (১৯১০) স্মৃতিবাহী হয়ে বর্তমান ঐ গদাধর মাষ্টারের স্কুলই রেলওয়ের ইঞ্জিনীয়ার মল্লিকপুর গ্রাম নিবাসী রাখাল দাস চট্টোপাধ্যায়ের অর্থানুকুলে পরিণত হল তাঁর বাবা বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত বেণীমাধব ইন্সটিটিউশনে। স্বদেশি করার অভিযোগে স্কুল থেকে যাঁদের তাড়ানো হত, বেণীমাধব ইন্সটিটিউশনে তাঁদের ভর্তির সুযোগ হত। প্রাক্তন কমিউনিষ্ট নেতা ও সাংসদ এবং জনপ্রিয় চিকিৎসক ডাঃ শরদীশ রায় ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধে স্কুল ছাত্রাবাসে তকলি কাটার অপরাধে (!) বিতাড়িত হলেন বিহার প্রদেশ থেকে। স্কুল-আমজোড়া হাইস্কুল থেকে তো বটেই। ঐ স্কুল বিহার প্রদেশের সাঁওতাল পরগণায় অবস্থিত ছিল। নগরীর রায় পরিবার-এর সন্তান হওয়া সত্বেও জিলা স্কুলে তাঁর ঠাঁই হল না। শেষে তিনি ভর্তির সুযোগ পেলেন বেণীমাধব ইন্সটিটিউশনে। জানিনা, সেদিন এরকম আর কেউ ছিলেন কিনা। এ তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, স্বদেশী করা শিক্ষার্থীদের প্রতি বেণীমাধব ইন্সটিটিউশনের একটা সহানুভূতি ছিল।

গৌরীহর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন ঐ স্কুল থেকে। উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হলেন স্কটিস চার্চ কলেজে। স্নাতকোত্তর স্তরে আইন পড়লেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এবার কর্মজীবন সিউড়ি কোর্টে আইন ব্যবসা। জীবনের শেষ পর্যন্ত ঐ ব্যবসাই ছিল তাঁর উপজীবিকা। তিনি ক্ষয় রোগাক্রান্ত হয়ে মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে মারা যান। তিনি বিপত্নীক হয়েছিলেন তাঁর জীবনাবসানের সাত বছর আগে—১৯৪০ সনে। দুই পুত্র ও এক কন্যা। বড় পুত্র ডঃ অমলেন্দু মিত্র। পেশায় ছিলেন শিক্ষক। রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। দ্বিতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র

মুকুল মিত্র সরকারী কর্মচারী ছিলেন। উভয়েই প্রয়াত।

গৌরীহরের সাহিত্য জীবনের শুরু কলেজেপড়ার সময় থেকে। পিতৃবন্ধু তৎকালিন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক কার্তিক দাশগুপ্তের প্রেরণা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজ করেছিল। তাঁর উৎসাহে তিনি ঐ সময়ে পূর্বোল্লিখিত 'প্রবাসীর' প্রবন্ধগুলি লেখেন। বীরভূম ইতিহাসের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের শেষাংশে প্রচারিত বিজ্ঞাপণ থেকে জানা যায় যে তিনি তৃতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপিও তৈরী করেছিলেন। ঐ খণ্ডে পূর্বোক্ত শিল্প সম্পর্কিত প্রবন্ধ ও তার সাথে কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ থাকার কথা ছিল। এছাড়া, বিভিন্ন স্থান সম্পর্কিত বিষয়ও থাকার কথা ছিল।

কিন্তু ঐখণ্ড আর প্রকাশিত হয়নি। ঐ পাণ্ডুলিপির কোনো হদিশও খুঁজে পাইনি। বইপত্র, পুঁথিরাজি অমরেন্দু মিত্রই বিশ্বভারতীর পুঁথিশালার অধ্যক্ষ প্রয়াত পঞ্চানন মণ্ডলের হাতে তুলে দিয়েছেন। ফাঁকা বাড়ি। তাও হস্তান্তরিত। 'রতন লাইব্রেরী' লেখা প্রস্তর ফলকও বেপাত্তা। এভাবেই হারিয়ে যায় ইতিহাস। হারিয়ে যায়, আমাদের ঐতিহ্যের নিদর্শন সমূহ।

একেতো আমাদের ইতিহাসবোধের প্রবল প্রভাব। তারপর আটলান্টিকের ওপার থেকে প্রথমে হিপিরা পরে রাষ্ট্রনায়করা জাহাজ ভরে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির- —যা মার্কিন মূল্লুকে কোনোকালেই শিকড় গাড়তে পারেনি—তবে জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন, হাওয়ার্ডকাস্ট, পল রবসন, ল্যাংসটন হিউস্ প্রভৃতির মার্কিনমুল্লুকে যেটুকু ছিল, তাও আজ অবসিত। তার বর্জ্য পদার্থ আসছে বিশ্বব্যাঙ্কে—আই এম. এফ ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অর্থ ও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ণের বিধিবিধানের সাথে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায় লিখেছিলেন, 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার / সেথা হতে সবে আনে উপহার। / নিবে আর নিবে / মিলাবে মিলিবে, যাবেনা ফিরে / এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'।

আজ রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে নিঃসন্দেহে ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতি ও চিন্তার ঐসব বর্জ্য পদার্থ দেখে অন্যভাবে ডাক দিতেন।

বীরভূমের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার বাসনা সম্ভবত প্রবাসীতে শিল্প সম্পর্কিত প্রবন্ধরাজি লেখার সময়কালেই জেগেছিল। সেই ভিত্তিতে তিনি তথ্যাদি সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রে বাবার প্রতিষ্ঠিত রতন লাইব্রেরীর অমূল্য গ্রন্থরাজি সহ বীরভূম বিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ, বাবার পরামর্শ (বাবার জীবনাবসান বাংলা ১৩৪৫ সনে) সম্ভবত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। রচনা কার্যে হাত দিবার আগে ইতিহাস বিষয়ক বিশেষত বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থও তিনি অধ্যয়ণ করেছিলেন। এই গ্রন্থ রচনার সমকালে তিনি তৎকালিক প্রথম

শ্রেণীর বাংলাভাষার মাসিক ও অন্যান্য সাময়িকীতে যথা,—প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বঙ্গলক্ষ্মী, পূর্ণিমা (লাভপুর থেকে প্রকাশিত ?) বঙ্গবাণী, মানসী ও মর্মবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতেন। লিখতেন ছোটদের পত্রিকা—শিশু সাথীতেও। বলা বাহুল্য, সেগুলি কেউ সংগ্রহ করেননি এখনও।

তাঁর রচিত বীরভূমের ইতিহাস প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল ১৩৪৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৪৫ সালে।

তাঁর এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ছিল প্রাচীন বীরভূম থেকে আরম্ভ করে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রবর্তন পর্যন্ত সময়ের ইতিবৃত্ত। দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রিটিশ শাসন কীভাবে এ জেলায় বিস্তৃত হল, তার পরিণামে কী হল, ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তন, চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তন (১৭৯৩), তার পরিণাম, সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) ও তার পূর্বক্ষণ, বীরভূমের জমি জরিপ ও তার বিবরণ প্রভৃতির বস্তুগুলির বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন ইতিহাসকার গৌরীহর মিত্র। বলা বাহুল্য, তাঁর স্বদেশ চেতনা এখানে কাজ করেছে, তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের পূর্বক্ষণের বীরভূমের সমাজ, বর্গীদের আক্রমণে বিধ্বস্ত বীরভূম ও তার জনজীবন, এ সবকিছুকেই গৌরীহর উপজীব্য করেছেন।

দুইখণ্ডের তিনি অনেকগুলি চিত্র দিয়েছেন। সেদিনকার ফটোগ্রাফ খুবই ব্যয়বহুল ও দুর্লভ ছিল। এব্যাপারে সম্ভবত ভৌমিক পরিবারের মূকবধির শিল্পী অতুল চন্দ্র ভৌমিক তাঁর কাজে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। অতুলচন্দ্র ভৌমিক কি সিউড়ির প্রথম শিল্পী ও ফটোগ্রাফার ?

গৌরীহর মিত্রের অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের এই ফলশ্রুতি রবীন্দ্রনাথ, ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, আচার্য যদুনাথ সরকার, বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসকার ডঃ বিমান বিহারী মুখোপাধ্যায়, কার্ত্তিক চন্দ্র দাশগুপ্ত সহ অনেকেই অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

তাঁর এই অনন্য অবদান বীরভূমের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও এক মূল্যবান নিদর্শন। শুধু বীরভূম কেন, আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয় ও বরণীয়।

বীরভূমের ইতিহাসের পুনঃপ্রকাশ

দীর্ঘদিন যাবত 'বীরভূমের ইতিহাস' দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছে। তাঁর উত্তরপুরুষও নতুনভাবে প্রকাশ করতে পারেনি, অথচ, অনেকেই এ গ্রন্থ খোঁজেন। একদিকে যেমন ক্ষয়িষ্ণু পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার বর্জ্য পদার্থের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ণের হাতছানিতে অন্ধভাবে (বলা বাহুল্য, বিশ্বায়ণের প্রসাদের কণামাত্র পাবার লোভ, প্রাসাদং কণিকা মাত্র, দেবতার আশীষই মুখ্য)। অন্যদিকে তার সর্বনাশা দিক সম্পর্কেও সচেতনতা বাড়ছে। আগামী বিশ্বে হবেই দুই-এর লড়াই। জাতীয় বৈশিষ্ট্য, তার গৌরবময় ঐতিহ্য, তার সংস্কৃতির প্রতিও বিশ্বায়নী প্রসাদের

আকাঙ্খামুক্ত, এককথায় মোহমুক্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, তাঁরা নিজেদের শিকড় খুঁজছেন। অবশ্য, ঐ শিকড়ের সাথে জড়িয়ে থাকা পোকামাকড়—যথা ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস—যার মূল অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতায়, যা এক থেকে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করে, পারস্পরিক দ্বেষভাব জাগায় তা অবশ্যই নির্দ্বিধায় বর্জনীয়, কিন্তু ঐ শিকড়ের প্রাণশক্তি তাঁর মানবিক বোধে, তার বহুধারার সমন্বিত চিন্তায়, আমরা তাকেই স্বাগত জানাবো।

ঐ লক্ষ্য সামনে রেখেই 'রাঢ়' পত্রিকার পরিচালক মণ্ডলী ঐ অমূল্য সম্পদ বীরভূমের ইতিহাস পুনঃপ্রকাশের দুঃসাহস করে ব্রতী হয়েছে। তাঁদের এই সাহসকে দুর্জয় বিশেষণেই আমি বিভূষিত করতে চাই।

ঐ গ্রন্থের প্রতিটি বর্ণ পুণমুদ্রিত হচ্ছে। তার সাথে সংযোজিত অংশে বীরভূমের হালফিল প্রত্নতাত্বিক গবেষণা, তার ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তন, তার জনবিন্যাসের ও জনসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, সাঁওতাল বিদ্রোহ। ঐ বিদ্রোহ সম্পর্কে নবসৃষ্ট সাঁওতাল পরগণার (১৮৫৬-তে সৃষ্ট) দ্বিতীয় ডেপুটি কমিশনার ব্রিটিশ সিভিলিয়ান ই. জি. ম্যানের বক্তব্য, বীরভূমে ব্রিটিশ শাসকের প্রথম পর্বের প্রশাসনিক ইতিবৃত্ত, যার লেখক ড্রেক সাহেব। ঐ দুর্লভ লেখা, ১৮৬৮ সালে লেখা তদানীন্তন জিলা কালেক্টর ময়ি হাইম সাহেবের লাভপুর বিবরণ, যা নিখুঁত ও বস্তুনিষ্ঠ, আরও কিছু দুর্লভ তথ্য, সাঁওতাল বিদ্রোহের উপর জারি গান ও বেদনাবিধুর অথচ প্রাণশক্তিতে ভরপুর একটি সাঁওতালি গাঁথা—এসব থাকছে, এর রচয়িতা নিজ নিজ ক্ষেত্রের কয়েকজন সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ। আশাকরি, বীরভূম তথা বাংলার ইতিহাস চর্চাকারী ও জিজ্ঞাসুজনের কাছে তা সমাদৃত হবে।

এই গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশে যাঁদের পরামর্শ, সাহায্য ও তাঁদের কাছ থেকে মূল্যবান লেখা পেয়েছি, তাঁদের অবদানের কথা বিশেষভাবে বলা অত্যন্ত প্রয়োজন। এঁরা হলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক বন্ধু যথা, ডঃ দীক্ষিত সিংহ, ডঃ সুব্রত চক্রবর্তী এবং ডঃ শুচিব্রত সেন। এই গ্রন্থের পরিকল্পনায় তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি। তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মোট পাঁচটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে। অধ্যাপক ডঃ সুব্রত চক্রবর্তীর লেখা প্রবন্ধ সময়াভাবে বঙ্গানুবাদ করা সম্ভবপর হল না। তাই, ইংরাজি লেখাটিই দিতে হয়েছে।

অপরাপর যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা ও পরামর্শ পেয়েছি, তাঁদের তালিকা বেশ বড়, তাই তার উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম। পূর্বাহ্নে অনেকে গ্রাহক তালিকাভুক্ত হয়ে আর্থিক দিকটা সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠার এই অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশে যে পরিমাণ মূলধন দরকার, উদ্যোক্তা 'রাঢ়' পত্রিকার সংগঠকদের তা নেই। তবু, তাঁরা দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছে, আমি খুব ভালোভাবেই জানি যে, তাঁদের এই উদ্যোগ কোনোরূপ ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক স্বার্থে নয়। তাঁরা জানেন যে এখানে সরস্বতী ও কমলার

বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। তা সত্ত্বেও তাঁরা এ পথে নেমেছে। তাঁদের উৎসাহ ও ঐকান্তিক আগ্রহ আমাকেও অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে। বহুদিন যাবত এ গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। মহানগরীর কোনো কোনো নামজাদা প্রকাশক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁদের ঐ আগ্রহের পিছনে বেশ কিছুটা ব্যবসায়িক স্বার্থের টানাপোড়েন আছে। তাই, এইসব কাজ অনেক সময় গুরুত্ব পেয়েও পায় না। কিন্তু এঁদের উদ্যোগে ঐ আপাত-আন্তরিকতা ও ব্যবসায়িক লাভ-লোকসানের খতিয়ান দেখিনি। তাই, নানাকাজের মাঝেও এদিকে যথাসাধ্য নজর দিয়েছি।

এ প্রকাশের উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে বোলপুরের মাধ্যমিক শিক্ষক শ্রী মলয় ঘোষ, সিউড়ির শ্রীমান কৌশিক ঘোষ ও শ্রীমান প্রান্তিক রায়ের আন্তরিক উদ্যোগ ও সক্রিয় প্রচেষ্টাও অবশ্য স্বীকার্য, এঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়ণ-প্রভাবিত বাণিজ্যিক স্বার্থের হড়পা বাণে এঁরা ভেসে যায়নি, এইটাই আনন্দের কথা।

গ্রন্থের আরেকটা দিক গ্রন্থায়ণ। চলতি ভাষায়, বাঁধাই। ঐ কাজ এবং প্রচ্ছদাদির অলঙ্কারের কাজ যাঁরা করেছেন, তাঁদের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। তাঁদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ গ্রন্থকে হালফিল করার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় ছবি তুলে দিয়ে সাহায্য করেছেন ধীরেন বাগদী, শুকদেব সাহা প্রমুখ। তাঁদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সম্পাদনার যোগ্যতা ও বাজার--প্রচলিত পাণ্ডিত্যের অধিকারী আমি নই। নিজের ক্ষমতার ঐ সীমাবদ্ধতা খেয়াল রেখেই আমি সম্পাদনার কাজ যথাশক্তি সম্পাদনা করেছি। তবে, আরও যোগ্য হাতে একাজ সম্পাদিত হলে, নিশ্চয়ই তাকে সু-সম্পাদিত বলা যেত। পাঠকবর্গের হয়ত একারণে ক্ষোভ থেকে যাবে। তা সত্ত্বেও সম্পাদনার কাজ হাতে নিয়েছি। এবার তার সাফল্য-অসাফল্যের বিচারের ভার পাঠকবর্গের হাতে ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন।

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৪১২
পূর্বাশা
পাইকপাড়া
পোঃ সিউড়ি, বীরভূম
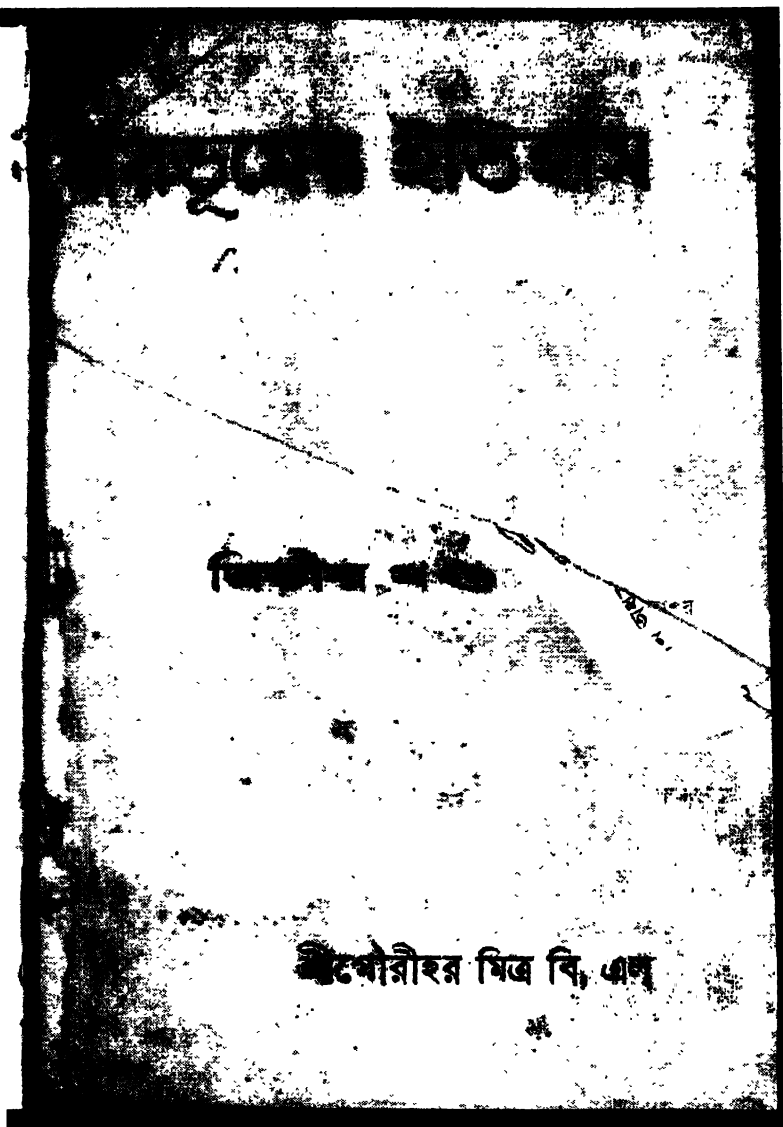
মূল বইয়ের 'প্রচ্ছদপট'

পরম পূজনীয় পিতৃদেব
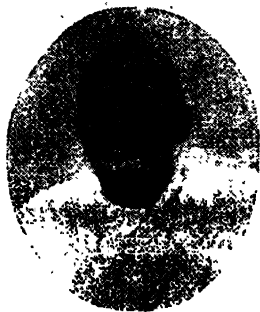
শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র

মহাশয়ের শ্রীচরণে

আমার বহু সাধনার ফল তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত

বীরভূমের ইতিহাস

ভক্তি-অর্ঘরূপে অর্পণ করিলাম

স্নেহের

গৌরীহর

প্রথম খন্ডের 'উৎসর্গ পত্র'

বীরভূমের গৌরব, অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী সার্থকনামা

মাতৃভাষানুরাগী কর্ম্মবীর

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের প্রতি

চিরকৃতজ্ঞতার যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শনস্বরূপ

বীরভূমের ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড

তাঁহার বহুবিখ্যাত নামের সহিত সংযুক্ত করিবার সুযোগ

প্রাপ্ত হইয়া চিরধন্য হইলাম

স্নেহমুগ্ধ

শ্রীগৌরীহর মিত্র

ৃক মুদ্রিত
লিঃ
কলিকাতা

দ্বিতীয় খন্ডের 'উৎসর্গ পত্র'

প্রথম খণ্ডের নিবেদন

দ্বাদশবর্ষব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কঠোর পরিশ্রমের ফলে আজ আমরা বীরভূমের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সহৃদয় পাঠকগণকে উপহার দিতে পারিয়া ধন্য হইলাম। বীরভূমের ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনের যে ইহাই প্রথম উদ্যম, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

ইংরাজীভাষায় গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক লিখিত Statistical Account বা District Gazetteerএ, সরকারী কর্ম্মচারিগণের সাহায্যকল্পে সংগৃহীত Statistics ভিন্ন, অন্য প্রাচীন ইতিহাসের কথা তেমনভাবে আলোচিত হয় নাই। স্বর্গীয় গুরুলাল গুপ্ত মহাশয় তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত Rural Sketch নামক গ্রন্থে Antiquities of Birbhum নামক একটি প্রবন্ধে স্বগ্রাম সুপুরের একটি প্রবাদমূলক উপাখ্যান সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র।

বীরভূমের কীর্ণাহার হইতে প্রকাশিত "সৎসঙ্গ" এবং মলুটি ইহতে প্রকাশিত "ধরণী" নামক মাসিক পত্রিকায় বীরভূম সংক্রান্ত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পর ১৩০৭ সালে কীর্ণাহার হইতে শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার জমিদার মহাশয়ের সহায়তায় ও স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় "বীরভূমি" মাসিক প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে, মদীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় "বীরভূমির ইতিবৃত্ত" নাম দিয়া বীরভূমের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ঐ সঙ্গে বীরভূমের প্রবাদ-প্রসঙ্গ, পল্লী-কবির গান ইত্যাদিও প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনতিকাল পরেই "বীরভূমির" প্রচার বন্ধ হওয়ায় এবং তাদৃশ উপকরণের অভাবে, তাঁহার এই প্রচেষ্টা মাত্র চারি পাঁচ অধ্যায় প্রকাশের পর বন্ধ হইয়া যায়। ফলে, তিনি উক্ত চেষ্টা ত্যাগ করিয়া প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। তবে, তিনি বীরভূম সংক্রান্ত যখন যাহা উপকরণ পাইতেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন।

ইহার পর, ১৩১৫ সালে হেতমপুরের মহারাজা ৺রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বীরভূমের উৎকৃষ্ট ইতিহাস লেখককে দুইশত টাকা পুরস্কার দিবার কথা

ঘোষণা করেন। কিন্তু কেহ এ বিষয়ে অগ্রসর হইলেন না দেখিয়া স্বর্গীয় কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঁকিশোরীলাল সরকার মহাশয়ের সহায়তায় "বীরভূম রাজবংশ" নামক একটি গ্রন্থ ১৩১৬ সালে প্রকাশিত করেন। ইহাতে প্রধানতঃ রাজনগরের ফৌজদারগণের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তৎপর ১৩২৩ সালে হেতমপুরে 'অনুসন্ধান সমিতি' স্থাপিত হইলে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় তিনি তিন খণ্ড "বীরভূম বিবরণ" প্রকাশিত করিয়া তাহাতে বীরভূমের সমগ্র রামপুরহাট মহকুমা, নানুর, লাভপুর, বোলপুর, ইলামবাজার ও দুবরাজপুরের প্রসিদ্ধ স্থানের ঐতিহাসিক এবং প্রবাদমূলক বিবরণ ও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে সঙ্কলয়িতার যথেষ্ট পরিশ্রম ও অনুসন্ধিৎসা প্রকটিত হইয়াছে। এই সংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমার পিতৃদেবের সংগৃহীত উপকরণ ও স্মারক-লিপির অধিকাংশই মহারাজকুমারের অভিপ্রায় মত, তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়; কিন্তু সেগুলি আর ফেরত পাওয়া যায় নাই। এগুলি পাইলে, আমাদের ইতিহাস রচনার পথ অনেকটা সুগম হইত।

১৯২২ খৃষ্টাব্দ। তখন আমি সবে মাত্র কলিকাতার স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে প্রবিষ্ট হইয়াছি। এই সময় আমার পিতৃদেবের অন্তরঙ্গ সুহৃদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Office Superintendent সুসাহিত্যিক ও কবি শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বি-এ মহাশয়ের উপদেশ মত বীরভূম সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। সেই প্রবন্ধগুলি প্রধানতঃ বীরভূমের শিল্প সংক্রান্ত। শুধু শিল্প সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে আটটি প্রবন্ধ 'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত হয় এবং প্রত্যেক প্রবন্ধের জন্য নির্দ্দিষ্টমত দক্ষিণাও প্রাপ্ত হই। এইরূপ উৎসাহ প্রদানের জন্য শ্রদ্ধেয় 'প্রবাসী' সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ রহিলাম।

এই সময় হইতে বীরভূমের নানাস্থানে ঘুরিয়া বীরভূমের প্রাচীন উপকরণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হই এবং ইতিহাস সংক্রান্ত নানাবিধ পুস্তক সংগ্রহ ও তৎসমুদয় পাঠ করিয়া উপকরণ সঙ্কলন করিতে থাকি। গভর্ণমেন্ট প্রকাশিত বহুবিধ পুস্তক ও Report আদি হইতে যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীত করি। এইরূপভাবে দ্বাদশবর্ষ পরিশ্রমের ফলে বীরভূমের সমগ্র সুবৃহৎ ইতিহাস রচিত হইল।

প্রাচীনকালে বা হিন্দু-যুগের সময় হইতে মুসলমান অধিকারের বিলোপ সাধন পর্য্যন্ত বীরভূমের ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক পারস্পরিক যোগসূত্র সন্ধান করিতে যে বিপুল পরিশ্রম করিতে হইয়াছে এবং কত অকর্ষিত গহন অন্ধকার পথে পরিভ্রমণ করিয়া সংযোজক পন্থা নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছে, তাহা আশা করি, সুধী পাঠকবর্গ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এরূপ যোগসূত্র সন্ধানের ইহাই যে আদি প্রচেষ্ট, তাহাও তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে বলিবার আবশ্যক

হইবে না।

আমরা পরিশ্রম করিবার অধিকারী — বিপুল পরিশ্রম করিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছি। কিন্তু ইহা প্রচার করিবার মত অর্থের অধিকারী নহি। তাই সহৃদয় পাঠকবর্গ ও শিক্ষিত বীরভূমবাসীর উপর নির্ভর করিয়া বহু ব্যয়ে বিবিধ ফটো চিত্রসহ এখন মাত্র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিলাম। এই খণ্ডে, প্রাচীনকাল হইতে ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বীরভূমের ইতিহাস এবং তৎসময়ের সামাজিক আচার ব্যবহার ও সাহিত্য-চর্চ্চার কথা আলোচনা করা হইয়াছে। পরিশিষ্ট সহ অপর দুই খণ্ডে, পরবর্ত্তীকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ইতিহাস ও যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

এই গ্রন্থরচনার কথা শুনিয়াই ইহার প্রচারকল্পে আমাদের বীরভূমের সহৃদয় ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ শ্রীযুক্ত ব্রজকান্ত গুহ আই, সি, এস্ মহোদয় এককালীন ২০্ টাকা সাহায্য দিয়া আমাদিগকে যথেষ্টরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। বীরভূমের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু মহোদয় এই ইতিহাস মুদ্রণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। মৌখিক ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিবার কল্পনা করাও নিতান্তই অশোভন মনে করি। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র বি-এল্ মহোদয় প্রত্যেকেই এই গ্রন্থ প্রচার-কল্পে এককালীন ১০্ টাকা করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের এই দানের কথা উল্লেখ করিয়া ধন্য হইলাম। গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই যাঁহারা অর্থ দিয়া এই পুস্তকের গ্রাহক হইয়াছেন তাঁহারাও ধন্যবাদের পাত্র। পাদটীকায় সন্ধান-গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে।

কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়, এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মুদ্রণকালে ৫০্ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়া আমায় যথেষ্টরূপ উৎসাহিত ও উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহাকে এই সুযোগে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

সিউড়ীর সবরেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত চুণীলাল শীল মহোদয়, বীরভূমের নানাস্থান সংক্রান্ত তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণন করিয়া আমাদের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বীরভূমের ইতিহাস রচনাকালে কার্য্যে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে উপদেশাদি প্রদানে যথেষ্টরূপ সহায়তা করিয়াছেন, ইঁহার ঋণ পরিশোধের কথা উল্লেখ করিলে, তিনি হয়ত আমার প্রতি স্নেহবশতঃ ক্ষুন্ন হইতে পারেন।

আমাদের পরম আত্মীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ সরকার, শ্রীযুক্ত উমাপদ সরকার,

শ্রীমান্ বিজয়কুমার সরকার ও শ্রীমান্ ন'কড়ি সরকার আমাদের মফঃস্বল পরিভ্রমণকালে পুঁথি-সংগ্রহ কার্য্যে ও অন্যান্য বিষয়ে আশাতীতরূপ সাহায্য করিয়াছেন।

বীরভূমের নানাস্থানের ফটো সংগ্রহকার্য্যে আমার সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার প্রতিবেশী গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ শিল্পী ও চিত্রকর মূকবধির শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ভৌমিক মহাশয় শীতে, গ্রীষ্মে, বরষায় ননারূপ অসুবিধা ভোগ করিয়াও, বিনা পারিশ্রমিকে ফটো তুলিয়া দিয়াছেন। ইঁহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বি, এস্, সি, বি-এল্ মহাশয়ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বীরভূমের ইতিহাসের জন্য কতকগুলি ফটো তুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

মদীয় পিতৃদেব বীরভূমের খ্যাতনামা প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশকালে সর্ব্ববিষয়ে সদুপদেশ লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা আমার পক্ষে পরম গৌরব ও সৌভাগ্যের কথা।

'বীরভূমের ইতিহাস' গ্রন্থখানি সুধীবর্গের প্রসন্ন দৃষ্টিলাভে সমর্থ হইলে আমার সকল পরিশ্রম, যত্ন ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব। ইতি -

রতন-লাইব্রেরী, সিউড়ী, বীরভূম। শ্রীগৌরীহর মিত্র

২৫এ শ্রাবণ, জন্মাষ্টমী, ১৩৪৩

১০—৮—১৯৩৬

দ্বি তী য় খ ণ্ডে র নি বে দ ন

'বীরভূমের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড পাঠকপাঠিকাগণের সমীপে উপস্থিত করিতে পারিয়া নিজকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছি। প্রথম খণ্ডে - প্রাচীনকাল হইতে মুসলমান আমলের শেষকাল, অর্থাৎ ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত সময়ের, ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান দ্বিতীয়খণ্ডে – বীরভূমে পাশ্চাত্য বণিকগণের বাণিজ্যব্যপদেশে বীরভূমে আগমন এবং ইংরাজাধিকারের সূচনাকাল হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত সময়ের ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। সুধী পাঠকবর্গ ইহা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে আমাদের সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

বীরভূমের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড বিক্রয়ের অর্থ হইতে এবং সদাশয় মহোদয়গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত এককালীন দান হইতে বীরভূমের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের ব্যয়, কোনরূপে পরিশোধিত হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে শীঘ্র দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রণ করিতে আরম্ভ করা সম্ভবপর হয় নাই। এমন সময় ভগবানের প্রেরিত দূতস্বরূপ পরম শ্রদ্ধেয় পাইকড় নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাণ্ডা মহোদয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া 'বীরভূমের ইতিহাস'- প্রথমখণ্ড পাঠে প্রীতিলাভ করিয়া, ইহার পরবর্ত্তী খণ্ড যাহাতে অচিরে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে কর্ম্মবীর – দেশের বহুসৎকর্ম্ম করিয়াছেন। যে কর্ম্ম করিতে একবার সঙ্কল্প করেন, তাহা নিষ্পন্ন না করিয়া তিনি বিরত হন না। এই অপূর্ব্ব দেশ-প্রেমিক পাণ্ডা মহোদয় তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ বীরভূমের কো-গ্রাম নিবাসী স্বনামখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায় Tea Garden, Colliery and Iron Mine Proprietor মহোদয়কে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করেন এবং যদি ইহা পাঠে গ্রন্থকারের পরিশ্রম ও সাধনা যথার্থই উৎসাহযোগ্য বিবেচনা করেন, তবে এই সুবৃহৎ 'বীরভূমের ইতিহাস' গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার সহায়তা করিলে যে অর্থের যথার্থই সদ্ব্যবহার করা হইবে – একথা তিনি তাঁহাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলিলেন।

কিন্তু ব্যোমকেশ বাবুকে ইহার জন্য অধিক বলিবার অপেক্ষা ছিল না।

তিনি স্বয়ং মাতৃভাষানুরাগী ও দেশহিতৈষী মহাপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি এই ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করিয়া অচিরেই দ্বিতীয় খণ্ড ইতিহাসের মুদ্রণকল্পে ব্যয়ভার গ্রহণ করিবার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আমায় উৎসাহপূর্ণ পত্র লিখিলেন। যে ভগবৎপ্রেরণা পাণ্ডা মহোদয়কে এইকার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছিল, তাহারই অপূর্ব্ব শক্তিবলে, তাহা অচিরেই সুসিদ্ধ হইল। এই উভয় মহাপ্রাণ মহোদয় বীরভূমের পরম গৌরবের ধন। ভগবান তাঁহার মঙ্গল-হস্ত, তাঁহাদের উপর চিরসম্প্রসারিত রাখুন – ইহাই গ্রন্থকারের একমাত্র প্রার্থনা।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর, গ্রন্থপাঠে প্রীত হইয়া সিউড়ী নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত পুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্ মুন্সেফ মহোদয় এককালীন ২০ টাকা ও তাঁতিপাড়া নিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত বনবিহারী সিংহ মহোদয় এককালীন ১০ টাকা অর্থ সাহায্য করিয়া প্রথম খণ্ডের ঋণ পরিশোধকল্পে গ্রন্থকারকে পরম উৎসাহিত করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বর্ত্তমান খণ্ড সঙ্কলনকালে মদীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নিকট সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা আমার পরম গৌরব ও সৌভাগ্যের কথা। তাঁহার বহু অভিজ্ঞতার ফলেই বীরভূমের রাজস্ব-সংক্রান্ত আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্তের আলোচনা ও পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, উকিল ও শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন চৌধুরি মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা জানাইয়া আমায় যথেষ্টরূপ উপকৃত করিয়াছেন।

আমাদের জেলার সর্ব্বজন প্রিয় জেলা-জজ শ্রীযুক্ত ব্রজকান্ত গুহ আই, সি. এস্ মহোদয়, অফিস-লাইব্রেরীর পুস্তকাদি পরিদর্শনের সুযোগ প্রদান করায়, আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তিনি, আমাদের ইতিহাস সঙ্কলন ও প্রকাশ বিষয়ে প্রথম হইতে যথেষ্টই উৎসাহ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না।

পূর্ব্বখণ্ডের ন্যায় বর্ত্তমান খণ্ডের ফটোগুলিও আমার প্রতিবেশী গভর্ণমেন্ট আর্টস্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ শিল্পী ও চিত্রকর মূকবধির শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ভৌমিক মহাশয় শীতে, গ্রীষ্মে, বরষায় নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিয়াও, বিনা পারিশ্রমিকে তুলিয়া দিয়াছেন। ইঁহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। ১৫ পৃষ্ঠার ফটোখানি (বাহিরের দৃশ্য - গনুটিয়ার কুঠি) বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বি, এস্, সি; বি, এল্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তুলিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

এই গ্রন্থ সঙ্কলনকালে যে যে পুস্তক, রিপোর্ট প্রভৃতি হইতে সাহায্য

পাইয়াছি, তাহা যথাস্থলে ফুট্-নোটে প্রদত্ত হইয়াছে।

পরিশেষে, আমার ব্যক্তিগত হৃদয়-বিদারক দুঃখের কথা লিপিবদ্ধ করিতে যথেষ্ট বেদনা অনুভব করিতেছে। আমার তৃতীয় কনিষ্ঠ সহোদর, বঙ্গের বিখ্যাত ব্যায়ামবীর, কবি ও সুসাহিত্যিক বনগোপাল মিত্র, আমাদিগকে চির শোক-সাগরে ভাসাইয়া গত ২৮এ বৈশাখ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছে। সে, এই গ্রন্থের ১০ম ফর্ম্মা পর্য্যন্ত মুদ্রণ কার্য্য দেখিয়া গিয়াছে এবং কতই না আগ্রহের সহিত এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য রোগশয্যায় দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করিয়াছে ! সে কি ইহা এখন লক্ষ্য করিবে ? অশ্রুসিক্ত নয়নে ইহা ভাবিয়াই এই ভূমিকার উপসংহার করিলাম। ইতি -

শুভ আষাঢ়, ১৩৪৫ — শ্রীগৌরীহর মিত্র
রতন-লাইব্রেরী
সিউড়ী, বীরভূম

প্রথম খণ্ড

ইংরাজ অধিকারকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত

প্রথম অধ্যায়

অবস্থান ও সীমানা

বীরভূমের বর্ত্তমান অধিকৃত স্থান[১], অতি প্রাচীনকালে প্রাচ্য ভারতের কোন্ উপ-বিভাগের অন্তর্নির্বিষ্ট ছিল এবং কেমন করিয়া ইহার সুদূরবিস্তৃত পরিধি ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান সঙ্কুচিত আকারে পরিণত হইয়াছে, বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা তাহাই আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

বৈদিক গ্রন্থে, পুরাণে ও তন্ত্রে — ঐতরেয় আরণ্যক, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও অথর্ব্ব সংহিতা প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে - অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশের উল্লেখ আছে[২]। রামায়ণে দেখিতে পাই যে রাজা দশরথ অভিমানিনী কৈকেয়ীকে যে সমস্ত প্রদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার দুর্জ্জয়মান অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ প্রভৃতি নাম উল্লিখিত আছে[৩]।

মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও গরুড়পুরাণে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পঞ্চ প্রদেশের নাম উল্লেখ আছে। চন্দ্রবংশীয় বলি রাজার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ও দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে পাঁচপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই পাঁচপুত্রের নামানুসারেই পাঁচটি দেশ পরিচিত হয়[৪]-

(১) অঙ্গ - বর্ত্তমান ভাগলপুর অঞ্চল
(২) বঙ্গ - বর্ত্তমান বাঙলা, পূর্ব্ববঙ্গ বা সমতট
(৩) কলিঙ্গ - বর্ত্তমান যাজপুর অঞ্চল
(৪) সুহ্ম - বর্ত্তমান রাঢ় দেশ
(৫) পুণ্ড্র - বর্ত্তমান পৌণ্ড্র (মালদহ, গৌড়দেশ)

পাণ্ডবগণের রাজসূয় যজ্ঞকালে ভীমের পূর্ব্ব দিগ্‌বিজয়-প্রসঙ্গে মহাভারতে "সুহ্ম" দেশের উল্লেখ আছে[৫]।

পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন গ্রন্থনিচয় আলোচনা করিয়া মনে হয় যে গঙ্গা বা ভাগীরথীর পশ্চিমাংশে— অঙ্গ এবং পূর্ব্বাংশে - পুণ্ড্র ও বঙ্গরাজ্য অবস্থিত ছিল। পুণ্ড্রদেশ বা

বর্ত্তমান মালদহ এবং বঙ্গদেশ তাহার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে বিস্তৃত ছিল। দাতা কর্ণের আবাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ এই অঙ্গদেশ, ভাগীরথীর পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছিল এবং বীরভূমি সেই সময় অঙ্গ-বিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। এইরূপ বিভাগের পর, প্রাচ্য ভারতে ভাগীরথীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরবর্ত্তী প্রদেশ 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' নামে পরিচিত হয়। "শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে"র ৭ম পটলে, সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের, ও বঙ্গ হইতে ভূবনেশ্বর পর্য্যন্ত গৌড়দেশের সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে গৌড়, পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন অঙ্গ ও পুণ্ড্র বিভাগের স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতে - স্বারস্বত, কান্যকুব্জ, উৎকল, মিথিলা ও গৌড় -এই 'পঞ্চগৌড়ে'র কথা স্কন্দ পুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে উল্লেখ আছে। এই পঞ্চ-গৌড়ের মধ্যে বঙ্গের নিকটবর্ত্তী গৌড়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। আবার, পাণিনি বলেন- গৌড় ও বঙ্গ এককালে সাধারণভাবে গৌড়-দেশ বলিয়াই কথিত হইত। কিন্তু বৃহৎসংহিতা, গৌড় ও বঙ্গকে দুই স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য নির্দ্দেশ – মাসিডনের অধিপতি দিগ্বিজয়ী সেকেন্দরের ভারত-অভিযানের সময় (৩২৬ পূঃ খৃঃ) ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ দেশ- "গঙ্গারিঢ়ি" নামে অভিহিত হইত। অনুমান হয় যে, রাঢ়দেশ এই গঙ্গারিঢ়ির অন্তর্গত। মহাভারতের টীকাকার নীলকন্ঠ সুহ্ম-প্রদেশকে 'রাঢ়' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[১]। প্রাকৃত ভাষায় লিখিত 'আচারাঙ্গ সূত্র' নামক প্রাচীন জৈনগ্রন্থেও এই সুহ্মকেই "লাড়" বা "রাঢ়" নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব শেষ-শতাব্দীর শেষাংশে মহাকবি ভার্জ্জিল তাঁহার 'জর্জ্জিকাস' কাব্যে এই গঙ্গারিঢ়ি প্রদেশবাসিগণের অপূর্ব্ব শক্তিমত্তার কথা সগৌরবে উল্লেখ করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউয়েনসিয়াঙ্গ এদেশে আগমন করেন। সে সময় সুহ্ম বা রাঢ় দেশ বহু জনাকীর্ণ ছিল। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে আমরা অবগত হই যে, এই সময় বঙ্গদেশ, নিম্নলিখিত সাতটি ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত ছিল --

(১) কমলাঙ্ক – বর্ত্তমান ত্রিপুরা, কুমিল্লা, কামরূপ ও আসাম।

(২) চম্পা – বর্ত্তমান ভাগলপুর।

(৩) তাম্রলিপ্ত – বঙ্গদেশের পশ্চিম দক্ষিণে সাগরতীরস্থ স্থান, (বর্ত্তমান - তমলুক)।

(৪) শ্রীক্ষেত্র – বর্ত্তমান শ্রীহট্ট, (তখন জগন্নাথ বা পুরী শ্রীক্ষেত্র নামে পরিচিত হয় নাই)।

(৫) সমতট - বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গ দেশ।

(৬) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা পুণ্ড্র - বর্ত্তমান বঙ্গের উত্তর বিভাগ।

(৭) কর্ণসুবর্ণ – বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রাঙামাটি; মতান্তরে পশ্চিম বাঙলাপ্রদেশ (বর্দ্ধমান জেলার কাঞ্চননগর অঞ্চল)। বর্ত্তমান বীরভূমি, সিংহভূমি ও সুবর্ণরেখার সমীপস্থ স্থান সকল উহার অন্তর্ভূক্ত[৭]। ইহাতে অনুমিত হয় যে বীরভূমি, কর্ণসুবর্ণের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, বীরভূমি পুরাণোক্ত পুণ্ড্র দেশেরই অন্তর্গত। সেই পুণ্ড্র দেশ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার অধিকৃত স্থান লইয়া সংগঠিত হইয়াছিল[৮]। এই পুণ্ড্র, প্রাচীন রাজধানী গৌড় হইতেও প্রাচীনতর। বঙ্গদেশের উত্তরাংশে পূর্ব্বোক্ত যাবতীয় দেশই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের শাসনাধীন ছিল।

খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে – খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বীরভূমি-অঞ্চল, মগধ-রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। পরে, পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতিগণের বিশাল-রাজ্যের কুক্ষিগত হয়। পালবংশের প্রতাপ বিলুপ্ত হইলে, সেন-নরপালদিগের প্রভাব কালে, বল্লালসেন কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গ বা গৌড় রাজ্য - বরেন্দ্র, রাঢ়, মিথিলা, উপবঙ্গ বা বাগড়ী ও বঙ্গ –এই বিভাগ পঞ্চকে বিভক্ত হইলে, বীরভূম রাঢ়-বিভাগের অন্তর্ভূক্ত হয়। "দিগ্বিজয় প্রকাশ"-গ্রন্থে রাঢ়ের এইরূপ সীমা নির্দ্দেশ আছে-

গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পূর্ব্বতঃ।
দামোদরোত্তরে ভাগে রাঢ়দেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

এই "বীরদেশ", বীরভূমেরই নামান্তর। বলাবাহুল্য যে, মিথিলার পর হইতে গঙ্গা ও ভাগীরথীর পশ্চিমাংশে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত প্রদেশই "রাঢ়" বলিয়া খ্যাত হইত। মধ্যভারতের খাজরাহো-লিপিতে[৯] এবং বল্লালসেনের সীতাহাটি তাম্রশাসনে এই রাঢ়-দেশের উল্লেখ আছে। বাঁকুড়ার চন্দ্র বর্ম্মার শিলালিপিতেও রাঢ়ের পরিচয় পাওয়া যায়। "মহাবংশ" নামক সিংহলের প্রসিদ্ধ পালি গ্রন্থে, বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত "লাড়' নামের উল্লেখ আছে। "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটকে গৌড় রাজ্য মধ্যে "নিরূপমা রাঢ়াপুরীর" কথা বর্ণিত আছে। এই রাঢ় দেশ পরবর্ত্তী কালে(অনুমান খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে) 'উত্তর রাঢ়' ও 'দক্ষিণ রাঢ়' - এইরূপ দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়।

রাজেন্দ্রচোলের ১০২৪ খৃষ্টাব্দের তিরুমলয় গিরিলিপিতে "উত্তির লাডম্" ও "তক্কণ লাডম্" –অর্থাৎ, উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়ের কথা উৎকীর্ণ আছে।

গঙ্গার দক্ষিণ হইতে দামোদর নদের উত্তর তীর পর্য্যন্ত 'উত্তর রাঢ়' এবং দামোদর নদের দক্ষিণ হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিভাগ 'দক্ষিণ রাঢ়' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। আমাদের বীরভূমি, এই উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত।

"বীরাভূঃ কামকোটিঃ স্যাৎ প্রাচ্যাং গঙ্গাজয়ান্বিতা।
আরণ্যকঃ প্রতীচ্যাঞ্চ দেশো দার্ষদ উত্তরে।
বিন্ধ্যপাদোদ্ভবা নদ্যঃ দক্ষিণে বহবঃ স্থিতাঃ।"

'কুলপঞ্জিকার' এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে- বীরভূম পূর্ব্বে "কামকোটি" নামে খ্যাত ছিল। তখন ইহা পূর্ব্বাংশে অজয়সম্মিলিত গঙ্গা, পশ্চিমে ঝাড়খণ্ডের ঘন অরণ্য, উত্তরে রাজমহলের পর্ব্বত শ্রেণী বা পাথরের দেশ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপাদোদ্ভবা দামোদর প্রভৃতি বহু নদ নদী এই সীমার অন্তবর্ত্তী ছিল। কুলপঞ্জিকাকার মহেশ্বর অন্যত্র লিখিয়াছেন-

'কামকোটি বীরভূম জানিবে নির্য্যাস'।

কিন্তু, কামকোটি বলিয়া কোন স্থান এখন বীরভূমে পরিদৃষ্ট হয় না। তবে কান্তার, কামতা, কেউটা প্রভৃতি অপভ্রংশ নামের গ্রাম এই জেলায় দেখা যায়[১০]। কোন্ সময় যে বীরভূমি 'কামকোটি' নামে আখ্যাত হইত, তাহা নির্ণয় করা এখন সম্ভবপর নহে।

রাঢ় ও উৎকল (উড়িষ্যা) রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূমিখণ্ড 'মল্লভূমি' নামে পরিচিত। পূর্ব্বে, মল্লজাতি ইহার অধীশ্বর ছিল। বর্ত্তমান মানভূমি, সিংহভূমি, শিখরভূমি, শূরভূমি প্রভৃতি, প্রাচীনকালে মল্লদেশের অন্তর্গত ছিল এবং মল্লগণ দ্বারা অধ্যুষিত ও শাসিত হইত। মান, সিংহ, বরা, বীর, শূর, ধল প্রভৃতি আধুনিক মল্লগণের উপাধি দেখিয়াও তাহা উপলব্ধি হয়।

মেগাস্থিনিস উল্লেখ করিয়াছেন যে, সমুদ্রের উপকূলে কলিঙ্গি জাতির বাস; তদূর্দ্ধে মল্ল ও মল্লী - যাহাদের গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশে মল্লস নামক পর্ব্বত[১১]। ইউল সাহেবের মতে - মল্লস পর্ব্বত বর্ত্তমান দামোদরের সন্নিকট পরেশনাথ গিরি[১২]। ইহা পঞ্চকোটের শৈলমালা বা শুশুনিয়ার পাহাড় হওয়া অসম্ভব নহে। পরেশনাথ, পঞ্চকোট এবং শুশুনিয়া বর্ত্তমান মল্লভূমির বহির্ভূত; কিন্তু মেগাস্থিনিসের সময় 'ভূমি' প্রত্যয়ান্ত মানভূমি, বীরভূমি ইত্যাদি প্রদেশ যে মল্লদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে[১৩]।

'মল্লভূমি'-প্রবন্ধের লেখক অনুমান করেন যে, এই মল্লগণের বিভিন্ন সম্প্রদায় মান, সিংহ, বীর, বরা, ধল প্রভৃতি মল্লভূমি মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আপন আপন নামানুসারে মানভূমি, বীরভূমি, সিংহভূমি প্রভৃতি বিভাগ সৃষ্টি করিয়া থাকিবে।

আবার, Prelude to Pandit Ratna Mitabali গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে আদীশূরের সময়, অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে বীরভূম, সিংহভূম, বর্দ্ধমান ও মল্লভূম (বাঁকুড়া) মানভূম-প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

সম্রাট আকবর স্বকীয় বিশাল সাম্রাজ্যকে দ্বাদশ বিভাগে বিভক্ত করেন (উত্তরকালে পঞ্চদশ)। সুবা বাঙলা তন্মধ্যে অন্যতম। এই সুবা বাঙলা, চতুর্ব্বিংশতি সরকারে বিভক্ত হয় এবং এই সরকারগুলি আবার কিঞ্চিৎ ন্যূন আট শত মহাল লইয়া সংগঠিত হয়[১৪]।

বীরভূমের নাম, আমরা আবুল ফজলের লিখিত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে দেখিতে পাই। বীরভূমি মহাল, মাদারুণ সরকারের ষোলটি মহালের মধ্যে অন্যতম। মাদারুণ সরকারকে ৯৪০৩৪০০ দাম (টাকার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ)[১৫], ১৫০ অশ্বারোহী এবং ৭০০০ হাজার পদাতিক সৈন্য, দিল্লীর বাদশাহের নিকট বৎসর বৎসর সাহায্য করিতে হইত। তন্মধ্যে বীরভূমিকে ৪৯৫২২০ দাম দিতে হইত[১৬]। পরবর্ত্তী সময়ে, এই বীরভূম-মহালের সীমানা সঙ্কুচিত ও সম্প্রসারিত হইয়া তাণ্ডে সরকারের এব্রাহিমপুর, চোঙ্গনদীয়া, দায়ুদসাহী, স্বরূপসিংহ, কুমারপ্রতাপ, নওয়ানগর, জেন্নতাবাদ সরকারের সাহেজাদপুর, গোরাঘাট সরকারের ফতেপুর, সরিফাবাদ সরকারের সেরপুর, আকবরসাহী এবং মাদারুণ সরকারের বীরভূমি, নগর, সেনভূম প্রভৃতি মহাল লইয়া নূতন এবং স্বতন্ত্র জেলার সৃষ্টি হয়।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে – সুবা বাঙলার নবাব-নাজিম মুর্শিদকুলী খাঁ (১৭২৪-২৫ খৃঃ) ছোটনাগপুরের (ঝাড়খণ্ডের) বর্ব্বর দস্যুগণের ভয়াবহ আক্রমণ হইতে সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিবার নিমিত্ত পাঠান-বংশীয় আসাদুল্লা খাঁকে, বীরভূমের জমিদারী এবং সৈন্য প্রতিপালনের জন্য বহুতর জমি নিষ্করর‍ূপে ভোগ করিতে অনুমতি প্রদান করেন[১৭]। এই সময় হইতে বীরভূমি, মুর্শিদাবাদের অধীনে একটি স্বতন্ত্র বিখ্যাত জমিদারী বলিয়া পরিগণিত হয়।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙলার রাজস্ব আদায়ের একরূপ পাকা বন্দোবস্ত করেন। সেই সময় তিনি বাঙলাকে- ১৩টি চাক্‌লা বা বৃহদ্বিভাগে বিভক্ত করেন। এই বিভাগের অন্তর্গত – মুর্শিদাবাদ চাকলা, রাজসাহী, বোগরা (বগুড়া), পাবনা, বীরভূম ও নদীয়ার অধিকাংশ লইয়া সংগঠিত হয়। এই চাকলার অন্তর্গত বীরভূমের জমিদারী, বাঙলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন ছিল[১৮]।

তখন ভাগীরথী হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় দেওঘর, সাঁওতাল-পরগণার অধিকাংশ এবং বিষ্ণুপুর জমিদারী (বাঁকুড়া), বীরভূমজমিদারীর অধীন ছিল। তৎকালে, বিষ্ণুপুর জমিদারী বাদ দিলেও, বীরভূমের আয়তন ৩৮৫৮ বর্গমাইল

ছিল[১৯]। পরে, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে যখন মীর কাশীমআলি ইংরাজদিগকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম তাঁহার সিংহাসন লাভের প্রতিদান স্বরূপ প্রদান করেন, তখন বীরভূমির প্রায় তৃতীয়াংশ, বর্দ্ধমান চাকলার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল[২০]।

ইংরাজগণ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙলার দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হন; কিন্তু ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজেরা প্রত্যক্ষভাবে বীরভূমির শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বীরভূমির জমিদার ক্রমশঃ হীনবল হইলে, শত্রুগণ পুনরায় দেশলুন্ঠনে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহাদের গতিরোধ করা দুরূহ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন বীরভূমি, মুর্শিদাবাদের অধীন; এজন্য বীরভূমে কোন ইংরাজ কর্ম্মচারী থাকিত না। কেবল মাত্র, সময়ক্রমে বীরভূমির জমীদার বা রাজাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ইংরাজ কর্ম্মচারী প্রেরণ করা হইত। কিন্তু ইহাতে কোন স্থায়ী উপকার দর্শিত না। সেই নিমিত্ত ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নূতনতর বিভাগ সংগঠিত করিবার সময়, তৎকালীন গভর্ণর জেনারল লর্ড কর্ণওয়ালিশ ইহাকে বাঁকুড়ার সহিত একত্র করিয়া, (আর মুর্শিদাবাদের অধীনে না রাখিয়া) ২৯শে মার্চ্চ তারিখের কলিকাতা গেজেটে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র যুক্ত-বিভাগ রূপে সংগঠিত করিয়া প্রচার করিয়া দিলেন[২১]। কিন্তু কালচক্রের বিষম আবর্ত্তে বাঙ্গলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের এমনি হীনাবস্থা হইয়া পড়ে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা, ইহার ফৌজদারী ও বিচার বিভাগ একেবারে রহিত করিয়া, রাজস্ব বিভাগ বীরভূমির অধীনস্থ করিবার কল্পনা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন! কিন্তু কার্য্যতঃ এতদূর ঘটিয়া উঠে নাই!

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারী 'বোর্ড অব রেভিনিউ' এর আদেশ মত বীরভূম হইতে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের জমিদারী, বর্দ্ধমানে অন্তরিত হয়। পরে, কয়েক বৎসর 'জঙ্গল মহলের' অন্তর্গত থাকিয়া, ১৮৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া স্বতন্ত্র জেলা বলিয়া ঘোষিত হয়[২২]। এই সময় বীরভূম হইতে নিম্নলিখিত পরগণাগুলি বাঁকুড়ার অন্তর্ভূক্ত করা হয়- পাঁচেট, ঝরিয়া, বেলিয়াপুর, কাতরাস, নওয়াগড়, তুণ্ডা, জয়নগর, নগর কিয়ারা, বাগন কোড়ার, খাসলা, ঝালদিয়া, পাতকুম, তুড়ুং, বঙ্গমোদা, জয়পুর, মুকুন্দপুর ও পাঁড়রা।

ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের কালেক্টারী, ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিভাগের কার্য্যের অসুবিধা হওয়ায়, মুর্শিদাবাদ হইতে চতুর্দ্দশ বিভাগের কমিশনার ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে একটি খসড়া মানচিত্র সহ প্রস্তাব করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটি থানার কি প্রকার অসুবিধা হয়, তাহা দেখাইয়াছেন। যথাঃ-

থানা	দেওয়ানী	ফৌজদারী	কালেক্টারী
চন্দ্রপুর	ভাগলপুর	বীরভূম	বীরভূম
পলসা	বীরভূম	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ
ভরতপুর	মুর্শিদাবাদ	বীরভূম	মুর্শিদাবাদ

চন্দ্রপুর থানা সিউড়ী হইতে ১০ মাইল এবং ভাগলপুর হইতে ১২০ মাইল দূরবর্ত্তী। ইহার দেওয়ানী বিভাগ বীরভূমে হওয়া উচিত।

পলসা থানা বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় সমদূরবর্ত্তী; কিন্তু মধ্যে ভাগীরথী নদী ব্যবধান আছে। ইহার ফৌজদারী ও কালেক্টরী বিভাগ বীরভূমে হওয়া উচিত।

ভরতপুর থানা মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী; কিন্তু মুর্শিদাবাদ হইতে আসিতে হইলে, ভাগীরথী নদী পার হইতে হয়। ইহার সমগ্র বিভাগই বীরভূমে হওয়া উচিত; ইহাতে বীরভূমির কিছু সীমা বাড়িবে, কিন্তু মুর্শিদাবাদের দেওয়ানী ও ফৌজদারীর অনেক কার্য্যের লাঘব হইবে। এতদ্ব্যতীত, প্রস্তাবিত বিভাগে ভাগীরথী নদী, এই বীরভূম-মুর্শিদাবাদের প্রাকৃতিক সীমারূপে অবস্থিত রহিবে। এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধ – ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সাঁওতাল হাঙ্গামা নিবৃত্ত হইবার পর, বীরভূম ও ভাগলপুর জেলার যে অংশে সাঁওতালগণ বাস করে, তাহাই চতুঃসীমাবদ্ধ করিয়া 'সাঁওতাল পরগণা' নামে একটি বিভিন্ন জেলার সৃষ্টি হয়। অতঃপর, বীরভূমির অন্তর্নিবিষ্ট পরগণা দড়ি মৌড়েশ্বরের উত্তরাংশ, তপ্পে কুণ্ডহিত কড়েয়া, তপ্পে মহম্মদাবাদ, পরগণা পাবিয়া, ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তরাংশে অবস্থিত পরগণা হুকমাপুর প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত হইয়া যায়[২৩]। ইহার পূর্ব্বে, বীরভূমি নিম্নলিখিত ৩৮টি পরগণায় বিভক্ত হইয়া ৩,১১,৪.৪৬ বর্গমাইল স্থান অধিকার করিয়াছিল[২৪]– ১) আকবরসাহী, ২) আলিনগর, ৩) বারবক সিং, ৪) ভুরকুণ্ডা, ৫) ভদ্রপুর, ৬) ধাওয়া, ৭) দড়ি মৌড়েশ্বর, ৮) ফতেপুর, ৯) গোকুলতা, ১০) তালুক হুকমাপুর, ১১) তপ্পে হরিপুর, ১২) ইছাপুখুরিয়া, ১৩) জোয়ার ইব্রাহিমপুর, ১৪) খর্ন্নি, ১৫) খড়গাঁ, ১৬) খটঙ্গা, ১৭) কুতুবপুর, ১৮) তপ্পে কুণ্ডহিত কড়েয়া, ১৯) কাষ্টগড়, ২০) মল্লারপুর, ২১) তপ্পে মহম্মদাবাদ, ২২) মজকুর্ণী, ২৩) ননী, ২৪) পুরন্দরপুর, ২৫) তালুক পাবিয়া, ২৬) বড়রা, ২৭) রুকুনপুর, ২৮) তপ্পে সারট দেওঘর, ২৯) সাবেক মৌড়েশ্বর, ৩০) সাহালামপুর,

৩১) সা-ইসলামপুর, ৩২) সাহাজাদপুর, ৩৩) সুপুর, ৩৪) সেরপুর, ৩৫) স্বরূপ সিং, ৩৬) সেনভূম, ৩৭) আমডহরা ও ৩৮) জয়নুজাল।

আপাতঃ সুবিধার নিমিত্ত সীমান্তরেখার এবম্বিধ নিত্য পরিবর্ত্তন হেতু, অন্যবিধ অসুবিধায় রাজা এবং প্রজা উভয়কেই বিব্রত হইতে হইল। পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে (জমা-কামেল-তুমারী) পরগণা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংগৃহীত হইত এবং ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিভাগের কোন তারতম্য ছিল না। কিন্তু এই নূতন সীমা নির্দ্দিষ্ট করিবার সময় নিত্য পরিবর্ত্তনে, ফৌজদারী ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র হইলেও, রাজস্ব আদায়ের কোন নূতন বন্দোবস্ত হইল না – পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারেই কার্য্য চলিতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত, সীমান্ত অবস্থিত কোন এক ভূমিখণ্ড কোন্ জেলার অধীন, তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা কখন কখন কঠিন সমস্যা হইয়া পড়িত। বলিতে কি, কোন মহালের ফৌজদারী, দেওয়ানী ও কালেক্টরী কার্য্য, তিনিটি বিভিন্ন জেলার অধীনে নির্ব্বাহ করিতে হইত। একটি উদাহরণ দেখুন,- রাণীগঞ্জে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মে মাস হইতে বর্দ্ধমানের মহকুমা সৃষ্টি হইলে, কেবলমাত্র ইহার রাজস্ব বিভাগ বর্দ্ধমানের অধীন ছিল। কিন্তু ফৌজদারী কার্য্য বাঁকুড়ায় এবং দেওয়ানী কার্য্য বীরভূমে সম্পন্ন করিতে হইত। বর্ত্তমান বীরভূমির অধীন রামপুরহাট, নলহাটি প্রভৃতি থানার এলাকাভুক্ত স্থানেরও এই প্রকার অবস্থা ছিল।

এই প্রকার অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের সীমানার বিশেষরূপ সংশোধন করা হয়। থানা রামপুরহাট ও নলহাটির দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগ বীরভূমির এবং ইহাদের রাজস্ব-বিভাগ মুর্শিদাবাদের অধীন ছিল। এই বৎসর জুন মাসের প্রথম অবধি, রামপুরহাট ও নলহাটিকে সর্ব্ববিষয়েই মুর্শিদাবাদের অধীনস্থ করিয়া দেওয়া হয়। থানা পলসার (বর্ত্তমান নলহাটি ও মুড়ারই থানার অন্তর্নিবিষ্ট) শুদ্ধ দেওয়ানী বিভাগ বীরভূমির এবং ফৌজদারী ও রাজস্ব-বিভাগ মুর্শিদাবাদের অধীন ছিল। এই সময় ইহাকেও মুর্শিদাবাদের অধীনস্থ করা হয়[২৫]।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কান্দীর পরিবর্ত্তে রামপুরহাটে একটি মহকুমা সংগঠিত হয় এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রাজস্ব আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিবার নিমিত্ত, বীরভূম জেলার পরগণা স্বরূপ সিংহ, সেরপুর প্রভৃতি হইতে ন্যূনাধিক ৩৯ খানি গ্রাম মুর্শিদাবাদের অধীনস্থ করা হয়[২৬]। এই বৎসর নভেম্বর মাসে পুনরায় মুর্শিদাবাদ হইতে পরগণা বারবক্ সিং, কুতুবপুর, সাজেহানপুর, আলিনগর, স্বরূপ সিংহ, কাষ্ঠগড়, সেরপুর ও সাহাজাদপুরের অন্তর্গত সার্দ্ধ

শতাধিক গ্রাম বীরভূমের অধীনে আইসে[২৭](২নং মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের সীমানার পুনরায় অভিনব বন্দোবস্ত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে রামপুরহাট, নলহাটি ও ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে নভেম্বর তারিখে অন্তরিত পল্‌সা থানা, বীরভূম হইতে মুর্শিদাবাদের অধীনস্থ করা হইয়াছিল। কিন্তু, এই বৎসর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, ঐ সকল থানা মুর্শিদাবাদ হইতে পুনরায় বীরভূমে অন্তরিত করা হয়। মুর্শিদাবাদের অধীনে কান্দীতে পুনর্ব্বার মহকুমা স্থাপিত করিয়া বীরভূমির অধীন বড়ঞাঁ থানাকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইল এবং রামপুরহাট নলহাটি প্রভৃতি থানা বীরভূমির অধিনস্থ হইলে, রামপুরহাট ও নলহাটি (আউটপোষ্ট পলসা সমেত) এবং সদর সব ডিভিসনের পূর্ব্বান্তর্গত মৌড়েশ্বর থানা একত্র করিয়া, বীরভূমের অধীনে রামপুরহাটে একটি মহকুমার সৃষ্টি হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বন্দোবস্ত রহিত করিয়া, এই নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে বীরভূম জেলার, এই প্রকার বিভাগের সূচনা হইল[২৮]।—

দেওয়ানী	থানা	সবডিবিজন ফৌজদারী	মন্তব্য
সদর সিউড়ী	সিউড়ী রাজনগর		
দুবরাজপুর	দুবরাজপুর	সিউড়ী	
বোলপুর	বোলপুর সাকুলিপুর লাভপুর[২৯]		
রামপুরহাট	রামপুরহাট মৌড়েশ্বর (*) নলহাটি (পলসা সমেত)	রামপুরহাট	* মৌড়েশ্বর হইতে মুন্সেফী আদালত উঠিয়া গেল।

ইহার পর, সাঁওতাল পরগণা হইতে আরও তিনখানি গ্রাম বীরভূমির অধীন নলহাটি থানার অন্তর্নিবিষ্ট করা হয়।

বীরভূমির আয়তনের এই প্রকার নানাবিধ পরিবর্ত্তনের পর, বর্ত্তমান সময়ে বীরভূমি ৪৪টি পরগণায় বিভক্ত হইয়া[৩০], সদর বিভাগের অধীন ১১০৮ বর্গমাইল ও রামপুরহাট মহকুমার অধীন ৬৪৫ বর্গমাইল, সর্ব্বসমেত ১৭৫৩

বর্গমাইল বা ১১২১৯০ একর স্থান অধিকার করিয়া আছে।

Deputy Surveyor General, Captain M. S. Sherwill এই জেলা জরিপ করিয়া ইংরাজী ১৮৪৯-৫২ খৃষ্টাব্দে যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে দেখা যায় যে তখন এই জেলার পরিমাণ ১৯৯১৩৩৮ একর বা ৩১১৪৪৬ বর্গমাইল[৩১] ছিল এবং ইহা ৩৮টি পরগণায় বিভক্ত ছিল। তখন ইহার পূর্ব্বদিকে মুর্শিদাবাদ, উত্তরদিকে ভাগলপুর, দক্ষিণদিকে বর্দ্ধমান ও পুরুলিয়া এবং পশ্চিমদিকে রামগড় ও মুঙ্গেরের অবস্থান ছিল (৩নং মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে, বীরভূমির আয়তনের সহিত, বর্ত্তমান আয়তনের তুলনা করিলে কিঞ্চিদূর্দ্ধ চতুর্থাংশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বীরভূমির বর্ত্তমান চতুঃসীমা-

পূর্ব্বে - মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গীপুর ও কান্দী এবং বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়া।

দক্ষিণে- দক্ষিণ-পশ্চিম কোন হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোন পর্য্যন্ত বরাবর অজয় নদী প্রবাহিত। অজয়ের পরপারে রাণীগঞ্জ, নিজ বর্দ্ধমান ও কাটোয়া।

পশ্চিমে- সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত জামতাড়া, নিজ দুমকা ও পাকুড়।

উত্তরে - উত্তরভাগের পরিসর অতি সামান্য মাত্র। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের রাজগ্রাম ষ্টেশন পর্য্যন্ত। সীমান্তে - পাকুড় ও জঙ্গীপুর।

তথ্যসূত্র

(১) অক্ষাংশ- উত্তর ২৩° ৩৩′ হইতে ২৪° ৩৫′ ও দ্রাঘিমাংশ পূর্ব ৮৭° ১০′ হইতে ৮৮° ২′

(২) (ক) 'ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চের পাদান্যন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র' – ঐতরেয় আরণ্যক ২/১/১

(খ) 'অন্তান্ বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টেতি ত এতেহ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মুতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি' – ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭/১৮

(গ) 'গন্ধারিভ্যো মুজবদ্ভ্যোহঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ'- অথর্ব্ব সংহিতা ৫/২২/১৪

(৩) দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গমাগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশীকোশলাঃ॥
তত্র জাতং বহুদ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম্।
ততো বৃণীষ্য কৈকেয়ি! যদাত্বং মনসেচ্ছসি – রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ১০ম

(৪) (ক) 'অঙ্গোবঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি॥' -- মহাভারত, আদি পর্ব্ব, ১০৪ অধ্যায়

(খ) বলিঃ সুতপসো যজ্ঞে অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গকাঃ।
সুহ্মপৌণ্ড্রাশ্চবালেয়া অনপানস্তথাঙ্গতঃ॥ – গরুড় পুরাণ, ১৪৪ অধ্যায়

(গ) 'অঙ্গ বঙ্গ মদগুরুকা অন্তর্গিরিবহির্গিরি' – মৎস্যপুরাণ

(ঘ) হেমাৎ সুতপাঃ, তস্মাদ্বলিঃ, যস্য ক্ষেত্রে দীর্ঘতমসা অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গসুহ্ম পুণ্ড্রাখ্যং বালেয়ং ক্ষত্রমজন্যত। – বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ১৮শ অধ্যায়

(৫) 'ততঃ সুহ্মান্ প্রসুহ্মাংশ্চ স্বপক্ষানতিবীর্য্যবান্।
বিজিত্যযুধি কৌন্তেয়োমাগধানভ্যয়াদ্বলী' – মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৩০শ অধ্যায়, ১৬শ শ্লোক

পরবর্ত্তীকালে কবি কালিদাস রচিত 'রঘুবংশে', বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিতে', আচার্য্য দণ্ডি রচিত 'দশকুমার চরিত' নামক উপাখ্যান-গ্রন্থে ও ধোয়ী কবির 'পবন দূত' কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে, সুহ্ম প্রদেশের নাম দেখিতে পাওয়া যায় – "অনম্রাণাং সমুদ্ধর্ত্তুস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব। আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈবৃর্ত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্॥" – রঘুবংশ, ৪র্থ সর্গ, ৩৫শ শ্লোক

(৬) সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ -নীলকন্ঠ – মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৩০শ অধ্যায়, ১৬ ও ২ শ্লোক, টীকা-বঙ্গবাসী

(৭) বাঙ্গালার ইতিহাস – 'নব্যভারত', ১৭শ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা, ৪০২ পৃঃ

(৮) 'অনুসন্ধান', ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৩ পৃঃ

(৯) বাঙ্গালার ইতিহাস – রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, ২১৩-১৪ পৃঃ

(১০) "কবি জয়দেব ও শ্রীগীতিগোবিন্দ" ১ পৃঃ ও 'সম্বন্ধ নির্ণয়' ক্রোড়পত্র, পৃঃ ১২-১৩

(১১) Fragments-I. VI.

(১২) Indian Antiquary-VI. p. 127.

(১৩) 'মল্লভূমি' - ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম ভাগ, ৩য় খণ্ড, ৩৬২ পৃঃ

(১৪) The History of the 12 Soobahs and Tukseen Jumma of the Soobah Bengal — Gladwin's 'Ayeen Akbari'

(১৫) আইন-ই-আকবরী ২৯৭ পৃঃ পাদটীকা

(১৬) আইন-ই-আকবরী ৪৭৩ পৃঃ

(১৭) আইন-ই-আকবরী ৪৭৩ পৃঃ পাদটীকা

(১৮) জমা কামেল তুমারী - সাহিত্য -৮ম বর্ষ, ১১৮ পৃঃ

(১৯) Hunter's S. A. VOL IV, p 316

(২০) Do VOL IX, p 18

(২১) Hunter's S. A. VOL IX, p 19.

(২২) Hunter's S. A. VOL IV, p 206

(২৩) Act XVII of 1855

(২৪) Dy Surveyor General Captain W. S. Sherwill's map of the District of Birbhum (Compiled from the original purgana maps) 1854

(২৫) Calcutta Gazette, May 22nd, 1872, p 2323

(২৬) Calcutta Gazette 1875. 24th Feb.

(২৭) Do 10th Nov. 1875

(২৮) Calcutta Gazette, Ist. Oct. 1879

(২৯) ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের রেজিষ্টারী আইন অনুসারে বীরভূম জেলার মধ্যে লাভপুরে যে Sub District হয়, তাহা এই বন্দোবস্তের পর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২২এ অক্টোবর Calcutta Gazette-এ রহিত হইয়া যায় - পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্রের স্মারকলিপি।

(৩০) দেওঘর হইতে পৃথক হইবার পূর্ব্বে ৩৮, রামপুরহাট বীরভূমির অন্তর্ভূত হইবার পূর্ব্বে ৭৭, বর্ত্তমানে - ৪৪ (২৯ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য)

(৩১) ৬৪০ একর = এক বর্গমাইল, এক একর = তিন বিঘা আধ কাঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নামরহস্য

বীরভূমি, আপন বর্ত্তমান আখ্যা কি প্রকারে কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার প্রবাদ ভিন্ন অপর ঐতিহাসিক প্রমাণ সুলভ নহে। তবে, ইহার নামোৎপত্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবাদ, জনশ্রুতি বা অনুমানমূলক কথা প্রচলিত আছে - এস্থলে, তাহারই কতকগুলি লিপিবদ্ধ করা হইল—

বীরভূমি, চিরকাল বীরজনয়িত্রী বলিয়া গৌরবান্বিতা। এজন্য, ইহার নাম 'বীরভূমি' হওয়া বিচিত্র নহে। কত পরাক্রমশালী ব্যক্তি, স্বকীয় বীর্য্য-প্রভাবে অদূরবিস্তৃত বেষ্টনীমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ সৃজন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছেন। অসভ্য বর্ব্বরগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও, অপেক্ষাকৃত সভ্য বীরভূমবাসিগণও সাধারণতঃ সমধিক বলিষ্ঠ ও সাহসী ছিল। এইরূপ বলশালী ও সাহসী হইবার আমরা দুইটি প্রধান কারণ দেখিতে পাই।

প্রথম- দেশের অবস্থা অনুসারে অধিবাসিগণের প্রকৃতি সংগঠিত হইয়া থাকে। নদী বা সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী মানবেরা নৌ-সঞ্চালনে অভ্যস্ত; পার্ব্বত্য প্রদেশীয়গণ স্বভাবতঃ কষ্টসহিষ্ণু। আবার, যাহারা অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর-ক্ষেত্রে বাস করিয়া অপরের মৎসরতা উদ্রিক্ত করিতে থাকে, অকালে বিপদ্-সম্পাতে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া দস্যু বা আক্রমণ-কারীকে বিতাড়িত করিবার নিমিত্ত তাহারা অসি বা লগুড়-সঞ্চালনে সমধিক পটু এবং বলবীর্য্য ও সাহসে অধিকতর উজ্জীবিত। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে বীরভূমি, পূর্ব্বে বর্ত্তমান অপেক্ষা আরও আয়ত ও বহুবিস্তৃত ছিল। যদিও অনুর্ব্বর শৈলরাজি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা শ্রেণীবদ্ধভাবে বহুদূর ব্যাপিয়া প্রস্তরবক্ষে দণ্ডায়মান ছিল এবং হিংস্র ও ভয়াবহ জন্তুর আবাসভূমি নিবিড় অরণ্যরাজি, বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া দেশ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল, তথাপি অজয়, হিঙ্গলা, ভাগীরথী প্রভৃতি নদ নদীর শুভ প্রসাদে, অনুর্ব্বর ক্ষেত্র বলিয়া বীরভূমের অপবাদ কোনকালেই রটিত হয় নাই। পরন্তু, ধনধান্যশালী বলিয়া ইহার খ্যাতি বহু দূরদেশ পর্য্যন্তও প্রচারিত হইয়াছিল। তখন

এখানে ধান্য, ইক্ষু, সর্ষপ, পাট, কার্পাস, শণ, প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন এবং নীলবড়ি, রেশম ও তসরের কারবার পূর্ণমাত্রায় পরিচালিত হইত। অরণ্যমধ্যে সুবৃহৎ কাষ্ঠের অভাব ছিল না; নদীগর্ভে বালুকণার সহিত বিমিশ্রিত সুবর্ণরেণু সৌরকরোদ্ভাসিত হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত এবং অতি পূরাকালেও লৌহের ব্যাপার প্রায় এমনিভাবে প্রচলিত ছিল[১]।

মধ্যভারত, বঙ্গদেশ অপেক্ষা অতিশয় অনুর্ব্বর এবং অসভ্য ও বর্ব্বর জাতির আবাসভূমি। এই অসভ্য জাতিসমূহ মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধভাবে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া দেশের ধনরত্ন ও শস্য প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যাদি লুন্ঠন করিয়া পলায়ন করিত। পরিশ্রমের ফল, এই প্রকারে বৃথা নষ্ট হইতে লাগিল। এখনকার মত তখন এতদঞ্চলে একছত্র রাজার শাসন ছিল না, এবং কেহ কাহারও সাহায্যে সহজে প্রবৃত্ত হইত না। অগত্যা, নিজের প্রাণ এবং ধনরত্নাদি রক্ষার ভার নিজেকেই গ্রহণ করিতে হইত। দলবদ্ধ দস্যুদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, সময়ক্রমে একক শক্তির প্রয়োজন হইত। এজন্য, বীরভূমবাসীদিগকে ঐ সমস্ত অসভ্য বর্ব্বর শত্রুর হস্ত হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য 'বীর' হইতে হইয়াছিল। ইহা অতি প্রাচীনকালের কথা।

দ্বিতীয়- অনেকেই "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" কথা শুনিয়া থাকিবেন। ১১৭৬ সালে (১৭৬৯ খৃঃ) দেশব্যাপী মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে বাঙলার তৃতীয়াংশ লোক প্রাণত্যাগ করে। ইংরাজ-রাজ তখন সবেমাত্র, কয়েকবৎসর হইল, রাজত্বের সূত্রপাত আরম্ভ করিয়াছেন! দেশের অবস্থা যাহাই হউক, এই দারুণ দুর্ভিক্ষের বৎসরেও নানাবিধ অত্যাচারের পর, বীজ-ধান্য পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া, পূর্ণমাত্রায় রাজস্ব সংগৃহীত হইল। কত রাজা, কত জমিদার অর্থাভাবে কারারুদ্ধ হইলেন। এই সময়, অধিকাংশ লোকেই গৃহত্যাগ করিয়া দূরদেশে ও অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। রীতিমত দস্যুদল সংগঠিত হইল এবং জমিদারগণও অনন্যোপায় ভাবিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদানে জীবিকা-সংস্থানের উপায় করিয়া লইল। কালে, তাহারা দেশকাল বুঝিয়া এই জঘন্যবৃত্তিই জীবিকা উপার্জ্জনের প্রশস্ত উপায় ভাবিয়া আপনাপন বংশধরগণকে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিল! এইরূপ দস্যুবৃত্তিকেই তাহারা স্পর্দ্ধা ও গৌরবের কথা বলিয়া নিজমুখে ব্যক্ত করিতে ঘৃণা বা লজ্জাবোধ করিত না! ইংরাজ-রাজ বহু কষ্টে অতি কঠোর দণ্ডের বিধান করিয়াও, ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের কমে এই দস্যুবৃত্তি দমন করিতে সক্ষম হন নাই[১]। যে প্রকার ক্ষিপ্রকারিতা ও সাহসিকতার সহিত এই দস্যুগণ একেবারে চারি পাঁচ শত জন একত্র হইয়া নগর বা গ্রাম আক্রমণ করিত, তাহাতে শিক্ষিত সৈন্য অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে

বলবীর্য্যশালী বলিয়া প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। ফলতঃ বিপাকে পড়িয়া দস্যুবৃত্তির ঘৃণিত অপরাধে অপরাধী না হইলে, তাহারা যে যথার্থই রণকুশল "বীর" নামে আখ্যাত হইতে পারে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন, এই বিবরণ হইতে "বীরভূমি"-নামের সার্থকতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

বীরভূমবাসিগণের বীর্য্যবত্তা সম্বন্ধে একটি উপকথা বা গল্প প্রচলিত আছে। একদা বিষ্ণুপুরাধিপতি মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া স্বরাজ্যের শৈলময় সীমান্ত প্রদেশে, একটি বলাকা শীকার করিবার মানসে, আপনার সুশিক্ষিত বাজপক্ষীকে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করেন। বলাকা, বাজপক্ষীর কবলে পতিত না হইয়া তাহাকে এম্‌নি উগ্রভাবে তাড়না করিল যে বাজপক্ষীটি আর কোন মতেই অগ্রসর হইতে না পারিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল এবং বলাকাও পূর্ব্বমত নিজ উদর পূরণে মনোনিবেশ করিল। রাজা স্বচক্ষে এই ঘটনা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং যে দেশের একটি সামান্য ইতর জাতীয় খেচর এতদূর সাহসী ও বলশালী, সে দেশের মনুষ্যেরা না জানি কতই বলবীর্য্যশালী হইবে, এই ভাবিয়া, এই প্রদেশকে 'বীরমাটি' বা 'বীরভূমি' নামে অভিহিত করিলেন। প্রবাদ এই যে, তদবধি এই স্থানের নাম "বীরভূমি" হইয়াছে। ইহা নির্জ্জলা উপকথা।

এই "বীরভূমি"-নামের অনুরূপ, পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে আমরা আরো অনেকগুলি নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা - মল্লভূমি, সিংহভূমি, শিখরভূমি, বরাহভূমি, ধলভূমি, ভঞ্জভূমি, ব্রাহ্মণভূমি, সেনভূমি ইত্যাদি। এই নিমিত্ত "মল্লভূমি"-প্রবন্ধ[৩] লেখক অনুমান করেন যে, মল্লগণের বিভিন্ন সম্প্রদায় - মান, সিংহ, বরা, ধল প্রভৃতি - কালে, মল্লভূমি হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আপনাপন নামানুসারে মানভূমি, ধলভূমি, সিংহভূমি ও বীরভূমি প্রভৃতি বিভাগ সৃষ্টি করিয়া থাকিবে।[৪]

প্রবাদ যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (ঐতিহাসিকগণের মতে ১২৪৪ খৃঃ) বীরভূমের পুরাতন রাজধানী লক্ষুর (বর্ত্তমান রাজনগর) পার্ব্বত্য জাতি কর্ত্তৃক সময় সময় লুন্ঠিত ও আক্রান্ত হইত। তখন সমগ্র বাঙলা দেশ প্রধানতঃ পূর্ব্ববঙ্গের সুবর্ণগ্রাম, দক্ষিণবঙ্গের সপ্তগ্রাম এবং পশ্চিমবঙ্গের গৌড় - এই তিন বিভাগে বিভক্ত হইয়া এক একটি শাসনকেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এবং পরে, সুবর্ণগ্রাম ও লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা পরস্পর দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদে রত ছিলেন। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগে "বীর"-উপাধিধারী এক হিন্দু লক্ষুরে আধিপত্য স্থাপন করেন। অনেকেই অনুমান করেন যে এই "বীর"-উপাধিধারী রাজার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই দেশ 'বীরভূমি' নামে অভিহিত হইতেছে।

"বর্ত্তমান বীরভূম জেলার কতকঅংশ শালতরুসমাকীর্ণ শালনদীর উত্তরে থাকায়, এইস্থান 'উচ্ছাল' নামে পরিচিত ছিল। বীরবর সিংহ বংশের রাজ্য হেতু, ইহা পরবর্ত্তীকালে 'বীরভূম' নামে খ্যাত হইয়াছে। যেখানে এই সামন্ত-রাজ্যের শাসনকেন্দ্র ময়গলপুর ছিল, সেই স্থান এখন 'মহলপুর' বা 'মোলপুর' নামে অভিহিত। ইহা, অক্ষা ২৩°৫৬'৪৫' উঃ এবং দ্রাঘি ৮৭°৩৭'পূঃ মধ্যে সিউড়ী হইতে ৪ মাইল উত্তরে ময়ূরাক্ষী নদীর শাখা কানা-নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত। ইহার তিনপোয়া পশ্চিমে রাজনগর গ্রাম (বীরভূমের মুসলমান রাজধানী রাজনগর নহে)। এখানে ভাস্কর সিংহের রাজধানী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। শাল নদীর উত্তরবর্ত্তী 'জৈন-উঝিয়াল্' পরগণা, প্রাচীন উচ্ছাল নাম রক্ষা করিতেছে" – ('বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' রাজন্য কাণ্ড, ১২৯ পৃঃ)।

প্রায় নয় শত বর্ষ পূর্ব্বে কান্যকুব্জাগত ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভ – এই পঞ্চব্রাহ্মণ বাসের জন্য যথাক্রমে, পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম এই পাঁচটি স্থান প্রাপ্ত হন।

পঞ্চকোটিঃ কামকোটি র্হরিকোটি স্তথৈবচ।

কঙ্ক গ্রামো বটগ্রাম স্তেষাং স্থানানি পঞ্চচ॥

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে, 'কামকোটি' বীরভূমের অন্যতম নাম। "সম্বন্ধ নির্ণয়" গ্রন্থের ক্রোড়পত্রের ১৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মহেশ্বরের কুলপঞ্জিকায় ইহা এড়ু মিশ্রের উক্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ ও বীরভূম জেলার সমস্ত উত্তরাংশ অজয় নদীর তীর পর্য্যন্ত এবং বর্ত্তমান মালদহ ও রাজসাহী জেলার সর্ব্ব দক্ষিণ অংশ এক সময় "দণ্ডভুক্তি" নামে পরিচিত ছিল (বীরভূম বিবরণ ১ম খণ্ড, ভূমিকা, ৯ পৃঃ)।

বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে বীরসেন নামে চন্দ্রবংশীয় এক রাজা ছিলেন। তাঁহারই বংশে সামন্ত সেন, বিজয় সেন, বল্লাল সেন প্রভৃতি রাঢ়ের সেনবংশীয় রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই "সদাচার পালন খ্যাতিগর্ব্বে গর্ব্বান্বিত রাঢ়দেশকে অননুভূতপূর্ব্ব প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন।" অনেকের মতে এই সেনবংশীয় নৃপতিগণই, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ এই বীরসেনের নামানুসারেই, এই অঞ্চলের নাম "বীরভূমি" বলিয়া প্রখ্যাত করেন।

প্রবাদ এই যে, প্রায় সাত আট শত বর্ষ পূর্ব্বে পশ্চিমোত্তর প্রদেশ হইতে (কাহারও কাহারও মতে, পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে) বীরসিংহ ও চৈতন্য সিংহ নামক

দুই ভ্রাতা বীরভূমে আগমন করিয়া অসভ্য আদিম নিবাসীদিগকে পরাজিত করেন। বীরসিংহ, বর্ত্তমান সিউড়ীর ছয় মাইল পশ্চিমে, আপনার নামানুসারে বীরসিংহপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই বীরসিংহ রাজাই বীরভূমের আদি হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া খ্যাত। এ সম্বন্ধে অপর প্রবাদ এই যে – বীরসিংহ জরাসন্ধ রাজার বা তাঁহার পুরোহিতের বংশধর এবং বীরভূমের শেষ হিন্দু রাজা। ইনি স্বীয় বাহুবলে দেশ জয় করিয়া রাজত্বের পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পরে, মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। রাজমহিষীও অত্যাচারের ভয়ে নিকটস্থ সুবৃহৎ কালীদীঘীর জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই কালীদীঘী এখনও রাণীর বিষাদময় দুর্ঘটনা স্মরণ করাইয়া 'রাণীর বান্দ' নামে কথিত হয়। রাজা বীরসিংহ, স্বীয় রাজধানীতে কালীমাতার (ভ্রম ক্রমে কেহ কেহ বলেন - গোপাল জীউর ও কালীমাতার) যে বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং রাজধানীর অপর অংশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া 'ভাণ্ডীরবন' নামে[৫] অভিহিত হইতেছে। বর্ত্তমান বীরসিংহপুরের পূর্ব্বাংশে বীরসিংহ রাজার রাজবাটির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন বলিয়া সাধারণে একটি ধ্বংসস্তূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এখানে, এখনও প্রচুর ইষ্টকখণ্ড ও ঘন বেল-বন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বীরসিংহ রাজার বীরপণা সম্বন্ধে আর একটি অন্যবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। তিনি এতদূর বলশালী ছিলেন যে অঞ্জলি মধ্যে সর্ষপ নিষ্পেষিত করিয়া তৈল নিষ্কাসিত করিতেন। ইঁহার মহিষীর সহিত মুসলমানগণের অবৈধ প্রণয়ের কথা শুনা যায়; কিন্তু তাহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। রাঢ়ের এই বনময় প্রদেশের হিন্দুনরপতি কিছুদিন স্বাধীনভাবেই রাজ্য পরিচালনের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার পরই বীরভূমে মুসলমান রাজত্বের সূচনা হয়। অনেকেই বলেন যে, বীরসিংহ রাজার নাম হইতেই 'বীরভূমি' নামের সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে।

সাঁওতালী-ভাষায় 'বির' শব্দের অর্থ জঙ্গল। এই জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, 'বীরভূমি'-শব্দ সাঁওতালী ভাষা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে[৬]। পূর্ব্বে এই দেশ যে প্রকার জঙ্গলময় ছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে যে পরিসর অধিকার করিয়া জঙ্গল বর্ত্তমান আছে, তাহাতে 'বীরভূমি'কে 'বীরভূইয়্যা' বা জঙ্গলময় ভূমি অভিহিত করা বিচিত্র নহে।

পূর্ব্বে বীরভূমে বীরাচারসম্মত ধর্ম্মানুষ্ঠান সমধিক প্রচলিত ছিল। তারাপুর, নলহাটি, লাভপুরের ফুল্লরা, কঙ্কালীতলা প্রভৃতি পীঠস্থান তাহার প্রমাণ। অনেকের মতে বীরাচারের প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া এদেশের "বীরভূমি" নাম হইয়াছে।

চীন পরিব্রাজক হিউয়েন-সঙের গ্রন্থে, 'কিরণ সুবর্ণ' নামক স্থানের উল্লেখ আছে। এই 'কিরণ সুবর্ণ' তাম্রলিপ্তির (বর্ত্তমান,তমলুক) সাত শত লী বা ১১৭

মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। কানিংহাম সাহেব বলেন যে, এই 'কিরণ সুবর্ণ' সিংভূমে অবস্থিত। ফারগুসন্ সাহেবের মতে বীরভূমির অন্তর্গত 'নগর' নামক স্থানই প্রাচীন 'কিরণ সুবর্ণ'[৭]; কিন্তু এই মত অকাট্য বা অভ্রান্ত নহে। নগরকে পারশী গ্রন্থে "লক্ষুর" নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়[৮]।

বীরভূমির বর্ত্তমান রাজধানী সিউড়ী, 'শূরী' (বা শৌর্য্যশালী) শব্দের অপভ্রংশ[৯]। ইংরাজী ভাষায় এখনও "সিউড়ী" না লিখিয়া "শূরী" লিখিত হয়। এইজন্য অনেকেই অনুমান করেন– 'শুরী' ও 'বীরভূমি' পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নামের সার্থকতা প্রকাশিত করিতেছে।

"শিবাড়ী" বৌদ্ধদিগের একটি নাম। বীরভূমে এককালে বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া "শিবাড়ী" হইতে "সিউড়ী" হওয়া বিচিত্র নহে[১০]। "সম্বন্ধ-নির্ণয়"-গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে– "জেলা বীরভূমের প্রধান নগর সিউড়ী। এই অঞ্চলে অদ্যাপি বেদগর্ভের অন্যতম সন্তান শিয়ারী শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। এই "শিয়ারীর" অপভ্রংশই –"শিউড়ী"।

তথ্যসূত্র

(১) Hunter's Annals of Rural Bengal, pp. 2–4

(২) Hunter's Annals of Rural Bengal, pp. 72–75

(৩) মল্লভূমি - ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম ভাগ, ৩য় খণ্ড, ৩৬২ পৃঃ

(৪) পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত স্মারকলিপি

(৫) বিস্তারিত বিবরণ ভাণ্ডীরবনের পূর্ব্ব-ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

(৬) Imperial Gazetteer of India, Vol III

(৭) সাহিত্য, ১০ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা ২০৮ পৃঃ

(৮) ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম ভাগ ২য় খণ্ডে রিয়াজ-উস্-সালাতিনে সংযোজিত পাদ-টীকা, ১৮৫ পৃঃ

(৯) Statistical Account of Birbhum, p 383

(১০) পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের স্মারক-লিপি

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাকৃতিক পরিচয়

ভূপৃষ্ঠ পরিচয়- বীরভূমের বর্ত্তমান আকার, দেখিতে একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মত। উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৬৫ মাইল ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে অজয় তীরবর্ত্তী সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত সীমা প্রায় ৫০ মাইল। এই জেলার উত্তরাংশের বিস্তৃতি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া প্রায় ৫ মাইলে পরিণত হইয়াছে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান-রেলওয়ে, বোলপুরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে প্রবেশ করিয়া সমগ্র জেলাকে উত্তর-দক্ষিণে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া রাজগ্রামের পর হইতে সাঁওতাল পরগণায় প্রবেশ করিয়াছে। জেলার সমগ্র দক্ষিণাংশে অজয় নদী প্রবাহিত হইয়া ইহাকে যেমন বর্দ্ধমান জেলা হইতে পৃথক্ করিয়াছে, তেমনি ময়ূরাক্ষী নদী এ-জেলার পশ্চিমাংশে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বাংশে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করিয়া, ইহাকে উত্তর ও দক্ষিণ - এই দুই উপ-বিভাগে বিভক্ত করিয়াছে। দক্ষিণ বিভাগ ও উত্তর বিভাগের মহম্মদ বাজার এবং সাঁইথিয়া ও মৌড়েশ্বরের কিয়দংশ লইয়া সদর সব্‌ডিভিসন এবং বাকী উত্তরাংশ লইয়া রামপুরহাট সব্‌ডিভিসন গঠিত হইয়াছে।

বীরভূম জেলার উত্তর সীমান্তের অদূরে, সাঁওতাল পরগণার পাহাড় ও গঙ্গা নদী পরস্পর পৃথক্ হইয়া, গঙ্গা পূর্ব্ব-দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে এবং পাহাড়-শ্রেণী দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া বীরভূম সীমার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

এই পাহাড়শ্রেণী বীরভূম জেলার পশ্চিম সীমান্তে প্রবিষ্ট হইলেও সীমান্ত-রেখা হইতে প্রায় সর্ব্বত্র পৃথক্ হইয়া রহিয়াছে। এদিকে গঙ্গানদীও, পূর্ব্ব সীমান্ত-রেখা হইতে দশ-পনর বা ততোধিক মাইল দূরে প্রবাহিত হইতেছে।

এই জেলার সমগ্র ভূমি-পৃষ্ঠ সমান বা সমতল নহে। সাধারণতঃ উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ইহা ক্রমনিম্ন হইয়া গিয়াছে। ইহার পশ্চিম সীমান্তসংলগ্ন প্রস্তরময় পাহাড়শ্রেণী বিচ্ছিন্নভাবে প্রায় অধিকাংশ সীমা-রেখার

নিকটবর্ত্তী স্থানে বিস্তৃত হইয়া আছে। স্থানে স্থানে এক একটি উচ্চ ও বিরল পাহাড় মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে। এই পাহাড়শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী নদীমাতৃক ব্যবহিত-প্রদেশ, ভাগীরথী প্লাবিত নিম্নভূমিতে আপন আপন স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। ফলে, এই জেলার মধ্যে প্রবাহিত প্রায় সমস্ত নদীর গতি পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছে। পশ্চিমাংশের অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী ও ব্যবহিত-প্রদেশের বহু স্থান, শাল প্রভৃতি বৃক্ষের জঙ্গলে সমাচ্ছাদিত। সমতল ভূমির ন্যায় পাহাড়ের নিম্নদেশও কৃষিকর্ম্মের জন্য ব্যবহৃত হয়। বলাবাহুল্য যে, প্রস্তরময় পাহাড়ের শিখরদেশ অকর্ষিত রহিয়াছে; এবং স্থানে স্থানে সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি জোনারী, অরহর প্রভৃতির কিছু কিছু চাষ করিয়া থাকে। জেলার উত্তরাংশের পাহাড় শ্রেণী, পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। নলহাটি, মুরারই ও রামপুরহাট থানার অধিকাংশই সমতল হইলেও, অদূরে পূর্ব্বান্তবর্ত্তী গাঙ্গেয় প্রদেশের মত নিম্নভূমি নহে।

নলহাটি থানায় সাত আটটি স্বতন্ত্র প্রস্তরময় পাহাড় আছে। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতমটি, মথুরাখালি পাহাড়ী নামে পরিচিত।

মৌড়েশ্বর ও সিউড়ী থানার পশ্চিমাংশে অনেক অনুচ্চ পাহাড় দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। কিন্তু এতদঞ্চলের উত্তরাংশ প্রায় সমভূমি এবং ময়ূরাক্ষী নদীর দক্ষিণাংশে ইহা কতক নিম্নভূমিরূপে পরিণত হইয়া, কিছুদূরে আবার কিয়ৎ পরিমাণে উচ্চ হইয়াছে। ময়ূরাক্ষীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী সিউড়ীর পূর্ব্বাঞ্চলের কিয়দংশ সমভূমি, কিন্তু সাঁইথিয়া-অঞ্চল ক্রমোচ্চ হইয়াছে।

সাঁইথিয়ার পূর্ব্ব হইতে লাভপুর এবং বোলপুরের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত কঙ্করময় ভূমি ক্রমনিম্ন হইয়া গিয়াছে। অজয়ের উত্তরাংশ এবং লাভপুর ও বোলপুরের দক্ষিণাংশ ভূমিখণ্ড একেবারে সমতল। ইহার মধ্যে পূর্ব্বাবাহিনী নদীসমূহ প্রবাহিত হইবার স্বাভাবিক সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিতায়তনে প্রবাহিত হইতেছে।

বীরভূমের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ সংলগ্ন বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণা প্রদেশের অদূরেই অজয়নদীর তীরে কতকগুলি প্রস্তরময় বিচ্ছিন্ন পাহাড় রহিয়াছে।

জেলার অনেক স্থলে প্রস্তরময় সুবিস্তীর্ণ উন্মুক্ত ডাঙ্গা পরিদৃষ্ট হয়।

এই জেলা, সমুদ্র হইতে গড়ে প্রায় নব্বই হইতে হাজার ফিট উচ্চ। ইহার মধ্যস্থিত কোন কোন পাহাড় ২৫০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ভূ-গর্ভ পরিচয় – এই জেলার স্থানে স্থানে অল্প নিম্নে ও মৃত্তিকোপরি বড় বড় বেলে-পাথর পাওয়া যায়। এই সমস্ত প্রস্তর কাটিয়া বড় বড় মন্দির, বাড়ী, রেলের সাঁকো প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাঁতিপাড়া, দুবরাজপুর প্রভৃতি

অঞ্চলে জঙ্গলাকারে পতিত সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডগুলি সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে। দুবরাজপুরের এক একটি প্রস্তরের বেড় শতাধিক হস্ত এবং উচ্চতাও প্রায় তদ্রুপ। বড়রা অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাঁসা-পাথর দেশ-বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। রাজগাঁ, নলহাটি ও রামপুরহাটের প্রস্তরের খনির কথা সর্ব্বজনবিদিত। এই জেলার প্রায় সর্ব্বত্র ঘুটিং নামক ছোট ছোট পাথর প্রচুর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। চূণ প্রস্তুতের জন্য বর্ষার পর, এই ঘুটিং, বহু পরিমাণে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

পারশুণ্ডী, জামালপুর, আরং বা আরঙ্গাবাদ, ভেলেনি, ব্রজডিহি, বেলিয়া (বেলে) নারায়ণপুর, আয়াস, ডেহুচা, মহম্মদবাজার, ডামরা, গণপুর, মল্লারপুর, সাঁইথিয়া, টাঙ্গসুলি প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে লৌহ-প্রস্তর পাওয়া যায়। এই সকল লৌহ-প্রস্তর সংগৃহীত হইয়া পূর্ব্বে কোন্ কোন্ স্থলে লৌহ প্রস্তুত হইত এবং কোথায় কোথায় সে সমুদয়ের সুবৃহৎ কারখানা ছিল, তাহা যথাস্থলে বিশদভাবে বর্ণিত হইবে।

বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণের জলে, গন্ধকের তীব্র ঘ্রাণের অনুভব হয় বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, এতদঞ্চলে ভূমি-নিম্নে গন্ধক আছে।

সিউড়ীর উত্তরাংশে বর্ত্তমান জলের কলের নিকট, ময়ূরাক্ষী নদীর যে স্থান হইতে 'কানা' নামক তাহার শাখা বাহির হইয়াছে, পূর্ব্বে সেই স্থানে সুবর্ণরেণু পাওয়া যাইত। এই রেণু-সংগ্রহের প্রক্রিয়া যথাস্থলে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বীরভূমের কোন কোন অঞ্চলে মৃত্তিকায় ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত তামা ও কিছু কিছু রৌপ্য পাওয়া গিয়াছে।

বীরভূমের অনেক স্থলেই কয়লা আছে। অজয় তীরবর্ত্তী আড়ঙ, বড়জোড় প্রভৃতি কোলিয়ারি বীরভূমেরই অন্তর্গত। রসা-গ্রামে কোলিয়ারির কার্য্য আরম্ভ হইয়া সম্প্রতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তর তীরস্থ টাঙ্গসুলী বা মেহেরপুর গ্রামে কয়লা ও শ্লেটের মত স্তরবিশিষ্ট পাথর পাওয়া যায়।

মহম্মদবাজারের নিকট খ'ড়ে, সিউড়ীর নিকট সিঙ্গুর, খয়রাশোল থানান্তর্গত বড়রা গ্রামে প্রচুর পরিমাণে খড়িমাটি পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকা, গৃহের প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত খড়ি শক্ত, তাহা বালকগণ পেন্সিলরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

কয়লাকুঠীর ব্যবহার জন্য বড়রা গ্রামে প্রচুর পরিমাণে Fire Clay পাওয়া যায়।

সিঙ্গুরের মাটিতে বহু পরিমাণে অভ্রচূর্ণ মিশ্রিত আছে। এতদ্ব্যতীত বীরভূমের

অনেক স্থলেই মৃত্তিকানিম্নে অভ্রচূর্ণ পরিলক্ষিত হয়।

উদ্ভিদ্ পরিচয় – এ জেলায়, বিশেষতঃ পশ্চিমাংশে বন-জঙ্গলের অভাব নাই। পাথরচাপুড়ি, পাতাডাঙ্গ, পারুলিয়া, রাজনগর, নগরী, ছিন্‌পাই, রায়পুর, ইলামবাজার, চৌ-পাহাড়ী, গণপুর, সেওড়াকুড়ি প্রভৃতি স্থানে ঘন শালবন দৃষ্ট হয়। এক একটি বন হাজার বা ততোধিক বিঘা পরিমিত স্থান জুড়িয়া আছে।

রাজনগর, বাড়াবন, মোল্লাই, সেকেড্ডা প্রভৃতি স্থানে ভাল ভাল বহু আম বাগান আছে। এই সমস্ত বাগান হইতে প্রতি বৎসর নানা জাতীয় সুমিষ্ট আম উৎপন্ন হয়।

অন্যান্য বহু বৃক্ষের মধ্যে, শিশু, অর্জ্জুন, জাম, কাঁঠাল, গাব, কেন্দ, মহুয়া, বট, অশ্বত্থ, শিরিষ, আঁকড়, বাব্‌লা, নিম, চাকলতা, মুর্গা, তাল, প্রভৃতি বৃক্ষ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে বহু প্রকারের বাঁশ দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদঞ্চলে- পোন্‌কা, পালং, পিড়িং, খুন্‌লটে, শুশুনী, হেঞ্চা, কলমী, সজ্‌নে, লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গে, আলু, বেগুন, পটল, ঢেঁড়স, কচু, কপি, শালগম, ছোলা, অরহর, মসুর, খেসারি প্রভৃতি নানা জাতীয় ও বিবিধ প্রকার শাক-সবজী উৎপন্ন হয়।

উপরিলিখিত আম্রের গাছ ব্যতীত, এখানে আতা, পেপে, আনারস, কলা, জাম, বেল, কাঁঠাল, কুল, তাল, খর্জ্জুর, সামান্য পরিমাণে ডাব, হরিতকী, আমলকী, প্রভৃতি ফল ও গোলাপ, বেলি, জুঁই, গন্ধরাজ, গাঁদা, তরুলতা, সূর্য্যমুখী, কাঞ্চন, কলিকা, চাঁপা, রজনীগন্ধা ও বন্য জাতীয় নানাপ্রকার ফুলের গাছ দৃষ্ট হয়।

এখানকার নদীতীরবর্ত্তী স্থানগুলিতে আয়ুর্বেদীয় নানাপ্রকার লতা গুল্ম প্রভৃতি পাওয়া যায়।

পশ্বাদি পরিচয় - পূর্ব্বে এখানকার পাহাড় ও জঙ্গলে বড়-বড় বাঘ, ভালুক, সিংহ, হাতী প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল ছিল। কলিকাতার যাদুঘরে যে প্রকাণ্ড হস্তি-কঙ্কাল রক্ষিত আছে, তাহা তদানীন্তন বীরভূমির অন্তর্গত বিলকান্দী নামক স্থান হইতেই সংগৃহীত হয়। এত বড় হস্তি সাধারণতঃ এ অঞ্চলে আর কোথাও পাওয়া যায় নাই।

এখন বন-জঙ্গল অনেক কমিয়া যাওয়ায় ইহাদের উৎপাতও অনেক কমিয়া গিয়াছে। তবে, এখনও সময় সময় চিতা, নেক্‌ড়ে ইত্যাদি জাতীয় বাঘ, বন্য বরাহ, খেঁকশেয়ালী প্রভৃতি বন্য জন্তুর উৎপাত দেখা যায়। শৃগাল এবং বানরের উপদ্রব এখানে খুব বেশী। ইহাদের উৎপাতে কৃষককুল ও গৃহস্থকে বড়ই লাঞ্ছনা

ভোগ করিতে হয়। খরগোস ও গোসাপ, এখানে পাওয়া যায়। সাঁওতালগণ ইহাদিগকে ধরিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। এদেশ গোখুরা, কেউটে, ঢেম্না, চিতি, খরিশ, লাউডগি, রাজ প্রভৃতি নানা জাতীয় সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষার সময় বন্যায় এদেশে অনেক ছোট ও বড় কুমীর আসিয়া বড় বড় দীঘী বা কন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেঁড়া, শূকর প্রভৃতিই প্রধান।

পাখীর মধ্যে এখানে বেশীর ভাগ ময়না, বাবুই, দহিয়াল. সিমটুনটুনি, বুলবুলি, চড়াই, শালিক, ঘুঘু প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়। হাঁস, মুরগী, পায়রা প্রভৃতিগুলি গৃহস্থগণ আহার ও বিক্রয় মানসে পুষিয়া থাকে। বন-প্রদেশে ময়ূর ও তিতির প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

এখানকার পুষ্করিণীগুলি হইতে রুই, কাতলা, মৃগেল, কই, মাগুর, টেঙ্গরা, ছোট চিঙ্গড়ী, গড়ুই , রাইখড়া, পুঁঠি, ম'য়ে, কালবাউস, চিতল, বোয়াল, প্রভৃতি মৎস্য পাওয়া যায়। বাঁধগুলিতে বড় বড় রোহিত মৎস্য জন্মিয়া থাকে। বর্ষাকালে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দ্বারকা প্রভৃতি নদী হইতে ইলিস এবং অন্য সময় প্রায় সকল নদী হইতে ছ', পুঁয়ে, ছোট চিংড়ী প্রভৃতি মৎস্য পাওয়া যায়।

নদ-নদী – বীরভূমের প্রায় সমস্ত নদীগুলি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত। নদীর মধ্যে অজয় নদী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই নদী বীরভূমের সমগ্র দক্ষিণাংশে প্রবাহিত হইয়া এই জেলাকে বর্দ্ধমান হইতে বিভক্ত করিয়াছে। বোলপুর ও দুবরাজপুর হইতে এই নদীর দূরত্ব যথাক্রমে দুই ও দশ মাইল। হাজারিবাগের উত্তর-পূর্ব্বাংশে অবস্থিত চাকাই পর্ব্বত হইতে এই নদী উৎপন্ন হইয়া বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলা মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হইয়া কাটোয়ায় ভাগীরথীতে গিয়া মিলিত হইয়াছে। বীরভূমের অধিকাংশ স্থলে ইহা প্রস্থে প্রায় সিকি মাইল। কিন্তু ইহার মোহনার সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া অজয় নদ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। বীরভূমের সমগ্র দক্ষিণাংশ দিয়া প্রবাহিত অজয় নদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০ মাইলের কম নহে। নদীতে বারমাস জল প্রবাহিত হইলেও তাহার গভীরতা, বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে এক-দেড় হাতের বেশী নহে। বর্ষার সময় এই নদী স্ফীত হইয়া দুই কুল প্লাবিত করে এবং তজ্জন্য পার্শ্ববর্ত্তী বহু পল্লী প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সিউড়ী হইতে রাণীগঞ্জ যাইবার রাস্তার ২০ মাইলে এবং বোলপুরের ২ মাইল দক্ষিণে এই অজয় নদী প্রবাহিত। এই স্থানদ্বয়ে ই, আই,. রেলের বড় বড় সাঁকো বা পুল আছে। প্রথমোক্ত পাণ্ডবেশ্বরের নিকট সাঁকোটি সুবৃহৎ। আরঙ্ কোলিয়ারী, জয়দেব-কেন্দুলী, ইলাম বাজার প্রভৃতি এই অজয় নদের তীরেই অবস্থিত। অতি পূর্ব্বকালে চণ্ডীদাস-নানুর দিয়া এই অজয় নদী প্রবাহিত হইবার

কথা শুনা যায় এবং তৎসম্বন্ধে স্থানীয় লোকে বহু নিদর্শনের কথা উল্লেখ করিয়া থাকে। প্রাচীন কালে এই নদী দিয়া মাল-বোঝাই বহু বড় বড় নৌকা বীরভূমে ব্যবসায় করিতে আসিত। তৎকালে এইভাবে জিনিষ পত্রের আমদানী-রপ্তানী হইত। কালক্রমে নৌকা সাহায্যে এইরূপ ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এক সময়, এই অজয় ও ময়ূরাক্ষী নদী দিয়া নৌকা সাহায্যে মগ, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি দস্যুগণ এদেশে আসিয়া বিস্তর অত্যাচার করিয়া গিয়াছে। এইসব নদী মজিয়া যাওয়ায় এখন বর্ষার সময় ছোট ছোট নৌকা বা ডোঙ্গা-যোগে লোক ও যানাদি পারাপার হয়।

অজয় নদের পরই ময়ূরাক্ষী বীরভূমের আর একটি বৃহৎ নদী। বীরভূমের প্রায় সকল স্থলেই ইহার প্রস্থ নূন্যাধিক ১৫০০ ফিট। ময়ূরাক্ষী নদী বীরভূমের সদর সিউড়ীর দুই মাইল উত্তরে প্রবাহিতা। এই নদী সাঁওতাল পরগণার দেওঘরের পূর্ব্বে ত্রিকূট পাহাড়ের নিকট হইতে উত্থিত হইয়া, সিউড়ী হইতে দুমকা যাইবার রাস্তার নবম মাইলে, আমজোড়া গ্রামের নিকট বীরভূমে প্রবেশ করিয়াছে এবং কেন্দুলী (জয়দেব-কেন্দুলী নহে), ভাণ্ডীরবন, রায়পুর, খটঙ্গা, অজয়পুর, দুর্গাপুর, সাঁইথিয়া, কোটাসুর ও রামনগরের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় পড়িয়াছে। এই নদী বীরভূম জেলার প্রায় মধ্যস্থল দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত। সাঁইথিয়ায় ময়ূরাক্ষী নদীর উপর ই, আই, রেলের একটি সুবৃহৎ সাঁকো আছে। এই সাঁকোর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া রেলগাড়ী এবং পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া মানুষ এবং যানাদি চলাচল করে। সিউড়ীর তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে ময়ূরাক্ষী নদী হইতে কাণা[১] নামে একটি বড় শাখা বাহির হইয়া, আট মাইল স্বতন্ত্র ভাবে প্রবাহিত হইবার পর, সাঁইথিয়ার অগ্রেই পুনরায় ময়ূরাক্ষীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই কাণা নদীতে সমগ্র বৎসর ধরিয়া জল প্রবাহিত হয়। এই শাখা নদীর জন্য, ময়ূরাক্ষীর ঐ অংশের স্রোত বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে। বীরভূম মধ্যে ময়ূরাক্ষীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫ মাইল। বর্ষাকাল ব্যতীত, এই নদীদ্বয়ের প্রবাহিত নির্ম্মল সলিলের গতি প্রখর নহে। এই ময়ূরাক্ষী নদী আবার ওলকুড়া বা ওলকুণ্ডা গ্রামের নিকট দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই শাখাটিরও নাম কাণা। মূলনদী পরে কুয়ে ও দ্বারকার সহিত মিলিত হইয়া বাবলা নাম ধারণ পূর্ব্বক কাটোয়ার প্রায় ৬ মাইল উত্তরে মৌগ্রামের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে এবং ক্ষীণকায়া শাখা-নদীটি মুর্শিদাবাদ জেলার সাহোড়া গ্রামের দক্ষিণ ও বড়োঞা থানার অদূরবর্ত্তী প্রান্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া কান্দীর পার্শ্ব দিয়া পরে দ্বারকার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। বর্ষার সময় নদীগুলিতে ডোঙা বা নৌকা চলাচল করে। এই সময় নদীগুলি স্ফীত হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে এবং কখন কখন পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের

লোকের ঘর, দুয়ার, গরু, বাছুর, ছাগল, ভেঁড়া প্রভৃতি ভাসাইয়া লইয়া গিয়ে অনেক ক্ষতি করে।

অজয় এবং ময়ূরাক্ষী নদীর মধ্যবর্ত্তী অংশ দিয়া হিঙ্গলা, শাল বা কোপাই, বক্রেশ্বর, চন্দ্রভাঙ্গা ও কুশকর্ণিকা নদী প্রবাহিত। **হিঙ্গলা** নদী অজয় নদের একটি বড় উপনদী হইলেও, ইহাতে বর্ষাকাল ব্যতীত জলের স্রোত থাকে না। এই নদী সাঁওতাল পরগণা হইতে বহির্গত হইয়া অজয় নদের উত্তরে মাত্র আট মাইল ব্যবধানে বীরভূম জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং বীরভূম জেলায় ১৫ মাইল প্রবাহিত হইবার পর চাপলায় অজয় নদের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। অণ্ডাল-সাঁইথিয়া লাইনে ইহার উপর ই,আই, রেলের একটি সাঁকো আছে। এই নদীর তীরে— হজরতপুর, ময়নাডাল, জোফলাই প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রামগুলি অবস্থিত।

ইহার পরই **শাল** বা **কোপাই** নদী। এই নদী হিঙ্গলার উত্তর অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া, উত্তরাংশে সমান্তরাল ভাবে পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হইয়া বোলপুরের কয়েক মাইল অগ্রে উত্তর মুখে এবং পরে, লাভপুরের নিকট হইতে পশ্চিমমুখে চলিয়া গিয়াছে। অণ্ডাল-সাঁইথিয়া লাইনে এবং লুপ লাইনে ইহার উপর ই, আই, রেলের দুইটি সাঁকো আছে। প্রথমোক্ত সাঁকো ১৩২৬ সালের বন্যায় ভাসিয়া যাওয়ায়, একটি যাত্রীবাহী সমগ্র রেলগাড়ী নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয় এবং তজ্জন্য বহু প্রাণহানি ঘটে। এই নদীতে অন্য সময়ে অতি অল্প পরিমাণে জল প্রবাহিত হয়।

বক্রেশ্বর নদী সাঁওতাল পরগণা হইতে আসিয়া, বক্রেশ্বর পীঠস্থান দিয়া ঘুরিয়া লাভপুরের অদূরে কোপাই নদীতে মিশিয়াছে। ছিনপাই ষ্টেশনের অদূর পশ্চিমে এবং আমোদপুর ষ্টেশনের দক্ষিণে লুপ লাইনে এই নদীর উপর দুইটি ই, আই, রেলের সাঁকো আছে। বর্ষাকাল ব্যতীত, এই নদীতে জলস্রোত থাকে না। ইহার প্রস্থ কোন স্থলেই তিন-চারি রশির বেশী নহে।

চন্দ্রভাগা ও **কুশকর্ণিকা** দুইটি ছোট নদী হইলেও প্রথমটিতে যৎসামান্য পরিমাণে প্রায় বারমাস জলস্রোত প্রবাহিত হয়। চন্দ্রভাগা নদী রায়পুর, মল্লিকপুর প্রভৃতি গ্রামের পার্শ্ব দিয়া এবং কুশকর্ণিকা বীরভূমের প্রাচীন রাজধানী রাজনগর, খটঙ্গা প্রভৃতির পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত। সিউড়ী হইতে দুমকা যাইবার রাস্তার চতুর্থ মাইলে কুশকর্ণিকা এবং সিউড়ী-দুবরাজপুর রাস্তার তৃতীয় মাইলের পর, চন্দ্রভাগা নদী। উভয় নদীর উপর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সাঁকো আছে। এতদ্ব্যতীত, চন্দ্রভাগা নদীতে অণ্ডাল-সাঁইথিয়া-লাইনে ই, আই, রেলের সাঁকো আছে। কুশকর্ণিকা নদী ময়ূরাক্ষীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

ময়ূরাক্ষী নদীর প্রায় দশ মাইল উত্তরে **দ্বারকা** নদী। এই নদী প্রথমতঃ সাঁওতাল পরগণা হইতে আসিয়া পূর্ব্ব দিকে গিয়া পরে উত্তরাভিমুখী হইয়াছে। শেষে, পূর্ব্বমুখী হইয়া বীরভূম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। এই নদী ফতেসিং পরগণা অতিক্রম করিয়া শেষে ভাগীরথীর সহিত মিলিয়াছে। ইহার প্রায় ২০ মাইল উত্তরে **ব্রহ্মাণী**। এই নদী ছোটনাগপুরের পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছে। ইহা সাঁওতাল পরগণা হইতে নারায়ণপুরের নিকট বীরভূমে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পর মুর্শিদাবাদে সাঁকোর ঘাট নামক স্থানে দ্বারকা নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মাণীর প্রায় ১৫ মাইল উত্তরে বাঁশলই নদী প্রবাহিতা।

বাঁশলই এবং ব্রহ্মাণী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থল দিয়া প্রবাহিতা **পাগলা** নদী অতিশয় ক্ষুদ্রাকায়া। এই নদী সাঁওতাল পরগণা হইতে বাহির হইয়া বীরভূম অতিক্রমপূর্ব্বক শেষে মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথীতে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

এই সমস্ত নদী ব্যতীত, বীরভূমে **মণিকর্ণিকা, পলাসী, গম্ভীরা, কৈ, সুরবুসি, চিল্লা, সিদ্ধনালা, বন্দর** প্রভৃতি আরও অনেকগুলি ছোট নদী বা কন্দর প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল নদী বা কন্দরে বর্ষাকালে বহু পরিমাণ জল নিষ্কাসিত হয়।

প্রস্রবণ—উষ্ণ ঃ সিউড়ীর ১৫ মাইল পশ্চিমে বক্রেশ্বর পীঠস্থানে চৌদ্দ পনরটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এই স্থানের বিশেষ বিবরণ পরে প্রদত্ত হইয়াছে।

রাজনগরের অনতিদূরে একটি শিবমন্দির ও কতকগুলি ছোট ছোট উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়।

খয়রাশোল থানার নাকড়াকোন্দা গ্রামের দুই মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ইহার জলের তাপ ৮৫°। কুণ্ডের নির্গত জল একটি ক্ষীণকায় নালায়, দুই মাইল দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া হিঙ্গলা নদীতে সংযুক্ত হইয়াছে।

ময়ূরাক্ষী নদী ও সিদ্ধনালার সঙ্গমস্থল হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী সিদ্ধনালার দক্ষিণ তীরস্থ তেঁতুলিয়াগ্রামে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ইহার জলের তাপ ১৫০° ফারণহিট্।

শীতল ঃ দুবরাজপুরের দশ মাইল পশ্চিমে দে-গঞ্জ গ্রামের অনতিদূরস্থিত জঙ্গল মধ্যে একটি প্রাচীন ভগ্ন মন্দির ও একটি কুণ্ড আছে। এই কুণ্ড হইতে অনবরত শীতল জলধারা উদগত হইয়া থাকে।

নানুর থানার অন্তর্গত আঙ্গেরা গ্রামের প্রায় এক মাইল উত্তরে 'ভুরভুরে' নামে একটি কুণ্ড আছে। এই কুণ্ড হইতে অবিরত শীতল জলধারা উত্থিত হইয়া অদূরবর্ত্তী কন্দরে পতিত হইতেছে।

বোলপুরের দুই মাইল পূর্ব্বে মুলুক গ্রামের দুই মাইল উত্তরে বিভাণ্ডক

ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল। এই স্থান এখন শিয়ান নামে অভিহিত হয়। মুলুকের উত্তরাংশে বিভাণ্ডক ঋষির যেখানে আশ্রম ছিল, সেখানে "মুনিকুণ্ড" নামে একটি শীতল প্রস্রবণ আছে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির মেলায় এখানে বহু যাত্রি স্নান করিয়া থাকে।

রামপুরহাট থানার অন্তর্গত খড়বোনা গ্রামের উত্তর প্রান্তে বুম্‌কোতলার ডাঙ্গায় একটি শীতল জলের প্রস্রবণ দেখা যায়। এই উৎস হইতে অবিরত বারিধারা নির্গত হইয়া থাকে। এই বুম্‌কোতলায় পৌষ সংক্রান্তির সময় বুমকেশ্বরী দেবীর একটি মেলা হয়।

মাড়গ্রামের উত্তরে শীতল জলের একটি প্রস্রবণ আছে। এই প্রস্রবণ হইতে অনবরত জল উদগত হইয়া থাকে।

নলহাটি-আজিমগঞ্জ লাইনের সাগরদীঘী ষ্টেশন হইতে ছয় মাইল দক্ষিণে গুড়ে ও পাশলা নামে দুইটি গ্রাম আছে। এই পাশলা গ্রামের উত্তর হইতে পশ্চিম দিকে গিয়া দক্ষিণাভিমুখী একটি প্রকাণ্ড বিল দেখা যায়। এই বিলের কোন কোন অংশের নাম কালীগঙ্গা, পাতালগঙ্গা, জাহাজডুবি, মগড়াদহ প্রভৃতি ! সাধারণতঃ এই বিল 'বসিয়ে' বা 'বশিষ্ট বিল' নামে খ্যাত। গুড়ে গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমে বিলের এই অংশ "বশিষ্ট কুণ্ড" নামে খ্যাত। এই স্থানে বশিষ্ঠ দেবের নামে পূজা হয়। এই বিলের কোন কোন স্থান হইতে গ্রীষ্মকালে শীতল জলের উৎস নির্গত হইয়া থাকে। বর্ষার সময় ডোঙা-যোগে লোকে বিল পারাপার হয়। অন্য সময়, এই বিলে নানারূপ ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নলহাটি থানার বারাগ্রামে 'হেঁড়েরূব' নামে শীতল জলের একটি প্রস্রবণ আছে। এই উৎসের জল নিকটস্থ গম্ভীরা নদীতে অবিরত পতিত হইতেছে।

পুরন্দরপুরের তিন মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে ভালুকসুঙ্গা গ্রামে শীতল জলের একটি প্রস্রবণ আছে।

জল – বীরভূমের প্রায় সর্ব্বত্রই অল্প নিম্নেই জল পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বীরভূমের গৃহস্থ খনিত কূপগুলির গভীরতা দশ হইতে পনর হাতের বেশী নহে।

আবহাওয়া – এখানে প্রধানতঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও বসন্ত এই চারি ঋতুর তুল্যরূপ প্রাধান্য অনুভূত হয়। তন্মধ্যে গ্রীষ্ম এবং শীত অধিককাল স্থায়ী হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে এখানকার স্বাস্থ্য মন্দ নহে। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লোকে এখানে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য আগমন করিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এদেশ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়ে। পরে, এই দেশে বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু এই সকল ব্যাধি অনেক কমিয়া গিয়া,

এখন জেলার স্বাস্থ্য ভালই হইয়াছে।

বারিপাত – সমগ্র জেলায় বাৎসরিক গড়ে ৪৬.৮৪ বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। সিউড়ী ৫২.৭১, লাভপুর ৪২.৪২, বোলপুর ৪৩.৪১, মুরারই ৪৬.১৬, হেতমপুর ৪৭.২৩ ও রামপুরহাট ৪৯.১১।

বিবিধ – এ জেলায় সাধারণতঃ ভূমি-কম্পের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয় না – বহু বৎসর অন্তর অন্তর ভূমির কম্পন অতি সামান্যই অনুভূত হয়।

তথ্যসূত্র

(১) Sir William Wilcox তাঁহার Lectures of Irrigation in Ancient Bengal (Cal. University) -এ কাণা নদীগুলিকে channel আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে কাণা নদীগুলি আপনাআপনি বহির্গত হয় নাই। চাষের সুবিধার জন্য এ গুলিকে বড় বড় নদী হইতে কাটিয়া বাহির করা হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থান দিয়া এই কাণা নদীগুলির প্রবাহিত হইবার ইহাই কারণ।

এ সম্বন্ধে আমরা একমত নহি – গ্রন্থকার

চতুর্থ অধ্যায়

পৌরাণিক বা তান্ত্রিক প্রসঙ্গ

পৌরাণিক বা তান্ত্রিক যুগে বীরভূম সংক্রান্ত মূলতঃ প্রবাদ ভিন্ন অন্য কোনরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। বীরভূমের যে যে অংশের সহিত কোনরূপ পৌরাণিক প্রসঙ্গ সংযুক্ত আছে, সেই সেইগুলির কথা এই অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইল। এগুলির কোনরূপ ঐতিহাসিক মূল্য আছে -একথা অনুসন্ধিৎসু পাঠক বিশ্বাস করিবেন কি না, জানিনা। কিন্তু প্রবাদ হিসাবে এগুলির কিছু মূল্য আছে। এই জন্যই এগুলি পরিত্যক্ত হইল না।

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন। বিষ্ণু সেই দেহ চক্রদ্বারা ছেদন করিলে উহার কর্ত্তিত অংশ যে যে স্থানে পতিত হয়, সেই সেই স্থান মধ্যে ৫১টি মহাপীঠ এবং ২৬টি উপপীঠ নামে তীর্থস্থল রূপে পরিণত হয়। ভারতের সর্ব্বত্র এই পীঠস্থানগুলি বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত আছে। বীরভূমের সৌভাগ্য যে এখানে বক্রেশ্বর, অট্টহাস(ফুল্লরা), সাঁইথিয়া সংলগ্ন নন্দীপুর, নলহাটি, কঙ্কালী-তলা প্রভৃতি মহাপীঠ ও উপপীঠ স্থান পাইয়া ধন্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, তারাপুর প্রভৃতি সিদ্ধপীঠও বীরভূম মধ্যে অবস্থিত। এই সকল স্থান সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। এস্থলে ইহাই বক্তব্য যে, সেই প্রাচীন যুগেও বীরভূমি শক্তি ও তান্ত্রিক-সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

বক্রেশ্বর সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান এই যে - সত্যযুগে ভগবান নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেন। হিরণ্যকশিপু ব্রাহ্মণ সন্তান। তাঁহাকে বধ করায় নারায়ণের ব্রাহ্মণ-হত্যার পাপ ঘটে এবং তাঁহার হস্ত ও পদনখে বিষম জ্বালা সমুদ্ভূত হয়। ভগবান, দেব-সমাজে ও ঋষিমণ্ডলে এই কথা প্রকাশ করিলে অষ্টাবক্র ঋষি সেই জ্বালা আপন মস্তকে ধারণ করিতে সম্মত হন। ভগবান প্রথমে অস্বীকার করিয়া পরে ঐ 'জ্বালা' অষ্টাবক্রের মস্তকে অর্পণ করেন।

ভগবান ভক্তের অশেষ যন্ত্রণা দেখিয়া জ্বালা নিবারণের প্রতিবিধান কল্পে বক্রেশ্বর শিবের মস্তক স্পর্শ করিয়া অষ্টাবক্র ঋষিকে উপবেশন করিতে আদেশ করেন এবং ইহাও নির্দ্দেশ করিয়া দেন যে, ভারতের যাবতীয় পবিত্র তীর্থবারী সুড়ঙ্গ দ্বারা আনীত হইয়া তাঁহার মস্তকে পতিত হইবে, তাহা হইলে ঐ দারুণ জ্বালা নিবারিত হইবে। এই বারিধারা, জ্বালা স্পর্শে উষ্ণভাব ধারণ করিয়া স্থানান্তরে নির্গত হইয়া নিকটস্থ পাপহরা নদীতে পতিত হইতে থাকে।

দুবরাজপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অজয় নদীতীরে পরিখা প্রাকার চিহ্নিত গড় ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে এই অঞ্চলে পঞ্চপাণ্ডব কিছুকাল অজ্ঞাত বাস করেন। পঞ্চভ্রাতার নামানুসারে ভীমগড়া, যুধিষ্ঠিরপুর, অর্জ্জুনপুর প্রভৃতি পাঁচটি গ্রাম ও পাঁচটি শিব আছে। এতদ্ব্যতীত, অজয় নদীর অপর তীরে পাণ্ডবেশ্বর নামে একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম ও রেলওয়ে জংশন স্টেশন আছে।

দুবরাজপুরের জঙ্গলাকারে পতিত বড় বড় পাথর সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে- শ্রী রামচন্দ্র হিমালয় হইতে রথে করিয়া বড় বড় পাথর লঙ্কাভিমুখে লইয়া যাইবার কালীন এই স্থানে ফেলিয়া যান। অপর প্রবাদ যে শিবের আদেশানুযায়ী বিশ্বকর্ম্মা এখানে এক রাত্রিতেই দ্বিতীয় কাশী নির্ম্মাণ করিবার জন্য বিস্তর পাথর সংগ্রহ করেন; কিন্তু রাত্রি প্রভাত হওয়ায় তাহা আর কার্য্যে পরিণত হই নাই!

এখানকার পাহাড়েশ্বর শিবের পূর্ব্বদিকে একটি বড় ফাঁপা পাথরের মধ্যে সমগ্র বৎসর জল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ যে সীতাদেবী এই জলে তাঁহার মস্তক ধৌত করিয়াছিলেন।

সিউড়ীর ছয় মাইল পশ্চিমে ভাণ্ডীরবনে অনাদিলিঙ্গ শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইনি 'সিদ্ধনাথ' বলিয়া খ্যাত। কথিত আছে যে রামায়ণোক্ত বিভাণ্ডক ঋষি বহুকাল ধরিয়া এই শিবপূজা করায় ঋষির নামানুসারেই ইনি ভাণ্ডেশ্বর শিব বলিয়া অভিহিত হন।

লাভপুরের দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গোপালপুর গ্রামের নিকটস্থ স্থানে দুর্ব্বাসা ঋষির আশ্রম ও তপস্যা-ভূমি ছিল বলিয়া কথিত হয়। দুর্ব্বাসা ঋষির আশ্রমের সান্নিধ্য অনুসারে গোপালপুর 'দুব সো গোপালপুর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বোলপুরের তিন মাইল পূর্ব্ব-উত্তরে শিয়াণ গ্রামে বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রমস্থল ছিল বলিয়া কথিত আছে। জনশ্রুতি এই যে, অঙ্গরাজ লোমপাদ বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলাইয়া আপন রাজধানীতে আনিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলে বিভাণ্ডক

মুনি উক্ত আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাণ্ডীরবনে আসিয়া নূতন আশ্রম ও তপস্যাভূমি প্রতিষ্ঠিত করেন। বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম ও তপস্যাভূমি বলিয়া এই স্থান ভাণ্ডীরবন নামে অভিহিত হইয়াছে।

বোলপুরের অদূরবর্ত্তী সুপুর গ্রামে সুরথ রাজার পূজিত বলিয়া নির্দ্দেশিত সুরথেশ্বর শিব এখনও বোলপুর-ইলামবাজার রাস্তার উপর বিদ্যমান আছেন। কথিত আছে যে সুরথ রাজা ভগবতী সুভিক্ষাদেবীর নিকট লক্ষ বলি প্রদান করেন। যে স্থলে এই বলি প্রদত্ত হয়, তাহা 'বলিপুর' হইতে অধুনা বোলপুর নামে খ্যাত হইয়াছে।

মল্লারপুর ষ্টেশনের পাঁচ মাইল পূর্ব্বে তারাপুর। কথিত আছে যে বশিষ্ঠ তারামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বহু সাধনার পরও সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। পরে, চীন প্রভৃতি নানা স্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক কামরূপ হইতে তারাদেবীকে আনয়ন করিয়া এই তারাপুর বা চণ্ডীপুরের উচ্চ স্থানে স্থাপন করেন এবং উত্তরবাহিনী দ্বারকা নদীর পূর্ব্বতীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া অনেক দুঃসাধ্য সাধনার পর তারাদেবীর আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। এই স্থানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে এই বশিষ্ঠ, রঘুকুলগুরু বশিষ্ঠ বা বশিষ্ঠ-বংশীয় অপর কোন প্রাচীনতর পৌরাণিক যুগের বশিষ্ঠ নহেন। এক নামের যে সকল বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভৃগু প্রভৃতি ঋষির উল্লেখ আছে, তাঁহারা সকলেই এক ব্যক্তি নহেন। তাঁহারা স্ব স্ব গোত্রনামে পরিচিত হইতেন বলিয়া এইরূপ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে[১]।

মল্লারপুর ষ্টেশনের অদূরেই মল্লারপুর গ্রামের পূর্ব্বাংশে শিব-পাহাড়ী নামে একটি পাহাড় আছে। কথিত আছে যে দ্রৌপদী হরণ করিবার অভিলাষে সিন্ধুপতি জয়দ্রথ কাম্যকবনে গমন করিলে, তিনি ভীম কর্ত্তৃক বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হন। তাহার পর তিনি এই স্থানে আসিয়া মল্লেশ্বর শিব 'সিদ্ধনাথের' আরাধনা করেন।

সাঁইথিয়ার পাঁচ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত কোটাসুর (অসুরের কোষ্ঠ বা কোঠা) মহাভারতোক্ত হিড়িম্ব ও বকাসুর নামক অসুরের আবাসভূমি বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। কথিত আছে যে, এই বকাসুর ভীম কর্ত্তৃক নিহত হয়।

নলহাটি পাহাড়ে পার্ব্বতী মন্দিরের অদূরে একটি প্রস্তরখণ্ডে দুইটি পদ-চিহ্ন অঙ্কিত দেখা যায়। সাধারণ লোকে, এই পদচিহ্ন দুইটি সীতাদেবীর পদচিহ্ন বলিয়া পূজা করিয়া থাকে।

নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেল লাইনের লোহাপুর ষ্টেশনের উত্তরে গম্ভীরা নদীতীরে বারা বা বালানগর নামে একটি গণ্ডগ্রাম আছে। এতদঞ্চলে প্রবাদ এই যে– এই বারা বাণ-রাজার রাজধানী ছিল। আবার কাহারও মতে – বালা রাজার রাজধানী

ছিল বলিয়া ইহার নাম বালানগর। অনেকেই বলেন যে বারা ও তাহার নিকটবর্ত্তী নগরা ও বাণেশ্বর এই তিন গ্রামের অধিকৃত অঞ্চল মহাভারতোক্ত বারণাবত নগর। এই স্থানেই পাণ্ডবগণ জতুগৃহ দাহ করিয়া একচক্রায় বা বর্ত্তমান মৌড়েশ্বর ও বীরচন্দ্রপুর প্রভৃতি অঞ্চলে চলিয়া আসেন এবং তথায় বকরাক্ষসাদি বধ করেন। পঞ্চ পাণ্ডবের নামানুসারে পঞ্চ গ্রামের (পাণ্ডব তলা) নামকরণ হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব কিয়ৎকাল এই অঞ্চলে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে।

বীরভূম জেলার উত্তর সীমান্তে রাজগাঁ ষ্টেশনের প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিমে প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষবিশিষ্ট বীরনগর নামে একটি ক্ষুদ্র স্থান আছে। ইহারই নিকটে সীতাপাহাড়ী নামক লতাগুল্ম সমাচ্ছাদিত একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাহাড়ে দুইটি গুহা আছে। প্রবাদ এই যে – বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন। আবার, বীরনগর হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে সীতপাহাড়ী নামে একখানি গ্রাম আছে। গ্রামের নিকটেই একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে পাথরের চুল্লী আছে। প্রবাদ যে, বনবাসকালে সীতাদেবী তথায় রন্ধন করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যে প্রস্তরে বসিয়া ক্রীড়া করিতেন, লোকে তাহারও চিহ্ন দেখাইয়া থাকে।

তথ্যসূত্র

(১) Ancient Indian Historical Tradition— Ch. XVIII, F. E. Pargiter.

পঞ্চম অধ্যায়

হিন্দু অধিকার কাল

প্রাচীন বঙ্গ- রাঢ়দেশ যে পূর্ব্বে 'সুহ্ম' ও 'গঙ্গারিঢ়ি' নামে অভিহিত হইত, তাহা প্রথম অধ্যায়ে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। মেগাস্থিনিসের সময় মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গঙ্গারিঢ়ি-কলিঙ্গি স্বাধীন রাজ্য ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর শেষার্দ্ধ পর্য্যন্ত বাঙালীর রণ-পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুদূর পাশ্চাত্যদেশেও প্রচারিত হইয়াছিল। ভার্জ্জিল কবির 'জর্জ্জিকাস' কাব্যে যে তাহার নিদর্শন আছে, তাহা পূর্ব্বেই চতুর্থ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষাংশে রাজপুতানা প্রদেশের পুষ্করণা নগরের অধিপতি সিংহবর্ম্মার পুত্র চন্দ্রবর্ম্মা বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যবর্ত্ত জয় করিয়াছিলেন। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পর্ব্বত-গাত্রে ও পোখরণা প্রভৃতি স্থানে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়*। চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে শতাব্দীর প্রারম্ভে চন্দ্রগুপ্ত মগধে আর একটি মহাসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ২) সমুদ্রগুপ্ত। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র ৩) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০ খৃঃ- ৪১৩ খৃঃ)। তাহার পর ৪) কুমার গুপ্ত ও ৫) স্কন্দগুপ্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে, আমরা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ম্মা রাজবংশীয়গণের নাম প্রাপ্ত হই।

তদনন্তর আমরা মুর্শিদাবাদের নিকট কর্ণসুবর্ণের রাজা **শশাঙ্কের** নাম পাই। ইনি 'গৌড়াধিপ' বা 'গৌড়েশ্বর' নাম গ্রহণ করিয়া রাঢ়-দেশ শাসন করেন।

---

* রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাসের' ১ম খণ্ডের ৪০ পৃঃ এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু 'উদয়ন'-পত্রে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই চন্দ্রবর্ম্মা, মাত্র 'মহারাজ' উপাধিধারী বলিয়া শুশুনিয়া লিপিতে উল্লেখ আছে। তিনি দিগ্বিজয়ী সম্রাট হইলে, তাঁহার নামের সহিত 'পরম ভট্টারক' বা ইত্যাকার উপাধি সংযুক্ত রহিত। এই জন্য তিনি অনুমান করেন যে সিংহবর্ম্মার পুত্র চন্দ্রবর্ম্মা, বাঁকুড়া জেলার দামোদর তীরে পুষ্করণা বা পোখরণার অধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা। তিনি সমগ্র রাঢ়-দেশে আধিপত্য করিতেন। সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়কালে, এই বিষ্ণুউপাসক চন্দ্রবর্ম্মার রাজ্যই অধিকার করিয়া থাকিবেন। এই মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। – লেখক

হর্ষবর্দ্ধনের সহিত শশাঙ্ক ছয় বৎসর কাল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। গৌড়াধিপ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর, তদীয় গৌড়-সাম্রাজ্য হর্ষবর্দ্ধনের হস্তগত হয়। তাহার পর সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বাঙলার বহু পরিবর্ত্তনের যুগ আইসে। অবিরাম রাষ্ট্রবিপ্লবে বঙ্গদেশ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। তাহার পর শৈলবংশীয় রাজগণের অভ্যুদয় হয়।

অষ্টম শতাব্দীতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি অঞ্চলে জয়ন্ত নামক এক সামন্ত নৃপতি অধিকার স্থাপন করেন। পরে, খড়্গাবংশীয় রাজগণের শাসনাধীনে বঙ্গদেশ কিছুকাল শান্তিভোগ করিয়াছিল। তদনন্তর ৭৮৪ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জর দেশের বৎসরাজ (মৃত্যু- ৮১২খৃঃ) বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া গৌড়পতি ও বঙ্গপতি উভয়কেই পরাভূত করেন।

শৈলবংশীয় গৌড়পতির সময় হইতে বৎসরাজের আক্রমণ কাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত বহিঃশত্রুর আগমনে ও পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্লবের ফলে, গৌড়মণ্ডলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কোন নরপতি সমগ্র গৌড়বঙ্গমগধের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে পারেন নাই। পরন্তু, বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ আপন আপন অধিকার মধ্যে আধিপত্য করিয়া পরস্পরের সহিত নিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রহিতেন। এই সুযোগে বিদেশীয় রাজগণ এদেশ আক্রমণ করিয়া গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দকে অতিমাত্রায় বিপন্ন করিয়া তুলিতেন। এইভাবে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দেশ ঘোরতর অরাজকতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য প্রজাবৃন্দ, সর্ব্ববিদ্যাবিদ দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র এবং রণকুশল বপ্যটের পুত্র **গোপালদেবকে** (প্রথম গোপাল) দেশের অধিপতি নির্ব্বাচন করেন। তিনি পালবংশীয় নরপতিগণের প্রথম ভূপাল। এই পালবংশীয় নরপতিগণ এখন বাঙ্গালী বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছেন। এই পালবংশের পরবর্ত্তী নরপতি ২) ধর্ম্মপাল, ৩) দেবপাল, ৪) প্রথম শূরপাল, ৫) নারায়ণপাল, ৬) রাজ্যপাল, ৭) দ্বিতীয় গোপাল ও ৮) দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। এই দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে পালবংশীয় রাজগণ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে কম্বোজবংশীয় নরপতিগণ কর্ত্তৃক গৌড়রাজ্যের অধিকারচ্যুত হইয়াছিলেন। তাহার পর পাল-সাম্রাজ্যের পুনরাবির্ভাব হয়। ৯) প্রথম মহীপালদেব 'অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য' উদ্ধার সাধন করিয়া দ্বিতীয়বার খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রারম্ভে পাল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে ক) চোলরাজ রাজেন্দ্রচোল খ) কল্যাণের চালুক্যরাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ ও পরে গ) হৈহয় বংশীয় গাঙ্গেয় দেব - এই তিন বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক গৌড়রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল।

গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকালে মুসলমানগণের সাময়িক আবির্ভাবের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল রাজত্ব করিলে পর, তাঁহার পুত্র ১০) নয়পাল গৌড়-মগধ-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রায় বিংশতিবৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১০৪৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁহার পুত্র ১১) তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্ব-কালে পাল-সম্রাজ্যের অধঃপাতের সূত্রপাত হয়। তাঁহারই রাজত্বকালের শেষাংশে, অথবা ইহার অব্যবহিত পরেই, উত্তরবঙ্গে দিব্বোকের অধিনায়কত্বে কৈবর্ত্তজাতি বিদ্রোহী হইয়াছিল।

ইহার পর- ১২) দ্বিতীয় মহীপাল, ১৩) দ্বিতীয় শূর পাল, ১৪) রামপাল, ১৫) কুমারপাল ১৬) তৃতীয় গোপাল, ১৭) মদনপাল ও ১৮) গোবিন্দপাল রাজত্ব করিলে পালবংশের অধিকার বিলুপ্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত রামপালের কৈবর্ত্তপতি ভীমের বিরুদ্ধে বারেন্দ্র-অভিযানকালে বীরভূমে যে সমস্ত নরপতিগণ তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরে প্রদত্ত হইল।

পাল নরপতিগণের পর বঙ্গে চন্দ্র ও বর্ম্ম রাজবংশ রাজত্ব করেন এবং সর্ব্বশেষে সেনবংশীয় রাজগণ- ১) সামন্ত সেন, ২) হেমন্তসেন, ৩) বিজয়সেন, ৪) বল্লাল সেন ও কবি জয়দেবের পৃষ্ঠপোষক রাজা ৫) লক্ষ্মণ সেন গৌড় রাজ্য অধিকার করিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হন।

লক্ষ্মণসেনের সময়েই, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাংশে বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকারের সূত্রপাত হয়। প্রাচীন বঙ্গের হিন্দুরাজগণের ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

সামন্তরাজগণ- অতি প্রাচীনকালে, গৌড়-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে, এখনকার মত বীরভূমের সীমা চিরসুনির্দ্দিষ্ট ছিল না। সমগ্র বীরভূমি-অধিকৃত স্থানে কোন্ কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে সামন্ত রাজগণ নিয়মিত করদানে শাসনাধিকার লাভ করিয়া স্ব স্ব সীমান্তবর্ত্তী স্থানে শাসনকার্য্য পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সকল ক্ষেত্রে তাহারও কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না।

কালে, দেশে যে সকল শক্তিশালী ব্যক্তি কতক কতক পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেন, তাঁহারাই প্রজাবর্গের নিকট- রাজা, ঘট্টপতি বা ঘাটোয়াল বা সীমান্তরক্ষক, মণ্ডল অথবা সামন্তরাজরূপে পরিচিত হইতেন। এই হেতু আমরা বীরভূমের প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ অনেক রাজা বা সামন্ত নরপতির নামোল্লেখ শুনিতে পাই। গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর হইতে বীরভূমের এই সামন্ত রাজগণ স্বাধিকার-মণ্ডলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিলেও গৌড়েশ্বরকে রাজচক্রবর্ত্তীরূপে স্বীকার করিতেন এবং আবশ্যক হইলে,

রাজ্যবিস্তারকল্পে গৌড়েশ্বরকে যে সহায়তা করিতেন তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই নিমিত্ত, বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্নভাবে সমগ্র বীরভূমি মধ্যে যেখানে যে সামন্তরাজ বা শাসনকর্তার নামোল্লেখ পাইয়াছি, তাহার সন্ধান প্রাপ্তির মূল সাধারণতঃ প্রবাদ হইলেও তাহা, এবং ক্বচিৎ কোন ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত দুই একটি শিলালিপি, তাম্রফলক বা সনন্দের যে সন্ধানপ্রাপ্ত হইয়াছি তৎসমুদয়ই, ভিন্ন ভিন্নভাবে এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। এইরূপ উপকরণ লইয়া রীতিমতভাবে ধারাবাহিক ইতিহাস গ্রন্থন করা আপাততঃ সম্ভবপর নহে; তাই, তাহার চেষ্টাও করি নাই। কালে এ বিষয়ে অধিকতর অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টার ফলে আরও উপকরণাদি সংগৃহিত হইলে তাহার চেষ্টা হইবে। এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিভিন্ন স্থানের কথা পৃথকভাবে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে কেবলমাত্র দেশপতিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল—

গৌড়পতি রামপালের "মহাসান্ধি বিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দীর পুত্র" পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের অধিবাসী রাজকবি সন্ধ্যাকর বিরচিত 'রামচরিত' (একাদশ শতাব্দীর শেষাংশে রচিত)। কাব্যে বরেন্দ্রভূমের কৈবর্ত্তপতি দিব্বোকের ভ্রাতুষ্পুত্র বরেন্দ্ররাজ গৌড়পতি ভীমের বিদ্রোহ দমনার্থ গৌড়পতি রামপালের যুদ্ধাভিযান বর্ণিত হইয়াছে। এই দ্ব্যর্থবোধক কাব্যের রচয়িতা স্বয়ং দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চত্রিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত টীকা রচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক শ্লোকের একটি দাশরথি রামপক্ষ ও অপরটি রামপাল পক্ষের টীকা আছে। এই টীকাতে রামপালের (মৃঃ-১০৬৬খৃঃ)[১] রাজত্বকালের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই কাব্যের টীকায় যে সকল সামন্তরাজ রামপালের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ঢেক্করীয় রাজ প্রতাপসিংহ, উচ্ছালপতি ভাস্কর ময়গল সিংহ, দণ্ডভুক্তিপতি জয়সিংহ, কুজবটিবতি শূরপাল, কয়ঙ্গলের মণ্ডলাধিপতি নরসিংহার্জ্জুন, তৈলকম্পের অধিপতি রুদ্রশিখর প্রভৃতি চৌদ্দজনের নাম উল্লেখ আছে।

এই সকল সামন্তরাজগণের মধ্যে উচ্ছাল, ঢেক্করী, দণ্ডভুক্তি বা দন্তভুক্তি, কুজবটি, কয়ঙ্গল ও তৈলকম্প – এই ছয় সামন্তরাজ্য তদানীন্তন বীরভূমের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

(ক) উচ্ছাল- বর্ত্তমান বীরভূম জেলার কতকাংশ শালতরু সমাকীর্ণ শাল নদীর উত্তরে থাকায় এই স্থান উচ্ছাল নামে পরিচিত ছিল। যেখানে এই সামন্তরাজ্যের শাসন-কেন্দ্র ময়গলপুর ছিল, সেই স্থান এখন 'মহলপুর' বা 'মোলপুর' নামে খ্যাত। ইহা সিউড়ী হইতে চারি মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত। ইহার দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে রাজনগর গ্রাম (বীরভূমের মুসলমান

রাজধানী রাজনগর নহে)। এখানে ভাস্করসিংহের রাজধানী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে[২]। শাল নদীর উত্তরাবর্ত্তী 'জৈন্ উঝিয়াল্ পরগণা' প্রাচীন উচ্ছাল নাম রক্ষা করিতেছে[৩]।

(খ) ঢেক্করী– উত্তর রাঢ়ে বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলাস্থ (তখন বীরভূম) অজয় নদের উভয় তীরবর্ত্তী সেনভূম। লাউসেনের বংশধরগণের হস্ত হইতে এই স্থান কিছুদিন সিংহবংশের অধিকারভুক্ত হয়। ইহার প্রধান নগর ঢেকুর হইতে 'ঢেক্করীয়' সামন্ত-রাজ্যের নামকরণ হইয়া থাকিবে। সামন্তরাজ প্রতাপসিংহের যেখানে রাজধানী ছিল, সেই স্থান কেন্দুলী হইতে ছয় মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অজয় নদের তীরে (অক্ষা ২৩°৩৬′৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি ৮৭°৩৩′৩০″ পূঃ মধ্যে) অদ্যাপি প্রতাপপুর নামে খ্যাত রহিয়াছে।

(গ) দণ্ডভুক্তি বা দন্তভুক্তি– দণ্ডভুক্তি দন্তভুক্তিরই নামান্তর। এই দন্তীরাজার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের দেড় মাইল উত্তর পশ্চিমাংশে পরিদৃষ্ট হয়। তথায় সুবৃহৎ দন্তীদীঘী বা দাঁতন দীঘী, দন্তী রাজার নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। মতান্তরে, মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত দণ্ডভুক্তি।

(ঘ-ঙ) কুজবটি ও কয়ঙ্গল– কুজবটি ও কয়ঙ্গল এখন সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত হইলেও তখন বীরভূমের অন্তর্গত ছিল। কুজবটি নয়াদুমকা হইতে ১৪ মাইল উত্তরাংশে অবস্থিত। কয়ঙ্গলের বর্ত্তমান নাম কাঁকজোল। ইহাও সাঁওতাল পরগণার উত্তরাংশে অবস্থিত।

(চ) তৈলকম্প– তৈলকম্প বর্ত্তমান মানভূম জেলায় শিখরভূম নামে খ্যাত। এস্থান পূর্ব্বকাল হইতে শিখরবংশের রাজত্ব। যেখানে এই শিখরবংশের পূর্ব্বতন রাজধানী তৈলকম্পী অবস্থিত ছিল, অদ্যাপি সেই স্থান 'তেলকুপী' নামে পরিচিত। এই স্থান দামোদরের ধারে (অক্ষা ২৩° ৪০′ উঃ ও দ্রাঘি ৮৬° ৩০′ পূঃ মধ্যে) শিখরভূমের অপর প্রাচীন রাজধানী পঞ্চকোট গড় হইতে সাড়ে দশ মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। এই শিখরবংশই এখন 'পঞ্চকোট' বা 'পাঁচেটের রাজবংশ' বলিয়া অভিহিত। পঞ্চকোট-রাজবংশমালার মধ্যেও 'রুদ্রশিখর' নাম বাহির হইয়াছে। তাহাতে এই রুদ্রশিখরের আবির্ভাব-কাল ১০২০ শক বা ১০৯৮ খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে[৪]।

রামপালের সহিত যে চৌদ্দজন সামন্তরাজ কৈবর্ত্তপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ছয়জন সামন্তরাজই বীরভূম অঞ্চলের অধিবাসী। এইভাবে (মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে নেপালে আবিষ্কৃত) 'রামচরিত' কাব্য, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর

শেষপাদে বীরভূমে ছয়জন সামন্ত নরপতির সম্বন্ধে আলোকপাত করিয়া, অন্ধকারময় অতীতকে সমুজ্জল করিয়া তুলিয়াছে।

রাজা দীনমণি সিংহ – বীরভূমের অধীন লাভপুর-অঞ্চল সামলাবাদ নামে পরিচিত ছিল। এই সামলাবাদের শেষ অধীশ্বরের নাম দীনমণি সিংহ বাহাদুর। ইনি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন।

রাজা কিঙ্কিন – কীর্ণাহারে কিঙ্কিন নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষ কর্ণহার বা কীর্ণাহার মানকরের দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত অমরার গড় হইতে এইস্থলে আসিয়া নানুরের নল-বংশীয় রাজা সাতরায়কে নিহত করেন এবং এই অঞ্চল অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। কিলগির খাঁ নামক এক পাঠান, রাজাকে হত্যা করিয়া কীর্ণাহার দখল করিলে, রাণী দুর্গাবতী কীর্ণাহারের কয়েক মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত মহেশপুরে গিয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

রাজ নৈ বা লোহিত – নানুরের চারি মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণস্থিত গোপডিহি গ্রামের প্রায় সিকিমাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে নৈ বা লোহিত রাজা নামে এক রাজা ছিলেন। প্রায় একবর্গ মাইল পরিমিত গোলাকার স্থানে রাজার রাজবাড়ী ছিল। এইস্থানের চতুর্দ্দিকে গড়ের চিহ্ন এখনও অতিশয় সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

রাজা শ্বেত বসন্ত – বোলপুরের প্রায় তিন মাইল পূর্ব্ব-উত্তরে, শিয়ান নামক একটি স্থান আছে। এই শিয়ানের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় শ্বেত বসন্ত নামে একজন হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেন।

রাজা সুরথ – বোলপুরের চারি মাইল পশ্চিমে সুপুরগ্রামে সুরথ নামে এক রাজার রাজধানী ছিল।

রাজা শিবাদিত্য – আমোদপুর ষ্টেশনের তিন মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে সাঁইথিয়া থানার অন্তর্গত সিউর বা শিবপুর গ্রামে শিবাদিত্য নামে একজন ক্ষত্রিয় রাজা বাস করিতেন। তথায় রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন গড় প্রভৃতি আজিও পরিলক্ষিত হয়।

রাজা রুদ্রচরণ – সিউড়ীর ছয়মাইল দক্ষিণে সিউড়ী-দুবরাজপুর যাইবার রাস্তার পশ্চিম সংলগ্ন কচুজোড় গ্রামে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে রাজা রুদ্রচরণ রায় রাজত্ব করিতেন। তিনি স্বীয় বাহুবলে আপন রাজ্য বিস্তার করিয়া বিশেষরূপে খ্যাতিলাভ করেন।

রাজা খগাদিত্য – দুবরাজপুরের দেড় মাইল পশ্চিম - উত্তরে খগরো গ্রামে খগাদিত্য নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত খগেশ্বর শিব

এখানে বর্ত্তমান আছেন।

রাজা শ্বেত – প্রবাদ যে বক্রেশ্বর - অঞ্চল উজানীর (মঙ্গল কোট) শ্বেত রাজার অধিকৃত ছিল এবং জনশ্রুতি যে তিনি বক্রেশ্বরের শ্বেতগঙ্গা কুণ্ডুর প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্রাহ্মণ রাজ – সিউড়ীর পাঁচ মাইল পশ্চিমে খটঙ্গা গ্রামেও একজন ব্রাহ্মণ রাজার রাজত্ব করিবার কথা শুনা যায় ।

রাজা বীরসিংহ — খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ক্ষত্রিয় রাজা বীরসিংহ বীরভূমের অধীশ্বর ছিলেন। এই সময় লখণোর বা নগর (রাজনগর) তাঁহার রাজধানী ছিল। সুলতান ঘীয়াসুদ্দীন ইয়ুজ তাঁহার নিকট হইতে লখণোর অধিকার করিয়া লন। তাহার অব্যবহিত পর, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমগ্র বাঙলায় এক দেশব্যাপী রাষ্ট্র বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই বিপ্লবের সুযোগে ব্রাহ্মণ জাতীয় 'বীর' উপাধিধারী একজন হিন্দু রাজা লখণোর অধিকার করিয়া লন।

সেনরাজগণ – বাঙলার পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তখন রাঢ়ভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল। বীরভূমি এই রাঢ়দেশেরই অন্তর্ভূত। বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রশাসনে আমরা প্রবল প্রতাপান্বিত কীর্ত্তিমান **সামন্ত সেন** নামক একজন রাজার উল্লেখ দেখিতে পাই। এই সেন-উপাধিধারী রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ কর্ণাট-ক্ষত্রিয়গণ রাঢ় প্রদেশে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। দাক্ষিণাত্যের দিগ্বিজয়ী রাজা রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় গিরিলিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে তিনি অনুমান ১০২৪ খৃষ্টাব্দে রাঢ়-প্রদেশ আক্রমণ করিয়া দণ্ডভুক্তির অধিপতি ধর্ম্মপালকে নিহত করেন। তদনন্তর তিনি বঙ্গাধিপতি গোবিন্দচন্দ্রকে তাঁহার রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূরকে পরাজিত করেন। তাহার পর তিনি উত্তররাঢ়ে অভিযান করিয়া (সম্ভবতঃ মহীপাল দেবের নিকট) বাধা প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই রাজেন্দ্র চোলের সমকালে সামন্ত সেন বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। রাজসাহী জেলার দেবপাড়া গ্রামে প্রদ্যুম্নেশ্বর শিব মন্দিরের শিলালিপি হইতে দেখা যায় যে তিনি "অনধিকৃত বিলুপ্ত" পিতৃরাজ্যের উদ্ধারকর্ত্তা প্রবল প্রতাপান্বিত প্রথম মহীপালকে পরাভূত করিয়া 'একাঙ্গবীর' নামে খ্যাতিলাভ করেন। এই মহীপাল, তীরভুক্তির অধীশ্বর "গৌড়বিজয়ী ও গৌড়ধ্বজ" উপাধিধারী গাঙ্গেয় দেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার পর, রাজেন্দ্র চোল ১০২৪ খৃষ্টাব্দে রাঢ়দেশ আক্রমণ করেন। ইঁহাদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া সামন্ত সেন সম্ভবতঃ প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন এবং ক্রমে রাঢ়-অঞ্চলে তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত "একাঙ্গবীর" বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার রাজ্যের অদূরেই পূর্ব্বাংশে গঙ্গা প্রবাহিতা। রাজসাহী দেবপাড়ার প্রশস্তিতে

সামন্তসেনের গঙ্গাতীরে শেষজীবন অতিবাহিত হইবার কথা লিপিবদ্ধ আছে। গঙ্গাতীর, বীরভূমের উত্তরাংশে সামন্ত সেনের রাজ্য ও রাজধানী বীরনগর হইতে দূরে অবস্থিত নহে।

সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেনও পিতৃরাজ্য রাঢ় দেশেই বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র বিজয় সেনই খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষাংশে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া রাজ্য বিস্তারকল্পে মনোনিবেশ করেন। ইনি গৌড়, কামরূপ এবং কলিঙ্গ বা উড়িষ্যা জয় করিয়া তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন এবং ক্রমে তাঁহার রাঢ় দেশস্থ রাজধানী বীরনগর (মুরারই থানার অন্তর্গত) পরিত্যাগ করিয়া গৌড় রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন। উত্তর-রাঢ়ের বীরনগর হইতেই রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে তিনি ক্রমে বরেন্দ্রভূমি, বঙ্গ, আসাম প্রভৃতি প্রদেশ স্বাধিকারে আনয়ন করেন। কলিঙ্গ অধিকার কালে ইনি কলিঙ্গাধিপতি চোড়গঙ্গ দেবের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বিজয় সেনের রাজ্যকালে উত্তর ও দক্ষিণরাঢ় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তিনি সেগুলি সমস্তই করায়ত্ত করিয়া 'মণ্ডল'-উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী পাহিদত্ত (যাঁহার নামানুসারে মুরারই থানার অন্তর্গত পাইকড় গ্রামের নামকরণ হইয়াছে) "মণ্ডল-পাত্র" নামে অভিহিত হইতেন। বিজয় সেন দক্ষিণ-রাঢ়ের শূর-বংশের রাজকন্যা বিলাসবতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। অনেকে বলেন যে এই বিলাসবতীর নাম হইতেই মুরারই থানার অন্তর্গত বিলাসপুর গ্রামের নামকরণ হইয়াছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত 'গৌড়ধ্বজ'-উপাধিধারী দিগ্বিজয়ী বীর রাজা গাঙ্গেয় দেবের পুত্র চেদিরাজ কর্ণদেবের নর্ম্মদাতীরে ত্রিপুর নগরে রাজধানী ছিল। ১০৪২ খৃষ্টাব্দে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই কর্ণদেব প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু গৌড়াধিপতি প্রথম মহীপালের পুত্র নয়পালের সহিত মগধযুদ্ধে তিনি ঘোরতর সংগ্রামে পরাভূত হন। এই সময়ে রাঢ় দেশে সেনবংশীয় নরপতি পূর্ব্বোক্ত সামন্ত সেন বা তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেন রাজত্ব করিতেন। চেদিরাজ কর্ণদেব, কিছুকাল তাঁহার প্রীতিভাজন কর্ণাটক ক্ষত্রিয়বংশীয় সেন বংশের রাজধানী পাইকড় গ্রামে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অনেকেই অনুমান করেন যে এই স্থানেই নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল কর্ণদেবের দুহিতা যৌবন-শ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজা বীরসেন – রাজগাঁ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বীরনগর সংলগ্ন রাজবাড়ী নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। ইহার অদূরে সীতা পাহাড়ী, চন্দ্র পাহাড়ী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় – এগুলি সাঁওতাল পরগণার মধ্যস্থিত ধরণী পাহাড় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

কথিত আছে যে এই বীরনগরে বীরসেন নামে এক রাজা ছিলেন এবং ঐ ধ্বংস-স্তূপ তাঁহারই অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। চন্দ্র পাহাড়ের নিকট চন্দ্রপাড়া নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে বীরসেন বংশীয় চন্দ্রসেন এবং ইহার এক ক্রোশ দক্ষিণে ভদ্রকালী ও ভাঁটরা গ্রামে ভদ্রসেন নামে অপর একজন রাজা বাস করিতেন। পরবর্ত্তী কালে বীরনগরের উপকণ্ঠে বিক্ষিপ্ত ভাবে বহুস্থান ব্যাপিয়া এই সেনরাজবংশীয়গণ যে বাস করিতেন, তাহার এখনও বহু নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। পাইকড় গ্রামকে রাঢ়ের পূর্ব্ব গৌরব সাদাচার পরায়ণ সেন-রাজকুমারগণের প্রধান লীলাভূমি বলা যাইতে পারে। এই সেন-রাজবংশীয়গণেরই কথা উপরে বলা হইল। তবকাৎ-ই নাসীরি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে এই সেন রাজবংশের ভাগ্য বিপর্য্যয় কালে বক্তিয়ারের সেনাপতি মহম্মদ শেরাণ লক্ষ্ণণাবতী বা গৌড় হইতে আসিয়া বীরভূমের প্রাচীন রাজধানী লক্ষ্ণণ নগর বা লক্ষুর জয় করেন। কেহ কেহ বলেন যে, সেনবংশীয় **কেশব সেন** কিছুদিন লক্ষুরে রহিয়া তাঁহাদের হৃতরাজ্য উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন। এই কেশব সেন বা তাঁহার বংশীয় কাহারও নিকট হইতে মহম্মদ শেরাণ লখণোর অধিকার করিয়াছিলেন।

নাথ ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসী– খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যাংশে বীরভূমে নাথ-সম্প্রদায়ের এক সময়ে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। নন্দীগ্রাম অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ভুক্ত নাথ গোস্বামী নামক একজন সন্ন্যাসী সংক্রান্ত অনেক কথা প্রচলিত আছে। এই নাথ গোস্বামীর সমাধির এখনও পূজা হয়। তারাপীঠ প্রসঙ্গে যে বশিষ্ঠের কথা উল্লেখ আছে, তিনি নাথপন্থী সন্ন্যাসী মীননাথের পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া কথিত হন এবং তিনি বীরভূমে তান্ত্রিক সাধনার শ্রীবৃদ্ধি করেন। তাঁহার নামেই 'বশিষ্ঠাবাধিতা তারা' - এই প্রবাদের প্রচলন হইয়াছে। নাথপন্থী সন্ন্যাসিগণ তাঁহারই অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়।

দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্র চোল ও চেদিরাজ কর্ণদেবের অধিনায়কত্বে বৈষ্ণবধর্ম্ম আলোচনার জন্য নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বীরভূমে আর একদল সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়।

নলরাজগণ – গৌড়ের ইতিহাস গ্রন্থে (১ম খণ্ড) লিখিত আছে যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে 'নলরাজগণ' বীরভূম অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। এই গ্রন্থে, এই উক্তির পোষকরূপে কোন প্রমাণ উল্লিখিত হয় নাই। কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থে দেখা যায় যে খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীতে রাজপুতানার অন্তর্গত নরবার বা নরওয়ার অঞ্চলে নলবংশীয় রাজগণ বর্ত্তমান ছিলেন। রাজপুতানা হইতে এই নলরাজগণের এতদঞ্চলে দিগ্বিজয় উপলক্ষে আগমনের কথা, বাঁকুড়ার শুশুনিয়ার পাহাড়ে প্রাপ্ত চন্দ্রবর্ম্মা রাজার শিলালিপি হইতেও পাওয়া যায়। সুতরাং নল

রাজগণের এদেশে আগমন এবং ক্রমে স্থায়ীভাবে বাসস্থাপন করিবার কথা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।*

লুপ লাইনের নলহাটি ষ্টেশনের নিকট একটি প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ ও পরিখার চিহ্ন দেখা যায়। উহা নলরাজার বাড়ী নামেই প্রসিদ্ধ। সতীর দেহাংশ পতিত হইবার জন্য নলহাটির নামকরণ হইয়াছে। নলরাজার বাসস্থান বলিয়াও এই নামের সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়।

প্রবাদ নলরাজগণ মৌড়েশ্বরের অধীন সন্ধিগড়া বাজার নামক গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে নলরাজার নামোল্লেখে কতকগুলি পুষ্করিণী ইত্যাদি এবং তাঁহার সেনাপতি কোচাই মল্লের নামানুসারে একটি পুষ্করিণী এখনও দেখা যায়।

জগদ্বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নানুর গ্রামেও প্রবাদ এই যে নলরাজগণ এতদঞ্চলে রাজত্ব করিতেন এবং নলহাটি, সন্ধিগড়া বাজার ও নানুরে শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। নানুর গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ সীমান্তে নলরাজগণের সম্পর্কিত সুবিস্তৃত ধ্বংসস্তূপ, পরিখা চিহ্ন ও নলগ'ড়ে, ঘি গ'ড়ে, তেলগ'ড়ে, ফুলগ'ড়ে পুষ্করিণী প্রভৃতি স্থানীয় লোকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কথিত আছে যে, নানুরে নলবংশীয় সাতরাজা রাজত্ব করিতেন। রাজা ও রাণীর নামানুসারে এখনও নানুরে সাতরায় বা সাতরাণীর দীঘী অতীত স্মৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

গুপ্ত বংশ— নলহাটি আজিমগঞ্জ লাইনের লোহাপুর ষ্টেশনের উত্তরে গম্ভীরা নদীতীরে বালা বা বারানগর নামে একটি প্রাচীন গন্ডগ্রাম আছে। এই বালানগরের সহিত গুপ্তবংশের বালাদিত্য উপাধিধারী নরসিংহ গুপ্তের সংস্রব আছে বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে রাজপুতানা প্রদেশের পুষ্কর্ণার অধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত স্বাধিকারে আনয়ন করেন*। বলা বাহুল্য যে, বঙ্গদেশ এই আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত ছিল। গুপ্তবংশীয় দিগ্বিজয়ী মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার নিকট হইতে বঙ্গদেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। এই গুপ্ত বংশের রাজা বালাদিত্য উপাধিধারী নরসিংহ গুপ্তের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। নানুরগ্রামে এই বালাদিত্যের একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা এখন নানুর গ্রামের ৺মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটিতে সংরক্ষিত আছে। বালাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্তের পর এই গুপ্তবংশের আর কোন পরিচয় পাওয়া

---

* এ সম্বন্ধে ৩৩ পৃঃ পাদ-টীকা দ্রষ্টব্য।

যায় না। গুপ্তবংশীয় মধ্যে কেহ রাঢ়ের এতদঞ্চলে আসিয়া বালানগরের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন– ইহা অনুমান করা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

বাণরাজা – বারা ও নিকটবর্ত্তী নগরা ও বাণেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চলে বাণরাজার রাজত্বের কথার প্রবাদ আছে। এতদঞ্চল এক সময় প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ বা আসাম রাজের অধিকারভুক্ত ছিল। বাণ, নরক, ভগদত্ত প্রভৃতি রাজগণ আসামপ্রদেশের অধিপতি ছিলেন। ভাস্করবর্ম্মা নিজকে ভগদত্তের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইনি বাণরাজার মত শৈব বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। কেহ কেহ বলেন যে সমধর্ম্মাবলম্বী বাণরাজার নাম হইতে এতদঞ্চলে বাণরাজা সংক্রান্ত প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। ভাস্কর বর্ম্মার পর কামরূপ হইতে আনীত তান্ত্রিক মত এতদঞ্চলে প্রসারলাভ করিয়াছে বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন।

রাজা মানপতি – রামপুরহাটের চারিমাইল পূর্ব্বে মাড়গ্রাম নামক একটি সুবৃহৎ গ্রাম আছে।কথিত আছে, মাণ্ডব্য নামক এক ঋষির নামানুসারে এই গ্রামের নামকরণ হয়। মাড়গ্রামের দক্ষিণে দ্বারকা নদীর তীরে মাণ্ডব্যের আশ্রম ছিল। এই মাড়গ্রামে, মানপতি নামক এক রাজার বাস ছিল বলিয়া কথিত আছে। প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে এই মানপতি নামক হিন্দুরাজা বর্ত্তমান ছিলেন।

রাজা জয়সিংহ – মাড়গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অবস্থিত তারাপুরের নিকট জয়সিংহপুর নামে একটি গ্রাম আছে। জনশ্রুতি এই যে, তথায় জয়সিংহ নামে এক রাজা ছিলেন।

রাজা চন্দ্রচূড় – তারাপুরের সন্নিকট দ্বারকা নদীর তীরে চন্দ্রচূড় নামে এক রাজা বাস করিতেন। রাজার নামে এখানে চন্দ্রচূড় অনাদিলিঙ্গ শিব বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

রাজা মুকুটরায় – তারাপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশের অদূরে একচক্রা (বিস্তারিত বিবরণ 'একচক্রা' দ্রষ্টব্য)। ইহার অদূরেই মৌড়েশ্বর গ্রামে মুকুটরায় নামে এক রাজা ছিলেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যখ্যাতিও ছিল। তিনি তাঁহার কন্যা পদ্মাবতীর সহিত নিত্যানন্দ প্রভুর পিতা হাড়াই পণ্ডিতের বিবাহ দেন। মৌড়েশ্বর এককালে বীরভূমের শক্তিপূজার কেন্দ্র ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

রাজা দুর্জ্জয় সেন – মৌড়েশ্বরের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে কোটাসুর গ্রামেও দুর্জ্জয় সেন নামে এক রাজা ছিলেন।

রাজা মল্ল – ই,আই,আর লুপ-লাইনের অন্যতম ষ্টেশন মল্লারপুর। এখানে 'মল্ল'নামধারী কোন রাজার রাজধানী ছিল। এখানকার মল্লেশ্বর শিব মন্দিরের

দ্বারে- ১১২৪ শকাব্দা ক্ষোদিত আছে। প্রবাদ এই যে, ইহা মল্লরাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তন্ত্রোক্ত বচনের —

বীরভূমৌ সিদ্ধনাথঃ
রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ

সিদ্ধনাথ, এই মল্লেশ্বর শিব।

রাজা রামজীবন – মৌড়েশ্বর থানার অন্তর্গত ঢেকা গ্রামের অধীশ্বর রাজা রামজীবন রায় চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে পরিচিত। ইঁহার কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। এই রামজীবন তদানীন্তন বীরভূমের রাজা খাজা কামাল খাঁর (মৃত্যু– ১৬৯৭ খৃঃ)সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন।

তথ্যসূত্র

(১) "সাহিত্য" ১৩২০ চৈত্র ৪৬০-৬১ পৃঃ ও "গোবিন্দচন্দ্র গীত" ৫২-৫৩ পৃঃ

(২) বর্ত্তমানে এখানে রাজনগর নামে কোন গ্রাম নাই। তবে রাজনগর বলিয়া মৌজা আছে। এই স্থান এখন বনজঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে। রাজনগর বলিয়া নির্দ্দেশিত স্থানে এখন শঙ্করপুর নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। এই স্থানের অর্দ্ধ মাইল দূরেই রাজার গড়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রাজবাড়ীর কোন নিদর্শন দেখা যায় না। - গ্রন্থকার

(৩) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস' - প্রথম খণ্ড ২৬১-৬২ পৃষ্ঠায় বসু মহাশয়ের এই মন্তব্যে আস্থাবান হইতে পারেন নাই - গ্রন্থকার।

(৪) শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় রচিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'– রাজন্যকাণ্ড ১৯৯ পৃঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলমান অধিকারকাল (১২০০-১৬০০ খৃঃ)

পাঠান অধিকারকাল- বীরভূমের মত ক্ষুদ্রায়ত স্থানের ইতিহাস সম্বন্ধে পরিচয় জানিতে হইলে, সমগ্র বঙ্গের ইতিহাসের সহিত, অন্ততঃপক্ষে স্থূলপরিচয় থাকা একান্ত আবশ্যক। এই জন্য আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে, মুসলমান শাসনের প্রারম্ভকাল হইতে গৌড়রাজ্যে পাঠান ও কখন কখন হিন্দু অধিকারকালের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া প্রসঙ্গক্রমে এই বিবরণের সহিত বীরভূমের তৎকালীন পরিচয় ও গৌড়-রাজ্যের সহিত ইহার সম্বন্ধের কথা বর্ণনা করিলাম।

সেন-বংশীয় গৌড়রাজগণের রাজত্ব অবসানের প্রাক্কালে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাংশে, বঙ্গে মুসলমানগণের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। সুলতান সাহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী, ভারত-বিজয়ের পর, কুতবুদ্দীন নামক এক তুর্কী ক্রীতদাসকে ভারতের রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া স্বকীয় ঘোরীরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কুতবুদ্দীনের অধীনে মহম্মদ বিন্ ব্যক্তিয়ার খিলজী সেনাপতি নিযুক্ত হন। ইনি অযোধ্যা, বিহার ও বঙ্গদেশ জয় করিলেও, এদেশে বিস্তৃতভাবে অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। বলিতে কি, বরেন্দ্র-মণ্ডলের মহানন্দা এবং করতোয়া নদীর নিকটবর্ত্তী দেবকোট প্রদেশের কয়েকটি মাত্র পরগণার তিনি প্রকৃতভাবে শাসনাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, গঙ্গাতীর হইতে দেবকোট পর্য্যন্ত অনুমান ৫০ ক্রোশ পরিমিত ভূমি মাত্র তিনি অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কামরূপ বিজয়ের জন্য যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, মহম্মদ শেরাণ নামক জনৈক খিলজী-বংশীয় আমিরকে, গৌড় হইতে দশদিনের পথ বা ৪০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত বীরভূমের লক্ষুর নগর অধিকার করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণাবতী বিজয়ের ৮ বৎসর পরে, হাসামুদ্দীন বা ঘিয়াসুদ্দীন ইয়ূজ গঙ্গার উত্তরে দেবকোট হইতে দক্ষিণে বীরভূমের লক্ষুরনগর পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন[১]।

তাহার পর বক্তিয়ার খিলজী আলিমর্দ্দন নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্দ্দয়রূপে নিহত হন।

বক্তিয়ার খিলজী, দিল্লীশ্বর কুতবুদ্দীনকে 'সুলতান' বলিয়া স্বীকার করিলেও স্বাধীনভাবে রাজ্যবিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার হত্যাকারী আলিমর্দ্দনও দিল্লীশ্বরের সনন্দলাভ করিয়াছিল।

আলিমর্দ্দন দেবকোট রাজধানীতে খিলজী বংশীয়গণ কর্ত্তৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনিও কিছুকাল দিল্লীশ্বরের নামেমাত্র অধীনতা স্বীকার করিয়া প্রকাশ্যভাবেই স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। ইতিমধ্যে সুলতান কুতবুদ্দীন সহসা অশ্ব হইতে পতিত হইয়া পরলোক গমন করিলে, হাসিমুদ্দীনের স্বাধীনতার পথ নিষ্কন্টক হইল। হাসিমুদ্দীন গৌড় নগরে রাজধানী নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া **'সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন'** নাম গ্রহণ করেন এবং এই নামেই তিনি ৬১৪ হিজরা হইতে ৬২০ হিজরা পর্য্যন্ত নিজ নামে মুদ্রা প্রচলিত করেন। সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন গৌড় নগরের যখন রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই সময় অনুমান ১২০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দিনাজপুরের অন্তর্গত দেবকোট রাজধানী হইতে গৌড় হইয়া তদানীন্তন রাঢ়ের রাজধানী লক্ষুর বা নগর পর্য্যন্ত দশ দিনের রাস্তাব্যাপী এক সুদীর্ঘ শরণি বা উচ্চ রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঘিয়াসুদ্দীনের এই সুদীর্ঘ শরণি এখন তাঁহার একমাত্র কীর্ত্তিচিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান আছে। বীরভূমের বর্ত্তমান রাজধানী সিউড়ীর মধ্য দিয়া এই রাস্তা চলিয়া গিয়াছে[২]।

সুতরাং অনুমান হয় যে ঘিয়াসুদ্দীন ঘোরীর পূর্ব্ব হইতেই এতদঞ্চলে মুসলমানগণের প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং সুদূর বীরভূম হইতে ইহার গুরুত্ব ও গৌরবের কথা, গৌড়-বিজেতার কর্ণগোচর হইয়াছিল এবং ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াই তিনি গৌড়ের সহিত বীরভূমের নগরের যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন।

ঘিয়াসুদ্দীন সুবিখ্যাত কুতুব-উল্ আলমের সহপাঠি ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই তদানীন্তন রাজনগরের সাধু হামিদ উদ্দীনের নিকট ঈশ্বরতত্ব বিষয়ে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন[৩]।

দ্বাদশ বৎসর রাজত্বের পর, ঘিয়াসুদ্দীনের মৃত্যু হয়[৪]। তাহার পর, আমরা ক্রমে নসিরুদ্দীন, আলাউদ্দীন ও সৈয়ফ্‌উদ্দীনকে গৌড়ের শাসনকর্ত্তারূপে দেখিতে পাই। তদনন্তর ইজুউদ্দীন **তুঘান খাঁ** নামক একজন ক্রীতদাসকে দিল্লীশ্বরী সুলতানা রজিয়া গৌড়ের রাজপ্রতিনিধি বা সুলতান নিযুক্ত করেন(১২৩৭ খৃঃ)। ইঁহার শাসনকালে যুদ্ধবিগ্রহ সংগঠিত হয়। তুঘান খাঁ যখন হিজরা ৬৪২ সালে (১২৪৩ খৃঃ) অযোধ্যা প্রদেশের সান্ধি বিগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় উড়িষ্যার অধিপতি সসৈন্য রাঢ়দেশ অধিকার করিয়া লক্ষ্ণণাবতী বা গৌড় আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করেন।

মুসলমানগণ রাঢ় অধিকারকালে কলিঙ্গরাজ্যের সীমা আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সেই জন্যই কলিঙ্গাধিপতি ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রাঢ়-রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন। তুঘান খাঁ, লুপ্তরাজ্য পুনরাধিকার করিবার আশায় সসৈন্যে কলিঙ্গ আক্রমণ করিতে গিয়া পরাভূত হন। তুঘান খাঁ লক্ষ্ণণাবতীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই কলিঙ্গাধিপতি তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সর্ব্বাগ্রে বীরভূমে লক্ষুর বা নগর আক্রমণ করেন এবং তথায় বহু সংখ্যক মুসলমান ও লক্ষুরের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা ফখর-উল্-মুলক করিমুদ্দীনকে নিহত করিয়া লক্ষ্ণণাবতী অবরোধ জন্য তদাভিমুখে অগ্রসর হন[৫]।

নগরের কালীদহের মধ্যস্থলে একটি বিরাম-নিকেতনের জঙ্গলময় ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যা-অঞ্চলে সুবৃহৎ জলাশয়ের মধ্যস্থলে এইরূপ বিরাম-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার প্রথা বহু স্থলেই পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু এদেশে এইরূপ প্রথা অন্যত্র কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং অনেকেই অনুমান করেন যে কালীদহের মধ্যস্থিত ইষ্টক-নির্ম্মিত বিরাম-কুঞ্জটি, কলিঙ্গ-রাজের লক্ষ্ণণাবতী বিজয়-ব্যপদেশে নগর বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

তুঘান খাঁর রাজত্বকালের শেষাংশে (অনুমান ১২৪৪ খৃঃ) বীরভূমের পশ্চিমাংশ হইতে সাঁওতাল প্রভৃতি পাৰ্ব্বত্যজাতি আসিয়া নগর লুন্ঠন করিয়াছিল[৬]।

সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন ইয়ুজ বসনকোট নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৭]।

সুলতান সমস্উদ্দীন আলতামাসের পর, লক্ষ্ণৌতি-লখণোরের তদানীন্তন অধিকারী ইবক বা আওর খাঁ নামক জনৈক, তুর্কীর সহিত এই বসনকোট দুর্গের অধিকার ব্যপদেশে তুঘান খাঁর বিরোধ হইয়াছিল। আওর খাঁর সহিত লক্ষ্ণণাবতী নগরের সীমা মধ্যে তুঘান খাঁর যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহাতে আওর খাঁ নিহত হন। অতঃপর তুঘান খাঁর অধিকার পশ্চিম সীমান্তে রাঢ়-দেশের লক্ষুর হইতে পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশে বসনকোট দুর্গ পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল[৮]।

ইহার পর তোগলক বংশের শাসনকালে বাঙলার সুলতানগণ ফকরুদ্দীনের বিদ্রোহ দমনে বহুকাল অতিবাহিত করেন। এই সময় বঙ্গদেশ মূলতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইলে- ১) সোনার গাঁয়ে. পূৰ্ব্ব বিভাগের ২) লক্ষ্ণণাবতীতে পশ্চিম বিভাগের ও ৩) সাত গায়ে দক্ষিণ বিভাগের রাজধানী স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহাতেও গোলযোগের নিবৃত্তি হইল না। পরে, শাসনকর্ত্তা শামসউদ্দীনের অধীনে সমস্ত বাঙলা একত্র হইয়া সোনার গাঁয়ে রাজধানী স্থাপিত হইল। বলিতে কি, শামসউদ্দীনই বঙ্গের প্রথম স্বাধীন রাজা। শামসউদ্দীন ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন। তাহার পর হইতে প্রায় দুইশত পঁচিশ বৎসরকাল বাঙলা দেশ স্বাধীনতা

ভোগ করিয়াছিল। শামসউদ্দীনের পুত্র সেকন্দর ও তাঁহার পুত্র গিয়াসুদ্দীন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীনের পৌত্রের শাসনকালে বঙ্গভূমি রাজা গণেশের হস্তগত হয়। ইনি রাজা কানস্ নামেও পরিচিত ছিলেন। তাহার পর, গণেশের পুত্র যদু জালালুদ্দীন নামগ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। এই সময় খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কায়স্থ রাজা দনুজমর্দ্দনদেব পাণ্ডুয়া নগরে স্বাধীনতা ঘোষণা পূর্ব্বক পাণ্ডুয়া নগরেই রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার পুত্র মহেন্দ্রদেব জালালুদ্দীন কর্ত্তৃক নিহত হন। তাহার পুত্র রমাবল্লভের সময় এই রাজবংশের অধিকার বিলুপ্ত হয়। জালালুদ্দীনের (বা যদুর) পুত্র শামসউদ্দীন আহম্মদ শা, দুইজন ক্রীতদাসের হস্তে নিহত হইলে, রাজা গণেশের বংশ লোপ হয়। তদনন্তর পাঠান বংশের পুনরায় অভ্যুদয় হয়। এই বংশে নাজির শা প্রভৃতি মাত্র অল্পদিন রাজত্ব করিলে পর এক আবিসিনীয় বা হাবসী দাস কর্ত্তৃক বাঙলার সিংহাসন অধিকৃত হয়। মাত্র সাত বৎসর রাজত্বের পরই ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদের রাজ্যলোপ পায়।

তৎপরে হুসেন শাহ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার সিংহাসন লাভ করেন (১৪৯৪-১৫১৯)। হুসেন শাহ সুপ্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকালে বর্ত্তমান সাগরদীঘী রেল ষ্টেশনের উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত চাঁদপাড়া নামক গ্রামে বাস করেন। তথায় সুবুদ্ধি রায় নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের অধীনে তিনি কাজ করিতেন। হুসেন শার রাজত্ব ও তাঁহার পূর্ব্বকালের কথা ইতিহাসে সুবিদিত, সুতরাং তাহা এখানে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

হুসেন শা গৌড়ে রাজ-সরকারে প্রবেশ লাভ করিয়া ক্রমে উজির ও সর্ব্বশেষে গৌড়েশ্বরের পদ প্রাপ্ত হন। হুসেন শার সময় শ্রীচৈতন্য ও নিত্যনন্দ প্রভুর আবির্ভাব হয়। তিনি বঙ্গ সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। রূপ, সনাতন, পুরন্দর খাঁ, মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ) প্রভৃতি সাহিত্যিক ও মনীষীবৃন্দ তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন।

বীরভূমে, আলাউদ্দীন হোসেন সাহর একখানি শিলা-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে– ইহাতে, ১৫১৬ খৃঃ তাঁহার একটি কূপ খনন করিবার কথা বিবৃত আছে[১]।

হুসেন সাহার পুত্র নাসিরউদ্দীন নসরৎ সাহও বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার পুত্র ফিরোজ সাহ তৎপুত্র গিয়াসুদ্দীন মহম্মদ সাহ। শের খাঁ বা শের সাহ গৌড় নগর অধিকার করিলে গিয়াসুদ্দীন মহম্মদ সাহার সাহায্যার্থ হুমায়ুন সসৈন্যে বিহারাভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময় শের খাঁ আত্মরক্ষার্থ ঝাড়খণ্ডে পলায়ন করিয়া রোহতাস দুর্গ অধিকার করেন। গিয়াসুদ্দীন মহম্মদ

সাহ পাঁচ বৎসর রাজত্বের পর পুত্রশোক ও নানাবিধ দুঃখভোগ করিয়া ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে কহলগাঁওএ দেহত্যাগ করেন। এইভাবে গৌড়বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগের অবসান হইল। অতঃপর (১৫৩৪-১৫৩৯খৃঃ) **হুমায়ুন** নির্ব্বিবাদে গৌড় সিংহাসন অধিকার করেন ও তিন মাস মধ্যে গৌড় ত্যাগ করিয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইহার পর **শের সাহ** ছয় বর্ষকাল (১৫৩২-৩৮খৃঃ) গৌড় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়া রাজ্যশাসন করেন। অতঃপর শের সাহ বংশীয় যথাক্রমে খিজর খাঁ, কাজী ফজীরত ও মহম্মদ খাঁ শূর বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করেন। মহম্মদ খাঁ শূর দিল্লীর অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন (১৫৪৫-৫৩খৃঃ)। এই সময় হইতে আকবর কর্ত্তৃক বাঙলা দেশ বিজয় পর্য্যন্ত গৌড় সিংহাসন দিল্লীশ্বরের অধিকারগত হয় নাই।

শের সাহ, তাঁহার ছয় বৎসরব্যাপী রাজ্যকাল মধ্যে রাজস্ব আদায় ও রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ব্যাপারের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারই শাসনকালে ঝাড়খণ্ডের দস্যুগণ হইতে বাঙলাদেশকে রক্ষা করিবার জন্য স্থায়ীভাবে এতদঞ্চলে মুসলমান জায়গীরদার নিযুক্ত হয়। পরবর্ত্তীকালে সম্রাট আকবর তাহাই সুসম্বদ্ধভাবে কার্য্যে পরিণত করিয়া ভারত ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। শের সাহ তাঁহার রাজ্য ১১৬০ পরগণায় বিভক্ত করিয়া প্রতি পরগণায় ৫ জন করিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উত্তরকালে ইহাই পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিয়া তোড়র মল্লের রাজস্ব বন্দোবস্ত নামে পরিচিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব তোড়র মল্ল তাঁহার জীবনের প্রথম অংশে শের সাহের অধীনে কর্ম্মচারী ছিলেন। বাদশাহী শরাণ (The Grand Trunk Road) শের সাহের অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি। তিনি বঙ্গদেশের সুবর্ণগ্রাম হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত তিন হাজার মাইল বিস্তৃত এই রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া এক এক ক্রোশ অন্তর এক একটি শরাই নির্ম্মাণ করিয়া দরিদ্র পথিকদিগকে ভিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সংবাদ বহনের জন্য প্রতি শরাই-এর মধ্যবর্ত্তী স্থানে দুইজন অশ্বারোহী ও কতকগুলি পদাতিক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই বাদশাহী শরাণ এখনও বৃক্ষাদি পরিশোভিত হইয়া অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বীরভূমের সীমার মধ্যে এই বাদশাহী শড়কের কিয়দংশ অবস্থিত রহিয়াছে।

শের সাহের মৃত্যুর পর আফগান প্রধানগণ পুনরায় বিদ্রোহাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু ইহার অল্পকাল পর হইতে আফগান অধিকারের প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। মহম্মদ সাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ছাপরার যুদ্ধে নিহত হইলে তাঁহার পুত্র বাহাদুর সাহ গৌড়ের সিংহাসন আরোহণ করেন। ইনি ছয়

বৎসরকাল রাজ্য করিয়া ১৫৬০ খৃঃ পরলোক গমন করেন। তদনন্তর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জালাল সাহ ও তৎপরে তাঁহার পুত্র গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন।

এই সময় সোলেমান কররাণী গৌড়রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করেন (১৫৬৪-৭৩খৃঃ)। ইনি আকবর বাদসাহের প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সোলেমানের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বয়াজিদ্ সাহ গৌড়ের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। আফগান ষড়যন্ত্রের ফলে ইনি মাত্র দেড় বৎসরকাল রাজত্ব করিবার পর নিহত হন।

ইহার পর ভ্রাতৃহত্যাকারীকে নিহত করিয়া সোলেমানের অপর পুত্র দায়ুদ সাহ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। এই দায়ুদ সাহ আকবর বাদসাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন।

বীরভূমের পূর্ব্বাংশে উত্তর-দক্ষিণে লক্ষ্ণৌতি হইতে মঙ্গলকোট এবং তথা হইতে বর্দ্ধমান ও সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে বৃহৎ ও সুপ্রশস্ত শরণি এখনও পরিলক্ষিত হয়, তাহা গৌড়-বাদসাহী রাস্তা নামে খ্যাত। পূর্ব্বে কূপ খননকালে হোসেন সাহের যে শিলালিপি আবিষ্কারের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই গৌড়-বাদসাহী রাস্তার অনতিদূরেই পাওয়া গিয়াছিল*।

দায়ুদ সাহ এই বাদসাহী রাস্তা দিয়াই ১৫৭৪ খৃঃ তদানীন্তন মোগল সেনাপতি (পরবর্ত্তীকালে রাজস্ব সচিব) তোড়রমল্ল কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া উড়িষ্যা অভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৫৭৫ খৃঃ দায়ুদ আত্মসমর্পন করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। এই সময় গৌড়ে ভয়ানক মহামারি উপস্থিত হইলে দায়ুদ সাহ দ্বিতীয় বার গৌড়রাজ্য অধিকার করিবার প্রয়াস পান। পরে দায়ুদ কটক হইতে অগ্রসর হইয়া তাণ্ডা রাজধানীতে আগমন করেন এবং অবশেষে ১৬০০ খৃঃ শিকরীগলি ও রাজমহল যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার ছিন্ন শির আকবরের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

দায়ুদ সাহই প্রকৃতপক্ষে গৌড়রাজ্যের শেষ স্বাধীন নরপতি। দায়ুদ সাহের মৃত্যু হইলে গৌড়ের আফগান প্রধানগণও সহজে আকবরের অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হয় নাই।

পাঠান রাজগণ প্রায় চারিশত বৎসরকাল বঙ্গে রাজত্ব করেন। মোগল শক্তি কর্ত্তৃক তাঁহারা পরাজিত হইলেও, তাঁহাদিগকে বঙ্গদেশ হইতে চির-অপসৃত

---

* ৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

করা আদৌ সম্ভবপর হয় নাই। বলিতে কি, মোগল বাদসাহকে, বঙ্গে অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া জায়গীরভোগী পাঠানগণের সহিত দ্বন্দ্ব-কলহ বা যুদ্ধ-বিগ্রহে নিয়ত বিব্রত রহিতে হইত। পাঠান শাসন অবসানের পরবর্ত্তী কালেও, আফগানগণের বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিবার হেতু বুঝিতে হইলে, তাঁহাদের শাসনপদ্ধতির কথা অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

পাঠান শাসন-পদ্ধতি – বঙ্গে পাঠান বা আফগানগণ বহুবর্ষকাল স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা ও অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজ্য-শাসনকে রাজ-শক্তি-প্রধান বলা যায় না। পরন্তু, ইউরোপে গথ্ ও ভ্যাণ্ডেল্ জাতি যেরূপ সামন্ত শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, উহা তাহারই অনুরূপ। বক্তিয়ার খিল্‌জী ও পরবর্ত্তী বিজেতৃগণ কোন একটি বিশেষ জেলা আপনার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন করিয়া লইতেন। অপর জেলাগুলির শাসনভার, তাঁহাদের অধীনস্থ সেনানীবর্গকে অর্পণ করা হইত। এই সেনানীগণ আবার তাঁহাদের অধিকার মধ্যে সমগ্র ভূমি তাঁহাদের অধিনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনানায়কগণকে বিভক্ত করিয়া দিতেন। এই ক্ষুদ্র সেনানায়কগণকে তাঁহাদের আত্মীয় ও অনুগত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কতকগুলি সৈন্য প্রস্তুত রাখিতে হইত। ইঁহারা স্বয়ং ভূমি কর্ষণ করিতেন না; কিন্তু ভূস্বামীরূপে কর লইয়া হিন্দু কৃষাণদিগকে ভূমি বন্টন করিয়া দিতেন। স্বার্থের অনুরোধে আফগানগণ, এই সকল হিন্দু কৃষাণ বা প্রজার সহিত ন্যায় ও সঙ্গত ব্যবহার করিতেন। শীঘ্র শীঘ্র ভূস্বামীর পরিবর্ত্তন না হইলে এবং সতত বিদ্রোহ ও শত্রুর আক্রমণ না থাকিলে, কৃষাণগণের অবস্থা অধিকতর সুখের হইতে পারিত; কেন না, বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে প্রজাদিগের ভূসম্পত্তিতে কেহ হস্তক্ষেপ করিত না।

যাহাই হউক, নিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগের বহু পরিমাণে হীনতা সাধন হইয়াছিল। তবে, পাঠান সেনানীগণ বিষয় কর্ম্মে ততদূর মনোযোগী না থাকায়, অথবা কার্য্য-ব্যপদেশে দূরে সেনাপতিগণের নিকট দীর্ঘকাল উপস্থিত থাকিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহারা ধনবান হিন্দুদিগের হস্তে তাঁহাদের ভূসম্পত্তি ইজারা বা পত্তনি বিলি করিতেন। এতদ্ব্যতীত, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্য হিন্দুগণের হস্তেই ন্যস্ত ছিল[১০]।

পাঠান শাসকগণ এইরূপ শাসনপদ্ধতি বা সেনাপতি ও সৈনিকগণের বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীরস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি প্রদানের প্রথা প্রচলন করিয়া সমগ্র দেশের কর আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ফলে, পাঠান শাসনকালের অবসান ঘটিলেও ভূস্বামীরূপে পাঠান সেনাপতি বা সেনানীগণ বঙ্গে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী মোগলগণ এই পদ্ধতির বিলোপ

সাধন করিতে প্রয়াস পাইলে আফগানগণ যে দীর্ঘকাল বিদ্রোহাচারণ করিয়া মোগলগণকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা সুবিদিত।

বীরভূমে পাঠান ফৌজদারগণ, এইরূপ শাসকগণের সেনানায়করূপে বীরভূম অঞ্চল সুরক্ষিত করিবার পরিবর্তে, ইহার উপস্বত্ব ভোগ করিবার অধিকার লাভ করিয়া এতদঞ্চলে তাঁহাদের অধীনে কর আদি সংগ্রহ করিতেন এবং আবশ্যক মত সৈন্য ও অর্থদ্বারা গৌড়েশ্বরের সহায়তা করিতেন। মোগল শাসনাধিকারকালে, আমরা এই সকল পাঠান ফৌজদার বংশধরগণের পরিচয় প্রাপ্ত হই।

তথ্যসূত্র

(১) তবকত-ই-নসিরি, ইংরাজী অনুবাদ ৪৭৩, ৪৮৪-৮৬ পৃঃ ও "বাঙ্গালার ইতিহাস" দ্বিতীয় ভাগ ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ পৃঃ

(২) (ক) Stewart's History of Bengal 62–63;

(খ) বঙ্গদর্শন ১৩১৪, ৬০৫-০৬ পৃঃ; (গ) "বাঙ্গালার ইতিহাস" – রাখাল, ৪০ পৃঃ

(৩) Stewart's History of Bengal p. 106

(৪) বঙ্গদর্শন ১৩১৪, ৪৩৪ পৃঃ

(৫) তবকত-ই-নসিরি; বঙ্গদর্শন ১৩১৪, ৬০৩-০৭ পৃঃ;

'বাঙ্গালার ইতিহাস'– দ্বিতীয় ভাগ, ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩ পৃঃ ও Stewart's History of Bengal, p 106

(৬) 'বাঙ্গালার ইতিহাস'– দ্বিতীয় ভাগ, ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯ পৃঃ

(৭) তবকত-ই-নসিরি ইংরাজী অনুবাদ ৫৮৩ পৃঃ

(৮) "বাঙ্গালার ইতিহাস"– দ্বিতীয় ভাগ - ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় - ৫০ পৃঃ

(৯) বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় খণ্ড ২৩০ পৃঃ

(১০) Stewart's History of Bengal p. 186–87 (বঙ্গবাসী)

সপ্তম অধ্যায়

মুসলমান অধিকারকাল (১৬০১-১৭৫৭খৃঃ)

মোগল অধিকারকালে আফগান বিদ্রোহ – পূর্ব্ব অধ্যায়ে বঙ্গে পাঠান-অধিকারকালের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ধৃতকালের মধ্যে সুদীর্ঘকাল, এমনকি, মোগল-কেশরী সম্রাট আকবরের রাজত্বের প্রায় শেষকাল অর্থাৎ ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, বা তাহারও পরবর্ত্তীকাল সময়ের কথাও লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে। তাহার কারণ, মোগল-শক্তি বঙ্গদেশ নামে মাত্র জয় করিলেও, সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আফগানগণ, প্রকৃতপক্ষে বঙ্গের শাসনভার মোগল হস্তে সহজে তুলিয়া দেয় নাই। এইজন্য বহু যুদ্ধ বিগ্রহ সংগঠিত হয়। অবশেষে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে দায়ুদ সাহের পরাজয়ে আফগান রাজশক্তি প্রায় সমূলেই বিনষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু ইহার পরেও মোগল বাদসাহগণকে বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে আরও প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল সময় অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল।

আফগানগণ পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহী হইয়া সর্ব্বশেষে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে মোগল-শক্তির নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। অতঃপর তাহারা শান্তভাবে স্ব-স্ব পূর্ব্বাধিকৃত স্থানের মধ্যে নিরুপদ্রবে বাস করিতে আরম্ভ করে। এই আফগানগণের বংশধরগণ বঙ্গের সর্ব্বত্র 'পাঠান'-নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

মোগল প্রতিষ্ঠা — মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে আফগান বিদ্রোহ এবং মোগল সৈন্যগণের মধ্যেও যে আত্মকলহ নিরন্তর চলিতেছিল, সেই সুদীর্ঘকাল মধ্যে, বঙ্গে যে মোগল সুলতানগণ শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন, তাহাদের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে বীরভূমের পাঠান জায়গীরদারগণের, বিদ্রোহ বা অন্য যে-কোন উপলক্ষেই হউক না কেন, কোনরূপ যোগসূত্র বা প্রসঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের বীরভূমের ইতিহাসে তাঁহাদের কথা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বলিতে কি, এই সময় মধ্যে আমাদের বীরভূম জেলা নবাগত মোগল-শক্তির কোনরূপ প্রাধান্যই স্বীকার করে নাই[১]। পরন্তু, স্বাধীন ভাবেই তাঁহাদের পূর্ব্বার্জ্জিত জায়গীর, কোনরূপ রাজকরের দায়িত্বের ভার

গ্রহণ না করিয়াই, সম্পূর্ণরূপ নিষ্কর ভাবেই ভোগ করিতেছিলেন।

সম্রাট্ আকবর বঙ্গ বিজয়ের পর দেখিলেন যে, আফগান বিদ্রোহ দমনে তাঁহার অধিকাংশ সময় নষ্ট হইয়া গেল! তিনি বঙ্গ বিজয় করিয়াও বঙ্গ হইতে বিশেষরূপ কোন কর সংগ্রহ করিতে পারিলেন না! সেইজন্য তিনি আফগানদের জায়গীর প্রথামতে, মোগল জায়গীরদার সেনানীবর্গের নিকট তাঁহাদের সৈন্য সংখ্যার বিবরণ এবং সৈন্যের বেতন দিয়া অবশিষ্ট রাজস্ব আদায় করিবার আদেশ দেন। এতদ্ব্যতীত, এই সকল জায়গীরদার এক স্থানে অধিক দিন রহিলে তাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বিদ্রোহী হইবার মত বল সঞ্চয় করিতে পারেন আশঙ্কা করিয়া, তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার প্রথাও প্রবর্ত্তন করিলেন। ইহার জন্য তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহের সূচনা হয়। এই সময় তিনি রাজা টোড়র মল্লকে একদল হিন্দু রাজপুত সৈন্য লইয়া বিদ্রোহ দমনে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় প্রেরণ করেন। তিনি এই বিদ্রোহ দমনে কৃতকার্য্য হন। তাহার পর তিনি রাজা তোড়র মল্লকে বঙ্গের রাজস্ব-বিভাগের কর্ত্তৃত্বভার প্রদান করেন। তিনি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের সমগ্র জমীদারীর বন্দোবস্ত করিয়া যে একটি হস্তবুদ প্রস্তুত করেন তাহার পরিচয় নিম্নে বিবৃত হইল।

রাজস্ব বন্দোবস্তের কথা — পাঠান রাজত্বকালে বঙ্গের রাজস্ব বন্দোবস্তের কথা পূর্ব্বে ৪৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণ আকবর বাদসাহের সময় হইতে ক্রমে ক্রমে মোগল শাসকগণের অধীনে বঙ্গে, তথা বীরভূমের, যে রাজস্ব বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহারই আনুপূর্ব্বিক সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই স্থলে প্রদত্ত হইল—

মোগল রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য ১৫টি ভিন্ন ভিন্ন সুবায় বিভক্ত হয়[২]। সুবা বাঙলা তন্মধ্যে অন্যতম। প্রত্যেক সুবায় এক একজন শাসনকর্ত্তা, বা সুবাদার, বা নাজিম রাখিয়া মোগলগণ শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে রাজা তোড়র মল্ল বাঙলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন; কিন্তু পরে শাসন-কার্য্যের অধিকতর সুবিধার জন্য সম্রাট আকবর খাঁ আজিমকে বাঙলার শাসনভার ও রাজা তোড়র মল্লকে বাঙলার রাজস্ব বন্দোবস্তের ভার অর্পণ করেন।

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা তোড়র মল্ল সমগ্র বঙ্গদেশকে ১৯টি সরকার (পরগণার সমষ্টি) ও ৬৮২টি পরগণায় (গ্রাম বা মৌজার সমষ্টি) বিভক্ত করিয়া সমস্ত খালসা, অর্থাৎ যে জমির আয় রাজকোষে আসিত তাহার উপর ৬৩৪৪২৬০ টাকা এবং জায়গীর অর্থাৎ যে জমির আয় হইতে কর্ম্মচারীগণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত তাহার উপর ৪৩৪৮৮৯২ টাকা মোট ১০৬৯৩২৬০ টাকা জমা নির্দ্ধারিত করেন। মোগল কর্ত্তৃত্বাধীনে ইহাই সর্ব্বপ্রথম রাজস্ব নির্দ্ধারণের প্রচেষ্টা এবং

ইহাই বঙ্গের সমস্ত খালসা ও জায়গীর জমির আসল তুমার জমা নামে পরিচিত। প্রত্যেক পরগণায় এক একজন করিয়া কাননগো এবং সর্ব্বোপরি একজন কাননগো ও তাঁহার অধীনে একজন নায়েব কাননগো নিযুক্ত হইয়াছিল।

বীরভূম মাদারুণ সরকারের অন্তর্গত ছিল। সরীফাবাদ (বীরভূমের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ ও বর্দ্ধমান) ও সেলিমাবাদের পশ্চিম সীমায় বীরভূম হইতে রূপনারায়ণ ও দামোদরের সঙ্গমস্থলের নিকট মণ্ডলঘাট পর্য্যন্ত, পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোট বা পাঁচেট ও দক্ষিণে সুন্দরবনের বাটি অবধি সরকার মাদারুণ বিস্তৃত ছিল। ইহার পরগণার সংখ্যা - ১৬ ও জমার পরিমাণ- ২৩৫০৮৫ টাকা ছিল।

সরকার মাদারুণ
১৬ মহাল ৯৪০৩৪০০ দাম

	দাম		দাম
১। উনহুটি	১২২৬৫৫	২। বলগুরি	৯৩৭০৭৭
৩। বীরভূম	৫৪১২৪৫	৪। ভীওয়ালভূম	৪৯৫২২০
৫। চিত্ত	৮০৬৫৪৪	৬। চম্পানগরী	৪১২২৫০
৭। হাভেলী মাদারুণ	১৭২৭০৭৬	৮। সেনভূম	৬১৫৮০৫
৯। সামার সানহাস	২৭৪৪৬১	১০। শেরগড় বা শিখরভূম	৯১৫২৩৭
১১। সাহাপুর	৬৩৪৪৬০	১২। কীট	৪৬৪৪৭
১৩। মণ্ডল ঘাট	৯০৬৭৭৫	১৪। নগর	৪০২৫৬০৮
১৫। মীনাবাগ	২৭৯৩২২	১৬। হুসোলী	২৬৩২০৭

এই সরকার কর্ত্তৃক ১৫০ অশ্বারোহী ও ৭০০০ পদাতিক দেয়[৩]।

মোগল বাদসাহ সাজাহানের রাজত্ব সময়ে সুলতান সুজা বাঙলার সুবেদার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই সময়ে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে রাজা তোড়র মল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধন করিয়া আরও ২৫টি সরকার, ৬৬৮টি পরগণা ও ২৪২২৭৫৫ টাকা জমাবৃদ্ধি করেন। এইজন্য তাঁহার সময়ে সমগ্র বাঙলা প্রদেশ ৩৪টি সরকার ১৩৫০টি পরগণায় বিভক্ত হইয়া তাহার জমা ১৩১১৫৯০০ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সংশোধিত জমা–আসল জমা নামে কথিত হইত।

ইহার বহু বৎসর পর নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহার শাসনকালে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে (১১২৮ সাল) বাঙলা প্রদেশকে বৃহত্তর আকারে ত্রয়োদশ বিভাগে বিভক্ত করিয়া এক একটি বিভাগ 'চাকলা' নামে অভিহিত করেন এবং পরগণার সংখ্যা

বৃদ্ধি করিয়া ১৬৬০ করেন। ইহাতে সমস্ত বাঙলার জায়গীর-জমা সমেত ১৪২৮৮১৮৬৲ টাকা জমা নির্দ্ধারিত হয়। এইরূপ জমা বন্দোবস্তের কাগজ জমা কামেল তুমারী নামে পরিচিত।

চাকলা মুর্শিদাবাদ ও চাকলা বর্দ্ধমান ব্যাপিয়া বীরভূমির মুসলমান জমিদারী বিস্তৃত ছিল। বীরভূম জমিদারীতে চাকলা মুর্শিদাবাদের আকবরসাহী, কিসমৎ বার্ব্বাকসিং, ভুরকুণ্ড, স্বরূপসিংহ, মল্লেশ্বর ও চাকলা বর্দ্ধমানের সেনভূম প্রভৃতি পরগণা অবস্থিত ছিল।

মুর্শিদকুলী খাঁ যে সময় বাঙলায় আগমন করেন সে সময়, সরকারের জন্য উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধাংশের দিবার ব্যবস্থা রহিলেও, সরকারকে বার্ষিক একটি নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু বীরভূমের তদানীন্তন পাঠান জায়গীরদার বংশের আসাদউল্লা খাঁ কেবল নির্দ্দিষ্ট করই প্রদান করিতেন। তাঁহার জমিদারীর মধ্যে খালসা-বিভাগের কর্ম্মচারীবৃন্দ বিশেষ কোনরূপ ক্ষমতা দেখাইতে পারিতেন না। কারণ বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও উৎপাত নিবারণের জন্য ইঁহাকে সর্ব্বদা সসস্ত্র সৈন্য, ঘাটোয়াল প্রভৃতি প্রস্তুত রাখিতে হইত। তৎকালীন বীরভূমের ২২টি পরগণায় ৩৬৬৫০৯৲ টাকা জমা ধার্য্য ছিল[৪]। বলিতে কি, বাঙলার সমস্ত মুসলমান জমিদারীর মধ্যে বীরভূমই বৃহত্তম ও সর্ব্বপ্রধান ছিল।

বীরভূমের তদানীন্তন জমিদার বাদীউল্ জমান খাঁ ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট বীরভূম অঞ্চল রক্ষা করিবার জন্য নূতন করিয়া সনন্দলাভ করেন। এই সময়ে নবাব সরকারের নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে তাঁহাকে বার্ষিক ৩৪৬০০০৲ টাকা রাজকর দিতে হইত। কিন্তু তিনি জমিদারীর আয়ের ১৪০০০০০৲ টাকা ধর্ম্ম ও শিক্ষাবিস্তারকল্পে, গরীব, ফকির ও ছাত্রদিগের সাহায্যকল্পে এবং নৃত্যগীতাদি আমোদ-প্রমোদে ব্যয় করিতেন বলিয়া সরকারের দেয় রাজস্ব প্রদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং জমিদারীর শাসনকার্য্য ও সৈন্যগণের পরিদর্শন ভার যথাক্রমে তাঁহার ভ্রাতা আজিম খাঁ ও পুত্র আলিনকী খাঁর উপর অর্পণ করেন। উপরন্তু, অপর পুত্র নহবৎ বা এওবৎ বা ফকরউল্ জমা খাঁ দেওয়ানের উপর সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান ভার ন্যস্ত ছিল।

বাদীউল্‌জমা খাঁ নবাবের বশ্যতা স্বীকার করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক হইলে নবাব সরফরাজকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সরফরাজ বাদীউল্‌জমানকে নবাবের বশ্যতা স্বীকার করিতে লিখিয়া পাঠাইয়া দ্বিতীয় বক্সী মীর সরফউদ্দীন ও খাজা বসন্তকে বর্দ্ধমানের পথে প্রেরণ করেন। অবশেষে বাদীউল জমান খাঁ নবাবের বশ্যতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সরফউদ্দীন ও বসন্তের নিকট স্বীকার-পত্র অর্পণ করেন। পরে, স্বয়ং মুর্শিদাবাদে আসিয়া নবাব সুজাউদ্দীনের

নিকট তাঁহার কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হন ও তিন লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে স্বীকার পূর্ব্বক বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্রকে রাজস্ব প্রদানের জামিন দিয়া বীরভূমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন[৫]।

১৭৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে বাদীউল্ জমান খাঁ, পিতা আসাদউল্ জমান খাঁর ন্যায় সময় সময়ে মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিয়া নবাবের বিদ্রোহাচরণ করিলে তাহার শাস্তি স্বরূপ নবাব বাহাদুর তাঁহার দেয় রাজস্বের আরও তিন লক্ষ টাকা বর্দ্ধিত করিয়া দেন[৬]।

মুর্শিদকুলী খাঁর পর ক্রমান্বয়ে সুজাউদ্দীন খাঁ ও সরফরাজ খাঁ মুর্শিদাবাদে দেওয়ান ও নবাব-নাজিম পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

বর্গী হাঙ্গামা – সরফরাজের পর নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ (১৭৪১-৫৬ খৃঃ) মুর্শিদাবাদে নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার এই পনর বৎসর শাসনকালের মধ্যে, মহারাষ্ট্র বা বর্গীদিগের বঙ্গদেশে 'চৌথ' (রাজকরের চতুর্থাংশ) আদায়ের জন্য বিপুল অভিযান প্রতিরোধ নিমিত্ত প্রায় দশ বৎসরকাল (১৭৪২-৫২ খৃঃ) অতিবাহিত হইয়াছিল। আলিবর্দ্দি পরিণত বয়সেও অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা অবশেষে এই মহা অকল্যাণকর বিদ্রোহের শান্তি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বর্গীগণের অভিযান দ্বারা মূলতঃ মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, কাটোয়া, মানকর, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম অত্যধিকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এই সকল ইতিহাসের কথা সর্ব্বজনবিদিত। আমরা এই স্থলে কেবলমাত্র বীরভূম-অঞ্চলে বর্গী হাঙ্গামার বিবরণ সঙ্কলন করিলাম।

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এল দেশে,
বুল্‌বুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দিব কিসে ?
ধান ফুরালো পান ফুরালো
খাজনার উপায় কি ?
আর এক বছর সবুর কর
রসুন বুনেছি।

এই শ্লোকটি না জানে এমন লোক আমাদের বাঙলা দেশে অতি অল্পই আছে। বর্গীদের কি নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর অত্যাচার দ্বারাই না এই শ্লোক পল্লীবাসীর অন্তর হইতে স্বভাবতঃই স্ফূরিত হইয়াছিল!

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোঁসলে ও বালাজী বাজীরাও পেশোয়া পদ লাভ করিবার জন্য উভয়েই প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দেশের

জনসাধারণের মহা অনর্থপাত করিয়া গিয়াছেন। রঘুজী ভোঁসলের সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত প্রায় চল্লিশ সহস্র বর্গীসহ বঙ্গদেশে 'চৌথ' আদায়ের জন্য প্রেরিত হন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ মহারাষ্ট্রদিগের এইরূপ দারুণ অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন জানিতে পারিয়া, ভাস্কর পণ্ডিত রাজনগরে শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক নবাবের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য একদল সৈন্য নিযুক্ত করেন এবং অপর সৈন্যদিগকে নিরীহ প্রজাগণের নিকট বলপূর্ব্বক 'চৌথ' আদায় করিবার আদেশ প্রদান করেন।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বহু দিনের চেষ্টার পর তাঁহার সেনাপতি মুস্তফা ও জানকীরাম দ্বারা কাটোয়া শিবিরস্থিত ভাস্কর পণ্ডিতকে প্রচুর অর্থদানের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে তৎকালীন মানকরের শিবিরে আনয়ন পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্য মীরজা বেগম দ্বারা তাঁহার দেহ তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া ফেলেন।

এই সংবাদ মহারাষ্ট্র দেশে প্রচার হইবামাত্র ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই, রঘুজী স্বয়ং বিপুলবাহিনীসহ এদেশে আগমন পূর্ব্বক লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্গীর ভয়ে আবালবৃদ্ধবনিতা বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। বর্গীদল নরনারী শিশুদের উপর অত্যাচারের চরম করিতে লাগিল। তাহারা রাত্রে লোকের ঘর পোড়াইয়া দিল, মাঠের ফসল তুলিয়া লইল– লোকের টাকা কড়ি সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। উপরন্তু ইহারা অনেকের নাক, কান, হাত, পা কাটিয়া ফেলিল। এমন কি, তাহাদের অত্যাচার এতদূর অগ্রসর হইল যে তাহারা স্ত্রীলোকের স্তন পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিতে কুন্ঠিত হইল না[৭]।

জমি জমার বিষয় গোপন করিয়াছে সন্দেহপূর্ব্বক বর্গীগণ লোকের প্রতি উৎপীড়নের চরম করিয়া তুলিল। ক্রমাগত এইরূপ অকথ্য ও অভাবনীয় দুর্ব্ব্যবহারে লোকের সংখ্যা কমিয়া গেল– দেশের গ্রাম ছারখারে গেল!

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে সিউড়ীর দক্ষিণে রেল-ষ্টেশনের উত্তর পূর্ব্বপার্শ্বে কেন্দুয়া গ্রামের (মুর্শিদ্‌গঞ্জ) পশ্চিম প্রান্তের উন্মুক্ত ডাঙ্গায় বর্গীদের শিবির সন্নিবেশিত হয়। এই স্থান কেন্দ্র করিয়া তাহারা চতুর্দ্দিকে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করে। বর্গীর নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম অত্যাচারে এবং নির্দ্দয় উৎপীড়নে দেশে মহা হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়া গেল। তাহাদের এই দারুণ নির্য্যাতনে যে কে, কোথায় পলাইয়া গিয়া পরিত্রাণ পাইবে, এরূপ অবস্থা কাহারও ছিল না। সে সময় নলহাটি, বোলপুর, সুপুর, রাজনগর, সিউড়ী, সিউড়ী-রাণীগঞ্জ রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী রায়পুর, কচুজোড়, সাতকিন্দুরী প্রভৃতি স্থান তাহাদের ঐরূপ উপদ্রব ও অত্যাচারে জনশূন্য হইয়া সারা দেশময় হাহাকার উঠিয়া গিয়াছিল! বর্গীদের অত্যাচারের ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া বহুলোক অন্যত্র চলিয়া যায়। তাহাদের পরিত্যক্ত ভগ্নগৃহ স্তূপ এখনও অনেক স্থলেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

রাজনগরের তদানীন্তন ফৌজদার বাদী উলজমান খাঁ, রাজনগর প্রভৃতি অঞ্চলে নিয়ত বহু সৈন্য প্রস্তুত রাখিয়া ইহাদের উৎপাত হইতে প্রজাবর্গকে কতক পরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি এই নিমিত্ত তাঁহার ভ্রাতা আজিম খাঁ এবং আসাদ উলজমান খাঁ ও বাহাদুর খাঁ নামক পুত্রদ্বয়কে সেনাপতি ও সিউড়ীর ৭ মাইল পশ্চিমস্থ ঘাট দুর্ল্লভপুরের সেনাপতি গোরাচাঁদ, রাজনগর সংলগ্ন রাধানগর নিবাসী হেতমপুর দুর্গের অধ্যক্ষ দিলীপচাঁদ প্রভৃতি ৩২ জনকে সহসেনাপতিত্বে নিয়োজিত করেন।

ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি স্থানের অসভ্য পার্ব্বত্যজাতির হাত হইতে নগরকে সুরক্ষিত করিবার জন্য তাহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল; কালে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু এই সময়ে বর্গীদের আক্রমণ হইতে নগরকে আরও সুদৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত করিবার জন্য ইহার ৭ মাইল ব্যবধানে চতুর্দ্দিকে ৩২ মাইল পরিধি বিশিষ্ট ও ১৬/১৭ হাত উচ্চ এবং ৫/৬ হাত প্রশস্ত এক মৃন্ময় প্রাচীর দেওয়া হয়। এই প্রাচীরের এক একটি করিয়া প্রবেশদ্বার রক্ষা করা হইয়াছিল এবং এই সকল প্রবেশদ্বারে সদা সর্ব্বদা প্রহরী নিযুক্ত থাকিত। ঘাট দুর্ল্লভপুর, প্রতাপপুর, পদমপুর মেটেলা, ভাড্ডি, নিশ্চিন্তপুর, লাউজোড়, একতালা, বেড়েলা প্রভৃতি স্থানে এখনও ইহার সেই প্রাচীন ঘাটির সুস্পষ্ট নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। মৃত্তিকা উত্তোলনে প্রাচীরের বহিঃস্পার্শ্বে যে খাত উৎপন্ন হইযাছিল, তাহারও চিহ্ন এখনও পরিদৃষ্ট হয়।

এতদ্ব্যতীত, তদানীন্তন সময়ের দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান ভূস্বামিগণ আপন আপন সীমানায় গড়, পরিখা, দুর্গ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া প্রজাবর্গকে কতক পরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই সমস্ত গড়, দুর্গ, পরিখা প্রভৃতি এখনও বীরভূমের বহু স্থলেই ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ইতঃপূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রদিগের সহিত সংগ্রামে বীরভূমের মহম্মদ জম্মা খাঁ ও আলিনকি খাঁ এই উভয় ভ্রাতার প্রতিষ্ঠার কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা এই বিপ্লব দূর করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উভয় ভ্রাতা ছদ্মবেশে মহারাষ্ট্রীয় শিবিরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের গুপ্ত মন্ত্রণা অবগত হন এবং অনতিবিলম্বেই অসতর্ক অবস্থায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া মীর কাসিমকে কারামুক্ত করেন।

আলিবর্দ্দির মৃত্যুর পর, তাঁহার বিশ বৎসর বয়স্ক প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের নবাব পদে অধিষ্ঠিত হইয়া নবাগত ইংরাজদিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করেন। তিনি বহু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বীরভূমের শক্তিশালী আলিনকি ও আহম্মদ জম্মা খাঁ ভ্রাতৃদ্বয়কে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে কলিকাতা যাত্রা করেন। দেওয়ান মানিকচাঁদ, মোহনলাল

এবং জাফর আলি খাঁও তাঁহাদের সমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়া কলিকাতার বাগবাজারে আপনাদের শিবির সংস্থাপন করেন। ইংরাজেরা পলায়ন করিয়া হাবড়া, বালি প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কলিকাতা অধিকৃত হইলে আলিনকি খাঁ কলিকাতার উপকণ্ঠে আলিপুরের পত্তন করেন। তাঁহার নামানুসারেই এই স্থানের নাম আলিপুর হইয়াছে। তৎকালে প্রভূত পরাক্রমশালী এই বীর ভ্রাতৃদ্বয় নবাবকে বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিলেন।

সেকালে রাজনগরে মহরম উৎসবে তাজিয়া বাহির করিবার সময় কলিকাতা লুঠের নিদর্শনস্বরূপ একখানি মূল্যবান কাপড় তাজিয়ায় জড়ান হইত। এ সম্বন্ধে এতদঞ্চলে একটি ছড়াও প্রচলিত আছে—

'আলিনকি বাহাদুর পগ্‌ড়ীমে বাঁধে তলোয়ার,
এক ঘড়িমে লুট লিয়া কলকাত্তা বাজার।'

মহারাজ নন্দকুমার রায় তাঁহার আবাসবাটী বীরভূমের অধীন ভদ্রপুর গ্রামে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন উপলক্ষে যে বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে অন্যান্য সাধারণ লোকের সহিত বঙ্গের যাবতীয় হিন্দু ও মুসলমান রাজা জমীদার সকলেই সাদরে সমাহূত হইয়াছিলেন। এই বিরাট অনুষ্ঠানে উপস্থিত মহারাজগণের মধ্যে- বর্দ্ধমানরাজ, কৃষ্ণনগরাধিপতি, নাটোরাধিপতি, মহারাজ রাজবল্লভ, মহারাজ দুর্ল্লভরাম প্রভৃতির সহিত "বীরভূমের বীরপ্রিয় নবাব আলনকী খাঁন বাহাদুর"ও উপস্থিত ছিলেন ('মহারাজ নন্দকুমার চরিত'- শাস্ত্রী, ২১১ পৃঃ)।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাসীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতন ও ইংরাজগণের প্রাদুর্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়।

তথ্যসূত্র

(১) During the great military revolt the District was lost to Akbar, and several years passed before it could be reconquered — L. S. S. O'malley's "Birbhum". p. 12.

(২) History of India — E. B. Cowell p. 544.

(৩) Ayeen Akbery– p. 473

(৪) মুর্শিদাবাদের ইতিহাস–˚ নিখিলনাথ রায় ৪৩৯ পৃঃ ও বাঙ্গালার ইতিহাস–˚ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৩ পৃঃ

(৫) রিয়াজ উস-সালাতিন ২৮৮-৮৯ পৃঃ

(৬) Asadulla Khan was succeeded by his son Badi-ul-zaman Khan, who like his father, refused to attend the court at Murshidabad, and rose in rebillion in 1737-38, the rebillion was quickly quelled and he was punished by having to pay an increased revenue of 3 Lakhs – Stewart's History of Bengal p. 421 and 491; B. Gazetter – p. 14

(৭) Cutting of ears, noses and hands of any of the inhabitants sometimes carrying their barbarities so far as cutting off the breasts of women etc. p. 134 – Interesting Historical Events by T. Z. Holwell esq.

অষ্টম অধ্যায়

মুসলমান অধিকার কাল (১৭৫৮-৭৭ খৃঃ)

সিরাজউদ্দৌলার পর ক্রমে মীর কাশিম আলি খাঁ মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম পদে অধিষ্ঠিত হন। মীর কাশিম নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অর্থের অনাটন হেতু জমিদারবর্গকে বর্দ্ধিতহারে কর দিবার আদেশ প্রদান করেন এবং পরে অত্যাচার করিয়া এই বর্দ্ধিত হারে কর আদায় করেন। বীরভূমির জমিদার আসাদ জম্মা খাঁকে উৎখাত করিয়া তিন বৎসরের মধ্যেই সমগ্র বীরভূমি জমিদার হইতে নানা উপায়ে উৎপন্ন ৮৯৬২৭৫্ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি হয়[১]।

বাঙলার ভিতর বীরভূমের জমিদারী মুর্শিদাবাদের অতি নিকটেই অবস্থিত; কিন্তু কি বল বিক্রমে, কি সৈন্য সংখ্যায়, কি সাহসিকতায় কেহই বীরভূমের তদানীন্তন মুসলমান রাজার সমকক্ষ ছিল না। সুতরাং রাজনগরের ফৌজদার আসাদ জম্মা খাঁ বর্দ্ধিত হারে কর দিতে অস্বীকার করেন[২]।

আসাদ জম্মা খাঁ পূর্ব্ব হইতেই নবাব সরকারকে উপেক্ষা করিতেন। এক্ষণে নবাব ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া কাশিমবাজারে স্থাপিত ইংরাজদলের অধিনায়ক মেজর ইয়র্কের সহিত মিলিত হইয়া ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাজার সহিত যুদ্ধ মানসে বীরভূমির দিকে অগ্রসর হন। নগরের রাজাও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি, পিতা বাদীউল্ জমান খাঁকে দেওয়ান স্বরূপ রাজ্য পরিচালনের ভারার্পণ করিয়া চারি পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী ও বিংশতি সহস্র পদাতিক সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা করেন এবং দুর্গম স্থান করিধা (?) (Keridha) গ্রামে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দলে দলে সৈন্য প্রেরণ করিয়া অগম্য পথ ঘাট অধিকার করেন[৩]।

নবাব স্বীয় রাজধানীর ২৪/২৫ মাইল পশ্চিমস্থ বুধগ্রামে শিবির সন্নিবেশ করিয়া স্বয়ং সেনাপতি খাজা মহম্মদী খাঁ, মেজর ইয়র্ক ও গোলন্দাজ দলপতি গুর্গন খাঁর সহিত নগররাজকে দমন করিবার জন্য সদলবলে অগ্রসর হন[৪]।

যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বেই নবাব পক্ষের অনুরোধে কোম্পানী বাহাদুর প্রেরিত

কাপ্তেন হোয়াইট বর্দ্ধমানের উত্তরাংশে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। শত্রুদলের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাকে আদেশ দেওয়া হয় যে তিনি যেন উত্তরপূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহী দলের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করেন। হোয়াইট এই সংবাদ শ্রবণে অতি সত্বর বহু তেলাঙ্গা সিপাহীর সহিত অগ্রসর পূর্ব্বক পশ্চাৎ দিক হইতে অতর্কিত ভাবে শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করিয়া আসাদ জম্মা খাঁকে পরাজিত করেন[৫]।

ইহার পর নবাব ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষকে জানান যে তিনি ২৮-এ জমেদওল আউয়াল সংবাদ পাইয়াছেন যে তাঁহাদের আগমনের ভয়ে ভীত হইয়া বীরভূম রাজ তাঁহার রাজধানী নগর পরিত্যাগ করিয়া বনাকীর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিয়াছেন। এই সংবাদ প্রচারিত হইলে মেজর ইয়র্ক সদলবলে অনায়াসে রাজনগরে উপস্থিত হইলেন[৬]।

আসাদ জম্মা খাঁ পলাইয়াও ক্ষান্ত হন নাই। তিনি মহারাষ্ট্রে সেনাপতি শিউভট্‌কে তাঁহার সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। শিউভট্‌ দুই কিম্বা তিন সহস্র অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাতিক সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত যোগদান করেন[৭]।

নগররাজের পুনরায় যুদ্ধ করিবার আয়োজনের কথা শ্রবণ করিয়া তাব্রিজ হইতে আগত সেনাপতি মহম্মদ তকি খাঁর সাহস ও কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া নবাব তাঁহাকে বীরভূমের ফৌজদার-পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান ও রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেন। বীরভূমির যুদ্ধে দেশীয় সেনাদলের অকর্ম্মণ্যতা লক্ষ্য করিয়া মীর কাশিম বাঙলার সৈন্যবিভাগের আমূল সংশোধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই খোজা গ্রেগরীর (গুর্গন খাঁ) অধীনে মুর্শিদাবাদের সৈন্যদল হইতে একদল গোলন্দাজ ও পদাতিক সৈন্য ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত করিবার উপায় বিধান হইয়াছিল। এক্ষণে তকী খাঁকে উপযুক্ত একদল সৈন্য সংগঠনের উপদেশ প্রদত্ত হইল। তকী প্রাণপণে প্রভুর কার্য্যে উৎসাহ দেখাইয়া অল্পকাল মধ্যেই নবাবের শ্রদ্ধাভাজন হন[৮]।

এদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, এল, ম্যাকলিয়নের অধিনায়কত্বে সিউড়ীতে বহুসৈন্য প্রেরণ এবং তথায় একটি সাময়িক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন[৯]।

এই সময়ে বাণিজ্যশুল্ক সম্পর্কে কোম্পানীর সহিত নবাব কাশিম আলি খাঁর মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। শত্রুপক্ষের পরস্পরের মনোমালিন্যের কথা শ্রবণ করিয়া আসাদ জম্মা খাঁ অবিলম্বে সেনাপতি সুরাজবেগের অধীনে তিন সহস্র অশ্বারোহী, চারিশত পদাতিক এবং পাঁচটি কামান ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইংরাজ সেনাপতি এল্‌, ম্যাক্‌লিয়ন ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখে

সসৈন্যে করিধায় শত্রু সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। এই যুদ্ধে সুরাজবেগ পরাজিত ও বিতাড়িত হইলে তিনি তাঁহার সমস্ত কামান হস্তগত করেন। কিন্তু যুদ্ধ অবসানের দুই ঘন্টা পরেই তিনি নানা লোকের নিকট হইতে সংবাদ পান যে বীরভূমরাজের সেনাপতি কন্দর বা কোম্মর খাঁ ছয় হাজার অশ্বারোহী পাঠান সৈন্য, কতিপয় পর্ত্তুগীজ ও আর্ম্মাণী সৈন্য এবং সহস্র সিপাহী ও কয়েকটি কামান লইয়া বার মাইল দূরে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ভয়াবহ বিপুল সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হওয়া অসম্ভব জানিয়া তিনি পলাইয়া আসেন এবং স্বপক্ষের কামানগুলির মুখ সীসাবদ্ধ করিয়া যানাদি ও দুর্গে অগ্নিসংযোগ দ্বারা সে সমস্ত পোড়াইয়া ফেলেন। ইহাতে তাঁহার ১০ কি ১২ জন সিপাহীর প্রাণনাশ হয়[১০]।

অনেকেই, এই করিধা হইতে ১২ মাইল দূরে হেতমপুর দুর্গে কোম্মর খাঁর অবস্থানের কথা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই হেতমপুরে নগররাজের একটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল এবং তথাকার দুর্গে নগররাজের সহিত ইংরাজ ও নবাবের যুদ্ধ হইয়াছিল[১১]।

কথিত আছে, এই সময় নগররাজ আসাদ জম্মা খাঁ হেতমপুর দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। বীরভূমরাজের হেতমপুর দুর্গের সেনাপতি দিলীপচাঁদ পূর্ব্ব হইতেই আশু সমর সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া রাজনগর ও ঘাট দুর্লভপুর হইতে আগত সৈন্যগণের অধিনায়কত্ব করেন। এই সম্বন্ধে একটি ছড়াও প্রচলিত আছে—

'আগে যায় বাঁকা দিলীপচাঁদ পাছে গোরারায়' ইত্যাদি।

এই যুদ্ধে বীরভূমরাজের অধিনায়কদ্বয় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও তাঁহার সৈন্যগণ বিন্দুমাত্র বিচলত না হইয়া সমভাবেই যুদ্ধ করিয়াছিল। নগররাজের হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক দুর্গাভ্যন্তর হইতে সমরক্রীড়া পরিদর্শন কালে একটি গোলা আসিয়া রাজার হস্তীর কপোলদেশে বিদ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে অন্য জনশ্রুতি এই যে, সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত কুণ্ডহিতের নিকট বনকাটি গ্রামের জনৈক ধোপী রাজার দেওয়ান ছিলেন। তিনি যুদ্ধকালে রাজার ন্যায় হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন। তিনি বিপক্ষদলের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বিশ্বাস ঘাতকতার কার্য্য করেন। যে সময় বীরভূমরাজের সৈন্যগণ ভীষণভাবে যুদ্ধ করিতেছিল, সেই সময় রাজা দুর্গস্থিত কতকগুলি সৈন্য লইয়া শত্রুগণকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু দেওয়ান তাঁহাকে বাধা দিয়া বলেন যে – "ভীরু কাপুরুষগণই পশ্চাৎদিক হইতে শত্রু আক্রমণ করে। তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষ সম্মুখ সমরেই প্রবৃত্ত হন। পশ্চাদ্ভাগ হইতে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিয়া ভীরু ও কাপুরুষের পরিচয় না দিয়া সম্মুখ সমরে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিয়া বীরভূমের বীরত্বের পরিচয় প্রদান করা উচিত।"

রাজা, দেওয়ানের এইরূপ কপটবাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া যেমন হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক শত্রুর সম্মুখীন হইলেন, তেমনি বিপক্ষদলের একটি গোলা আসিয়া হস্তীর কপোলদেশ বিদ্ধ করিল। গুলীর আঘাত পাইয়া হস্তী উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং রাজাকে পৃষ্ঠে লইয়া ভীষণবেগে পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইল। হস্তী অনতিদূরবর্ত্তী তালবেড়িয়ার জঙ্গলে প্রবেশ করিলে রাজা মানসায়রের নিকটস্থ একটি বৃক্ষের শাখা ধরিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। কিন্তু তিনি অনতিবিলম্বে বৃক্ষশাখা হইতে পতিত হইলে তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া গেল। তদবধি লোকে তাঁহাকে খোঁড়া রাজা বলিত। রাজাকে সহসা হস্তীপৃষ্ঠে পলায়নপর দেখিয়া, সৈন্যগণ হতাশ হইলে নবাব ও ইংরাজ সৈন্য জয়লাভ করিয়া হেতমপুর দুর্গ অধিকার করিলেন। এই সময় হইতে আসাদ জম্মা খাঁ স্বরাজ্য হইতে বঞ্চিত হন[১২]।

মীরজাফর আলির পুত্র মীরণ পিতার নিকট হইতে রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া প্রজাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। নবাবের দুই কন্যার জীবন নষ্ট করিয়া যখন তিনি তাঁহাদের যথা সর্বস্ব লুন্ঠন করিতেছিলেন, তখন তিনি অনুচরবর্গের সহিত বজ্রাঘাতে প্রাণ হারান। আসাদ জম্মা সুবিধা বুঝিয়া, এই সময়ে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্যসহ চুনাখালি নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। নবাবের আশ্রিত অন্যান্য জমিদারগণ তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। নবাব সন্তানশোকে নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই। কাজেই বীরভূমের রাজা যে-যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থান তাঁহাকে অর্পণ করিয়া নবাব সন্ধির প্রস্তাব করেন। আসাদ জম্মা ইহাতেও সম্মত না হইয়া ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইলেন। নবাব-পত্নী মরি বেগম আপন স্বামীর রাজ্যের অধিকাংশই ইংরাজ হস্তে অর্পণ করিয়া সাহায্যপ্রার্থিনী হন। ইংরাজগণ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। রাজা সংগ্রামে পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলে ইংরাজগণ ক্ষান্ত না হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং কিছুদিন পর্য্যন্ত রাজধানী অবরোধ করিয়া থাকেন। পরে, সন্ধি হয় যে তিনি ইংরাজদিগকে রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ দিবেন - তাহা হইলে তাঁহারা বীরভূমের রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না; কিন্তু রাজা ইংরাজদিগের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিবেন। এই সন্ধির পর হইতে আসাদ জম্মা নবাবকে রাজকর প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মুন্সী অনুপ মিত্র নামক এক ব্যক্তি রাজাকে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। রাজা তাহা পরিশোধ করিতে না পারিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে সহস্র বিঘা এবং তাঁহার পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ ৬৫০০/০ বিঘা নিষ্কর ভূমি দেন।

আসাদ জম্মা খাঁ ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় পক্ষাঘাত রোগে প্রাণত্যাগ করেন। প্রবল পরাক্রমশালী এবং দানশীল বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর – ক্লাইভের পর ভেরেলষ্ট এবং কার্টিয়ার ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের গভর্ণর নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহারা দেশে কোনরূপ শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারিলেন না। কোম্পানীর গভর্ণর ও সেনাপতি এই যুগ্ম-পদাধিকারী ক্লাইভের বন্দোবস্ত অনুসারে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে নবাব বঙ্গের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন- তজ্জন্য তিনি কোম্পানীর নিকট বার্ষিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাইবেন এবং কোম্পানী নবাবের দেওয়ান স্বরূপে রাজস্ব সংগ্রহ কবিবেন। ক্লাইভের প্রবর্ত্তিত এই দ্বৈত শাসন-প্রণালী দেশ মধ্যে মহা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল। কোম্পানী, বাদসাহ সাহ আলমের নিকট ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ লাভ করিয়া মুর্শিদাবাদে মহম্মদ রেজা খাঁ এবং পাটনার রাজা সেতাব রায়কে ডেপুটি নবাব পদে নিযুক্ত করেন। রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারিগণ, দেশের লোকের সুবিধা অসুবিধা বা কল্যাণের প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য না রাখিয়া নির্ম্মম ভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শাসনবিভাগের কর্ত্তা নবাব, ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না। দেশে দস্যু তস্করের উপদ্রব বৃদ্ধি পাইল। এই দারুণ দুঃসময়ে ১১৭৬ সালে (১৭৬৯ খৃঃ) বঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। এই ভীষণ দুর্ভিক্ষ বাঙলা ১১৭৬ সালে ঘটিয়াছিল বলিয়া ইহা— **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর** নামে খ্যাত। দেশে এই দারুণ দুর্ভিক্ষ; কিন্তু রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারিগণ তাহার জন্য দায়ী নহে। এই নিমিত্ত তাহারা পূর্ণ মাত্রায় রাজস্ব আদায় করিয়া দেশের প্রজাবর্গকে একেবারে রিক্ত হস্ত করিয়া দিল – দেশের লোকের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য নবাব বা শাসনকর্ত্তা কোন চেষ্টাই করিতে পারিলেন না[১৩]।

১১৭৪ সালে এ-দেশে ভালরূপ ফসল হয় নাই বলিয়া পরবর্ত্তী বৎসর খাদ্য শস্য অতীব মহার্ঘ হইল[১৪]। দেশে যাহা চাউল ছিল তাহা কোম্পানী বাহাদুর পল্টনের জন্য কিনিয়া লইলেন[১৫]। সাধারণ লোক একেবারে অনাহারে দিন কাটাইতে লাগিল। প্রজার এত কষ্ট হইলেও রাজা জমিদার তাঁহাদের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লইলেন। ফলে প্রজাবর্গের দুর্দ্দশার চরম সীমা উপস্থিত হইল। তাহাদের কান্নার রোল বা অভাব অভিযোগের কোনরূপ প্রতীকার করা কেহ আবশ্যক মনে করিল না!

১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে আশায় উৎফুল্ল হইয়া ধান্য রোপন করিল। কিন্তু আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে এক বিন্দু বারিপাত না হওয়ায় মাঠের ধান মাঠেই শুকাইয়া গেল ! লোকের দুর্দ্দশা আরও অত্যধিকরূপে বাড়িয়া গেল!

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু শেষে ভিক্ষা দিবার লোক রহিল না। কতকগুলি লোক কোন প্রকারে দুই চারি দিন অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে লাগিল; কিন্তু এরূপ বেশী দিন চলিল না। দেশে আর চাউল বা অন্যান্য

খাদ্য দ্রব্য রহিল না। তখন লোকে পেটের জ্বালায় গাছের পাতা, ঘাস, বন্যজন্তু ইত্যাদি খাইতে আরম্ভ করিল[১৬]। তাহাও দুই দিন পর ফুরাইয়া গেল। ইহাতেই বা কতদিন চলিবে ? চুরি ডাকাতির সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। ভাল লোকেও চুরি করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু ডাকাতি করিয়া সোনা রূপা লইয়া তাহারা কি করিবে ? কোথায় বেচিবে ? বেচিয়া খাইবে কি ? দেশে চাল নাই ! পেটের জ্বালায় পূর্ব্বেই থালা, বাটি, ঘটি, গেলাস, গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া, ছেলে, মেয়ে, পরিবার, লাঙ্গল, জোয়াল, বীজ ধান সবই বেচিয়া ফেলিয়া কিছুই করিতে পারে নাই[১৭]! অনেক লোক দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইয়া গেল; কিন্তু পলাইয়াও রক্ষা পাইল না। বিদেশে গিয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল। গ্রামে গ্রামে কলেরা বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়িয়া গেল। অনশনে ও রোগে দিন দিন হাজার হাজার লোক মরিতে লাগিল ! জঠর জ্বালায় মাতা পিতা তাহাদের স্নেহশীল সন্তানের মাংস উদরস্থ করিতে কুন্ঠা বোধ করে নাই ! এমন সোণার দেশ মহা শ্মশানে পরিণত হইল – যে যেখানে মরিল সে সেইখানে পড়িয়া শৃগাল, কুকুর, শকুনী ও বুভুক্ষিত মানুষের উদরগত হইতে লাগিল। মানুষ কই ? কে কাহার সৎকার করিবে ? কে কাহার সংবাদ লইবে ? অন্ন কষ্ট, অর্থ কষ্ট, জল কষ্ট খুব বাড়িয়া গেল। খাল, বিল, ডোবা, নদী, নালা, পুষ্করিণী, কূপ সবই শুকাইয়া গেল। গ্রামের মাঠ ঘাট পথ সব শ্মশান ও প্রেত ভূমিতে পরিণত হইল[১৮]। মন্বন্তরের পরবৎসর বীরভূমের এক তৃতীয়াংশেরও অধিক ভূমি পতিত বলিয়া হস্তবুদে লিখিত হইয়াছিল[১৯]।

প্রায় এক বৎসর ব্যাপী মন্বন্তরের ফলে বীরভূমির এমন দুর্দ্দশা হইয়াছিল যে, তাহার পূর্ব্বাবস্থা ফিরিতে প্রায় চল্লিশ বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

বীরভূমির প্রায় অর্দ্ধশত সমৃদ্ধ গ্রাম মন্বন্তরের দশ বৎসরের মধ্যে জঙ্গলময় হইয়া হস্তী প্রভৃতি বন্য জন্তুর আবাস স্থল হইয়া উঠিয়াছিল[২০]। যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহারা বাঘ ভালুক হস্তী প্রভৃতি বন্য জন্তুর উৎপাতে অতিষ্ঠ হইয়া আবার দেশ ছাড়িতে বাধ্য হইল। শেষে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে বীরভূমির রাজা, সরকার বাহাদুরকে জানাইয়াছিলেন যে হস্তীর উৎপাতে এদেশ জনশূন্য হইয়া গিয়াছে– প্রজাগণ পলায়ন করিয়াছে[২১]!

ইহাদের উৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণিজ্য শিল্পও বিলুপ্ত হইয়া গেল ! বীরভূমের লৌহ শিল্পী, রেশম শিল্পী, কয়লা ব্যবসায়ী প্রভৃতি প্রাণের ভয়ে অন্যত্র পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিল[২২]!

এই মন্বন্তরের ১৭/১৮ বৎসর পরই ইংরাজগণ প্রত্যক্ষভাবে বীরভূমির শাসনভার গ্রহণ করেন।

তথ্যসূত্র

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস - কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮০ পৃঃ

(২) The Seir Mutaqherin, Vol II p 393

(৩) The Seir Mutaqherin, Vol II p 395

(৪) বাঙ্গালার ইতিহাস- কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫৯ পৃঃ

(৫) The Seir Mutaqherin, Vol II p 396

(৬) Selections from unpublished records of Government- By Rev J. Long, Vol II, p 249, 269

(৭) Selections from unpublished records of Government- By Rev J. Long, Vol II, p 250

(৮) বাঙ্গালার ইতিহাস- কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৬৩-৬৪ পৃঃ

(৯) বীরভূম বিবরণ, ১ম খণ্ড, ৩৪ পৃঃ

(১০) Selections from unpublished records of Government- By Rev J. Long, Vol II, p 329

(১১) বীরভূম বিবরণ- ১ম খণ্ড, ৩৫ পৃঃ

(১২) বীরভূম বিবরণ - ১ম খণ্ড, ৩৫-৩৭ পৃঃ

(১৩) ভারতবর্ষের ইতিহাস - শ্রী শিবরতন মিত্র, ২১২-১৪ পৃঃ

(১৪) The Annals of Rural Bengal - W.W. Hunter, p 20.

(১৫) বঙ্গদর্শন (নব পর্য্যায়) ১৩১৫, ২০৫ পৃঃ

(১৬) The Annals of Rural Bengal - W.W. Hunter, p 26.

(১৭) Letter from Richard Becker Esq, to the President and Council of the Select Committee, 30th Sept. 1770

(১৮) Letter from Alexander Higginson Esq. Supervisor of Birbhum 22nd Feb, 1771.

(১৯) বঙ্গদর্শন (নব পর্য্যায়) ১৩১৫, ৩৮১ পৃঃ

(২০) Letter from the Collector of Birbhum to the Board of Revenue, April 1790.

(২১) বঙ্গদর্শন (নব পর্য্যায়) ১৩১৫, ৮ম বর্ষ, ৩৮২ পৃঃ

(২২) (ক) মন্বন্তর - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(খ) বঙ্গদর্শন (নব পর্য্যায়) - ৩—১০ম ও ১২শ সংখ্যা

(গ) The Annals of Rural Bengal - W.W. Hunter, p 64, 66, 69.

(ঘ) Do Appx. -B - The supervisor of Birbhum, Mr. Higginsons Reports, pp 413-14.

নবম অধ্যায়

রাজনগরের রাজা বা ফৌজদারগণ

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে রাজনগরে মুসলমান শাসকগণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের বন্য প্রদেশ হইতে আগত পার্ব্বত্য ও বন্য জাতির আক্রমণ নিরোধ জন্য এখানে বক্তিয়ার খিলজির সময় হইতে কয়েকজন পাঠান সৈন্য বা কর্ম্মচারী স্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্ত্তী বঙ্গের সুলতানগণের নিকট হইতে নগরের এই সকল পাঠান রক্ষকগণ এতদঞ্চল জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং তদ্বিনিময়ে প্রয়োজন মত সৈন্যাদি প্রস্তুত রাখিয়া এতদঞ্চল দস্যুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহারা কেবল কর সংগ্রহেই আত্মনিয়োগ করিতেন এবং তাহাতেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল বলিয়া তৃপ্ত রহিতেন। দেশের সহিত তাঁহাদের প্রাণের প্রবল কোন যোগ ছিল না ; সুতরাং এতদ্দেশবাসীর উন্নতিকল্পে তাঁহারা সমগ্র দেশব্যাপী বিশেষ কোন সাধারণ উপকারজনক কার্য্য করেন নাই এবং তাহার তাদৃশ কোন ব্যাপকভাবে নিদর্শনও পাওয়া যায় না।

রাজনগরের এই পাঠান জায়গীরদার বা ফৌজদারগণের প্রথম অবধি তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে মুর্শিদকুলী খাঁর সময় রাজস্ব বন্দোবস্তের কালে আমরা নগরের ফৌজদারগণের প্রথম নামের পরিচয়, প্রাপ্ত হই। আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে নগরের এই ফৌজদার বা রাজগণের যথাসম্ভব বংশ-তালিকা সহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম–

(১) দেওয়ান বাহাদুর খাঁ বা রণমস্ত খাঁ বাহাদুর– ইনি বাঙ্গালা ১০০৭ সালের জ্যৈষ্ঠ (১৬০০ খৃঃ) মাসের প্রথম হইতে ১০৬৬ সালের (১৬৫৯ খৃঃ) ১লা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ৫০ বৎসর রাজনগরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন[১]। ইনি অতিশয় শক্তিশালী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন বলিয়া প্রজাবর্গ ইঁহাকে শেষোক্ত নামে অভিহিত করিত। মৃত্যুর পর ইঁহার পুত্র দেওয়ান খাজা কামাল খাঁ বাহাদুর

রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

রণমস্ত খাঁর সময় এদেশ অতিশয় সমৃদ্ধশালী ছিল- দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভাল ছিল- অন্নকষ্ট ছিল না।

(২) **দেওয়ান খাজা কামাল খাঁ বাহাদুর**– ইনি ১৬৫৯-৯৭ খৃষ্টাব্দ (১০৬৬-১১০৪ সাল) পর্য্যন্ত মোট ৩৮ বৎসর ৪ মাস ১৩ দিন রাজত্ব করেন[২]। ইনি অতিশয় দানশীল ও পরদুঃখ কাতর ছিলেন। রাজনগর অঞ্চলে ইনি নিজের নামানুসারে (খোজ কামালপুর) একটি গ্রাম স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রজাবর্গ ইঁহাকে অতিশয় প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত।

ইনি জ্বররোগে প্রাণত্যাগ করিলে ইঁহার শব রাজনগরের অদূরবর্ত্তী পশ্চিমে ফুলবাগান নামক রাজগণের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়।

(৩) **দেওয়ান আসাদ উল্লা খাঁ**— খাজা কামাল খাঁর পর আসাদ উল্লা খাঁ ১৬৯৭-১৭১৭ খৃষ্টাব্দ (১১০৪-২৫ সাল) পর্য্যন্ত ২১ বৎসর ১ মাস ২০ দিন রাজত্ব করেন। ইনি পরম দয়ালু, ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী রাজা ছিলেন[৩]। ইনি বহু ভূসম্পত্তি সাধু, পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক লোকের জন্য দানের ও কানা, খোঁড়া প্রভৃতি গরীব দুঃখীদিগের দৈনিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। ইনি অনেক স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এতদ্ব্যতীত, ইনি বহুস্থলে জলাশয় ও কূপ খনন করাইয়া প্রজাবর্গের জলকষ্ট নিবারণ করেন[৪]।

শত্রুর হস্ত হইতে দেশ রক্ষার জন্য ইনি সৈন্য সংখ্যার বৃদ্ধি করেন। ধর্ম্মালোচনায় ইনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। যুদ্ধবিগ্রহের সময় ইনি তদানীন্তন মুর্শিদাবাদের নবাবকে নানাদিক দিয়া সাহায্য করিয়া প্রজাগণকে অতিরিক্ত করভার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন[৫]। ইহাতে দেশবাসী ইঁহাকে অতিশয় প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত।

(৪) **দেওয়ান বাদীউলজমা খাঁ**— আসাদ উল্লা খাঁর পর তদীয় অন্যতম পুত্র বাদী উলজমা খাঁ ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে (১১২৫ সাল) পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ (১১৫৮ সাল) পর্য্যন্ত ৩২ বৎসর কাল রাজত্ব করেন[৬]। ইনি তদানীন্তন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট হইতে সনন্দ লইয়া বীরভূম অঞ্চল রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করেন[৭]। এই সময়ে নবাব-সরকারের নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে তাঁহাকে বার্ষিক ৩৪৬০০০৲ টাকা রাজকর দিতে হইত[৮]। ইনি অতিশয় বিলাসপরায়ণ ছিলেন। ইঁহারই সময়ে বর্গীদিগের দারুণ অত্যাচারে এদেশ বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। বর্গীদিগের অত্যাচার দূরীকরণার্থ ইনি বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

নগররাজগণের বংশতালিকা
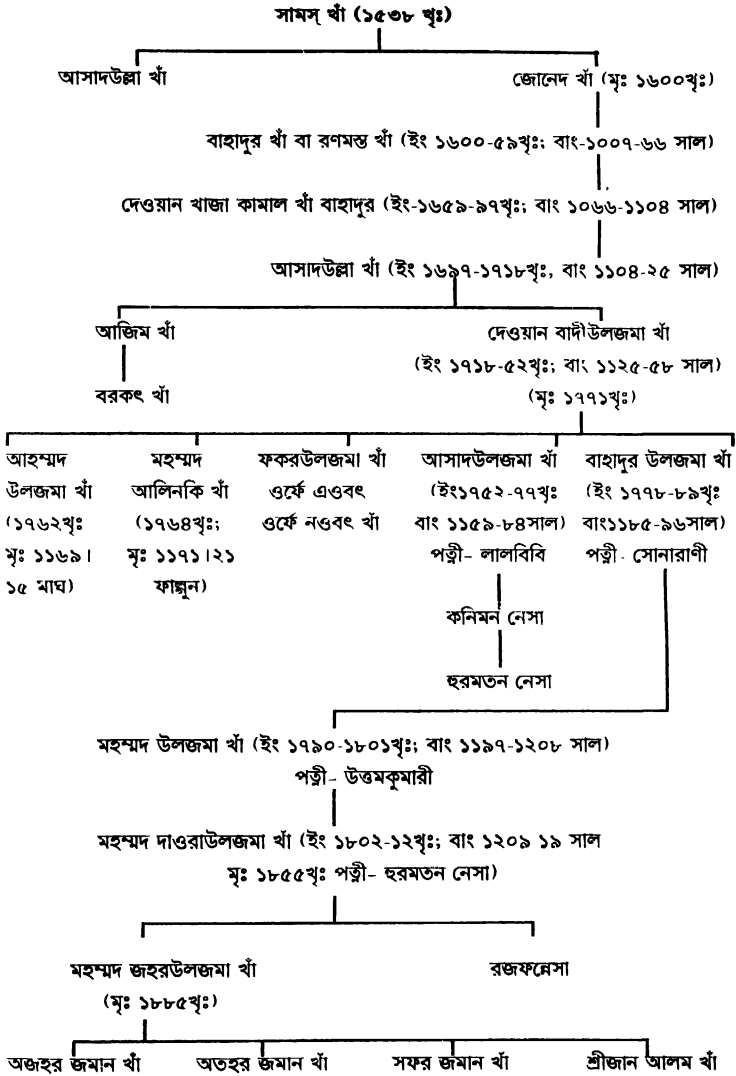
বাদীউলজমা খাঁর দুই পত্নী– প্রথমার গর্ভে **আহম্মদউলজমা খাঁ** ও **মহম্মদ আলিনকি খাঁ** নামক দুইপুত্র এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে **ফকরউলজমা খাঁ** বা **এওবৎ বা নওবৎ খাঁ** ও **আসাদউলজমা খাঁ** নামক দুই পুত্র – এই চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত, রাজার **বাহাদুরউলজমা খাঁ** নামক এক জারজ পুত্র ছিল[৯]। আসাদউলজমা খাঁ সাতিশয় ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন বলিয়া রাজকার্য্যে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। প্রথম ও দ্বিতীয় রাজপুত্র প্রভূত ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং অস্ত্রনৈপুণ্যে তাঁহাদের বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই সময়ে নানারূপ অশান্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এক সময় উত্তরাঞ্চল হইতে শৈফুল হক্ নামক জনৈক ফকির রাজধানীতে আসিয়া অবস্থান করিতে থাকেন এবং ক্রমে তিনি রাজা বাদীউলজমা খাঁর বিলক্ষণ বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। কোরাণাদি শাস্ত্রে ফকিরের ব্যুৎপত্তি থাকায় তিনি তাঁহার নিকট সর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতেন। ফলে, তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং তিনি রাজকার্য্যে বীতস্পৃহ হইয়া উঠেন। এই নিমিত্ত আলি এবং আসাদ উভয় ভ্রাতাই পিতাকে ফকিরের কবল হইতে উদ্ধার করিবার মানসে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন। তথায় কিছুদিন অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহারা তাঁহাদের বলবীর্য্যেব পরিচয় প্রদান করিয়া নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর চিত্তাকর্ষণ করেন[১০]।

কথিত আছে যে একদিন এক মাহুত তাহার হস্তীকে জলপান করাইবার নিমিত্ত পুষ্করিণীতে লইয়া যায়। ঘটনাচক্রে আহম্মদজমা খাঁ তথায় উপস্থিত ছিলেন। হস্তী ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলে মাহুত রাজপুত্রের শরণাপন্ন হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ হস্তীর দন্ত ধরিয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলে হস্তী শান্ত হয়। রাজপুত্রের এবম্বিধ ক্ষমতা দর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দ সকলেই বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এই ব্যাপারে অবিলম্বে নবাবের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহাদের উভয় ভ্রাতাকেই আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন[১১]। রাজকুমারদ্বয় এই সুযোগে ফকিরের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের পিতৃরাজ্যের ভাবী অমঙ্গলের কথা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। নবাবের নিকট ফকিরের প্রাণদণ্ডের আদেশ লইয়া ভ্রাতৃদ্বয় রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন এবং অবিলম্বেই ফকিরের প্রাণ বিনাশ করিলেন[১২]।

রাজা বাদীউলজমা খাঁ ফকিরের হত্যায় নিরতিশয় ক্ষুন্ন হইলে রাজপুত্রেরাও যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইলেন এবং পিতৃসমীপে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে রাজ্যরক্ষার জন্য তাঁহারা যেরূপ বিসদৃশ কার্য্য করিয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহারা সেই রাজ্যাধিকার গ্রহণে চিরক্ষান্ত থাকিবেন। তদনুসারে তাঁহারা তাঁহাদের অন্যতম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আসাদউলজমা খাঁকে রাজ্যাধিকার প্রদানে

কৃতসঙ্কল্প হইয়া (অপর ভ্রাতা খঞ্জ ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন) মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন এবং নবাব সমীপে তাঁহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করেন[১৩]।

আহম্মদ ও আলি উভয়েই রাজনগরে ফিরিয়া আসিয়া ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১১৫৯ সালের বৈশাখ মাসে মহা সমারোহে ভ্রাতার রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ইহার পর উভয় রাজপুত্রই নবাব সরকারে চাকুরি গ্রহণ করিয়া মুর্শিদাবাদে অবস্থান করেন।

বাদীউলজমা খাঁ নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর নিকট 'রাজা' উপাধিলাভ করেন। ইঁহার বিনয় ও নম্র স্বভাবের জন্য প্রজাবর্গ ইঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। ইনি বহুলোককে নিষ্করভূমি দান করিয়া যথেষ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন।

ইঁহার সময় কতকগুলি দেশীয় যুদ্ধবিগ্রহ সংগঠিত হয়। গিধোড়ের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া ইনি পরাজিত হন[১৪]।

রাজা বাদীউলজমা খাঁ ইতঃপূর্ব্বেই রাজকার্য্য ও রাজ্যশাসন বিষয়ে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে দেখিয়া এক প্রকার অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। রাজনগরের অদূরবর্ত্তী পশ্চিমে নগররাজগণের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র ফুলবাগানের রমণীয় উদ্যানমধ্যে তাঁহার সমাধি-মন্দির দৃষ্ট হয়[১৫]।

(৫) **রাজা মহম্মদ আসাদউলজমা খাঁ বাহাদুর**- রাজা বাদীউলজমা খাঁর শাসনকার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের (১১৫৯ সালের ১লা বৈশাখ) আসাদউলজমা খাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্যোগে তিনি রাজনগরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ (১১৮৪ সাল) পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহার রাজ্যাভিষেকের চারিবৎসর পরে মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ পরলোক প্রাপ্ত হইলে তদীয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ইংরাজদিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করেন। আলিনকি ও আহম্মদজমা খাঁ ভ্রাতৃদ্বয় সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া সিরাজের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন[১৬]।

আলিনকি পিতৃশত্রু গিধোড়ের রাজার সহিত ছয় দিন তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাভূত করেন। ইহার পর হইতে দেওঘর পাঠানদিগের হস্তগত হয়। আলিনকি পাণ্ডাদিগের হস্তে দেবালয়ের কার্য্যভার অর্পণ করিয়া তাঁহাদের নিকট নির্দ্দিষ্ট কর গ্রহণ করেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ খাঁ ও ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে আলিনকি খাঁর মৃত্যু হয়। উভয় ভ্রাতার শব রাজনগরের ইমামবাড়ার প্রাঙ্গনভূমিতে পাশাপাশিভাবে সমাহিত করা হয়[১৭]।

মীরকাশিম আলি খাঁ নবাব পদে অধিষ্ঠিত হইয়া অর্থাভাবের নিমিত্ত অন্যান্য জমিদারের ন্যায় বীরভূমের জমিদারের কর বৃদ্ধি করিলে আসাদজমা খাঁ তাহা দিতে অস্বীকার করেন। এই জন্য তাঁহার সহিত যে নবাবপক্ষের ক্রমাগত বিদ্রোহ সংগঠিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে।

ইনি স্বীয় জমিদারী বিস্তারের বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে আসাদউলজমা খাঁ পক্ষাঘাতরোগে প্রাণত্যাগ করিলে ফুলবাগান সমাধিক্ষেত্রে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। ইনি দানশীল ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন এবং প্রজাবর্গের অশেষ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন[১৮]।

(৬) **বাহাদুরউলজমা খাঁ** - আসাদউলজমা খাঁর মৃত্যুর পর বাহাদুর উলজমা খাঁ ইংরাজদের সাহায্যে নগরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি জারজ ছিলেন বলিয়া আপত্তি উঠিলে ইংরাজগণ আসাদউলজমা খাঁর পত্নী লালবিবিকে তদীয় ভ্রাতা মহম্মদ তকি খাঁ সহ জমিদারী রক্ষা করিবার ভারার্পণ করেন[১৯]। ইহাতে বাহাদুরউলজমা খাঁ অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া নগরের সিংহাসন লাভের উপায় উদ্ভাবন করেন। ভোতন সাহা নামক বাহাদুর খাঁর এক পরম বন্ধু ছিল। তাহার কৌশলে তিনি লালবিবিকে রাজ্যচ্যুতা করেন এবং মহম্মদ তকীর ভৃত্যকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া বলাইলেন যে তাহার প্রভুকর্ত্তৃক সে বাহাদুরকে হত্যা করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। তকির বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যের কথায় ইংরাজগণ বিশ্বাস করিয়া তকির হস্ত হইতে রাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক বাহাদুরউলজমা খাঁর হস্তে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে (১১৮৫ সাল) অর্পণ করেন[২০]। পরে উক্ত লালবিবির আবেদনক্রমে তিনি সরকার বাহাদুর হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে দুইশত টাকা মাসহারা প্রাপ্ত হন[২১]।

বাহাদুরউলজমা খাঁ উক্ত ভাবে ১৭৭৮ খৃঃ সিংহাসন লাভ করিয়া ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাত্র দ্বাদশ বর্ষকাল রাজত্ব করেন। জীবিতকালে ইনি ইঁহার নাবালক পুত্র মহম্মদউলজমা খাঁকে রাজকার্য্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি সিউড়ীর পশ্চিম প্রান্ত সংলগ্ন হুস্‌নাবাদ নামক স্বকীয় পল্লীভবনে শোথ রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জীবনলীলা সাঙ্গ করেন। এই পল্লীভবন হইতে ইঁহার শব রাজধানীতে নীত হইয়া তথাকার ফুলবাগান নামক নগররাজগণের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়।

বাহাদুরউলজমা খাঁ রাজস্ব দিতে না পারায় বন্দী হইয়া প্রেসিডেন্সীতে প্রেরিত হন এবং সরকারের আদেশমত ইঁহার সম্পত্তিও ক্রোক করা হয়[২২]।

(৭) **মহম্মদউলজমা খাঁ**– মহম্মদউলজমা খাঁ ইংরাজদিগের অনুমতি

লইয়া ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়সে মুর্শিদাধাদ হইতে রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে আগত লালা রামনাথ ভাদুড়ী দেওয়ান এবং বীরভূমের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট কীটিং সাহেব সরবরাহকার ছিলেন[২৩]। ১৮০০ খৃঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অধিকার কালে বীরভূমের লোকসংখ্যা ৭,০০,০০০ ছিল। এই সময় তদানীন্তন মুর্শিদাবাদের নবাব বীরভূমের রাজস্ব আদায় জন্য লালা রামনাথ ভাদুড়ীকে প্রেরণ করেন। লালা রামনাথ বীরভূমের রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কার্য্য সম্পাদন করিলে তিনি জায়গীর স্বরূপ বহু ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি সিউড়ীর ছয়মাইল পশ্চিমে ভাণ্ডীরবনের শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন (৩০-৩১পৃঃ দ্রষ্টব্য)। মহম্মদউলজমা খাঁ মাত্র দ্বাদশ বর্ষকাল রাজত্ব করিয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে (১২০৮ সালের ১৫ই ফাল্গুন তারিখে) বারদ্বারি নামক রাজপ্রাসাদে দেহত্যাগ করেন এবং ফুলবাগান নামক রাজগণের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার শব সমাহিত করা হয়।

ইঁহার নিকট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনেক টাকা রাজস্ব পাওনা হয়। কিন্তু তিনি তাহা দিতে অসমর্থ হওয়ায় ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বন্দী হন[২৪] ও পরে কোন প্রকারে রাজস্ব পরিশোধ করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন[২৫]।

(৮) **রাজা মহম্মদ দাওরাউলজমা খাঁ**– মহম্মদউলজমা খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মহম্মদ দাওরাউলজমা খাঁ ১৮০২ খৃষ্টাব্দে (১২০৯ সাল) পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া দ্বাদশবর্ষ পরে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইনি ইংরাজদের নিকট সনন্দলাভ করেন[২৬]। ইনি সুদীর্ঘ ৩৩ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১২৬২ সালের ১৭ই ফাল্গুন তারিখে ইঁহার মৃত্যু হয়। রাজনগরের বাজারে মসজিদের নিকট ইঁহার শব সমাহিত করা হয়।

(৯) **মহম্মদ জহরউলজমা খাঁ**-- মহম্মদ দাওরা উলজমা খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মহম্মদ জহরউলজমা খাঁ ও তাঁহার জননী হুরমতন্নেসা বিবি বীরভূমরাজের উত্তরাধিকার লাভ করিয়া কিছুদিন রাজত্ব করেন। ইঁহার সময় বীরভূমের অবস্থা অতিশয় হীন হইয়াছিল। ইনি, জমিদারীর অনেক অংশ নষ্ট করিয়া ফেলেন ও তজ্জন্য বিশেষ কষ্ট ভোগ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়।

তথ্যসূত্র

(১) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 387,393

(২) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 393

(৩) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 387,393

(৪) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 387

(৫) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 387

(৬) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 334

(৭) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 387

(৮) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 388

(৯) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 388

(১০) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 388

(১১) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 388

(১২) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 388

(১৩) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 388

(১৪) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 390

(১৫) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 894

(১৬) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W W. Hunter, p 389

(১৭) A Statistical Account of Bengal, Vol IV. W.W. Hunter, p 390

(১৮) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 392, 394

(১৯) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 392

(২০) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 392

(২১) Bengal Ms. Record, Vol III, W.W. Hunter, p 247-48, Letter No. 9493 of Sept. 1800

(২২) Bengal Ms. Record, Vol I, W.W. Hunter, p 133, Letter No. 1186,1187.

(২৩) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 392-93

(২৪) Bengal Ms. Record, Vol II, W.W. Hunter, p 22, Letter No. 3366 of Feb. 1794 p 112, Letter No. 4561 of March. 1795

(২৫) Bengal Ms. Record, Vol III, W.W. Hunter, Letter No. 3412 of March. 1794

(২৬) A Statistical Account of Bengal, Vol IV, W.W. Hunter, p 393

দশম অধ্যায়

বীরভূমের অন্যান্য যুদ্ধ বিগ্রহ

(১) ত্রিষষ্ঠীগড় বা ঢেকুরে ইছাই ঘোষের যুদ্ধ--ত্রিষষ্ঠীগড় বা ঢেকুর তদানীন্তনকালে বীরভূমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ত্রিষষ্ঠীগড়, জয়দেব কেন্দুলীর নিকট অজয় নদীর দক্ষিণ তীরের অল্প দূরেই অবস্থিত। গৌড়েশ্বরের অধীনে তখন এই সমস্ত দেশ পরিচালিত হইত। গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল তখন গৌড়ের অধিপতি। ইঁহার অধীনে মেদিনীপুর জেলার ময়নাগড়ের কর্ণসেন রায় নামক একজন সামন্ত নরপতি এই ত্রিষষ্ঠীগড়ে অবস্থিতি করিতেন।

সে প্রায় নবম শতাব্দীর কথা। ত্রিষষ্ঠীগড়ের সোম ঘোষ নামক জনৈক গোপের, গৌড়রাজের প্রাপ্য রাজকর না দেওয়ায়, কারাবাস হয়। বহুদিন যাবৎ কারাবাসের পর গৌড়েশ্বরের অনুগ্রহে সোম ঘোষ নিষ্কৃতি লাভ করেন। এই সোম ঘোষের ইছাই ঘোষ নামে এক অমিত বিক্রমশালী পুত্র ছিলেন। তিনি পিতার এইরূপ লাঞ্ছনা ও অবমাননার কথা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ভবানীর আরাধনা করিয়া বর স্বরূপ শত্রু ধ্বংসের মহা অস্ত্র লাভ করিলেন এবং ত্রিষষ্ঠীগড়ে প্রাসাদ সদৃশ অট্টালিকা ও বহু মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া নিজ অট্টালিকায় বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া দিলেন। এই ভবানী দেবীই শ্যামারূপা নামে পরিচিত হইলেন। ইছাই ঘোষ ত্রিষষ্ঠীগড়কে "ঢেকুর" নামে অভিহিত করিলেন।

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে গৌড়েশ্বর বঙ্গভূমি শাসন করিতেছেন- যমদূতসদৃশ নব লক্ষ সেনা বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া বীরদর্পে পৃথিবী কম্পিত করিতেছেন, এমন সময় বীরভূমের অজয় তীরবর্ত্তী ঢেকুর-রাজ্যের অধীশ্বর ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইলেন - গৌড়ের ভূপতিকে আর কর দেন না - তাঁহার আদেশ মান্য করেন না। ইছাই ঘোষ কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইয়া কর্ণসেনকে বিতাড়িত করিয়া নিজকে আরও ভালরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে নব সজ্জায় সজ্জিত করিয়া ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া

দিলেন। ইছাই ঘোষ প্রস্তুত ছিলেন। অজয় তীরের এই তুমুল যুদ্ধে, অসংখ্য লোক হত ও আহত হইল– ঢেকুর নর-রক্তে প্লাবিত হইয়া গেল! রাজার সাতপুত্র বিনষ্ট হইল– রাণী পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইছাই ঘোষের জয় জয়কার হইল। ইছাই ঘোষ বিজয় লাভ করিয়া স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ এক প্রকাণ্ড দেউল নির্ম্মাণ করিলেন। তাহা ইছাই ঘোষের দেউল নামে পরিচিত। কথিত হয় যে জয় লাভের পর ইছাই ঘোষ এই দেউল মধ্যে শ্যামারূপাকে স্থাপন করিয়া শক্তির আরাধনা করিতেন।

কর্ণসেন হৃতসর্ব্বস্ব ও পরাজিত হইয়া গৌড়েশ্বরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন। এদিকে কর্ণসেনও প্রায় বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি গৃহত্যাগী হইয়া বনে যাইবার অভিপ্রায় করিলে গৌড়েশ্বর রাণীর নিকট আপন অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন যে তিনি তাঁহার ষোড়শ বর্ষীয়া সুন্দরী শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত রাজা কর্ণসেনের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এইরূপ বিবাহ অসামঞ্জস্য হইবে বলিয়া রাণী এ বিবাহে কিছুতেই নিজের মত দিলেন না এবং বলিলেন যে ভ্রাতা মাহুদ্যার (মহামদ) বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্যই হইতে পারে না। মাহুদ্যা রাজার শ্যালক এবং রাজমন্ত্রী! রাজা রাণীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত রাজা কর্ণসেনের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে গৃহত্যাগী হইতে বিরত করিলেন।

পরে, কর্ণসেনের ঔরসে এবং রঞ্জাবতীর গর্ভে এক পরম সুন্দরকান্তি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ রাজার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আনন্দের বন্যা বহাইয়া দিল। এই পুত্রই সুবিখ্যাত বীর রাজা লাউসেন।

লাউসেন যথাযোগ্য ভাবে সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেন এবং রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র বলিয়া প্রজামহলে সম্মানিত হইলেন। লাউসেনের ভুজবীর্য্য, বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া গৌড়েশ্বর ভাবিলেন এই বীরের দ্বারাই আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে এবং ইহার হস্তেই ইছাই ঘোষের বধ সাধন হইবে।

লাউসেন ধর্ম্ম পূজা করিতেন এবং এই পূজায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি রাণীমাতা রঞ্জাবতীর পদধূলি লইয়া ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। প্রসিদ্ধ যোদ্ধা কালু বীর (কালু ডোম) রাজার সৈন্য সামন্ত লইয়া ইছাই ঘোষের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিলেন। কালু ডোম পূর্ব্ব হইতেই ইছাই ঘোষের সেনাপতি লোহাটা বজ্জরের নিকট হইতে তাঁহার অজেয় অস্ত্র হস্তগত করিয়াছিল এবং শেষে তাঁহার দ্বারাই ভগবতীর সেবক ইছাই ঘোষ তাহার সেনাপতি লোহাটা বজ্জরসহ সেই প্রচণ্ড গোঁয়ার দুর্দ্ধর্ষ কালুবীরের হস্তে প্রাণ হারাইলেন!

ঢেকুরে এখনও সেই পুরাকালের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ইছাইএর বৃহৎ অট্টালিকা ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নগর এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

লাউসেন তলাও, কান্দুনেডাঙ্গা, গড়ের পরিখা চিহ্ন, রক্তনালী প্রভৃতি যাবতীয় নিদর্শন এখনও সেই সমস্তের স্মৃতি বহন করিতেছে।

(২) **কাঠিগ্রামের যুদ্ধ**— কথিত আছে যে প্রায় পাঁচ ছয় শতবর্ষ পূর্ব্বে মৌড়েশ্বর থানার অধীন কাঠিগ্রামে বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় (রাজা বাজ বসন্ত রায়) নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। ইনি নিতান্ত গরীব হইয়া নিজ ভাগ্যবলে বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হন। ইনি মাত্র আঠার বৎসর বয়সে সাত দিনের এক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। এই পুত্র তদানীন্তন কালের রাজা রাম সা। এই বংশ অধুনা মল্লারপুর ষ্টেশনের ছয় মাইল পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণার মলুটি গ্রামে বাস করিতেছেন।

রাজা রাম সার তেমন অভিভাবক না থাকায় তিনি বিশেষরূপে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন এবং বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া তিনি কাহাকেও বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। ইনি দেশীয় বহু ভূস্বামীকে উৎপীড়িত, নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত করিতেন। ইঁহার বারংবার এইরূপ ব্যবহারে অসহ্য হইয়া দেশীয় রাজন্যবর্গ বাদসাহ সমীপে রাম সার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার প্রার্থনা করেন। রাম সা ইহাতে বড় একটা চঞ্চল হইলেন না। দিল্লী হইতে মন্ত্রীর পরিচালনায় পাঁচ সহস্র সৈন্য কাঠিগ্রামে প্রেরিত হইল। তিন দিন তিন রাত্রি তুমুল যুদ্ধের পর চতুর্থ দিনে রাজা রাম সা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আপন সৈন্যগণকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিয়া বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিলেন। সম্রাট সৈন্য রাজা রাম সার নিকট পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিল।

এই সংবাদে দিল্লীর সম্রাট ভীষণরূপে ক্রোধান্বিত হইয়া রাম সার দেহ হইতে মস্তকচ্যুত করিতে তিনি পুনরায় অসংখ্য সৈন্য কাঠিগ্রামে প্রেরণ করিলেন। এদিকে রাজা রাম সা পিতৃগুরু সমভিব্যাহারে বাদসা সমীপে উপনীত হইয়া ক্ষমা প্রার্থী হইলেন।

(৩) **ডামরার যুদ্ধ**– রাজা রাম সার অনেক পরবর্ত্তী বংশধর রাজা জয়চন্দ্র কাঠিগ্রামের বাসত্যাগ করিয়া পাঁচ মাইল পশ্চিমে মহম্মদ বাজারের নিকট ডামরা গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন।

ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা রাজচন্দ্র প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে যখন এখানে রাজত্ব করিতেন তখন রাজনগরের মুসলমান ভূস্বামীগণের প্রবল প্রতাপ। এই বংশের আলিনকী খাঁ ঈর্ষাপরবশ হইয়া বলপূর্ব্বক রাজচন্দ্রের প্রজাবর্গের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতেন। ফলে, বহু প্রজা ভয়ে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। রাজচন্দ্র আলিনকী খাঁকে এ বিষয় সাবধান করিয়া দিলেও কোন ফল হইল না। বরং আলিনকী খাঁ ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া ডামরায় হঠাৎ

আসিয়া রাজধানী আক্রমণ করিলেন। রাজা রাজচন্দ্রও হীনবল ছিলেন না। তাঁহার অসংখ্য সৈন্যবর্গ প্রাণপণে সপ্তাহ কালব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ করিল। অষ্টম দিবসে আলিনকী হীনবল হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন। এই যুদ্ধে বহু হতাহত হইল- রক্তের স্রোত বহিয়া গেল। আলিনকীর বহু সৈন্য বন্দী ও কারারুদ্ধ হইল। ইহার একবৎসর পর পুনরায় আলিনকী এই রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিলে, তিনি পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারেও পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন।

এই যুদ্ধের পর তিনি অনেক দিন নীরব ছিলেন; কিন্তু তাঁহার ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হয় নাই। তিন বৎসর পর যখন শুনিলেন যে রাজচন্দ্র এখন একাকী; তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তীর্থভ্রমণে চলিয়া গিয়াছেন– সেই সুযোগে তিনি আবার রাজচন্দ্রের বিরুদ্ধে বহু সৈন্য সহ ডামরা অভিমুখে যুদ্ধ মানসে ক্ষিপ্রগতিতে আগমন করিলেন। ডামরা প্রান্তে বনমধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইল। এবার আলিনকী নিজকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করিয়াই আসিয়াছিলেন। রাজার সৈন্যসামন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া নিজদের এই যুদ্ধে আহুতি দান করিল; কিন্তু তাহারা আলিনকীর সহিত এবার পারিয়া উঠিল না। আলিনকী সুযোগ বুঝিয়া তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে রাজার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ফেলিলেন।

রাণী, রাজ-সেনাপতি নারায়ণ দলুই-এর সুবুদ্ধিতে তিনটি শিশুপুত্র লইয়া নিকটবর্ত্তী মলুটির বনময় স্থানে রাজার গুপ্তগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। রাজচন্দ্রের ভ্রাতৃদ্বয় তীর্থ ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত তথ্য অবগত হন এবং পরে এই স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

(৪) **হেতমপুরের যুদ্ধ**– প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীর বাদশাহ কন্যা আমিনাবিবি সেনাপতি ওসমানের প্রেমাসক্ত হইয়া গুপ্তভাবে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া হেতমপুরের প্রতিষ্ঠাতা হাতেম্ খাঁর নিকট আসিয়া আশ্রয়লাভ করেন। তাঁহারা নিজদিগকে হাফেজ খাঁ ও শেরিণা বিবি বলিয়া পরিচয় দেন। তৎকালে হাতেম খাঁর কোন পুত্র কন্যা জীবিত না থাকায় তিনি শেরিণা বিবি ও হাফেজ খাঁকে আশ্রয় দিয়া পুত্রকন্যা নির্ব্বিশেষে পালন করেন। পরে, তাঁহারা হাতেম খাঁর নিকট নিজেদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করেন। মৃত্যুকালে হাতেম খাঁ তাঁহার সম্পত্তি এই হাফেজ খাঁ ও শেরিণা বিবিকে দিয়া যান।

হাফেজ খাঁ ও শেরিণা বিবি হেতমপুরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা, গড়, বাঁধ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া রাজা রাণীর ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন।

বাদশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র হোসেন খাঁর সহিত আমিনাবিবির বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইয়াও আমিনাবিবি ওসমানের প্রেমাসক্ত হইয়া গুপ্তভাবে পলায়ন করায় বিবাহ হয় নাই। এই হেতু হোসেন ওসমানের চিরশত্রু হইয়া ছদ্মবেশে তাঁহাদের সন্ধানে সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করিয়া শেষে ফকিরের বেশে হেতমপুরে

আসিয়া তাঁহাদের সন্ধান পান। সেই সময় হঠাৎ ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীরা বীরভূমে আসিয়া লুটপাট আরম্ভ করিয়াছে। ইনি মহারাষ্ট্রীয়দের নেতা ভাস্কর পণ্ডিতের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাকে কোনরূপ বশীভূত করিয়া অকস্মাৎ রাত্রে হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দে হেতমপুর আক্রমণ করেন। হাফেজ খাঁর সৈন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হইল। নররক্তে হেতমপুর প্লাবিত হইয়া গেল। হাফেজ খাঁ অবশেষে এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। শেরিণা বিবি সদ্যপ্রসূতা হইয়াও বীরাঙ্গনা বেশে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধ করিলেন। অবশেষে হোসেন তাঁহার প্রণয়প্রার্থী হইলে, তিনি শিশু পুত্রকে বক্ষে ধরিয়া ছাদ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অন্দরস্থ পুষ্করিণীর জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। এই পুষ্করিণী এখনও বর্ত্তমান আছে।

হেতমপুরের পূর্ব্ব প্রান্তে হাফেজ খাঁর গড় ও রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এবং তাহার অল্প দূরে শেরিণা বিবির সমাধি মন্দির, হাফেজ খাঁ বা হাপুস্ খাঁয়ের বাঁধ নিদর্শন স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

(৫) **সংগ্রামপুরের যুদ্ধ**– সিউড়ীর ছয়মাইল দক্ষিণে সিউড়ী-দুবরাজপুর রাস্তার সংলগ্ন কচুজোড় গ্রামে রুদ্রচরণ রায় নামে এক রাজা বাস করিতেন। প্রায় আড়াইশত বর্ষ পূর্ব্বে কচুজোড় সংলগ্ন উত্তর দিকের ডাঙ্গায় রাজার সহিত মুসলমানগণের যুদ্ধ হয়। পরে, এইস্থলে কয়েক ঘর লোকের বসতি হইয়া ইহা এখন সংগ্রামপুর নামে খ্যাত হইয়াছে। এই গ্রামের উত্তর পার্শ্ব দিয়া অণ্ডাল-সাঁইথিয়া লাইন চলিয়া গিয়াছে।

(৬) **জগন্নাথপুরের যুদ্ধ**– ই, আই, আর লুপ-লাইনের মুরারই ষ্টেশনের তিনমাইল পূর্ব্বে কনকপুর গ্রাম। এই অঞ্চলে রাজা উদয়নারায়ণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সহিত মুর্শিদকুলী খাঁর রাজস্ব ব্যাপারে মতদ্বৈত হওয়ায় পরস্পর পরস্পরের শত্রু হইয়া দাঁড়ান। ফলে, উভয় পক্ষের মধ্যে কনকপুর গ্রামের পশ্চিম প্রান্তরের ডাঙ্গায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নিকটস্থ জগন্নাথপুর গড়ে রাজা উদয়নারায়ণের সৈন্যগণ শিবির সংস্থাপন করিয়াছিল। রাজা উদয়নারায়ণের পক্ষে গোলাম মহম্মদ জান ও লহরী মল্ সেনাপতিত্ব করেন। উভয় পক্ষে বহু লোক হতাহত হয়। গোলাম মহম্মদ এই যুদ্ধে নিহত হন। রাজা উদয়নারায়ণের পুত্র সাহেবরাম এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পিতার সহিত দেবীনগরে পলাইয়া গিয়া প্রাণরক্ষা করেন।

একাদশ অধ্যায়

বীরভূমির প্রাচীন আলেখ্য

বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা ইংরাজ শাসনাধিকারকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন বীরভূমির সামাজিক ও সাধারণ জীবনযাত্রা প্রণালীর একটি আলেখ্য প্রদানের চেষ্টা করিতেছি।

সাধারণভাবে লক্ষ্য করিলে সহজেই অনুভব করা যায় যে, বর্ত্তমানকালে ইতর ভদ্র সকলেরই জীবনযাত্রার প্রণালী যেরূপ ব্যয়বহুল এবং নানাবিধ বিদেশী উপসর্গে কন্টকিত হইয়াছে, সে কালে তেমন ছিল না। ইহার কারণ তৎকালে বিদেশী শাসকগণের প্রভাব এরূপ প্রত্যেক লোকের উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করিবার সুযোগ লাভ করে নাই। এইজন্য তাহারা কোনরূপ বৈদেশিক প্রভাব দ্বারা উপদ্রুত না হইয়া তাহাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রা প্রণালী রক্ষা করিয়া দিন যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

অভাব বোধই মানুষকে অভাবগ্রস্ত করে। তখনকার কালের লোকদিগের মধ্যে এখনকার মত আমাদের জল মাটি, আচার ব্যবহার সামাজিক ও লৌকিক ব্যবহারাদি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ব্যয়বহুল অযথা অভ্যাস দ্বারা ভারগ্রস্ত হয় নাই। তাই, তাহারা নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে রহিয়া নিজের নিজের যাহা কিছু আবশ্যক, তাহাই সঞ্চয় করিয়া পরমানন্দে আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া দিন যাপন করিত।

এখন যেমন নানাবিধ কারণে গ্রাম্য দলাদলি প্রায় সর্ব্বত্রই তীব্রতম ভাবে পরিস্ফুট হইয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামবাসী নিরীহ লোকদিগের পক্ষে নিশ্চিন্ত মনে নির্দ্বন্দ্বে বাস করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, তখনকার দিনে এরূপ দ্বন্দ্ব-কলহের বা দলাদলির উপলক্ষ্যই ছিল না। এখন সন্ধ্যায় পল্লীগ্রামে প্রায় প্রত্যেকেরই বসিবার ঘরে লোকজন সমবেত হইয়া এই দলাদলির কথা লইয়াই উত্তেজনায় রাত্রি জাগরণ করে। কিন্তু পূর্ব্বে তাহারা দিবসে আপন আপন জীবনযাত্রার উপযোগী পরিশ্রমাদি করিয়া সন্ধ্যার পর সমবেত হইয়া পার্থিব দ্বন্দ্ব-কলহের

অতীত এক উচ্চ ভাবুকতাময় অবস্থায় অবসর বিনোদনে তৎপর রহিত। কিছু না হইলেও একটি সামান্য মৃন্ময় তৈলপ্রদীপের ক্ষীণ আলোকে রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ করিত এবং তাহাই সমবেত লোক নিস্তব্ধ ভাবে শুনিয়া, সেই সব গ্রন্থোক্ত ভাব ও উপদেশনিচয় আত্মস্থ করিয়া তথাকথিত বর্ত্তমান শিক্ষিত লোক অপেক্ষা দেশের সংকৃষ্টির সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রহিবার চেষ্টা করিত। নিরক্ষর ব্যক্তি, যে নিজের নাম পর্য্যন্ত স্বাক্ষর করিতে পারে না, সেও হয়ত এরূপ উপায়ে রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্য-চরিত, চণ্ডীকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থোল্লিখিত বিষয় অধিগত করিয়া লইত। ইহাতে নিরক্ষরতার জন্য কোন বাধা উপস্থিত হইত না।

লোকের শিক্ষাপ্রণালীর বিস্তার ও প্রচার কল্পে শ্রীমদ্ভাগবতের কথকতা, রামায়ণের গান, চণ্ডীর গান, ধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতির গান তখন দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে গীত হইত এবং ইতর ভদ্র সকলকেই এই সকল বিষয়ে তুল্য রূপে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিত। বলিতে কি, ইহাকে এক প্রকার ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বলা অসঙ্গত হইবে না। যাত্রার ও কালীয় দমন গান. প্রভৃতিও গ্রামে গ্রামে লোকদিগকে যুগপৎ আনন্দ ও উপদেশ পরিবেশন করিয়া দেশবাসীর মনকে হিংসা দ্বেষ হইতে মুক্ত করিয়া উচ্চতর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিতে যথেষ্টরূপ সহায়তা করিত। ইহার ফলে, দেশের উচ্চ চিন্তা, দেশের ধর্ম্ম চিন্তা, দেশের সামাজিক জীবন প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হইতে কাহারও বাকী রহিত না। তাহারা নিরক্ষর হইলেও রামায়ণের ভ্রাতৃবৎসলতা, পিতৃভক্তি, পত্নীপ্রীতি, মহাভারতের ভ্রাতৃভাব ও ধর্ম্মের বিজয়; চৈতন্য-চরিতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভগবৎ সান্নিধ্য ও সেবাধিকার লাভ; বেহুলার পতিভক্তি– এই সব উচ্চতম চিন্তা, উচ্চতম ভাব গ্রামবাসীগণের অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে যে শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করিত, তাহাতে এইরূপ আবেষ্টনের মধ্যে রহিয়া কেহ দুষ্ট চিন্তার প্রতি ধাবিত হইবার আগ্রহ বা উত্তেজিত হইবার অবকাশই পাইত না। এরূপ কল্পরাজ্য অসম্ভব ছিল না।

তখনকার দিনে মুদ্রণযন্ত্র ছিল না; সুতরাং সুলভ গ্রন্থ-প্রকাশের কল্পনাই ছিল না। কিন্তু গ্রন্থ-প্রকাশের পরিবর্ত্তে, পূর্ব্বোক্ত উপায়ে লোকশিক্ষার কাজ যে প্রকৃষ্টতর ও ব্যাপকতর ভাবে হইত, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই ভাবে গ্রামবাসিগণ যে একত্রে বসিয়া ভগবৎ-মহিমা শ্রবণে তৎপর রহিত এবং তজ্জন্য আয়োজনাদি কল্পে তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে মিলিত হইয়া উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে যে সকল কার্য্য করিতে হইত, তাহাতে নির্ব্বিচারে তাহাদের সকলের মধ্যে একটি সঙ্ঘবদ্ধ ভ্রাতৃভাব অলক্ষ্যেই যেন অঙ্কুরিত হইত। আবার, এই ভগবৎ-মহিমা শ্রবণ করিতে করিতে তাহাদের মধ্যে ভাবের ও করুণ রসের অমৃত-সিঞ্চনে এই

অঙ্কুর ক্রমে সুদৃঢ় বৃক্ষরূপে পরিণত হইত। এইরূপ গ্রামে গ্রামে রাত্রি জাগরণের ফলে, দুষ্ট চোরগণের উপদ্রব হইতে গ্রামবাসীগণ অনেক ক্ষেত্রে নিরাপদ হইতে পারিত।

চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বীরভূমে আমরা জয়দেব ও চণ্ডীদাস এই দুইজন জগদ্বিখ্যাত কবির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হই। কিন্তু সুবৃহৎ বনস্পতি বা সমুচ্চ শৈল-চূড়া দূর হইতে দর্শকের মনে যেমন তাহাদের পাদদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য তরুগুল্ম এবং অনতিউচ্চ পর্ব্বত শ্রেণীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, সেইরূপ আমরা মনে করি যে সেকালে একটি চণ্ডীদাস বা একটি জয়দেব, মরুক্ষেত্রে একটি বৃক্ষের ন্যায় সমুদ্ভূত হন নাই। তৎকালীন দেশব্যাপী সংস্কৃতিতে শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত অসংখ্য কবি ও মহাজন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা ইঁহাদের উজ্জ্বলতম প্রভায় নিষ্প্রভ ও মলিন হইয়া কালের গর্ভে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছেন। আমাদের দেশে মুদ্রণযন্ত্রের অভাবে এবং বিরুদ্ধ আবহাওয়ার দৌরাত্ম্যে, অগ্নিদাহে, বন্যায় ও কীটের দৌরাত্ম্যে কত কত সুন্দর সুন্দর পুস্তক যে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই!

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হইতে নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মভূমি বীরভূমির প্রতি পল্লীতে পল্লীতে আমাদের মহাপ্রভুর পূত প্রভাবে প্রভাবান্বিত সমগ্র মনোহরসাহী পরগণায কত কত কবির আবির্ভাব হইল, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। সে সময় প্রতি পল্লীতে হরিনামের গান ও চৈতন্য প্রভুর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও তাঁহারই উদ্ভাবিত ভগবত প্রেমে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার অদ্বিতীয় সোপান স্বরূপ রসকীর্ত্তন ও নাম-কীর্ত্তনে সমগ্র দেশবাসী একেবারে অপূর্ব্ব পুলকে যেন কন্টকিত হইয়া উঠিল। সকলেই ভাবে গদগদ, সকলেই ভগবদ্‌ভাবে বিভোর, সকলেই একাধারে ভক্ত ও কবি– তা কে জানে পণ্ডিত, কে জানে মূর্খ, কে জানে ধনী, কে জানে নির্ধন! দেশব্যাপী সংস্কৃতির কি অপূর্ব্ব প্রভাব!

রামপ্রসাদের ও অন্যান্য শাক্ত কবির গান দেশবাসীর হৃদয়ে যে মাতৃভাবের ও অপত্যস্নেহের বিকাশ সাধন করিয়াছিল, তাহার জন্য কোন বিদ্যায়তন প্রয়োজন হয় নাই। না হইলেও ওরূপ ভাবে সম্ভবনা ছিল না। মায়ের প্রতি সন্তানের যে কত নির্ভরতা, কন্যার প্রতি পিতার কি মমতা, তাহা আগমনীর গান যিনি শুনিয়াছেন, তাঁহারই হৃদয়ে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবের সমাবেশ হয় এবং এই দুর্দ্দিনেও প্রতিবৎসর তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের দেশে কবির গানে দেশের ইতর সাধারণের মধ্যে দাঁড় কবিগণ, শাস্ত্রমর্ম্ম প্রচার কল্পে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অশিক্ষিত ইতর লোকেদের মধ্যে তাহাদেরই মনোমত ভাষায়, তাহাদেরই মত কোন লোক দল বাঁধিয়া

প্রশ্নোত্তরচ্ছলে হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত অসংখ্য উপাখ্যান বর্ণন করিয়া তাহাদের মধ্যে হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম সহজে ও সুখবোধ্য ভাষায় তাহাদের নিকট উপস্থিত করিয়া দিত। এই কবির গানে অনেক ভদ্রশ্রেণীর লোকেও তাঁহাদের প্রতিভা প্রয়োগ করিয়া ইহাকে মহিমান্বিত করিয়াছে। এই দাঁড়-কবির গান, অবশ্য ইহার কদংশ বাদ দিয়া, ইতর সাধারণ মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ঠ সহায়তা করিয়াছে। যে সকল দুষ্ট প্রকৃতির ইতর লোক অসদুপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে উন্মুখ, তাহাদিগকেও এই প্রভাবের টানে পড়িয়া অসৎ পন্থার প্রতি বীতরাগ হইতে হইয়াছে।

দেশ-ভ্রমণ শিক্ষালাভের একটি অঙ্গ। বীরভূমের সংস্থান লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইবে যে বীরভূমবাসীকে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ বা উপার্জ্জনের জন্য অন্যত্র যাইবার বড় আবশ্যক হইত না। এরূপ অবস্থায় দেশবাসীর কূপমন্ডুকের মত অজ্ঞ হইবার আশঙ্কা। এইজন্য দেশভ্রমণ শিক্ষার একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত ইহা অবশ্য করণীয় বলিয়া সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইত। এই নিমিত্ত অন্যান্য দেশের ন্যায় বীরভূমবাসীও দলে দলে তীর্থ ভ্রমণ জন্য পদব্রজে নানা বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়াও সুদূর বৃন্দাবন, পুরী, কাশী, কামাখ্যা এবং ভারতের অন্যান্য সুদূরবর্ত্তী তীর্থস্থান ভ্রমণ করিত। কালে অনেকেই তাহাদের মত প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে দিনের পর দিন ধরিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কথা শ্রবণ করিয়া দেশের ও তীর্থস্থানের একটি যথাযথ চিত্র অনুভব করিয়া লইতে পারিত।

প্রত্যেক লোকের স্ব স্ব দেশের ইতিহাস জানা কর্ত্তব্য। গ্রামে গ্রামে প্রত্যক্ষদর্শী পল্লী-কবিগণের রচিত এইরূপ খাঁটি ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে অসংখ্য ছড়া বা পল্লীগান রচিত হইয়া গ্রামে গ্রামে ভিক্ষুকগণ কর্ত্তৃক গীত হইত। ইহাতে সাধারণ লোকের ঐতিহাসিক জ্ঞান অর্জ্জনে সুযোগ ঘটিত। ঐতিহাসিক প্রবাদ অবলম্বনেও এইরূপ বহু ঐতিহাসিক ছড়া প্রচলিত আছে। আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাহা সঙ্কলন করিয়াছি।

দেশের ঐতিহাসিক জ্ঞান যেমন আবশ্যক, তেমনি স্ব স্ব পরিবারের পরিচয় বা কীর্ত্তিগাথা জানা একান্তই আবশ্যক। আমাদের দেশে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমাগত ভাট বা চারণগণ এইরূপ গৃহস্থের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করিয়া পুরস্কার লাভ করিত এবং এখনও করে। ইহাদের জীবিকাই এই। কুল-পঞ্জিকাকারগণের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা উচিত। এই শ্রেণীর লোক আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস রক্ষণে যথার্থই কৃতী। তাহাদের নিকট হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস সঙ্কলন হইল না! অথচ দেশের প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলনে ইহাই অন্যতম প্রকৃষ্ট পন্থা।

একটানা স্রোতে জীবন যাপন করা প্রীতিপদ নহে। মানুষ চায় কর্ম্মের বিরল অবসরে উচ্চতর চিন্তা বা ধর্ম্মানুশীলনে নিযুক্ত থাকিতে। ইহা যেমন আবশ্যক, মানুষের আবার তেম্‌নি চিত্ত বিনোদনের জন্যও লঘু বা তরল বিমল আনন্দ উপভোগের প্রয়োজন হয়। এই উপলক্ষে আমরা পূর্ব্বে কতকগুলি ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছি।

গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মপূজাদি উপলক্ষে সঙ্‌ আদির দ্বারা লোকে শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিত। পল্লীতে পল্লীতে তখন পটুয়াগণ ভগবল্লীলার নানাবিধ পট চিত্রিত করিয়া তদন্তর্গত বিষয়, গানের দ্বারা সাধারণ লোক ও মহিলাগণের আয়ত্ত করিতে যথেষ্ঠরূপ সহায়তা করিত। এই পটুয়াগণই আমাদের পল্লীগ্রামের চিত্র-শিল্পের অন্যতম প্রধান রক্ষক।

তখন গ্রামে গ্রামে স্কুল ছিল না, নিকটে নিকটে কলেজ ছিল না। টোল বা পাঠশালা ছিল, তাহাতেই বা কয়জন শিক্ষালাভ করিত ? কিন্তু তখনকার দিনের যা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য - শাস্ত্র গ্রন্থপাঠ বা তাহার মর্ম্ম অধিগত করা, তাহা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সহজেই সুসাধিত হইত। এইভাবে অনেক তথাকথিত অজ্ঞ ব্যক্তিও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে দেশের ভাব, চিন্তা ও সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইয়া কত নূতন গ্রন্থ, কত নূতন গান, কত নূতন গাথা রচনা করিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন! তাঁহাদের বর্ণাশুদ্ধি জ্ঞান ছিল না, কিন্তু মাতৃভাষায় কথা বলিতে বা ভাব প্রকাশ করিতে তাহাদের ভুল হইবে কেন ? তাই, টোলে বা পাঠশালায় বিদ্যা অধিগত না করিলেও, তাহারা যে সাধারণ জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিত, প্রতিভাশালী বহুব্যক্তি তাহারই বলে, বহু সুন্দর ও সুষ্ঠু রচনা দান করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়াছেন।

এখন যেমন পুলিস, চৌকী, সবডিভিসন বা জেলা সর্ব্বত্রই লোকে অনায়াসে বিচারপ্রার্থী হইয়া বিচার পাইতে পারে, তখনকার দিনে সে সুযোগ ছিল না। সাধারণ লোক, দেশের শাসক বা তাহার নিযুক্ত বিচারপতি ও বিচারালয় কোন্ সুদূর প্রদেশে আছে, তাহা বড় জ্ঞাত ছিল না। গ্রামের বিবাদ বিসম্বাদ গ্রামের মধ্যে যিনি মণ্ডল, যিনি বয়োবৃদ্ধ ও যিনি বিত্তশালী এবং সর্ব্বোপরি নিরপেক্ষ সর্ব্বজনে সমদর্শী এমন উপযুক্ত লোকের নিকট স্ব স্ব অভাব অভিযোগ নিবেদন করিত এবং তিনি অন্যান্য লোকের সহায়তায় যথাবুদ্ধি নিরপেক্ষ মীমাংসা করিয়া দিতেন। লোকে তাহাই মাথা পাতিয়া চরম সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইত। ইহাতে উকিল মোক্তারের বালাই ছিল না, পেয়াদার অত্যাচার ছিল না, বা বিচার বিক্রয়ের কোনরূপ কর ধার্য্য ছিল না। বৈষয়িক সংক্রান্ত ব্যাপারেও এইরূপ প্রণালী অনুসৃত হইত। কিন্তু সামাজিক ব্যাপারের ব্যবস্থা অন্যরূপ ছিল। তখন দেশে পাঁচটি কি

দশটি গ্রামের মধ্যে একজন শাস্ত্রজ্ঞ সভাপণ্ডিত বা সমাজপতি থাকিতেন। তাঁহার শাসনাধীন গ্রামের মধ্যে সামাজিক দূরাচারের প্রতিকার ব্যবস্থা করিবার একমাত্র তিনিই অধিকারী ছিলেন এবং গ্রামবাসিগণ তাঁহারই ব্যবস্থা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিত। তিনি বিধিকর্ত্তা এবং ঐহিক, পারত্রিক ও লৌকিক- সর্ব্ববিধ বিষয়েই উপদেশ দান করিয়া জনসাধারণকে নিয়মিত করিতেন। তাঁহারাও অসন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহার নিরপেক্ষ বিচার মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য গ্রামবাসিগণের স্বাক্ষরসহ স্বীকারপত্র লিখিয়া দেতেন (দ্বাদশ অধ্যায় ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

তখনকার দিনে দেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশের মধ্যেই ব্যয়িত হইত, সুতরাং যে পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইত, তাহাতে তাহাদের যথেষ্টরূপ অভাব পরিপূর্ণ হইত। নগদ অর্থের বিশেষ আবশ্যক ছিল না। দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন। তখন গৃহস্থের ঘরে গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, ক্ষেতে যথেষ্ট পরিমাণ গুড় এবং তুলাও উৎপন্ন হইত; সুতরাং অভাব রহিল কিসের ? আর তখন বিলাসিতার নিত্য নূতন অভাব সৃষ্টি হয় নাই। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই - যিনি মাসিক দুই টাকা বেতনে চাকুরি করিতেন, তিনি তাহাতেই দোল, দুর্গোৎসব, অষ্টপ্রহর, নবরাত্র এবং বার মাসে তের পার্ব্বণ করিয়া লোককে ভুরিভোজনে পরিতৃপ্ত করিতেন – যাহা এখনকার দিনে নগদ পাঁচশত টাকা বেতনভোগী কর্ম্মচারীর পক্ষে কল্পনাতীত! এত টাকা উপার্জ্জন করিয়াও তাঁহারা মাত্র নিজ পরিবার প্রতিপালনেই গলদঘর্ম্ম হইয়া পড়িতেছেন। তৎকালের এইরূপ অনুষ্ঠানের প্রাচীন তালিকা হইতে অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। ফলতঃ ইংরাজীতে প্রবাদ আছে— "It is not what we earn, but what we save that makes us rich"

৫০০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া চারিশত নিরানব্বই টাকা খরচ করা অপেক্ষা ১০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সাত টাকা খরচ করা কি অধিকতর লাভের কথা নহে ? তখন লোকে নিজের চাষের উৎপন্ন টাটকা দ্রব্য - ঘি, দুধ, মাছ, গুড় প্রচুর পরিমাণে আহার করিত ও অপরকে আহার করাইয়া আনন্দলাভ করিত। সে সময় গৃহস্থের ঘরে অতিথি অভ্যাগত আসিলে কি আনন্দেরই না সাড়া পড়িয়া যাইত, কি উৎসাহভরেই না তাহারা তাহাদের সেবা পরিচর্য্যা করিত! তাহাদের ভাবনা কিসের ? ঘরের ঘি, ঘরের ময়দা, ঘরের গুড় বা চিনি, ঘরের মাছ, ঘরের ক্ষীরের সন্দেশ। অতিথি অভ্যর্থনার আর চাই কি ? একটি নগদ পয়সার খরচ নাই, অথচ অতিথিকে রাজভোগে পরিতৃপ্ত করা চলিত। সুতরাং, অতিথির আগমনে গৃহস্থের আনন্দ না হইবে কেন ? কিন্তু এখন ? কোন অতিথি আগমন করিলে গৃহস্থের মহাদুর্ভাবনা। সামান্য জল খাওয়াইবার জন্যই নগদ কত পয়সা

খরচ হয়, তার উপর অন্যান্য সেবার কথা স্বতন্ত্র। খুব কম হইলেও একজন অতিথিকে অভ্যর্থনার জন্য একবেলায় দেড় দুই টাকা খরচ হয়। এই খরচ গৃহস্থের স্কন্ধে বিষম ভার বলিয়া বোধ না হইয়াই পারে না।

বীরভূমের স্থানে স্থানে বহু প্রাচীন মেলা প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মেলায় অবহমানকাল বহু পল্লীবাসীর সমাগম হয়। ফলে, পরস্পরের আত্মীয় স্বজন মধ্যে দেখাশুনা ও আলাপ পরিচয় ইত্যাদি হইত। ইহাতে ছেলেমেয়ের শুভসম্বন্ধ নির্ণয় ও তৎস্থাপনকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিত। লোকে মেলায় তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি, যাহা সাধারণতঃ পল্লী অঞ্চলে পাওয়া যায় না, তাহা ক্রয় করিত এবং অনেক উৎপন্ন দ্রব্য ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় চলিত। এই মেলায় অনেক সম্পন্ন ব্যক্তি অন্নসত্র খুলিয়া সমাগত দরিদ্রগণকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া কৃতার্থ হইত। অন্নদান চিরকালই পুণ্যময় অনুষ্ঠান বলিয়া সকলেরই ধারণা– তখনও, এখনও। জয়দেব মেলায় আজিও এ-প্রথা যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। আমরা জানি, এতদঞ্চলের অনেক গৃহস্থ, এতদুপলক্ষে নিষ্কর জমি দান করিয়া এই পুণ্যময় ব্যাপারটিকে স্থায়িত্ব দান করিয়াছেন। কিন্তু কালের গতিতে তাহাও বা লুপ্ত হয়!

এখন ছেলেমেয়ের বিবাহে পণ দিতে গৃহস্থ যেরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছেন, তখন বিবাহ ব্যাপারটা এরূপ কষ্টের বিষয় ছিল না – পীড়নের যন্ত্র রূপে ব্যবহৃত হইত না - কিছুদিন পূর্ব্বেও ছিল না। এখন সামান্য গৃহস্থ ব্যক্তি কন্যাদায়গ্রস্ত হইলে দুই সহস্র টাকার কমে নিষ্কৃতি পান না। লোকে হয়ত বৎসরে একহাজার টাকা রোজগার করিতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমানকালে সে চিরজীবনেও হয়ত এক হাজার টাকা সঞ্চয় করিতে পারে না। কোন রকমে কষ্টে সৃষ্টে খাটিয়া দিনপাত করে মাত্র। তদুপরি, পুত্র সন্তানের শিক্ষার ব্যয়বাহুল্য আছে; সুতরাং সামান্য গৃহস্থের কিরূপ দুরবস্থা কল্পনা করুন। কন্যাকে পাত্রস্থ করিতেই হইবে- ভিটামাটি বন্ধক দিয়া আহারের সংস্থান জমিজমা বিক্রয় করিয়া; সুতরাং আনন্দের ব্যাপার শুভ-পরিণয়, কিরূপ নিরানন্দে পরিণত হইয়াছে! কিন্তু আমরা প্রাচীন অপ্রকাশিত কাগজপত্র হইতে দেখিতে পাইতেছি যে শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বেও এতদঞ্চলে শিক্ষিত ভদ্রগৃহস্থের বিবাহে পাত্র পুরস্কার মাত্র ৯ / ১০ টাকার বেশী ছিল না! আজকাল এই অল্প টাকায় বিবাহ সুনির্ব্বাহের কথা অনেকেই বিশ্বাস বা ধারণা করিতে পারিবেন না। কিন্তু তখনকার দিনে দুইজন বিশিষ্ট দেশখ্যাত পণ্ডিতের পরিবারে শুভসম্বন্ধ বিষয়ে কিরূপ খরচ হইয়াছিল, তাহা দ্বাদশ অধ্যায়ের ১নং (ক) ও (খ) সংখ্যক পল্লীচিত্র পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।

তখনকার দিনে প্রায় প্রতি গ্রামের মধ্যাংশে একটি করিয়া চণ্ডীমণ্ডপ

ছিল। ইহা গৃহস্বামীর শারদ-উৎসব জন্য নির্ম্মিত হইলেও, প্রায় সর্ব্বত্রই গ্রামের সর্ব্বসাধারণের মিলন-মন্দিররূপে ব্যবহৃত হইত। এখানে গ্রামের সর্ব্বসাধারণ অবসর সময়ে একত্র হইয়া নানারূপ জল্পনায় ও আলাপ-আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিত। ইহারই প্রাঙ্গণ চত্বরে রামায়ণ, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতির গান, ভাগবতের কথকতা, কবির লড়াই, মনসামঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গলের গান প্রভৃতি হইত। বিদেশ হইতে অপরিচিত অতিথি অভ্যাগত আসিলে তাহারা এই চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয়লাভ করিয়া যথাযোগ্য ভাবে সৎকৃত হইত। আবার, স্থানাভাব ঘটিলে এই চণ্ডীমণ্ডপের পিড়ায় গুরুমহাশয়ের গ্রাম্য পাঠশালার অধিবেশন হইত। আবার হয়ত দেখিবেন-সেখানে বসিয়া কোন লেখক, কোন সম্পন্ন গৃহস্থের জন্য প্রাচীন পুঁথির আদর্শ হইতে এক এক প্রস্থ রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্য চরিতামৃত, ভাগবত বা এইরূপ কোন পুঁথির দিনের পর দিন ধরিয়া অনুলিপি প্রস্তুত করিতেছে। তিনচারি মাস কাল এইভাবে ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া গৃহস্বামীর জন্য অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিলে তিনি তাহাকে হয়ত ২টি টাকা প্রণামী ও একজোড়া কাপড় বিদায় দিতেন। লেখকও সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় লইয়া অন্যত্র গমন করিত। তখনকার দিনে এইরূপ কষ্ট করিয়া এক এক খানি পুস্তক গৃহস্থকে সঞ্চয় করিতে হইত; সুতরাং এইরূপ কষ্টার্জ্জিত গ্রন্থ যাহাতে চুরি বা হস্তান্তরিত না হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক গ্রন্থের শেষে গ্রন্থাপহারীর প্রতি কঠোর দিব্য লিপিবদ্ধ করিত। এই ব্যবসায়দার লেখকগণের লেখা অতি সুন্দর; অত বড় বড় পুঁথি লিখিয়াছেন; কিন্তু কোথাও কাটাকুটি নাই। আবার লেখাগুলি-

'সমানি সম শীর্ষানি ঘনানি বিরলানিচ'

আবার সেই লেখার কালীই বা কত সুন্দর। তখনকার দিনে যে কালী তাহারা নিজে প্রস্তুত করিয়া লইত, তাহা তিন চারিশত বৎসর পরেও দেখিতেছি তেমনি উজ্জ্বল। তাহাদের কালী প্রস্তুতের formula বা আর্য্যা ছিল—

'তিল ত্রিফলা সিমূল ছালা
ছাগ দুগ্ধে করি মেলা
লৌহ পাত্রে লাহায় ঘসি
ছিঁড়ে পত্র না ছাড়ে মসি।'

গৃহস্থগণ গৃহমধ্যে এইরূপ একখানি গ্রন্থ রক্ষা করিয়া নিত্য পূজা করিত, ধূপ চন্দন দিত এবং তাহা অহাদের ধর্ম্ম-জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিত। এখনকার সুলভ ছাপাখানার দিনে হতাদরে সে সকল পুঁথি ক্রমে বিলুপ্ত হইতে চলিল! ফলে, কত গ্রন্থকারের মূল রচনা ও দুষ্প্রাপ্য অনুলিপি চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গেল!

এই মিলন-মন্দিরের প্রাঙ্গন-চত্বরে শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বিলুপ্ত হইত। কেননা, এইখানেই শ্রীমদ্ভাগবতের কথকতা, শ্রীকৃষ্ণের লীলা বা রাস কীর্ত্তন, চৈতন্যমঙ্গলের গান, চণ্ডীমঙ্গলের গাথা, ধর্ম্মরাজের মাহাত্ম্য, মনসামঙ্গলের গান প্রভৃতি সমভাবেই অনুষ্ঠিত হইত এবং সাধারণের প্রত্যেকেই তাহা পরম শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ হইত। তখন কে শাক্ত, কে বৈষ্ণব— তাহার ভেদাভেদের দুর্জ্জয় পক্ষপাতিত্ব ছিল না।

আবার এই চণ্ডীমণ্ডপে সর্ব্বসাধারণের বৈঠকে গ্রামের মণ্ডল ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সকলে সমবেত ভাবে গ্রাম্য অপরাধীর অপরাধের যে বিচার করিত, সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তৎকালে ডাক্তার কবিরাজের এখনকার মত এত ভিড় ছিল না, বা এত প্রকার রোগের ভয়াবহ নামও কেহই জানিত না। তবে কি মানুষের রোগ হইত না? নিশ্চয়ই হইত, তবে এত রকমারি রোগের বা চিকিৎসার কথা শুনা যাইত না। ছেলে মেয়ের চিকিৎসা মা, দিদিমাই করিত। সামান্য মুষ্টিযোগ তাহাদের জানা থাকিত, তাহাতেই তাহারা ছেলেমেয়েদের বাঁচাইত এবং সেই ছেলেমেয়েরা দীর্ঘজীবি হইত। এখন রোগ বৃদ্ধি হইয়াছে, স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে— অর্থাভাব হইয়াছে; পুষ্টিকর খাবার নাই; সুতরাং লোকের পরমায়ুও দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। এখন লোকে যেমন রোগব্যাধিকে সকল দিক দিয়া অত্যন্ত ভয় করে, তখন তেমন ভয়ের কারণ ছিল না। ঘরের খাঁটি দুধ, ঘি, ভাত, মুড়ি, গুড় খাইয়া তাহারা অটুট স্বাস্থ্য লাভ করিত।

এখন যেমন প্রায় হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষভাব দেখা যায়, তখন তেমন দেখা যাইত না। হিন্দু মুসলমানে প্রীতি ছিল— অপরাপর জাতির সহিত অপরাপর জাতির সখ্যভাব লক্ষিত হইত। তাহাদের ভিতর কাকা, মামা, দাদা, জেঠা, চাচা, নানা, মামু, দাদী প্রভৃতি মধুর সম্বন্ধ ছিল। হিন্দু মুসলমানে সই পাতাইত। হিন্দুদের বিবাহের সময় মুসলমানেরা নিমন্ত্রিত হইত এবং তাহাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত। মুসলমানদের বিবাহে তাহারা হিন্দুদের নিমন্ত্রণ করিত এবং তাহাদের বাড়ীতে মূল্যবান 'সিধা' অর্থাৎ ভাল চাউল, দাল, তেল, ঘি, মাছ, মসলা, ময়দা, তরকারি প্রভৃতি দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিত। বিবাহে, অন্নপ্রাশনে উভয় পক্ষের উপহার দিবার প্রথা ছিল।

তখনকার মেয়েরা অধিক পরিশ্রম করিলেও, তাহারা লেখাপড়ায় তাদৃশ মনোযোগ দিবার সুযোগ পাইত না। তাই বলিয়া তাহারা যে আমাদের ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি সদ্ গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিল, এমন নহে। বরং তাহারা লেখাপড়া না শিখিয়াই, মুখে মুখে

এই সব বিষয় আয়ত্ব করিয়া রাখিত।

শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মোপলক্ষে বহু গ্রামের আত্মীয়স্বজন ও কুটুম্বাদি নিমন্ত্রিত হইত। এখনও এই নিয়ম প্রায় সর্ব্বত্র রক্ষিত হয়। তাহাদের কেহই এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পরান্মুখ হইত না। এই উপলক্ষে মহাভারত (বিরাট পর্ব্ব) পাঠের ও লীলাকীর্ত্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা হইত এবং ইহার ফলে সমাগত কুটুম্বমণ্ডলী উহা শ্রবণ করিয়া উপকৃত হইতে পারিত।

পূর্ব্বকালে এখানকার অনেক গ্রামের লোকের মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে, তাহারা কোন সম্পত্তি ক্রয় বা বিক্রয় করিবার পূর্ব্বে তাহার এক কাঠা হইতে দশ কাঠা পর্য্যন্ত ইচ্ছামত গ্রাম্য দেবসেবার জন্য দান করিত। এইভাবে অনেক দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা ও তাহার সেবাকার্য্যাদি সুনির্ব্বাহ হইত।

এতদ্ব্যতীত, ভিক্ষার দ্বারাও চাউল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া অনেকেই অনেক পূজা উৎসব করিত।

দ্বাদশ অধ্যায়

বীরভূমের প্রাচীন পল্লীচিত্র

ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে কেবলমাত্র সনতারিখযুক্ত দেশাধিপতিগণের যুদ্ধবিগ্রহ বা তাঁহাদের অভিযানাদির বিষয় লিপিবদ্ধ করিলেই যে প্রকৃতপক্ষে কার্য্যসিদ্ধ হয় না, তাহা বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই। দেশের অধিবাসিগণ কিভাবে জীবনযাপন করিত– তাহাদের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ কিভাবে সুনির্ব্বাহ হইত– এক কথায়, তাহাদের প্রাচীন সমাজের নিখুঁত বর্ণন সংগ্রহ করিতে পারিলেই, ইতিহাস রচনার কার্য্য যথাযথরূপে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন সমাজের বিবরণ সংগ্রহ করা সেরূপ সহজসাধ্য নহে। বিশেষতঃ ইতিহাস রচনা বিষয়ে বঙ্গ সাহিত্যে, প্রচেষ্টার একান্ত অভাব। প্রাচীন সাহিত্য মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে যাহা কিছু সামাজিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা রচয়িতাগণের সমসাময়িক চিত্র বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু তাহা কতটুকু ?

তবে এ বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইলেও চলিবে না। প্রাচীন সমাজের নিখুঁত বর্ণনমূলক লিখিত প্রমাণ এখনও সন্ধান করিলে পাওয়া অসম্ভব নহে। সন্ধানী-আলো যেমন অন্ধকারের মধ্যে স্থানবিশেষকে উজ্জ্বলভাবে আলোকিত করিয়া সেই স্থানের যাবতীয় পদার্থই সুস্পষ্টরূপে গোচরীভূত করে, তেমনি এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকরণগুলিও ইতিহাসক্ষেত্রে সন্ধানী-আলোকের ন্যায় অংশবিশেষের সমুজ্জ্বল চিত্র আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়া দেয়। আমরা এইরূপ কয়েকটি উপকরণ সংগৃহীত করিয়া এইস্থলে প্রকাশিত করিতেছি।

আমাদের রতন-লাইব্রেরী পুস্তকালয়ে যে ৫/৭ হাজার প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত আছে, তাহার মধ্যে অনেক পুঁথির দপ্তরেই, পুঁথি ছাড়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজে লিখিত নানাবিধ বিষয় পরিলক্ষিত হইতেছে। পুঁথির অধিকারগণকে লিখিত বহু পত্রাবলী সেই সকল পুঁথির মধ্যে দেখিতে পাইতেছি। বহুবিধ বিচিত্র দলীল, হকীকত, একরারনামা বা স্বীকারপত্র প্রভৃতিও এই পুঁথিগুলির মধ্যে রক্ষিত আছে। এইগুলির মধ্যে অধিকাংশই সন তারিখযুক্ত, সুতরাং তাহাদের প্রাচীনত্বের

সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আমরা এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলীল, স্বীকারপত্র ইত্যাদির কথাই বলিতেছি। এইগুলি পাঠ করিলে আপনারা প্রাচীন বীরভূমের বিশিষ্ট অংশের সামাজিক চিত্র সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করিতে পারিবেন। এই হিসাবে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপিগুলির মূল্য অত্যন্ত অধিক।

দেশের তখনও শাসনকর্ত্তা ছিল, বিচারক ছিল। কিন্তু গ্রামের বিবাদ বিসম্বাদ, আপদ বিপদ এবং বহুবিধ বিষয়ের সুষ্ঠু মীমাংসা গ্রামবাসি মণ্ডল, সমাজপতি বা শাস্ত্রজ্ঞ সভাপণ্ডিত মহাশয়ই করিয়া দিতেন। গ্রামবাসিগণ তাহাই অবনত মস্তকে সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লইত। এই কথা আমাদের এই উপকরণগুলির দ্বারাই নিঃসংশয়িতরূপেই প্রমাণিত হইবে। আমরা একে একে এই সকল উপকরণগুলির প্রতিলিপি, কোনরূপ বর্ণবিন্যাসের পরিবর্ত্তন না করিয়া, যথাযথরূপেই প্রকাশিত করিলাম।

(১)

এখনকার দিনে পুত্র কন্যার বিবাহে খরচের পরিমাণ কিরূপ, তাহা ভুক্তভোগী সকলেই অবগত আছেন। তখনকার কালে দুইজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের পরিবারে শুভসম্বন্ধ বিষয়ে কিরূপ খরচ হইয়াছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত দুইটি শুভসম্বন্ধ পত্র হইতেই বিশেষরূপে জানা যাইবে।

ক) ৭ শ্রীহরি

৭ প্রজাপতয়ে নমঃ

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয়

শ্রীযুত পুরুষোত্তম বিদ্যালঙ্কার বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীলালমোহন দেবশর্ম্মণঃ শুভসম্বন্ধপত্রমিদং সন ১১৭৩ সাল অব্দে লিখনং কার্য্যনঞ্চ আগে তোমার পুত্র শ্রীগুরুপ্রসাদ দেবশর্ম্মার আমার কন্যা শ্রীমতী দাম্নী দেবীর সহিত শুভ সম্বন্ধ নির্ণয় করিলাম তাহাতে তোমার কুলমর্য্যাদা পন ১৪ তঙ্কা দিঞা লগ্নানুসারে শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিব। ইতি তাঃ ১১কার্ত্তিক ১১৭৩সাল

এতদর্থে শুভ সম্বন্ধ পত্র দিল

কুলাচার্য্যের বিদায় তুমি করিবেন।

পণ ১৪\
জায়–
দান সামগ্রী ১১\
বরযাত্র ৩\
ইহ পত্রে মধ্যস্থ শ্রীবীর চন্দ্র শর্ম্মা লগ্নানুসারে শুভকার্য্য সংপূর্ণ করিব

খ) ৭ শ্রীরাম

শ্রীশ্রীযুত রাধারমণ জী

শ্রীশ্রী প্রজপত নমঃ

শ্রী গৌরমোহন দেবশর্ম্মণঃ
সাং মুড়াগাঁ

স্বস্তীর সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত পুরুষোত্তম বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহানুভবেষূ

লিখিতং শ্রীযুত গৌরমোহন দেবশর্ম্মণে ষুভ সম্বন্ধ পত্রমিদং সন ১১৭৩ সাল অব্দে লিখন কার্য্যনঞ্চ আগে আমার কন্যা শ্রীমতী রাধামুণি দেবীর সহিত তোমার পুত্র শ্রীযুত গোবিন্দপ্রসাদ দেবশর্ম্মার সহিত ষুভ সম্বন্ধ নির্ণয় করিলাম ইহার কুলমর্য্যাদা ও দানসামগ্রী ও বরাভরণ সমেত ১॥ ডের.. দিব এই করারে ষুভ সম্বন্ধ করিলাম। লগ্ন অনুসারে কার্য্য সংপূর্ণ করিব .... এতদর্থে ষুভ সর্ম্মন্দ পত্র দিল– ইতি, সন ১১৭৩ তারিখ ২২ শ্রাবণ।

(২)

তখনকার দিনে দশ বিশখানি গ্রাম মধ্যে এক একজন সভাপণ্ডিত থাকিতেন এখনও আছেন। কিন্তু তখনকার দিনে সভাপণ্ডিতগণের আদেশ মানিয়া লোকে তাহাদের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিত। তিনিই বিধিকর্ত্তা এবং ঐহিক, পারত্রিক ও লৌকিক সর্ব্ববিধ বিষয়েই উপদেশ দান করিয়া জনসাধারণকে নিয়মিত করিতেন। তাহারাও নির্ব্বিচারে তাঁহার নিরপেক্ষবিচার মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য গ্রামবাসিগণের সাক্ষরসহ স্বীকারপত্র লিখিয়া দিতেন। এইরূপ কয়েকখানি স্বীকারপত্রও এইস্থলে প্রদত্ত হইল। প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য বিধি প্রার্থনা করিবার দুইখানি পত্র এই।

ক) ৭ শ্রী শ্রী হরি

স্মরণং

শ্রীশ্যামচরণ ঘোষ
সাং ছাতিন গ্রাম

মহামহিম শ্রীযুক্ত বিধি কর্ত্তা শ্রীনাথ ঠাকুর মহাশয়

বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীশ্যামচরণ ঘোষ কস্য হকিকত পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চআগে আমার আন্দাজী বএক্রম তিরিষ বৎস্বর হইবেক আমি আমাদ্যের ধানের জমীর ধান্য দেখিতে গিয়াছিলাম সেই জমীতে বিড়ের থাক দেওয়া ছিল থাকের মধ্যে ইন্দুর গড় করিয়াছিল সেই দেখিয়া আমি গাড়ের মাটি তুলিতেছিলাম এতমধ্যে ডাইন হস্তের মদ্যম আগুলে কামড়িয়া দিল তাহার

চিকিস্বা করাইলাম তাহাতে যুত্র থাকিল তাহার পর আন্দাজী একবৎসর পরে কর্ণ ফুলিল এবং পাএর বামপত্রের তিনটা মর্দ্দের আগুল ফুলিল কতকদিন পরে চিকিস্বা করাইলাম তাহাতে আরাম না হইয়া ঐ তিনটা আগুল লোপ পাইয়াছে ইহার পর আমার কর্ণমূল ফুলে নাই এবং গায়ে দাগ দোগ কিছুই নাই ইহাই আমার হইয়াছে ইহাই আমি জানি ইহার সয় আর কিছুই জানি না। ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিল ইতি সন ১২২৪ সাল তারিখ ২২শে পৌষ রাত্তি

ইহাতে আমার বোধ হইল আমার কুলবেআধি হইয়াছে ইহার পাচিত্তি করিব আপনকারা সাস্ত অনুসারে বেবস্থা দিতে আজ্ঞা হইবে।

ইসাদী

শ্রীগোপীনাথ ঘোষ	শ্রীগৌরহরি ঘোষ	শ্রীজগতদুর্ল্লভ ঘোষ
সাং খুজুটিপাড়া	সাং ছাতিন গাঁ	সাং ছাতিন গাঁ

খ) শ্রীরাধাকৃষ্ণ

শ্রীচরণ স্বরণ ঃ–

শ্রীশ্রীবাধামদন গোপাল জীউ শ্রীচরণ প্রসাদাৎ ভরসা মাত্র

শ্রীপদ পঙ্কজ ধ্যায়িন শ্রীগঙ্গাধর দাস দেস্য– প্রণামান্ত নিবেদনাঞ্চাদৌ– মহাশএর শ্রীচরণপদ পঙ্কজে মোলভৃঙ্গ মকরন্দ পানাসক্ত মূর্ত্তরূপে শ্রমণ করিতেছে তদর্থে অত্রাণন্দ বিশেষঃ ॥

পরন্তু নিবেদন– মম বাঞ্চা শ্রীপদাম্বুজ দর্শনাকিঞ্চন মম গ্রহ প্রযুক্ত শ্রীযুক্ত পাট দর্শন অভাব আর্ত্ত প্রীয়জন নিমিত্ত আপনকাকে পত্রলিপী করিতেছি আমার ব্যাপার আদি কর্ম্ম বড় অপ্রতুল হইয়াছে— তুরনির্মির্ও মহাসয় এ ভির্ত্তের প্রীতি সদয় হৈয়া জীউ শ্রীচরণে এক হাজার তুলসি অর্পন করিতে আজ্ঞা হৈবেক— অতএব চাল্য সন্দেশ রস্তার দাম ॥০ অষ্ট আনা পাঠাই দক্ষিণা পরে পাঠাইব– এ ভির্ত্তের প্রীতি অনুগ্রহ করিবেন জাহাতে আমিহ রক্ষা পাই এমৎ করিতে আজ্ঞা হইবেক– আমীহ জিবৎ মির্ত্তু হৈয়া আছি ব্যবসা বানুজ্য যাহাতে ভালরূপে চলে এমত করিতে আজ্ঞা হৈবেক গতাআতের দ্ব্যারায় শ্রীপাঠের কুশল লিখিতে আজ্ঞা হৈবেক– আমার রাসি নাম – শ্রীমধুসূদন দাস দে গঙ্গাধর দে হইলাম সঙ্কল্প করিতে আজ্ঞা হইবেক– কাস্যপ গোত্র ইহা শ্রীচরণে নিবেদন তাঃ- ২৫পৌষ ১২৩১ সাল।

(৩)

গ্রামে যে সকল চরিত্র-ঘটিত অপবাদ রটনা হইত, সে সকল ক্ষেত্রে অপরাধিগণের সহজে নিস্তার ছিল না। তৎসংক্রান্ত প্রায়শ্চিত্তের বিধি গ্রহণ করিতে হইত এবং তথাকথিত অপরাধী যে সে প্রকৃত অপরাধী নহে, তদ্বিষয়ে সভাপণ্ডিতের নিকট নিজের ও সাক্ষিগণের স্বাক্ষরযুক্ত স্বীকারপত্র লিখিয়া না দিলে তাহার নিষ্কৃতি ছিল না। সভাপণ্ডিতের নিকট লিখিত এইরূপ চারিখানি পত্রের লিপি এইস্থলে প্রদত্ত হইল—

ক) শ্রীকৃষ্ণ

সন ১২৩০।-

শ্রীকৃষ্ণ মদক
সাং বাইতাড়া

মহামহিম শ্রীযুত সভাপণ্ডীত
ঠাকুর মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণ মদক

কস্য হকীকত পত্র মিদং লিখিনং কার্য্যনঞ্চাগে মৌজে বাইতাড়া পরগণে আজমতসাহী মৌজে মজকুরে আমার বসত আমার ভাত্রি বধু বিদবা আমার বাটীতে আমার সহিত এক অর্ন্যে ছিল। ঐ বধুর সহিত কখন দুষ্ট জনরব হইয়াছিল কিন্তু গামস্ত লোকে অনেক মত তদারক করিলেক একথা সাবুদ হইল না আমি এ কর্ম্ম করি নাই ঐ দুষ্ট বাক্য জনরব হইয়াছে এমতে আমি আপন খুসীতে হকীকত লিখিয়া দিতেছি জনরব দুষ্ট বাক্যের সাস্তানুসারে প্রার্ছিত্তের বিধি দিতে আজ্ঞা হয়। আমি গ্রামস্ত লোক লইয়া এদাএ উদ্ধার হই আর ঐ বিদবা বধুকে আপন ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছি। এতদর্থে হকিকত পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩০ সাল ১৩ই (ছেঁড়া)

ইসাদী

শ্রীনবকুমার ঘোষ	শ্রীমানিকচন্দ্র সরকার	শ্রীবাস সরকার
সাং বাইতাড়া	সাং বাইতাড়া	সাং বাইতাড়া

খ) ওঁশ্রীশ্রীকৃষ্ণ

প্রতলকর্ত্তা

শ্রীনফর দে মদক
সাং সেহালা
তরফে হাজরাপাড়া

মহামহিম শ্রীযুৎ সভাপণ্ডিত
ঠাকুর মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীনফর দে মদক

কস্য হকীকত পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে— আজমৎসাহী পরগণার মধ্যে মৌজে সেহেলা গ্রামে আমার বিধবা কন্যা শ্রীজয়-মুনি আমার বাটীতে এক অন্নে ছিল এক্ষনে ঐ সাকীমের শ্রীসোনাতন মদক সহিত জনরব হইআ ঐ সোনাতনের বাটীতে আছে আহার বেবহার বেআন্দাজ করিতেছে সাস্ত্র যুক্তিদ্বারা দুষ্টবেবহার দেখিয়া ঐ জয়মুনিকে ত্যাগ করিয়া পাত্রছিতি করিতে উদ্যত হইয়া আছি মহাশঅ সভাপণ্ডিত সাস্ত অনুসারে বেবস্তা দিতে আজ্ঞা হয় ইতি সন ১২৩১ সাল তারিখ ২৭ জৈইষ্ঠী।

ইসাদী

শ্রীনফরচন্দ্র ঘোষ	শ্রীহীরাধোন মদক	শ্রীসুদাম নাগ
সাং বাইতাড়া	সাং সেহালা	সাং নর্ম্মদা
শ্রীনীলাচল মদক	শ্রীকানাই মদক	শ্রীষুখময় মদক
সাং খুজুটিপাড়া	সাং ব্রাহ্মণখণ্ড	সাং গেলে
শ্রী পাঁচু মদক		
সাং খুজুটিপাড়া		

গ)　　　　　　　　ওঁশ্রীশ্রীহরি

শ্রীহারাধন পাল
সাং খুজুটিপাড়া

মহামহিম শ্রীযুত শ্রীকান্ত ঠাকুর

সাসনৈক ভট্টচার্য্য মহাসয় বরাবরেষু—

লিখিতং, শ্রীহারাধন পাল কস্য হকীগত পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে— আজমতসাহি পরগনার মৌজে খুজুটিপাড়া গ্রামে আমার বষ-বাষ — আমার ভগ্নী যুগী সংসর্গ হইয়া আমার কাছ হইতে গিয়াছে অতএব হকীগত লিখিয়া দিতেছি— মহাশয় বেবস্তা কর্ত্তা বেবস্তা দিতে আজ্ঞা হইবেক- – এতদর্থে হকীগত পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৪১সাল তাঃ ২৭ কার্ত্তিক,।

ইসাদ

শ্রীরামনন্দ সরকার	শ্রীরামভদ্র পাল	শ্রীকোমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী
সাং সামুখ	সাং সামুখ	সাং খুজুটিপাড়া
শ্রীহারাধন পাল	শ্রীসখাচরণ লাহা	শ্রীশ্রীরাম চক্রবর্ত্তী
সাং ষামুখ	সাং সামুখ	শ্রীউমাচরণ চক্রবর্ত্তী
শ্রীকৃষ্ণ পাল	শ্রীবিশ্বম্ভর মিত্র	শ্রীখুদিরাম ঘোষাল
সাং সামুখ	সাং সামুখ	সাং সামুখ
শ্রীদিননাথ দেআসি		শ্রীগদাধর মণ্ডল
সাং খুজুটিপাড়া		সাং সামুখ

ঘ)　　　　　　　　৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

পরম পূজনীয় শ্রীযুত প্রাণবল্লভ (ছেঁড়া)

মহাশয় সমীপেষু

লিখিতং শ্রীসাকীন নবস্তা নিবাসীদিগের হকীগত পত্র মিদং কার্জনঞ্চ আগে আমাদিগের নিবেদন মৌজে উক্ত গ্রাম নিবাসী সাকী ধৈয়া..... ঘটনা উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীরসময় ঘোষ সহিত হওয়াতে গ্রাম হইতে বাহির হইয়া জায়— তাহাতে আমাদের গ্রাম দিগর মণ্ডল ও গোমস্তা সহিত এবং চউকীদার আমায় এতেলা করিবাতে থানা বরকোন্দ দাস আসীয়া.. . দারগার নিকট অর্ন্ন বস্তর সইকার করিয়া লইআছে আমরা নাপিত পুরোহিত গো পেসা সকলি আটক করিয়াছি কিছুদিন মধ্যে সাং বামনখণ্ড নিবাসী শ্রীজগমোহন চৌকীদারের নিকট শ্রীশ্রী ঁভেক লইয়াছেন লইয়া গ্রামে আসিয়া . . ... সহিত ঘর দুয়ার করায় একঅর্ন্নে থাকে এমনটা আমরা দিষ্ট করিয়াছি এরূপ খারু হস্তে দেখা দিষ্টি প্রমাণ কিন্তু বষ্ণবের পক্ষে দোষ নাই-ইহাতে কীমত বেবস্তা দেন শ্রীযুত বিধি কর্ত্তা মহাশয়... দেখায় যেমত হয় হকীকত পাঠালাম ইতি সন ১২৬০ সাল তারিখ ১২ই জ্যৈষ্ঠ,

শ্রীবেণী ঘোষ	শ্রীভাগবত সাধু	শ্রীযুত মধুসূদন সাধু	শ্রীমাণিক ঘোষ
শ্রীরামচন্দ্র পাল	শ্রীরাইচরণ সাধু	শ্রীরামসুন্দর মণ্ডল	শ্রীজদু পাল
শ্রীদীনু পাল	সাং নবস্তা	শ্রীরামেশ্বর মণ্ডল	শ্রীচন্দ্রলাহা
শ্রীযুভন পাল	শ্রীশিতল পাল ও নফর পাল সর্ব্ব সাকিম নবস্তা		
		শ্রীগদাই পাল	শ্রীকেনারাম পাল
		শ্রীবিন্দাবোন পাল	শ্রীজয়রাম পাল

(৪)

বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে সভাপণ্ডিতগণের ব্যবস্থা কি ভাবে সম্মানিত হইত, তাহা এই পত্রখানি হইতে বুঝা যায়

৭ শ্রীশ্রীহরি
স্বহায়

শ্রীগঙ্গাচরণ নাগ
শ্রীনিবাস নাগ
শ্রীচন্দ্রমোহন নাগ
শ্রীদ্বারিকা নাথ নাগ
শ্রীসুরধুণী দাস্যা
সর্ব্ব সাকিম মড্ডা

মহামহিম শ্রীযুক্তয়সেষ সান্ত অধ্যাপক
মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীগঙ্গাধর নাগ ও শ্রীনিবাষ নাগ ও ৺গৌর নাগের পুত্র চন্দ্রমোহন নাগ ও ৺ক্ষেত্রনাথ নাগ ইহার পরিজন নাম ষুরধুণী দাস্যা ও দ্বারিকা নাথ নাগ কস্য হকিকত পত্র মিদং কার্য্যণঞ্চাগে আজমতসাহী পরগণে মৌজা মড্ডা আমাদের বাসস্তল আমি গঙ্গাধর নাগ শ্রীনিবাস নাগ আমি চন্দ্রমোহন নাগ আমার পিতা ৺গৌর নাগ আমরা ৺অদ্বৈত নাগের প্রথম পক্ষের সন্তান আমি দ্বারিকানাথ নাগ আমি ষুরধুণী দাস্যা আমার সামী ৺ক্ষেত্র নাথ নাগ আমরা দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান আমরা একয়ন্নে এক কারবারে থাকিয়া আমি ষুরধুণী দাস্যা আমার ষ্যামী ৺ক্ষেত্রনাথ নাগ ৺গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়— তাহার পর আমার কর্ন্নের বিবাহ দেই এখন ভাত্রি বিরদ হৈয়াছে–আমরা সকলে সাস্তমান্য করিয়াছি সাস্তয়নুসারে কি মত অংশ ধার্য্য হয় অনুপূর্ব্বক বেবস্তা দিতে আজ্ঞা হয়— ইতি ১৮ আষাঢ়,

(৫)

তীর্থ করিতে গিয়া অর্থাভাব ঘটিলে পাণ্ডাদের নিকট ঋণ গ্রহণ করিবার একখানি খতপত্র এই—

সাক্ষী
শ্রীশ্রী ৺গদাধর
গয়া—

নিসান সহি
শ্রীগৌরিমণি দেব্যা
সাং খুড্ডীপাড়া
পং আজমতসাহি
চাকলে বর্দ্ধমান

মহামহিম শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম সেন কয়াল ঠাকুর চরণেষু

লিখিতং শ্রীগৌরমণি দেব্যা।–কর্জ্জখত পত্র মিদং কার্য্যাঞ্চাআগে আমি আমি শ্রীশ্রী ৺তীর্থে আসিয়া পিতৃকার্য্য করিয়াছি তাহার দক্ষিণা দান সমেত ২০ কুড়ি টাকা খত মহাজনকে দিলাম এই খত লইয়া মহাশয়ের লোক জখন আমার বাটী জাইবেক তখন এ খতের টাকা শোদ দিয়া খত খালাষ করিব–এতদর্থে খত পত্র দিলাম ইতী সন ১২০৭ বারসও সাত সাল আখিরি তেরিষ ৩০ ত্রিষা চৈত্র,

(৬)

শিষ্য বিভাগ লইয়া গুরুবংশীয়গণের মধ্যে বিবাদ হইলে শিষ্যগণের কিরূপ বিপর্য্যস্ত হয়, তাহার নিদর্শন এই পত্র হইতেই বুঝিতে পারা যায়--

৭ শ্রীহরি
ঠাকুর পুত্র

শ্রীদুর্গাঠাকুর
মহাশয় এস্থাতে
আগমন করিয়া
বিহান করিবেন ইতি

তুল্যাভাষঃ শ্রীশ্যামসুন্দর শর্ম্মণঃ দণ্ডবৎ প্রণামা বহব নিবেদনঞ্চ আগে শ্রীচরণ শুভানুধ্যান করনেই এজনার অহিক পারর্থিক মঙ্গলবিশেষ, এখানকার সমাচার সকল সুগোচর আছে শ্রীযুক্ত ঠাকুর পুত্র মহাশয় উষ্মা করিয়া শ্রীযুক্ত বসুধাকে পত্র লিখিয়াছেন তাহা সেই লিখনের নকলে বেদ্য হইবেন এমত ধারা প্রভুদিগের ছিল না এখন আপনাদিগের ভাগ্যেই করে ঘরে ঘরে বিবাদ করিয়া তাহার অবধি না করিয়া শিস্যগণকে পিড়া দেওয়া উচিত হয় না এখন এই হইল চারা কি আমার উভয়পক্ষে কথা কহিতেই দোষ— অতঃপর শিষ্যের দফা আপনারা ন্যায়ত বিবাদ মিটাইয়া জে কর্ত্তব্য করিবাই উচিত তবে এখানকার ভাল তাহা না করেন আমরা কি কহিব জেমত রাখেন তেমতে থাকিব কিন্তু প্রভুদিগের একথা লোক দ্বারে বিক্ষ্যাত হইবেক সে কথা যুনিতে হইলেও দোষ ফলতো এই হইল চারা কি আমি কিছুরমধ্যে নক্রি অথচ ঠেকিতে হয় আপনারা সকল বৈদ্য যাহাতে আমি এ দায় খালাস হই ইহা প্রভুর কর্ত্তব্য। জাবত অনুগ্রহ পত্র না আসিয়াছে তাবত এইরূপ থাকিতে হইল–ইহাবুঝে ˘ বিবাধ করিবা হবেক। ইহার নিদান প্রভু জানিলে হইত না এখন চির্ত্তবাদ কেন হইবেক— ব্রাহ্মণ শিশ্য কলঙ্কিত হইলে অন্য লোক কি কহিবে–বিবাদ দূর করিয়া চিত্ত প্রসন্ন হইবেক জেন আমরা খালাষ হই না করিলে আপনার..... যাইব শ্রীযুক্ত রামনাথ মাজখণ্ডে জাইতেছেন সাক্ষাতে নিবেদন করিবেন জেয়াদা কাহাতক লিখিব॥ মরমক বেদন মরমহি যানত– ইহা নিবেদন করিলাম ইতি ২০ কার্ত্তিক

(৭)

শতাধিক বর্ষপূর্ব্বে দান বিক্রয় ও পোষ্য পুত্র গ্রহণের দুইখানি দলীলের অনুলিপি এই স্থানে প্রদত্ত হইল—

II
STAMP OFFICE

ক) ৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণ

পরম পূজনীয় শ্রীযুৎ গুরুপ্রসাদ ঠাকুর পুত্র মহাশয়, বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীমতী বিমলামুণি দেব্যা কস্যপত্র মিদং কার্যনঞ্চাআগে মৌজে পালিগ্রাম পরগণে আজমতসাহী মৌজে মজকুরের মধ্যে আমার হিস্যা ব্রহ্মত্রর বসত বাটী ও জমী ও গ্রাম হাএর জে জে জমী ও বাগাত ও পুস্কর্ণী আছে তাহা আমি সইচ্ছাপূর্ব্বক আপন খুসিতে আমার স্বামী এবং আমার সর্গার্থে আপনকাকে দান করিলাম দান করিয়া দানপত্র লিখিয়া দিলাম—আপনি ব্রহ্মত্রর বাটী ও জমী ও পুস্কর্ণী ও বাগাত মায় বিক্ষাদি নিচের তপসীল মাফিক

পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবেন—আমি কিম্বা আমার ওয়ারিসান কেহ কোন কালে দাওকরে ও করি সে ঝুটা ও বাতিল ও নামঞ্জুর এতদর্থে আপন খুসিতে সশ্চন্দ শরীরে প্রাণ পূর্ব্বকে হুলবাহাতে দানপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২১৬ সাল তারিখ ৯আশ্বিন

খাজনা আমরা

Treasury

অপর পৃষ্ঠা ইংরাজী সহি

শ্রীনন্দকুমার মিত্র সন ১৮০৯ সাল ১৭ সেতেম্বর

খ) শ্রীষ্ণ সন ১২২৩।-

সস্তি সকল মঙ্গলালয় লিখিতং শ্রীগুরুপ্রসাদ দেবশর্ম্মা

শ্রীকমলাকান্ত ঠাকুর ও শ্রীছিদামমুনি দেব্বা

কস্য পুশ্ব পুত্র পত্রলিখনং কার্য্যনঞ্চআগে–মোজে খুজুটিপাড়া পরগণে আজমতসাহী মোজে মজকুরের মধ্যে আমার্দ্দের বসবাষ আমার্দ্দের সন্তান সনতথী নাই এমতে তুমি আমাদের ভাতসপুত্র তোমাকে তিন মাসের সন্তান লইয়া দুইজনাতে পিতিপালন করিয়া তোমার অন্নপ্রাষণ ও জজ্ঞপবীত সমুষকারাদি করিআ সিষ্য করিআ আপন পুত্র বলিআ আপন গাদীতে বান্দিয়াছি আমার্দ্দের পিতাকুলের যে সব বিত্রাদি জমী ও বাউস্তুবাটী ও স্থাবর আদি ও পুস্কন্নির হিস্যা ও শ্রী ঁসেবাত সেব্বা ও সপাজ্জিত বিত্রাদি জেখানে জে আছে তাহা সকলে দখল দেলাই আছি পূর্ব্বে কিছু লিখিতে পড়িতে হয় নাই—এক্ষানে আমরা উভএ তোমাকে আমার্দ্দের হিস্যায় বিত্রী ও সপার্জ্জিত ও পৈত্রিক সকল বিত্রী জেখানে জে আছে তাহা লিখিআ দিলাম আমার্দ্দের শ্রী ঁপ্রাপ্তি হইলে পরে উত্তাদিকীআ ও মহছব আদি করিআ আমার্দ্দের গদিতে থাকীআ হিস্যামাফিক শ্রী ঁসেবা করিআ ঘর গেরস্তালি ও আমার্দ্দের ঐসব বিত্রাদি দখল করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করহ-তাহাতে কোন আপত্র নাই আমরা কিম্বা আমার্দ্দের উত্তআরিষ আপ কেহ কখন দাওয়া করি কিম্বা করে সে নামঞ্জুর ও বাতিল এতদর্থে আপন আপখুসীতে পুস্বপুত্র পত্র লিখীআ দিলাম ইতী সন ১২২৩সাল তাঃ ২ভাদ্র

(৮)

তখন এক একখানি পুঁথি নকলকরা সহজ ছিল না, সেইজন্য হারাইয়া বা নষ্ট হইয়া যাইবার ভয়ে সহজে কেহ কাহাকেও পুঁথি দিতে চাহিত না। পুঁথি গ্রহণ করিতে হইলে কিভাবে স্বীকার পত্র লিখিয়া দিতে হইত, তাহার নিদর্শন স্বরূপ দুইখানি পত্র এইস্থলে প্রদত্ত হইল—

ক) ৭ শ্রীশ্রীরাম

সহায়

শ্রীমুকুন্দমঞ্জরী ঠাকুর জীউ

লিখিতং শ্রীমাণিকচন্দ্র দেবশর্ম্মা

একরার পত্রমিদং সন ১২১৫ পন্দর সাল লিখনং কার্য্যঞ্চাগে সন ১২০৫ সাল আমার শ্রীযুক্ত ঠাকুর আপকারা স্থানে হইতে পুঁথি লইয়া আসীয়াছিলেন সন ১২১৩ সালে সেই পুঁথি

নওবাজার মোকামে পাঠ করিয়া এখানে ছিল– সেই সঙ্গে সে পুঁথি লইয়া সহরে সেবক বাটীতে রাখিয়াছি প্রবাষ করিয়া জাইবারকালে সহর হইতে পুঁথি লইয়া আপনার নিকট দিবে এবার পুঁথি না দেই এবার খিলাপ করি আপনি জে দাওা করেন তাহা বেওজার নিসা করিবো এতদর্থে একরার পত্র দীলাম– ইতি তারিখ ২০বৈশাখ

ইসাদী

৭ শ্রীগুরুপ্রসাদ দেবশর্ম্মা
শাং শামুখ
৭ শ্রীগউরমোহন দেবশর্ম্মা
সাং নাসিগ্রাম
শ্রীজয়দেব দাস
সাং সামুখ

শ্রীবদনচন্দ্র দাস
সাং সামুখ
শ্রীনীলাচল বহর
সাং সামুঁখ

খ) ৺৭ শ্রীশ্রীহরি
শরণং

শ্রীভাগবৎ

পরম সুভাশীর্ব্বাদ লিখনং বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তুমার মঙ্গল শদা সর্ব্বদা শ্রী৺স্থানের বাঞ্ছা করিতেছি তাহাতে আত্মানন্দ হয় বিশেষ পরে লিখি যে তুমার নিকট শ্রীগৌরমুনি বষ্ণবকে পাঠাই। এই লোক সমিস্তারে ৺চূর্ণক কথা ইহাকে দিবে আর শ্রীরাম ঠাকুরের ছড়া জন্ম হইতে শেষ পর্য্যন্ত জাহা আছে তাহা এই পুস্তকে পাঠাইবে ইহাতে কুন সন্দেহ করিবে না আমি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করি আছি এখানে সকলি অর্জ্জন মিছির চূর্ণক ইহাকে গ্রাহ্য হয় না তোয়ার পুস্তক দেখিয়া লিখিব লেখা হইলেই পুনর্বার বাটি পহুছিবে আর কি লিখিব যদি পুস্তক না আইসে তবে লেখা রহিল এখানকার সকলে ভাল আছেন তথাকার মঙ্গল জানাইবে ইতি সন ১২৫৯সাল তাং ২৮ অগ্রহায়ণ–

অপর পৃষ্ঠা

পরম কল্যাণবর শ্রীযুক্ত মহানন্দ দেবশর্ম্মা চিরজীবেষু
চলিত পত্র গৌর বাজার হইতে খুজুটিপাড়া পুঁহুছে

(৯)

পুঁথি সংক্রান্ত এইরূপ একটি পত্রে বর্গীহাঙ্গামার কথা উল্লেক আছে। ১৭৪২-৪৫ খৃষ্টাব্দে দেশে যখন বর্গীহাঙ্গামা চলিতেছিল, এই পত্রখানি সেই সময়ের লেখা—

শ্রীশ্রীগদাধর প্রাণনাথ

ভৃত্যাভাস শ্রীবৃন্দাবনবিহারী দাসস্য

ভূমৌনিপত্য দণ্ডবৎ প্রণতী নামান নিবদনঞ্চ শ্রীচরণ কৃপাতে এজনের সমস্ত মঙ্গল বিশেষঃ। আজ্ঞাপত্রী পাইয়া শিরোধার্য্য করিয়া সাবধানে জ্ঞাত হইলাঙ আপনে নিরুদ্বেগে পার

হইয়াছেন এ সম্বাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাঙ বর্গীর সম্বাদ সম্প্রতি নিষ্কর্ষ লেখা জায়না চৈত্রের পর নিশ্চয় সম্বাদ লিখিব সেখানকার মঙ্গলাদি সর্ব্বদা লিখিতে আজ্ঞা হইবেক শ্রীশ্রী৺কারণ আবীর ও ফুলেল ও ২ দুই টাকা খরচ পাঠাই পৌচিবেক নিবেদন মিতি তাং ১৫ ফাল্গুন চরণ নিবেদন পত্রে অবধান হইবেক সর্ব্বদা শ্রী৺ধ্যানে কাল কাটিতেছি নিবেদনমিতি

পুনশ্চ শ্রীশ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর স্বাক্ষর দশম পাঠাইবেন তবে লেখা হবেক নত্তবা লেখা আটক হইল অবশ্য অবশ্য পাঠাইবেন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্লোকে টীকা করিয়াছেন আমাকে দেখাইলেন না বক্রী শ্লোকের টীকা করিয়া পাঠাইবেন ইতি।

অপর পৃষ্ঠা

ইং ভৃত্য শ্রীউদয়রাম শর্ম্মণঃ প্রণাম নিবেদনঞ্চ বিশেষঞ্চ মূলপত্রে অবধান হইবেক সদামঙ্গলাদি লিখিতে আজ্ঞা হইবেক বড় নগরের বিদায় হস্তবশ হয় নাই পশ্চাৎ পাঠাইব নিবেদনমিতি।

সমাচার মূলপত্রে অবগত হইবেন আপনি শ্রীভাগবত অধ্যয়ন করিতেছেন ইহাতে বড়ই আনন্দ পাইলাম সর্ব্বদা ব্যবসায় করিবেন নিবেদন ইতি ইং ভৃত্যাভাস শ্রীগঙ্গারাম শর্ম্মণশ্চ প্রণতীনামানস্ত্যং নিবেদন শ্রীচরণ কৃপাতে এ ভৃত্যের সমস্ত মঙ্গল ইং ভৃত্য শ্রীআনন্দীরাম দাসস্য দণ্ডবৎ প্রণতী নামন্তং সমাচার মূলপত্রে গোচর হইবেন ভৃত্য প্রতি কৃপা করিবেন নিবদনমিতি।

ইং ভৃত্য স্ত্রী (ছেঁড়া) রামশর্ম্ম শ্রীব্রজানন্দ শর্ম্মণোশ্চ প্রণতীনামন্ত্যং নিবেদনঞ্চ এখানকার সমাচার মূলপত্রে অবগত হইবেক ভৃত্য প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন নিবেদনমিতি

ইং পরম পূজনীয়
শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম বিদ্যালঙ্কার
মহাশয় চরণেষু শ্রীবৃন্দাবন
বিহারী দাসস্য প্রণতীনাং

(১০)

বিবিধ বৈষয়িক ব্যাপার সংক্রান্ত চারিখানি দলীল এই—

ক)

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা

মহামহীম শ্রীযুক্ত জেলা বর্দ্ধমানের দেওয়ানী আদালতের ভট্টাচার্য্য মহাশয় বরাবরেষু

পরগণে আজমৎসাহী মৌজে শামুক গ্রামের শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ শর্ম্মার হকীগত পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে পরগণে সেনপাহাড়ী মৌজে অমরপুর গ্রামের শ্রীগোলাম বাঘ আমার শিষ্য তাহার ব্রহ্মত্তর জমী ঐ সেনপাহাড়ী ও সেরগড় ও গোপভূমি এই তিন পরগণাতে ২২/০ বাইষ বিঘ্যা আছে ঐ বাঘ মজকুর অবর্ত্তমান হইলে পর তাহার ব্রাহ্মনি শ্রীমতী

শ্রীদুর্গাজয়তি
শ্রীদুর্গাদাস শর্ম্মনাং
পত্রো সংস্থ সংক্রান্তপতি স্বাবরাদি
যত্রে গুরবে দত্তং তত্রভ
গৌরাঙ্গিকাস্তে
নম্রানাধিকারিতঙ্কস্ত দান
স্মৃতি গৃহীত বিদুষাং পরামর্শঃ

গোবিন্দমুনি দেবী আমাকে খোস বেজাতে সইচ্ছাপূর্ব্বকে সামীরসর্গার্থে এই বাইষ বিঘা জমী ইমসন দান করিয়া দানপত্র লেখিয়া দিলেক এবং আমার সমিভ্যাবিত গ্রাম গ্রাম জাইয়া জোদ্দারর্দ্দে পাস দেলাইয়া দিলেন এবং জোদ্দারদিগ্যে কহিয়া দিলেন জে শ্রীঠাকুর মহাশয়কে এই সকল জমীর খাজনা সন সন দিবে আমার সহীতে বিশয় নাঞী এক্ষণে আমার ঐ দানের জমী ২২/০ বিঘার মধ্যে ঐ শ্রীমতী গোবিন্দমুনীর সখুড়ী খানখা করিয়া আপন ভ্রাতার জামাতে ৮/০ আট বিঘ্যা লিখিয়া দিয়াছে— অতএব মহাশয় শাস্ত্রজ্ঞ শাস্ত্রানুসারে কার অধিকার হয় ইহার ব্যবস্থা দিতে আজ্ঞা হয় ইতি সন ১২০৬ সাল তারিখ ১৫ পনরঞী ফাল্গুন

খ) শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ

(পার্শী অক্ষরে সহি)

পরগণে আজমতসাহির সিকদার--

এতহসিলদার সদ্দার চরিতেষু লিখনং কার্য্যনঞ্চাআগে—

শ্রী পুরুষোত্তম বিদ্যালঙ্কার এগয়রহ নালিশ করিয়া সামুকগ্রামে ইহাদিগের বির্ত্তে আছে যে জমী নিজ জোত করিয়া থাকেন তাহার ফসল খামারে বান্ধিয়া থাকেন ভাগ দিবেক ফসল বাটীতে লইয়া গিআ থাকেন তবে সদর তলব জে হইয়াছে সেই হার মাফিক কতিদিবেক প্রজস্তা হাসিল জমী হালে পতিত হইয়া থাকে তলবী ওয়াকাই করিয়া গোমস্তার ফর্দ্দ দস্তখতি করিয়া পাঠাইবে বিত্তিয়ালাকে তলব না করিবে পুনশ্চ নালিশ পোহুছে ইতি সন ১১৭০ সাল তা ৩০ফাল্গুন

জায় আসামী—

নিজ বিদ্যালঙ্কার ১
কীনুরাম সিদ্ধান্ত ১
উদয়রাম শর্ম্মা ১
বীরসিংহ মুখোপাধ্যায় ১

বন্দী আচার্য্য ১
রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ১
ফকীর চট্টোপাধ্যায় ১
নন্দ ঠাকুর ১

৭ জন আসামী

গ) ৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সরনঃ—

শ্রীবীরুআলদার সাং সামুক নিসান সহি ॥

মহামহিম জেলা বীরভোমের শ্রীযুক্ত মেজষ্টর সাহেব

বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীবীরু আলদার কস্য একরার পত্রমিদং কাজ্যনঞ্চআগে মোজে সামুক পরগণে আজমৎসাই মোজে মজকুরের মধ্যে নিপাবান চাকর পাঁচজন তাহার মধ্যে হারা ডোম চৌকীতে হাজির নাই এবং হাকীমানের কাজে রজু না থাকাতে তোমরা ষোল আনা গ্রামের প্রজাতে চাকরীতে নারাজ হইয়া তাহাতে চাকরীতে বরতরফ করিয়া আমাকে সেই চাকরীতে সেই মোটে বহাল করিলেন আমিহ বাহাল হইলাম আমীহ বরঞ্চ চৌকীতে হাজীর থাকিয়া এবং হাকীমানের যে সকল কার্জ্য জখন যে হইবেক মাফিক আইন কার্য্য করিব এবং সীমানা সব জেখানে জে আছে তাহা খুব হুষআরীতে মাফিক আইন কার্জ্য করিব ইহাতে কোন বাবুতে খতবা হয় মাফিক আইন আমলে আনিব এতদর্থে

আপন খুসিতে বাহুষবাহাল তরিয়তে একরার পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২১৯ সাল তাঃ ২৫ বৈশাখ

ইসাদ

শ্রীবদন আলদার
সাং সামুক

শ্রীপ্রাসাদ আলদার
সাং সামুক

শ্রীমহন আলদার
সাং সামুক

ঘ) ৭ শ্রীশ্রীহরি

ওয়াদী কীর্দ্দ সাধ শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস ষুছরিতেষূ—

খাতক শ্রীরাম বল্লভ দাষ—কস্য কর্জ্জ পত্রমিদং সন ১১৯৫ সাল আখেরি লিখনং কার্য্যনঞ্চ আগে আমি তোমার স্থানে সিক্কা ১০ দস তঙ্কা কর্জ্জ করিলাম—ইহার ষুদ ফি তঙ্কে ৵১০ অর্দ্ধ আনা করিআ ওয়াদা মাহ আশ্বিনে ষুদ সমেত পরিশোধ করি——জদি এওয়াদাতে নাদীতে পারি তবে পৌষের উর্চ্চ মধ্যে ষুদ সমেত ধান্য দিয়া পরিশোধ করিব এতদর্থে করজ খত পত্র দিল ইতি তারিখ ১৫ পোনরই আশ্বিন

শ্রীরাম বল্লভ দাস
সাং মসলকোট

সহি শ্রীলাল মোহন শর্ম্মা
আমিহ ইহার খাস জাবিন
হইলাম—ইহ করার মাফিক না দেন
আমি নিজে দিব ইতি

(১১)

কন্যা বা শুক্র-বিক্রয়, তখনকার দিনে কিরূপ প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল, তাহার নিদর্শনস্বরূপ এই 'শুভ-সম্বন্ধ পত্র' খানি প্রকাশিত হইল। সেকালের ৩৫১ টাকা সামান্য গণ্য করা চলে না। মেয়ের বয়স হিসাবে, অর্থাৎ যত বৎসরের মেয়ে ততগুণ ২০, ৩০ বা ৫০ টাকা হিসাবে, এই টাকার পরিমাণ নির্ণীত হইত।

ওঁ প্রজাপতয়ে নম—

শ্রীভাগবৎ চন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়
সাং কুলাড়া

স্বস্তি সকল মঙ্গালয় কন্যাকতা শ্রীযুত য়দ্বৈত চন্দ্র অধিকারি বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীভাগবৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কস্য শুভ সম্বন্ধ নীর্ন্নয় পত্রমিদং—

সন ১২৩৬ সাল লিখনং কার্য্যনঞ্চ আগে আপনার কন্যা শ্রীমতী সহচরি দেবীর সহিত আমার পূত্র শ্রীমান চন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত শুভ সম্বন্ধ স্থির করিলাম— ইহার পণ সবে আমী আপানকাকে ৩৫১ তিন সত্ত একান্য টকা দেনা হইলাম এই কথা স্থির হইয়া শুভ সম্বন্ধ স্থির করিলাম—বিবাহে পূর্ব্ব বিঃ তপসিল কথক টকা দিব সওয়ায় বেবাক টাকা বিবাহকালে দিব আর নগ্নানুসারে উভয় সনমত রাজক দৈব বাদে কন্যা সম্প্রদান করিবে ˚ না

করেন কোন রাজক দৈব হয় যদি হয় তবে আমি উপরকার লিখিত পন বাহার মধ্যে বিঃ তপসিল যে টাকা দিতে তাহা ফিরিয়া লইব ইহাতে কোন বয়স্ত(?) নাই— এতদর্থে শুভ সম্বন্ধ স্থির করিয়া শুভ পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি ১২৩৬ সাল ১৩ বৈশাখ

এই পত্রে লিখিতং শ্রীভাগবৎচন্দ্র অধিকারী আমরা এই পত্রে শুভ সম্বন্ধে মধ্যস্থ হইলাম নগ্নানুসারে শুভকার্য্য সমাপন করাইয়া দিব যদিষ্যৎ কার্য্য সমাপন করাইয়া দিতে না পারি তবে যে টাকা বরকর্ত্তা স্থানে তোমাকে যে টাকা দেয়াইতেছি তাহা তোমাকে ফিরিয়া দিতে হইবেক ইতি সন ১২৩৬সাল তারিখ ১৩ বৈশাখ

শ্রীভাগবৎ চন্দ্র অধিকারী
শ্রীভারতচন্দ্র অধিকারী
সাং আইমাপুর

জের— উপরকার লিখিৎ পনবাহা মবলকে ৩৫১ তিনসত্ত একান্ন

ওয়াসীন নিজ খোদ	৩৫	
	৩১৬	

ইসাদি
শ্রীকৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য
সাং বৈদ্যটিকুরি
শ্রীধর্ম্মরূপ অধিকারী
সাং আইমাপুর
শ্রীরামকুমার গুপ্ত
সং আইমাপুর
শ্রীরামমোহন (ছেঁড়া)
সাং মাহতা

এই সকল নিদর্শন হইতে সামাজিক বা ঐতিহাসিক উপকরণ ব্যতীত আর একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে এগুলি প্রাচীন গদ্য-সাহিত্যের নিদর্শণ স্বরূপ রক্ষিত হইবার যোগ্য।

* দ্রষ্টব্য— এই অধ্যায়ের উপকরণ আমাদের রতন লাইব্রেরীতে রক্ষিত প্রচীন পুঁথি হইতে সঙ্কলিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বীরভূমির প্রাচীন গ্রাম্য-গীতিকা

ভাবই মূল, ভাবই জগতের রাজা, ভাবের ইঙ্গিতেই সমগ্র জগৎ পরিচালিত। ভাব ব্যক্তি, জাতি, কাল বা দেশ বিশেষের নিজস্ব নহে। প্রকৃত ভাব সমগ্র বিশ্ব-বাসীর সমভাবে গ্রহণীয়; তাই প্রকৃত ভাবুক, প্রকৃত কবি, দেশ বা কালবিশেষের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে।

ভাষা ভাবের বাহক মাত্র। ভাষা যে দেশের যেমনই হউক না কেন, তাহার দ্বারা যে ভাব প্রকটিত হইয়াছে বিশ্ববাসীর তাহাই লইয়া কারবার। সুতরাং ভাবই মুখ্য, ভাষা গৌণ। ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উদ্দামগতি নিয়মিত, সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ভাব প্রকাশের একটা বহুজনমান্য পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করা ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের কার্য্য। এই নিয়মই যে সর্ব্বত্র সমভাবে স্বীকৃত বা অনুসৃত হইয়াছে তাহা নহে। কেননা ভাব আগে, ভাষা পরে। ভাব আবেগের বশে প্রকাশিত হয় – তাহা ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বা তাহার অনুশাসন মানিয়া নহে।

যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহাদের ভাষা, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্রের নিয়মদ্বারা অনুশাসিত। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত ভাব এই নিয়মানুবর্ত্তী ভাষার দ্বারাই লিপিবদ্ধ হয়। ক্রমে এই নিয়মানুবর্ত্তীতা তাঁহাদের স্বভাবগত হইয়া যায়। তাঁহাদের সাধনাই এই। তাঁহাদের

হৃদে ভাব উঠে মুখে ভাষা ফুটে
উভয়ে অধীন যেন।

ভাব সাধারণতঃ আবেগভরে ছুটিয়া বাহির হইতে চায়—বন্যার মত দেশ ভাসাইয়া, প্লাবিত করিয়া, সরস করিয়া। ক্ষুদ্রায়ত কৃত্রিম খাতের তাহার বিপুলায়ত ভাববন্যার প্রবাহের বেগ ধারণ ও স্থান প্রদানের অবকাশ নাই। তাই বলিতেছি,

ভাবই মূল, ভাষা তাহার বাহকমাত্র। তাই বলিয়া ভাষার শুদ্ধি সম্পাদন বিষয়ে অমনযোগী হইলে চলিবে না। পরন্তু, ইহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও ইহার শাসনাধীনে থাকাই কর্ত্তব্য। তবে যেখানে দেখিব, ভাবের খেলা রহিয়াছে, অথচ ভাষার নাই, সেখানে শুদ্ধ সে কৃত্রিম সৌষ্টভ জন্য ভাবকে বর্জ্জন করা নিতান্তই অবিবেচনার কার্য্য হইবে। অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিশালী বা সাধনশীল ব্যক্তিগণের নিকট গৌণই মুখ্য হইয়া ভাষার দৈন্যবশতঃ ভাব খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয়।

গ্রাম্য কবির পল্লী-সঙ্গীত, গাথা, ছড়া প্রভৃতি পল্লীবাসীর নিত্যসেব্য সুখ দুঃখের মর্ম্মগাথাগুলি স্বতঃউচ্ছ্সিত ভাবের বহির্বিকাশ। তাহা কোনরূপ ছন্দ, অলঙ্কার বা শব্দ-শাস্ত্রের পাশ দিয়াও যায় নাই। কিন্তু যে ভাষায় যে ভাবে পল্লীবাসিগণ তাহাদের নিত্য সুখ দুঃখের সংসারের জ্বালা ঝঞ্ঝাটের কথা পরিবার ও বন্ধুবর্গের সহিত অসম্বৃতভাবে ব্যবহার করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করে, পল্লীকবির এই গ্রাম্য সঙ্গীতগুলি ফনোগ্রাফ যন্ত্রের মত সেই ভাষার সেই সুর লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং ভাবের দিক দিয়া দেখিলে এগুলির বিশেষ মূল্য আছে। পল্লীজীবনের এমন নিখুঁত ছায়াচিত্র আর কোথায় পাইবেন?

অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত পল্লীকবির হৃদয়ের প্রসার তত সুদূরবিস্তৃত বা মস্তিষ্কের ধারণাশক্তি তত পরিপুষ্ট নহে। তাঁহারা স্বভাবজাত কবিত্ব-শক্তির তাড়নায় যখন যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, সুষ্ঠুভাষা প্রয়োগে সুগঠিত বা কল্পনার সমুজ্জল বর্ণে তাহা রঞ্জিত করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহা আমাদের চর্ম্মচক্ষুর সমক্ষে সমুদ্ভাষিত মানবসমাজ ও প্রকৃতির নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। সুশিক্ষিত কবি সুনিপুণ চিত্রশিল্পীরূপে বর্ণিত হইলে, এই অশিক্ষিত কবিকে ছায়াচিত্রের যন্ত্র বলা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক ঘটনাবিশেষ অবলম্বন করিয়াই হউক, বা পৌরাণিক বিষয় লইয়াই হউক, তাঁহারা যখন যে বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা কোন স্থলেই তাঁহাদের প্রত্যক্ষ্যানুভূতিকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এইজন্য, তাঁহারা পৌরাণিক দেবতা সংক্রান্ত আখ্যায়িকা বিশেষ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের নিজের সংসার সমাজ, দেশ ও কালকে কণামাত্রও ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং, তাঁহারা তাঁহাদের গ্রাম্যজীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলীই বর্ণনা করিয়াছেন—তবে দেবতার নামের আবরণ দিয়াছেন মাত্র। বলা বাহুল্য যে প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ প্রায়ই সাধারণ মানবজীবনের আখ্যায়িকা বর্ণনা করা সমীচীন মনে করিতেন না। এই জন্য যখনই তাঁহারা এই বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা তাহা দেবতা সংসৃষ্ট করিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

আমাদের বীরভূম-অঞ্চলে গ্রাম্য-কবি রচিত এইরূপ অনেকগুলি গান, বা

গীত হইবার জন্য রচিত পদ্যময় সন্দর্ভ প্রচলিত আছে। পুস্তক বা পুঁথির আকারে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা স্বতন্ত্র। কিন্তু সে সকল গান বা গাথা এখনও লিপিবদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল লোকের মুখে মুখেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সকল গান বা গাথার কথা উল্লেখ করিতেছি। রঙ্গপুর অঞ্চলে যেমন গোপীচন্দ্র বা মাণিকচন্দ্রের গীত গাহিয়া এক প্রকার জাতি চিরকাল ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তদ্রূপ বীরভূম-অঞ্চলে যুগী বা পটুয়া (চিত্রকর) জাতীয় একদল লোক কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, চৈতন্যলীলা, যমপট প্রভৃতি স্বহস্ত অঙ্কিত চিত্র দেখাইয়া এবং কখন কখনও পট্ বা চিত্র লইয়া ঐ ঐ বিষয় মন্দিরা সহযোগে গান করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই পটুয়াগণ, চিত্র-অঙ্কন ব্যতীত, চাষের এবং তাঁতের কর্ম্ম করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত, তদানীন্তন সময়ে ঝুমুর, কবি, পাঁচালী, সত্যপীর, মাণিকপীর, তর্জ্জা, লুটো, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি বিষয়ে গ্রাম্য কবি ও পাঁচালীকারের প্রভূত প্রভাব বিস্তার ঘটিয়াছিল। এই সমুদয় গ্রাম্যগীতি এখনও সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হয় নাই। পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় এইরূপ ঐতিহাসিক বিষয়াবলম্বনে কয়েকটি গ্রাম্যগীতি সংগৃহীত করিয়া প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে 'বীরভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমরা এইরূপ কয়েকটি গ্রাম্যগাথা সংগৃহীত করিয়া এইস্থলে প্রকাশিত করিলাম। আশাকরি, আমরা এবিষয়ে সমধিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিব। এই গ্রাম্যগীতিগুলি সংগৃহীত করা কিন্তু তত সহজসাধ্য নহে। যে ভিক্ষুজীবিগণ এই গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহারা কিছুতেই তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের অবলম্বন এই গানগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া লইতে দেয় না। হয়ত আশঙ্কা করে যে আমরা তাহাদের গান গাহিয়া তাহাদেরই অন্নে ধূলা দিব!

ময়মনসিংহ অঞ্চলে সংগৃহীত গ্রাম্য-গীতিকার কথা অনেকেই অবগত আছেন। আমরা আশাকরি যে চেষ্টা করিলে আমরাও আমাদের এই ভাবের বহু উপকরণ সংগৃহীত করিয়া মাতৃভাষার সৌষ্টব সাধন করিতে সক্ষম হইব।

এই গানগুলিতে যে কেবল সামাজিক চিত্র বা তৎকালীয় গ্রাম্য জীবনের ভাবনিচয়ই প্রকট দেখিতে পাই তাহা নহে। এই গ্রাম্য গীতগুলিতে ভাষাতত্ত্ববিদগণ ভাষা তত্ত্বালোচনার যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। দেশবিশেষে প্রচলিত নিত্যব্যবহার্য্য এমন অনেক শব্দ আছে যাহার দ্বারা আমরা আমাদের মনোভাব অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারি, যাহার ব্যঞ্জনাশক্তি স্থলেবিশেষে অতি সুস্পষ্ট; কিন্তু সেই সকল দেশজ শব্দ এখনও বঙ্গভাষার কোন অভিধানে স্থানপ্রাপ্ত

হয় নাই। সেগুলি সংগ্রহ হওয়া কম লাভের কথা নহে।

(১)

মা দুর্গার শঙ্খ পরা

শিব জপরে মন, হেলিবে শমন।
বদন ভরিয়ে মুখে বল বম্ বম্॥ ধ্রু॥
ব্যাঘ্র ছাল বিছায়ে বসেন যোগপতি।
হরের বামে চণ্ডিকা বসেন পার্ব্বতী॥
বাম কড়ে[১] থেকে গৌরী বলেন বচন।
এক বাক্য বলি শুন ঠাকুর ত্রিলোচন॥
দুর্গা বলে—'আমার বাইয়ে[২] শঙ্খ নাই, তোমার নাই লাজ।
ঠাকুর দু'টিবাই শঙ্খ দাওহে স্বামী দেবরাজ॥
কোথা না[৩] দেখিলি শঙ্খ; কোথা খুঁজে এলি।
কি বুঝিয়ে শঙ্খদান আমারে মাগিলি[৪]॥
রূপা, সোনা পর, যে অকালে বেচি খাবি।
রাঙা রুলি শঙ্খপরি কোন্ স্বর্গে যাবি॥
রুপা সোনা পরে আমার অঙ্গ ব্যথা করে।
দুটি বাই শঙ্খপরতে বড় সাধ করে॥
কড়ার ভিখারী দুর্গা, কড়ার লেগে মরি।
কোথা গেলে পাবলো দু'বাই শঙ্খের কড়ি॥
তোমার পিতা দক্ষরাজা ধনের ঈশ্বর।
শঙ্খ পরতে সাধ থাকে ত যাও বাপের ঘর॥
শুনিলে শুনিলে পদ্মা বুড়া ভাঙ্গড়ের বচন।
সিকে দশেকের[৫] শঙ্খ দিতে উড়ে যাবে ধন॥
নিতুই কি মা বাপের ঘরে পরে আভরণ।'
'তোমার পিতা দক্ষরাজা বল্‌গা গিয়ে তারে।
স্বতন্তরা হ'য়ে শঙ্খ কিনে দিতে পারে॥'
'চোখ থাক মোর মা বাবা চোখ থাক মোর পরে।
জেনে শুনে বিয়ে দিলে ভিখারীর ঘরে॥
চোখ থাক মোর মা বাপ চোখ থাক মোর খুড়ো।
জেনে শুনে বিয়ে দিলে ঠেঙ্গা-ধরা বুড়ো॥'
ঠাকুর বলে–'ডাঙ্গর ডাঙ্গর বলে দুর্গা নাহি দিও গাল।
দুটি হাতে ধ'রে বল্‌ছি দুর্গা শঙ্খ দিব কাল॥'

এই ঠিঞে[৬] থাক বুড়ো কুচ্‌নির[৭] মাথা খেয়ে।
আমি যাছি বাপের ঘর কার্ত্তিক গণেশ নিয়ে॥
কোলে নিল কার্ত্তিক হাঁটিয়ে লম্বোদর।
ক্রোধ ক'রে যাত্রা করে মাতা পিতার ঘর॥
ঘরে হ'তে বেরিয়ে মস্তকে ঠেকে চাল।
ডাইনে শৃগাল যায় বামে যায় কাল[৮]॥
দুর্গাবলে—'আজকে যাবার যাত্রা লক্ষণ ত নাই।
কেনে ঘরের বার করলাম কার্ত্তিক গণাই॥
এমন লোক কে আছে, এগিয়ে এসে নিতে।
যাব না যাব না বলে যাব তার সাথে॥
ঢেঁকী বাহনে নারদ গেছে ব্রহ্মার ভবন।
আসিতে মামীর সাথে পথে দরশন॥
আজ কেনে দেখি মামীর বিরস বদন।
মামাতে মামীতে কোন্দল কিসের কারণ॥
দুর্গাবলে 'তোর মামাকে চাইলাম দু'বাই শঙ্খের কড়ি।
দিলে না সেই কারণে যাচ্ছি আমি মাতাপিতার বাড়ী॥
এইখানে থাক মামী তিলেক বসিয়ে।
মামাকে জিজ্ঞাসা ক'রে তোমাকে নিবসিঞে[৯]॥
ব্রহ্ম ডাঙ্গালে রইলাম নারদ তোর বিলম্ব চেয়ে।
তোর মামাকে জিজ্ঞাসা ক'রে শীঘ্র নিবেসিঞে॥
দৌড়াদৌড়ি করে হল নারদের গমন।
মামার সাক্ষাতে নারদ দিল দরশন॥
মামাগো তুমি ত ব'সে আছ রতন সিংহাসনে।
কার্ত্তিক গণেশ ভাই দেখতে পাইন্না মামা কৈলাস ভুবনে।
কত দূর গেল তোমার মামী নারদ আনগা ফিরিয়া।
কাল দু'বাই শঙ্খ দিব নগরে[১০] কিনিয়া॥
ভাল হলো মামাগো মামী বাপের ঘর গেল।
আজ হৈতে কৈলাসে কোন্দল ঘুচিল॥
তখনই বলিলাম মামা বিয়ে নাহি কর।
সহুরে নগুরে মামী আন বড় নাবর[১১]॥
কোন্দলের ঝী বটে, কোন্দল কেবা পারে।
দেবতার বৌ জলকে যায় না, তার কোন্দলের ডরে॥
কোন্দলের ঝী যে দিন কোন্দল নাহি পায়।

বেল গাছে চুল জড়িয়ে গড়াগড়ি যায়॥
শীঘ্র করি যারে নারদ আনগা ফিরিয়া।
কাল দু'বাই শঙ্খ দিব নগরে কিনিয়া॥
কোন্দলের পড়ো[১২] নারদ বগল দাবিল।
দু' কাঠি বাজায়ে নারদ যাত্রা করিল॥
দৌড়াদৌড়ি ক'রে হলো নারদের গমন।
মামীর সাক্ষাতে নারদ দিল দরশন॥
পালাছিস ত পালা মামী কার্ত্তিক গণেশ লয়ে।
দুয়ারে ব'সেছে মামা ত্রিশূল হাতে লয়ে॥
তোমার নাগাল ধরতে পেলে বধিবে পরাণে।
নারদের কথা কিছু মনেতে লাগিল।
কার্ত্তিক গণেশ লয়ে দুর্গা বাপের ঘর গেল॥
দৌড়াদৌড়ি ক'রে হচ্ছে নারদের গমন।
মামার সাক্ষাতে নারদ দিল দরশন॥
মাথার কিরে[১৩] দিলাম মামা বারে বার।
তবু ত আমার মামী নাহি এল ঘর॥
বুদ্ধি বল নারদ, উপায় বল মোরে।
তোমার মামী ঘরকে এসে[১৪] কেমন প্রকারে॥
মামা, মামী হ'য়েছে বাগ্দিনী তুমি হওনা বাগা।
বড় ব'নের বাঘ হ'য়ে, তুমি পথে দাওগা দাগা[১৫]॥
নারদের কথা কিছু মনেতে লাগিল।
বাঘের মূর্ত্তি মহাদেব সাজিতে লাগিল॥
হোল্‌না[১৬] পারা মাথা বাঘের তারাপারা আখি।
এমন চূড়ান্ত বাঘ কভু নাহি দেখি॥
বাঘ মূর্ত্তি হ'য়ে ঠাকুর আগুলিল পথে।
ভাল হলো গণেশের মা বাহন পেল পথে॥
লম্ফ দিয়ে চাপতে গেল বাঘের উপরে।
লজ্জাতে ব্যাকুল হয় ঠাকুর দাঁড়াইল দূরে॥
জয় রাম শ্রীরাম বলে ঠাকুর কৈলাসকে যায়।
নারদ বলে মামাগো ভেয়ে ভেয়ে সা'ধ[১৭] তোমাদের
কান্দে করা আছে।
রাসলীলা করে ছিলা শ্রীবৃন্দাবনে॥
রাধারাণী বলে, ও তারা হেটে যেতে নারি।

এসহে দয়াল ঠাকুর তোমায় কান্দে করি॥
মামাগো, বাঘ যে দুর্গার বাহন তাও আমি জানি।
না পালালে তোমার কান্ধে চাপতো আমার মামী॥
বুদ্ধি বল নারদ উপায় বল মোরে।
তোমার মামী ঘরকে এসে কেমন প্রকারে॥
মামাগো, এই বেলাতে সাজতে পার শাঁখারী বরণ।
রূপেগুণে মামীর সাথে হ'বে দরশন॥
কতকগুলি ধন নিল, গায়ে নিল শঙ্খের গুঁড়ি।
অধিক ক'রে নিলেন ঠাকুর গাঁজার ধুকুড়ি[১৮]॥
'শঙ্খ নিবে' 'শঙ্খ নিবে' ব'লে গো শাঁখারী চলে যায়।
রাজকুলি[১৯] বেয়ে গো শাঁখারী চলে যায়।
বাড়ীর ভিতর ছিল পদ্মা শুনিবারে পায়॥
বাড়ীর বাহির হ'য়ে পদ্মা ডাকিতে লাগিল।
চল চল শাঁখারী আমাদের ঘরে চল।
তোমার শঙ্খ পরিবে দুর্গা অভয়া মঙ্গল॥
ভদ্রলোকে বাড়ী যেতে প্রাণে লাগে ডর।
নাজানি কে ব'সে আছে ভোলামহেশ্বর॥
কার্ত্তিক গণেশ দু'টি ভাই খেলিবারে যায়।
সুবর্ণের পাটি[২০] শাঁখারীরে ফেলে দেয়॥
মোচে পাক দিয়া বুড়াটি চাপিয়ে বসিল।
শিব হলো শাঁখারী যার পবণ গুজারি।
শঙ্খ দেখতে এলো শিবের খুড়শেশ শ্বাশুড়ী॥
গায়ে বস্ত্র নেয় না তারা করে হুড়াহুড়ি।
কোন নগরে থাক ঠাকুর কোন নগরে ঘর।
শঙ্খ বেচতে এলে ঠাকুর আমারই নগর॥
পূর্ব্ব দেশে থাকি আমার উজানিতে ঘর।
শঙ্খ বেচতে এলাম পদ্মা তোমার নগর॥
শঙ্খেরই মূল্য শুনি ওহে আগে থেকে বল।
তোমার শঙ্খ পরিবে দুর্গা অভয় মঙ্গল॥
কে কে পরিবে শঙ্খ কিনে কিনে পর।
এক বারে কড়ি দিতে না পার যতেক দিনে পার॥
এক জোড় দুই জোড় শঙ্খ তিন জোড় দেখিল।

দু'টি বাই শঙ্খ পদ্মার মনেতে লাগিল॥
তেল জল লয়ে গো শাঁখারীর আগে দিল।
নরম বাই পেয়ে বুড়াটি টিপিয়ে ধরিল॥
একগাছি শঙ্খ পরায় মন্ত্র ক'রে সার।
দুর্গার বাইকে শঙ্খ গিয়ে না বেরিও আর॥
করাতে কাটিলে শঙ্খ কাটা নাহি যেও।
সদাশিবের দাপে শঙ্খ অমর বর হৈও॥
শঙ্খগুলি পরাবে ঠাকুর বসে বাম পাশে।
উঠে মুঠে বলে শাঁখারী আমারে কেমন সাজে॥
কতকগুলি ধান এনে শাঁখারীর আগে দিল।
ঠাকুর বলে ধানের মরা[২১] নই ঝাড়খণ্ডের ঘর[২২]॥
আমার ঘরে আছে কত পরশ পাথর॥
সোনার কুমড়ো কত মেঝেয় গড়াগড়ি যায়।
সে ধন বেঁচিতে দাসীর গতর[২৩] দুখায়॥
এত ধন আছে ঠাকুর; তোমারি সে ঘরে।
দারুণ শাঁখার বোঝা দেখি তোমার মাথার উপরে।
জাতিহীন নই পদ্মা বৃত্তি হীন নই।
এ কারণে শাঁখার বোঝা মাথায় ক'রে বই॥
শাঁখারী মুনসে দরজী মুনসে এক নগরে রয়।
শাঁখারী মুনসের কথা কিছু দরজী মুনসে কয়॥
উষ্মাতে হালিছে[২৪] গা দুর্গার কি করতে পারে।
দুর্গা শঙ্খ ভাঙ্গিতে গেলেন হেঁসেল ঘরের কোণে॥
হেঁটে শিল উপরে নোড়া মধ্যে দেবী শাঁখা।
শিল শূন্য হলো শাঁখার গায়ে নাহি লাগে ঘা॥
সদাশিবের সাপে শঙ্খ অমর বর হয়॥
ব্যাঘ্র ছাল বিছায়ে বসেন যোগপতি।
হরের বামে চণ্ডিকা বসেন পার্ব্বতী॥
বাম কড়ে[২৫] থেকে গৌরী বলেন বচন।
একবাক্য বলি শুন ঠাকুর দেব ত্রিলোচন॥
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে গো, চরণে রাখ মতি।
ইহা শুনিলে মঙ্গল হয় গোয়ালে[২৬] ভগবতী॥
তুমি চিন সবারে, তোমারে চিনে কে।
ডাকিয়ে চিন্তিয়ে নাম যপ মনে মনে॥
শিব বিনে কেউ দয়াল নাই এ তিন ভূবনে॥ ধ্রু॥

(১) নিকটে বা পার্শ্বে (২) বাহু বা মণিবন্ধে (৩) কোথায় (৪) চাহিলি (৫) দশসিকা অর্থাৎ ২৷৷০ টাকা (৬) স্থানে (৭) ভালবাসার (৮) কালসর্প (৯) আসিয়া লইয়া যাইব (১০) বীরভূমের প্রাচীন রাজধানী ? বা সহর (১১) ঠেটা (১২) ছাত্র (১৩) শপথ (১৪) আইসে (১৫) কষ্ট (১৬) হোলা মৃৎপাত্রবিশেষ (১৭) অভ্যাস সাধ্য (১৮) পোঁটলা (১৯) রাস্তা (২০) কটিবন্ধের গহনাবিশেষ (২১) ধানের কাঙ্গাল (২২) বৈদ্যনাথ অঞ্চল (২৩) শরীর! (২৪) কাঁপিছে (২৫) পার্শ্বে (২৬) গোশালা; পাঠান্তর- গাইল ভগবতী। তাহা হইলে এই গানটি ভগবতী নামধারী কোন ব্যক্তির রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

(২)
শিবের চাষ

শিব জপরে মন, হেলিবে শমন।
বদন ভরিয়ে মুখে বল বম্‌বম্‌॥ ধ্রু॥
দুর্গাবলে——
শিবের ঘরে অন্ন নাই বাতাসে নড়ে হাঁড়ী।
সকলে যে ধন দিয়ে, আপনি ভিখারী॥
কাল ভিক্ষা ক'রে এলাম কুজানি নগরে।
উঠে মুঠে বল্‌ছে দুর্গা, অন্ন নাহিক ঘরে॥
তিনদিনকার ভাত গৌরি খেলে একদিনে।
এ ঘরকন্নাতে বুড়া বাঁচিবে কেমনে॥
কতগুলি ঘরের ব্যয় না জান বুড়াটি।
তোমার একলা ভীমকে[১] চায় বাহান্ন পৌটি॥
হাতে খড়ি করি[২] গোসাঞী নাও কেন্নে লেখা[৩]।
উচিত কথা বল্‌তে হলেই মুখ কর্চ্ছো বাঁকা।
ভিক্ষার অন্নে কুলায় না হে ঠাকুর চাষে দাও মন।
ফুল তুলসী পাবে সকল দেবতাগণ॥
অন্য লোকের বালকগুলি দুধে ভাতে খায়।

সোনার চাঁদ গণপতি অন্নকে লালায়[৪] ॥

চাষ কর্ম্ম কর ঠাকুর সুখে অন্ন খাব।
বড় বড় মুনির নাগাল[৫] দুয়ারে বসে পাব॥
চাষ কর্ম্ম করে দুর্গা না করি জঞ্জাল।
নগর ভিক্ষা মেগে খাছি, সুখে আছি ভাল॥
চাষের পরম লক্ষ্মী শুন কৃত্তিবাস।
ক্ষেতে হবে মুগ মসূরী সরিষা কাপাস॥
রাম রম্ভা, গণেশ রোপিবে থরে থরে[৬]।
শাঁকআলু কচু দিবে বাড়ীর ভিতরে॥
নটে পটে সাম্‌নে ঠাকুর দেখছি বার মাস।
চাষের পরম লক্ষ্মী শুন কৃত্তিবাস॥
ঠাকুর বলে—
কোথা পাব লাঙ্গল জোঙাল, কোথা পাব বীজের ধান।
কোথা গেলে পাব দুর্গা ক্ষেতের কৃষাণ॥
হাতের ত্রিশূল ভেঙ্গে গড়, কোদাল আর ফাল।
রাখাল কৃষি করবে ঘরে নন্দী মহাকাল।
আমার বাঘে তোমার বৃষে মর্ত্তে জোড় হাল॥
ঠাকুর বলে—বাঘে বলদে হাল নাহিক শুনি।
লাঙল জোয়াল নিয়ে মাঠে করবে টানাটানি॥
অতিবাদ ক্ষুধা লাগলে বাঘা ধ'রে খায় আপনি।
তখনি ফুরাবে দুর্গা ঘরের জঞ্জাল।
কাপাস চাষ কর ঠাকুর বস্ত্র পরিব।
দেবতার বৌ হ'য়ে কত বাঘ ছাল পরিব॥
আখ চাষ কর ঠাকুর অমৃত ফলিবে।
চিনি শর্করা ল'য়ে ধর্ম্ম সেবায় লাগিবে।

শিব জপরে মন, হেলিবে শমন,
বদন ভরিয়ে মুখে বল বম্‌বম্‌॥ ধ্রু॥
বীচনের কারণে ভীম কৃষাণ পাঠিয়ে দিছি।
এস এস ভীমরে বাটার তাম্বুল খাবে।
শীঘ্র করে লক্ষ্মীর ঘরে সংবাদ আনিবে॥
একে তেশিরে ভীম যেই আজ্ঞা পেল।
নেতের ক্ষেতে সেতের ধড়া[৭] ভীম তিন বেড়ে বান্ধিল॥
আশী মন লোহার গদা বাম কাঁধে ফেলিল।

চৌদ্দ মন সোণার নুপুর পায়ে তুলে নিল॥
যাবেরে শিবের ভীম যাবে অনেক দূর।
দুই পায়ে তুলে নিল বাজন্ত নুপুর॥
সাজন কোজন ক'রে ভীম চায় রোষে রোষে।
ভীম খট্ মট্ পা ফেলে বার বার ক্রোশে॥
উত্তরিল যেয়ে ভীম লক্ষ্মীর বাড়িতে॥
লক্ষ্মী বলে, আজ ভীম দেখি কেনে বিরস বদন।
মা মোরে পাঠালে কিঞ্চিৎ বীচনের কারণ॥
আজ ভীম কর কিছু রন্ধন ভোজন,
রন্ধন ভোজন করিলে সামগ্রী দিবে কি ?
বাহান্ন মন চাল লাগে, তের পৌটি ডাল।
সাত কলসী ঘৃত চাই লবণ মন চার॥
চাল ডাল লয়ে ভীম সমুদ্র ধারকে যায়।
ভীমকে দেখিয়ে তখন সমুদ্র পালায়॥
পালাও না পালাও না সমুদ্র মেরা ভাই।
এক ফুট[৮] জলদাও রসুই করে খাই॥
পাড়েতে গুড়ুলে[৯] ভীম তেউড়ি[১০] খিচিল[১১]।
আড়াই নুড়ো জ্বালে ভীমের অন্ন তৈয়ার হল॥
হাঁড়ীর কানা[১২] ধ'রে ভীম মাড়[১৩] গড়াইল।
মাড়জোল নদী[১৪] বলে তাই জন্ম হলো॥
গামছা বিছায়ে ভীম অন্ন ঢেলে দিল।
কুলকুচি[১৫] করিয়ে ভীম অন্নেতে বসিল॥
লক্ষ্মী বলে—
কও দেখিরে ওরে ভীম, তোমার অন্নে কুলাইল।
ভীম বলে জলে থলে ওগো মা, পৌণে-পেটা[১৬] হলো।
নিতুই অন্ন দিয়ে মামা পালে গো পুষিবে।
এক দিন অন্ন দিতে তুমি অনাথ হয়ে গেলে॥
গঙ্গাজলি ধান লক্ষ্মী বাহির করে দিল।
বাঁকের ডগায়[১৭] বেন্ধে ভীম বন্দনা করিল॥
সাজন কোজন ক'রে ভীম যায় রোষে রোষে।
ঠাকুর বলে—
আজ কেনে দেখি, ভীম তোমার বিরস বদন।
আজ কিছু করে ছিলাম রন্ধন ভোজন॥

রন্ধন ভোজন করলে সামগ্রী দিলে কি ?
সলিয়া কলাই সলিয়া বেগুণ ঝম্ফ কুড়ি-কুড়ি[১৮] ॥
মন পঁচিশেক দিয়াছেন ঝাল মরিচের গুঁড়ি।
বাহান্ন মন চাল দেয়, তের পৌটি ডাল।
সাত কলসী ঘৃত দেয় লবণ মন চার।
শিব নিন্দা করো না, শিবের কর সেবা।
শিব দিতে পারে বর ধনে করে রাজা॥
শিবের নিন্দা ক'রে দক্ষ অজা[১৯] মুখো হ'লো।
রামের মা'রে রাবণ রাজা নির্ব্বংশ হ'লো॥
শিবের যপরে মন হেলিবে শমন।
বদন ভরিয়ে মুখে বল বম্ বম॥ ধ্রু॥

(১) মহাভারতের ভীম নহে (২) হিসাব করিয়া (৩) হিসাব (৪) অন্নের জন্য লালায়িত হয় (৫) সঙ্গ (৬) স্তরে স্তরে (৭) গামছা বা ছোট কাপড় (৮) একবার ভাত ফুটিবার পরিমাণ জল (৯) গোড়ালির দ্বারা আঘাত করিয়া (১০) আখা (১১) প্রস্তুত করিল (১২) কিনারা (১৩) ফেন বা মণ্ড (১৪) বাতিকার সন্নিকট সিজাকড্ডাং গ্রামের অদূরস্থিত নদী (১৫) মুখ প্রক্ষালন (১৬) সম্পূর্ণরূপ পেট ভরিল না, এক চতুর্থাংশ বাকী রহিল (১৭) ভারের আগায় (১৮) থোকা থোকা (১৯) দক্ষরাজার ছাগমুণ্ডের কথা লোক প্রসিদ্ধ

(৩)

শ্রীকৃষ্ণের ফল ভক্ষণ

অবধান কর কিছু নিবেদন করি।
গোকুলে আনিল ফল এক মাগী বুড়ী॥
একটা ঝুড়ী মাথে,
একটা ঝুড়ী মাথে, বসলো পথে, লঞা একটা ঢেলে[১]।
ডেকে বলে–ফল নাওসে, যত গোপের ছেলে॥
বাপু সব দৌড়ে আয়,

বাপু সব দৌড়ে আয়, ডাকছে তায়, ডাক্‌ছে ঘনে ঘনে।
শ্রীদাম বলে ওভাই কানাই, বুড়ী ডাক্‌ছে কেনে॥
ইহার সব বৃত্তান্ত,
ইহার সব বৃত্তান্ত, কিছু অন্ত, জান তো গুণের ভাই।
ডাক্‌ছে বুড়ী, ধীরি ধীরি, চল কেন্নে যাই॥
আবার সব আসবো ফিরে,
আবার সব আসবো ফিরে, ধীরে ধীরে, খেলা করবো হেথা।
চল যাই গুণের ভাই, শুনিগা বুড়ীর কথা॥
চলিল সভে মিলে,
চলিল সভে মিলে, গোপের ছেলে, মন্দ মন্দ হাসি।
সেই ঠাঁইকে[২] গেলেন বুড়ী যেথায় আছে বসি॥
বুড়ী তুমি ডাকছো কেনে,
বুড়ী তুমি ডাকছো কেনে, ঘনে ঘনে, করছ কলরব।
তোমার বাণী শুনে আমরা ধেঞা এলাম সব॥
তখন ডোমনী বলে,
তখন ডোমনী বলে, ডাক্‌ছি আমি, শুন্‌রে গোপের বেটা।
আম্র, কাঁঠাল, পিয়াল, জাম, ফল এনেছি গোটা॥
ধর নাও কিছু মিছু,
ধর নাও কিছু মিছু, যত শিশু, ফল এনেছি পাড়ি।
ধর হাতে কর বেতে[৩] খাওগা টোকার মারি[৪]॥
খেলে বড় সদ[৫] পাবে,
খেলে বড় সদ পাবে, ব'সে খাবে, মুখের হবে তার[৬]।
ঘরকে গেঞা, মায়ের ঠেঞা, বুঝে আনগা ধার[৭]॥
যাও যাও বোলে বুড়ী,
যাও যাও বোলে বুড়ী, চল্‌লেন হরি, গেলেন গোকুলপতি।
ডেকে বলে ফল দাও সে, মাগো যশোমতি॥
চল মা রাজার পথে,
চল মা রাজার পথে, আমার সাথে, কিনে দাওগা ফল।
দিবি কিনা দিবি মা সত্য ক'রে বল॥
নয়ত উপায় করি,
নয়ত উপায় করি, ভাঙ্গবো হাঁড়ি, দধি দুগ্ধ ছানা।
ঘর সইতে[৮] দিব ঠেলে যত হাঁড়ির কানা॥
দিব ঠেলে ফেলে,

দিব ঠেলে ফেলে, যাবে পড়ে, তখনি পাবি জ্বালা।
নইলে কড়ি[৯] দিয়ে মোরে তুমি কিনে দাও সে কলা॥
ব'লে কান্দেন হরি,
ব'লে কান্দেন হরি, দে মা কড়ি, বলেন যাদব রায়।
লোকের ছেলে, মাকে বলে, কত কিনে খায়॥
শুনে হাসে রাণী,
শুনে হাসে রাণী, কথাশুনি, বলে গোপের ঝি।
হারে, লোকের ছেলে কি বা খায় তুই খাস্ না কি॥
বাপ তোর কেমন কথা,
বাপ তোর কেমন কথা, কইলি হেথা, আমায় দিলি দোষ।
পাকা পাকা ফল আনব আসুক নন্দ ঘোষ॥
ঘরে আসুন নন্দ,
ঘরে আসুন নন্দ, কৃষ্ণচন্দ্র, ফল আনাব পাড়ি।
কিসের লেগে নীচের ঘরে মজাইবে কড়ি॥
ব'সে খাও ক্ষীর নবনী,
ব'সে খাও ক্ষীর নবনী, যাদুমণি, ও মোর চাঁদের কনা।
কুম্ভ কাঁখে জল আনিগা ঘরে থাক সোনা[১০]॥
ঘরে মোর বসি থাক,
ঘরে মোর বসি থাক, শিশু ডাক, সবে কর খেলা।
ঘর কন্না সব রৈল ধান্য রৈল মেলা॥
আমি যাব জলে,
আমি যাব জলে, রাণী বলে, নিয়ে আসি জল।
দ্বিজ বলরামে বলে আমার ঠাকুর খাবেন কলা॥
নিলা ধান্য কড়ি,
নিলা ধান্য কড়ি, নিলা হরি, হাতে করি ধান।
তুষ্ট হইল ডুম্নী বুড়ী দেখি ভগবান॥
তুমি কাদের ছেলে,
তুমি কাদের ছেলে, কাছকে এলে, ও মোর চাঁদের কনা।
মোরে যত ধান্য দিলে সব হৈল সোনা॥
তুমিত মানব নও,
তুমিত মানব নও, দেবতা হও, সকল দেবের সার।
পূর্ণ ব্রহ্ম গোপের ঘরে হঞাছ অবতার॥
পূণ্য যশোমতী,

পুণ্য যশোমতী, ভাগ্যবতী, জবা দিয়েছে গোটা।
বহু জন্ম কৈল পুণ্য ভক্তি বটে আঁটা[১১]॥
একবার বল মাতা,
একবার বল মাতা, শুনি কথা, এসো নীচের কোলে।
নিকটে পেঞাছি বাছা পূর্ব্ব জন্ম ফলে॥
একবার বল মাতা,
একবার বল মাতা, শুনি কথা, জুড়াক মোর গা[১২]।
ওচাঁদ বদনে একবার বল দেখি মা॥
নীচের ভক্তি দেখে,
নীচের ভক্তি দেখে, কোলে চেপে, মা বলিলা শ্যাম।
ফল খেঞে ঘরে চলে নাচে বলরাম[১৩]॥
এলেন যশোমতী,
এলেন যশোমতী, ভাগ্যবতী, শ্রীদাম সুবল ডাকে।
ধান্য ছিল কেবা নিল আমি শুধাই তোকে॥
বাপরে বল মোরে--
বাপরে বল মোরে, ছিলে ঘরে, সত্য করে বল।
শ্রীদাম বলে শুন মাথা চটুই[১৪] নেমে ছিল॥
আমরা জানিনা গো, শুন ওমা, কখন গেছে উড়ে।
তোমার কথা সত্যবটে ধান রয়েছে প'ড়ে॥
ছড়া ত উঠান ময়, প'ড়ে রয়, ছড়া গিয়েছে ধান।
রাণী বলে আজকে সবার করবো অপমান॥
যত মোর মনে আছে,
যত মোর মনে আছে, বান্ধবো গাছে, যত গোপের ছেলে।
সবাই মিলে যুক্তি করে ঘর নষ্ট ক'লে॥
নিত্যি ছড়া ফেলা, ওগো ওমা, কোন যে জ্বালা হলো।
ঘর ছাড়ি জল আনায়[১৫] প্রমাদ ঘটিল॥
তখন মায়ের চোখে,
তখন মায়ের চোখে, শ্রীদাম সুবল সকল কথা বলে।
ডোমকে বলেছে—মাতা, চেপেছে নীচের কোলে॥
দিল অগ্নি গায়,
দিল অগ্নি গায়, ক্রোধে তায়, মন হৈল ভারি।
যষ্টী হাতে নিলা রাণী এলান[১৬] কবরী॥
ধরি যাদুর হাতে,

ধরি যাদুর হাতে, অখিল নাথের পৃষ্ঠে পড়িল বাড়ি।
ঘরে হৈতে হৈল যেতে শুন গোপের রাণী॥
আমার ভেঙ্গে খেলেক,
আমার ভেঙ্গে খেলেক, প্রাণে মেলেক, শুন গোপের বালা।
নন্দ ঘোষে বলবো আমি কত সইবো জ্বালা॥
কাতর হৈয়ে তবে,
কাতর হৈয়ে তবে, কান্দে নন্দ-রাণী।
ঘর দ্বার সব নষ্ট কৈল যাদুমণি॥
শ্রীদাম কর অবধান,
শ্রীদাম কর অবধান, ডেকে আন, বাছা যাদব রায়!
দণ্ড চার বেলা হৈলে কতবার খায়॥
পাছে বা পিত্তি পড়ে,
পাছে বা পিত্তি পড়ে, কার ঘরে, বসে আছে একা।
প্রাণ রক্ষা কর শ্রীদাম ডেকে আন্ তোর সখা॥
শ্রীদাম বলে মর্ম্ম,
শ্রীদাম বলে মর্ম্ম, জান না কর্ম্ম, কিছু নাহিক জ্ঞান।
রাণী বলে ঘাটি[১৭] কর্ম্ম হ'য়েছে শ্রীদাম
শ্রীদাম গেলেন ধেঞা,
শ্রীদাম গেলেন ধেঞা, নাগালি পেঞা সঙ্গে আনলেন হরি।
দ্বিজ বলরামে[১৮] কয় মনে ভাবি গোবিন্দপুরে[১৯] বাড়ী॥

ইতি ফল ভক্ষণ সমাপ্ত

(রতন লাইব্রেরী পুঁথি নং ১৮৯৪, ২২৪৫)

(১) ঝুড়ি (২) স্থান (৩) মুখগহ্বর (৪) অম্লরসের দ্রব্য আস্বাদনকালে তালু সংযোগ জিহ্বার দ্বারা শব্দ বিশেষ (৫) স্বাদ, রুচিকর আস্বাদ (৬) মুখের জড়তা দূর হইয়া সরস হওয়া (৭) মূল্য বা পারিশ্রমিক (৮) সমেত, সমগ্র গৃহের (৯) অর্থ (১০) স্নেহ সূচক আহ্বান (১১) দৃঢ় (১২) গাত্র (১৩) বর্ত্তমান সঙ্গীতের রচয়িতা (১৪) চড়ুই পক্ষী (১৫) আনিতে (১৬) এলাইলেন (১৭) ঘাট বা দোষ (১৮) দ্বিজ বলরামের অপর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না (১৯) অনুমান, সিউড়ী সন্নিকট গোবিন্দপুর

(৪)

শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ

শুন ভাই সভাজন করি নিবেদন।
শুনিলে প্রবল সুখ পাপ-বিমোচন॥
একদিন শিশু সঙ্গে শ্রীনন্দ নন্দন।
খেলাবশে কৈল প্রভু মৃত্তিকাভক্ষণ॥
একদিন শিশু যশোদারে কৈল নিবেদন।
তোমার কাহ্নাইয়া করে মৃত্তিকা ভোজন॥
শুনিয়া যশোদা দেবী ধাইল সত্বরে।
উপনীতা হইলা আসি যথা গদাধরে॥
হারে হোরে বলিঞা যশোদা ধৈল হাতে।
মৃত্তিকা ভক্ষণ কর কেনে, কিছু পাওনা খেতে।
দধি দুগ্ধ ননী-ছানা আছে ভাণ্ড ভরা।
লোকে শুনে কি বলিবে শুন্‌রে পাগলা॥
নানা মতে ভৎর্সনা ভৎসিলা নন্দরাণী।
ঈষৎ হাসিয়া কিছু বলে যাদু-মণি॥
মিছা-মিছি করিঞা বলঞ শিশুগণ।
মৃত্তিকা নাহি খাই গালি দেহ অকারণ॥
শুন গো মা যশোমতী করি নিবেদন।
তোমার সাক্ষাতে দেখ মিলিব বদন॥
মায়া করি মুখ যে মিলিএ চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ বদনে দেখিলা নন্দরাণী॥
নন্দ-উপনন্দ দেখে গোপ গোপীগণ।
ধেনু আদি বৎস দেখে গিরিগোবর্দ্ধন॥
যমুনা পুলিন দেখে শ্রীবৃন্দাবন।
তাহার নিকটে দেখে ভাণ্ডীর গহন॥
শাল পিয়াল তাল হিন্তাল গুবাক।
অশোক কিংশুক দেখে কদম্ব চম্পক॥
মল্লিকা মালতী যূথি বেড়িয়াছে সব।
নানা ফুলে তরুগণ হঞাছে উৎসব॥
অলিগণ গান করে পিএ মধুকর।

ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ দেখএ দিবাকর॥
পার্ব্বতী সহিত শিব দেখে বৃষের উপর।
রক্ত বর্ণ মহাতেজ আদিত্য স্বরূপ॥
হংস বাহনে ব্রহ্মা দেখে চতুর্ম্মুখ।
মহিষের পৃষ্ঠে দেখে ঊন চতুর্দ্দশ যম॥
মৃগ পৃষ্ঠে দেখে ঊন পঞ্চাশপবন।
সনৎকুমার আর সনক সনাতন॥
গোবিন্দের মুখে রাণী দেখে পঞ্চজন।
তাহার উপরে ধ্বজ চার মনোহর॥
সুভদ্রা বলাই আর কমলা দেবী সাথ।
দেউল ভিতরে রাণী দেখে জগন্নাথ॥
রক্ত পদ্ম যিনি দেখে চরণের তল।
রতন নুপুরে তাথে অতি মনোহর॥
কটিতটে কিঙ্কিণী গাথা দেখি সারি সারি।
নীল মেঘেতে যেন পড়িছে বিজুরী॥
অঙ্গদ বলয়া করে দেখে সুশোভন।
বনমালা দোলে প্রভুর ভুবন মোহন॥
মাণিকে মণ্ডিত চিত্র বিচিত্র মনোহর।
কন্ঠ মালা দোলে প্রভুর হৃদয় উপর॥
শ্রীমুখ পদ্ম জিনি দেখে পূর্ণ সরোবর।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে করে ঝলমল॥
মুকুট কুণ্ডল দেখে মস্তক উপরে।
মনিমুক্তা প্রবাল মণি ঝলমল করে॥
কত স্থানে কত শত আসে সাধুজন।
সাষ্টাঙ্গ প্রণতি দিয়া বন্দএ চরণ॥
ষোড়শ রোহিনী কুণ্ডে কেহ করে স্নান।
বটবৃক্ষে দেখি কেহ করে আলিঙ্গন॥
বালুকা উপরে কেহ করএ মন্ত্রস্নান।
সিন্ধু গর্ভ দেখি কেহ করে পিণ্ড দান॥
আর এক নন্দ রাণী দেখে অপরূপ।
অন্ন ব্যঞ্জন পিঠা বাজারে বিকায় মূল॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ॥

১২১২ সাল ১০ই চৈত্র॥

(রতন লাইব্রেরী পুঁথি নং ১০১৮)

(৫)
রামলীলা

অজ রাজার পুত্র রাজা নামে দশরথ।
শোভা ক'রে বসলেন রাজা লয়ে প্রজাগণ॥
রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজায় কষ্ট পায়।
গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট ঘরের লক্ষ্মী উড়ে যায়॥
. . . . . মহারাজা রথ সজ্জা কৈল।
শনির নিঃশ্বাসে রথ উড়িতে লাগিল॥
কোথায় ছিল জটায়ু পক্ষী সে রথ ধরে নামাইল।
নিজের গলায় ফুল মালা জটার গলে দিল॥
জনমের মত জটার সঙ্গে রাজা মৈত্রতা পাতাইলা।
বনে থাকি বনের পশু মৈত্রের কিবা জানি।
আমার সঙ্গে মৈত্রতা পাতালে রাজা তুমি॥
এইখানে থাক মিত্র আমার রথ আগুলিয়া।
আমি আসি কানন বনে থেকে মৃগ শীকার করিয়া॥
বনের মাঝে বন আছে অন্ধক ব্রাহ্মণী।
পালনের জল আনতে যেছে গুণের সিন্ধুক মণি।
নিত্যি যাই নিত্যি আসি পিতা সরোবরের ঘাটে।
আজ ত যাবনা কেন প্রাণ কেন্দে কেন্দে উঠে।
কাল গেছে একাদশী রে বাপ আজ ব্রাহ্মণের ভোজন।
শীঘ্র করে আন জল করিব পারণ॥
কান্দিতে কান্দিতে সিন্ধুক যায় সরোবরের ঘাট।
সরোবরের ঘাটে সিন্ধুক জল পূরিতে লাগিল।
বনের হরিণ বনে রাজা সিন্ধুককে মারিল॥
কে মেলিরে মৃত্যু বান অঙ্গ গেছে জ্বলে।
আছিড়ে পড়িল সিন্ধুক সরোবরের জলে॥
ঘোড়া হৈতে নেমে রাজা সিন্ধুক নিল কোলে।
গুরু হত্যা ব্রহ্ম হত্যা মুখে সুর পাল
চার পাপে পাপী নয় ভজে শ্রীরাম নাম॥
মরা সিন্ধুক কোলে লয়ে মুনির দ্বারে এল।
পাতার মচমচি কর্ণেতে শুনিল॥

কে এলি বাপ সিন্ধুর এলি মাব'লে ডাক জুড়াক রে জীবন।
না জানাতে বধ ক'রেছি মা তোমারি নন্দন॥
সাত নয় পাঁচ নয় রাজা একা সিন্ধুক মুনি।
কি অপরাধ করেছিল বলিস নাই তার দণ্ড দিতাম আমি॥
পুত্র যদি আছে রাজা নি-পুত্রিয়া হবি।
পুত্র যদি নাই তোর চারপুত্র পাবি॥
এই কথা শুনে রাজা আনন্দিত হলো।
মরা সিন্ধুক কোলে লয়ে নাচিতে লাগিল॥
একা সিন্ধুক মারিস নাই রাজা, মেলি তিন জন।
এমনি কান্দ কান্দবি যে দিন রাম লক্ষ্মণকে দিবি বন॥
তিন জনার সৎকার্য্য একই চিতায় কৈল।
কলসী কলসী ঘৃত ঢালিতে লাগিল॥
বিশ্বামিত্র মুনির কাছে চরু মেগে নিল।
সেই চরু নিয়ে রাজা রাণীদিগে দিল॥
সেই চরু ভক্ষণ করে রাণীর রাম জন্ম হলো।
এক মুনির মনের কথা আর এক মুনি কয়।
রামকে আনতে পারলে যজ্ঞ রক্ষা হয়॥
মুনিরা সব প্রাণের ভয়ে যায় দেশ দেশান্তরে।
দশ মাস দশ দিন পরিপূর্ণ হলো।
ফলে ফুলে গুণের রাম ভূমিষ্ঠ হইল॥
শঙ্খের ধ্বনি দিয়ে মুনি রাজার দ্বারে গেল।
গলায় বস্ত্র দিয়ে রাজা মিনতি করিতে লাগিল॥
ঘন ঘন ঘন্টা নড়ে শিঙায় দেয় সান।
রাম লক্ষ্মণ লয়ে যাব কবির যজ্ঞস্থল॥
রাম আমার যেমন তেমন লক্ষ্মণ নয়ন তারা।
খাণিক ক্ষণ না দেখতে পেলে হই গো দিশে হারা॥
ধান দূর্ব্বা দিয়ে রামকে বাড়ীর ধারে দিল।
অর্দ্ধেক দূরে গিয়ে মুনি জিজ্ঞাসা করিল॥
ছয় মাসের পথে যাবে কিনা ছয় দিনের পথে যাবে।
ছ' মাসের পথে গেলে যজ্ঞ দরশন।
ছ'দিনের পথে গেলে তাড়কা নিধন॥
ছ'মাসের পথে যাবনা মুনি যাব ছ'দিনের পথে।
তাড়কা যে কেমন বীর দেখ্‌ব দু'জনাতে॥

দুষ্ট তাড়কা রাক্ষসী প'ড়ে আছে পর্ব্বত সমান।
তাই দেখে রঘুনাথ ধনুকে জুড়লো বাণ॥
লক্ষ্মণ যত বাণ মারে ধ'রে ধ'রে খায়।
শ্রীরাম দণ্ডিকা বাণে তাড়কা বধয়॥
গৌতম মুনির শাপে অহোল্যা পাষাণ হ'য়েছিল।
রামের পদ-ধূলি পেয়ে মানব হইল॥
যজ্ঞস্থলে গিয়ে নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিল।
ঐ থেকে রাম করিল গমন।
নৌকার ঘাটে গিয়ে দিল দরশন॥
পার কররে ধীবর মাঝি, পার কররে মোরে।
জনক রাজার বাড়ী যাব তোরই কৃপা বলে।
কাঠের তরি ছিল ধীবরের সোণা হ'য়ে গেল।
ঐখান থেকে রাম করিলেন গমন।
জনক রাজার ঘরে গিয়ে দিল দরশন॥
হরের ধেনুকে দিলে টান।
হরের ধেনুক ভেঙ্গে গো হলো তিন খান॥
ঐখানে জনক রাজা সীতালক্ষ্মী দান কৈল,
গলায় বস্ত্র দিয়ে মুনির চরণে ধরিল॥
মাঝ পতে আসি হলো পরশুরামের সঙ্গে দেখা।
সাত দিন সাত রাত যুদ্ধ যে করিল।
হাতে হাত দিয়ে পরশুরামের বল হ'রে নিল॥
ঢোল বাজে খোল বাজে আর বাজে কাঁসী।
রামচন্দ্রের বিয়ে হয় তোলপাড় ক'রে মিথিলার মাটী।
জল ছড় দিয়ে রামে বাসরে ল'য়ে যায়।
আপনার কপালের লেখন দুয়ারে দেখতে পায়॥
রাজা হব রাজ্য লব মনের উল্লাসে।
সকাল বেলায় কৈকয়রাণী রামকে দিছ বনবাসে॥
চৈত বৈশাখ মাসে রাম হলেন বনচারী।
একেত রোদের তাপ, নীচে খর বালী॥
ভাঙ্গ লক্ষ্মণ তরু ডাল ধর সীতার শিরে।
তারই ছায়ায় সীতালক্ষ্মী যায় ধীরে ধীরে॥
মাঝ পথে গিয়ে হলো ভরতের সঙ্গে দেখা
প্রাণের দাদা ছাড়ি আজ চ'লে যাবে কোথা

সুখে রাজত্ব কর ভাই ভরত শত্রুঘণ।
পিতার সত্য পালিবারে যাচ্ছি পঞ্চবটী বন॥
ঐখান থেকে রাম করিলেন গমন।
চণ্ডালের গৃহে গিয়ে রাম দিল দরশন॥
মদ খায় মাংস খায় চণ্ডালের নাকে মদ গলে।
ঘৃণা নাহি করে রাম চণ্ডালকে লয় কোলে॥
চণ্ডাল বংশ উদ্ধার ক'রে করিলেন গমন।
পঞ্চবটির বনে আসি দিল দরশন॥
তাল পাতে কুঁড়াখানি খড়িকার টিপুনী।
পথে ব'সে পাশাখেলে জনক নন্দিনী॥
খেলিতে খেলিতে পাশা পড়ে ভূমি তলে।
রাবণের ভগ্নী সূর্পনখা পুষ্পর অন্বেষণে॥
বিয়া কর বিয়া কর ঠাকুর রঘুনাথ।
আমার বিয়া হ'য়েছে লক্ষ্মণের বিয়া নাই।
এই কথা বলে গেল লক্ষ্মণের কাছে।
ধেনুকের হুলে ধ'রে সূর্পনখার নাকটি নিলে কেটে।
বনের মায়ামৃগ হ'য়ে মারীচ নাচিতে লাগিল।
আনরে দেওর লক্ষ্মণ মৃগটা ধরিয়ে পালিব পুষিব।
চৌদ্দ বৎসর হলে মৃগ দেশে লয়ে যাব॥
লহ লহ জিহ্বা করে মুখে হুঙ্কার ছাড়ে।
স্ত্রীলোকের কথা রাম কর্ণেতে না শুনে।
ধেনুক বাণ ল'য়ে সবে মৃগের পেছা দৌড়ে।
মার মার ধর ধর বলে খেদাড়িয়ে যায়।
অদিপুরের বাণের স্রোতে মায়ামৃগ দু'খান হয়ে যায়॥
যোগীর বেশে রাবণ রাজা ভিক্ষার ছলে যায়।
ঘন ঘন ঘন্টা নাড়ে শিঙায় দিচ্ছে সান।
কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিবে লক্ষ্মী রক্ষা করি প্রাণ॥
বাটায় ক'রে ফল মূল সাজায়ে সীতা ভিক্ষা লয়ে এলো।
কাছে ছিল পুষ্পক রথ সীতা হরে নিল॥
এবন ওবন খুজে দেখে মৃগ নাহি পেলো।
শূন্য কুটীর দেখে রাম অচৈতন্য হলো॥
রাম না কান্দে থির না মানে পড়ি ভূমি তলে।

রামের জটা বাকল ভিজে যায় নয়নেরই জলে॥
সীতা মলে সীতা পাব কুলের কামিণী।
দাদা মলে অনাথ হব কোথায় পাব আমি
আন্‌রে ভাই জল থল বাঁচাওরে জীবন।
তোমা হতে হবেরে ভাই দুঃখ নিবারণ॥
জলথল লয়ে আনি দাদার কাছে দিল।
জলথল খেয়ে দাদা উঠিয়ে বসিল॥
কিষ্কিন্ধ্যার বনে দেখে বালি আর সুগ্রীব।
কিষ্কিন্ধ্যার বনে আসি দরশন দিল॥
কে বালী কে সুগ্রীব বল্‌তে না পারে।
দু'টি ভেয়ে যুদ্ধ করে ঘোর অন্ধকারে॥
বালীর গলায় মালা দিয়ে বালী চিহ্নিত করিল।
এই কথা বলে রাম বালীকে বধিল॥
বালীর পুত্র অঙ্গদ বলে কেন বধিলি বালি
লেঙ্গুরে বান্ধিয়ে লঙ্কা এনে দিতাম কালি॥ইত্যাদি॥

(৬)
বানভাসীর গান

(সন ১২৩০ সালে পঞ্চকোট হইতে অম্বিকার ঘাট পর্য্যন্ত দামোদর নদের যে দেশপ্লাবী প্রবল বন্যা হইয়াছিল, এই পল্লী-কবির সঙ্গীতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। একশত তের বৎসর পূর্ব্বে রচিত পল্লী-কবির এই ছড়া বা গান, এখনও স্থানে স্থানে লোকমুখে রক্ষিত হইয়া ঘটনার জীবন্ত সাক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, ইহা অন্য কোনরূপ বিশেষত্ব বা কবিত্বের দাবী করিতেছে না। এরূপ কবিতা ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিবার যে একটা বিশেষ সার্থকতা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

কায়স্থ-কবি নফর দাস, বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানার অন্তর্গত বড়রা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি পাঠশালার শিক্ষকতা করিয়া সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য ঘটনাবলম্বনে তাঁহার রচিত আরও ছড়া বা গান এখনও লোকমুখে প্রচলিত আছে।)

নদী সে দামোদরে, বড়াকরে, কর্‌ছে আনাগোনা।
দু'ধার মিশায়ে ভাঙ্গে শেরগড় পরগণা॥
এল বান পঞ্চকোটে,—
এল বান পঞ্চকোটে, নিলেক লুটে, ভাঙ্গলো রাজার গড়।

দুড় দুড় শবদে ভাঙ্গে পর্ব্বত পাথর॥
মিশায়ে নালা খোলা—
মিশায়ে নালা খোলা, বানের খেলা, নদীর হলো বল।
দামোদরে জড় হলো চৌদ্দতল জল॥
নদীতে আঁটিবে কত,—
নদীতে আঁটিবে কত, শত শত, নৌকা ভাসে জলে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে॥
ভাঙ্গলো আদগাঁ ভাড়া—
ভাঙ্গলো আদগাঁ ভাড়া, গোপের পাড়া, ভাঙ্গলো বাবুইজোড়।
তার পর ভাঙ্গিল যে নপূর বল্লভপুর॥
যত সব ডুবলো গোলা—
যত সব ডুবলো গোলা, হাতে খোলা, নিলেক মহাজন।
দামোদরের বল দেখে উঠলো সিঙ্গেরণ[১]॥
চল্‌লো বান যোজন জুড়ে—
চল্‌লো বান যোজন জুড়ে, ত্বরা করে, যেমন টাঙ্গন ঘোড়া।
আদগাঁ ভুলুই[২] ভাঙ্গে মেজে ময়সাড়া[৩]॥
করলে ঢিপেপুরি—
করলে ঢিপেপুরি, আহা মরি, কি করলে ঠাকুর,
তারপর! ভাঙ্গলো গিয়ে পুব্‌ড়া মদনপুর॥
চল্‌লো বান পূর্ব্ব মুখে—
চল্‌লো বান পূর্ব্ব মুখে, আপন সুখে, চল্‌লো দামোদর।
দু'ধার মিশায়ে ভাঙ্গে, কাঞ্চন-নগর॥
বাবুদের কাঠগোলাতে—
বাবুদের কাঠগোলাতে, নাটসালাতে, প্রবেশ করলো বান।
বাঁকার সনে সালিশ ক'রে ভাঙ্গলো বর্দ্ধমান॥
বাজারে নৌকা চলে—
বাজারে নৌকা চলে, কুতূহলে, প্রলয় দেখি বান।
যে যেখানে আছে, পলায় ছাড়ি বর্দ্ধমান॥
ভাঙ্গলো রাণীর হাটা—
ভাঙ্গলো রাণীর হাটা, দালান কোঠা, জজসাহেবের কুঠি।
রাজবাড়ী ছাড়ি বান যান গুটিগুটি॥
এবারে বান বাহির হলো—

এবারে বান বাহির হলো, রাত পোহালো, চল্‌লো মাঠে মাঠে।
গঙ্গায় মিশায় বান অম্বিকার ঘাটে॥
বারশ' ত্রিশ সালে—
বারশ' ত্রিশ সালে, বরষাকালে, ভাঙ্গলো নফর দাস।
কেউ হলো পাত্‌ড়ে রাজা—কারো সর্ব্বনাশ॥*

(১) রাণীগঞ্জের নিকট ক্ষুদ্র নদী (২) 'রামায়ণ', 'দুর্গাপঞ্চ রাত্র', 'আত্মবোধ' প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িতা সুবিখ্যাত প্রাচীন কবি জগদ্রাম রায়ের নিবাস ভূমি (৩) রাণীগঞ্জ হইতে বাঁকুড়া যাইবার রাস্তায় দামোদরের অপর তীরবর্ত্তী বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত গ্রান সমূহ

* এই সঙ্গীতটি, ১২৩০ সাল আশ্বিন-সংখ্যায় 'প্রবাসী'-পত্রে ৭৪৪ পৃঃ মদীয় পিতৃদেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বীরভূমে সাহিত্য-চর্চ্চা— প্রথম প্রস্তাব

বীরভূমে সাহিত্য-চর্চ্চার ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিবার আকাঙ্খা রহিলেও, তাহা এখন সম্পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর নহে। কেননা, এখনও কত কত যে উৎকৃষ্ট পুস্তক, মহাজনের পদাবলী ও বিবিধ সন্দর্ভ লোক-লোচনের অন্তরালে পুঁথির মধ্যে লুক্কায়িত আছে, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। আমাদের রতন-লাইব্রেরীতে নিয়তই যে পুঁথি সমাহৃত হইয়া সঞ্চিত হইতেছে, তাহারই মধ্যে অগণিত নূতন পুস্তক ইত্যাদির সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া আমরা বিস্মিত ও পুলকিত হইতেছি। ইতিমধ্যে কত গ্রন্থকারের কত পরিশ্রমের ফল যে অযত্ন ও অন্যান্য কারণবশতঃ নষ্ট বা চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে! যাহাই হউক, দেশের সমগ্র পুঁথি একত্র একস্থানে সংগৃহীত হইবে, তাহার আশু সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা এরূপ আলোচনা হইতে বিরত হইতে পারি না। যাহা কিছু উপকরণ আছে, তাহা লইয়াই আমরা বীরভূমের সাহিত্যালোচনার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

এই অধ্যায়ে সাহিত্য-চর্চ্চার ইতিহাসের ধারা অনুসন্ধান করাই উদ্দেশ্য। ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে কেবলমাত্র বিষয়-বিশেষের খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের নামোল্লেখ করিতে হইবে— কিন্তু ছোটবড় সকল গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ সম্ভবপর হইবে না। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বীরভূমের যাবতীয় সাহিত্য সেবকগণের বর্ণানুক্রমিক নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের পরিচয় ও গ্রন্থাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা যে কয়জন গ্রন্থকারের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া ধন্য হইবার আকাঙ্খা করিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ বিচ্ছিন্ন মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু, নিবিড় শ্যাম-শোভার মধ্যবর্ত্তী সুদূর সংস্থিত গগনস্পর্শী সুবিশাল বনস্পতিচয়ের সাক্ষাৎলাভ করিয়া যেমন তাহার চতুঃস্পার্শ্ববর্ত্তী অগণিত ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ ও গুল্মরাজির অস্তিত্ব কল্পনা স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়, তদ্রূপ এই

বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বীরভূমের সাহিত্যিকগণের চতুঃপার্শ্বে অগণিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ কবিবৃন্দের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া আমরা বহু আশায় উৎফুল্ল হইয়াছি। আমাদের দৃঢ় ধারণা, আমরা আশাহত হইব না। আমাদের সংগৃহীত পুঁথি হইতেই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি।

সাময়িক বিপ্লবের ক্ষণিক উত্তেজনায় বীরভূমবাসী নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট, এই অনুযোগ যেরূপ সত্য, সমাজের মঙ্গলকর, জাতির উন্নতিকর শাশ্বত ও সুন্দর সৎসাহিত্যের আলোচনায় বীরভূমবাসী আবহমানকাল ধীরক্ষেপে ও দৃঢ়পদে অগ্রসর –একথাও তদ্রূপ ইতিহাস ও অনুসন্ধান দ্বারা অভ্রান্তরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। বীরভূমবাসী কোনকালেই বাহ্য উত্তেজনার প্রবল তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া স্থানচ্যুত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া দূরদূরান্তরে ভাসিয়া যান নাই। কোনকালেই তাঁহারা তাঁহাদের বহু সাধনার ধন, সুন্দরের উপাসনা, সত্যের আলোচনা – সাহিত্যসেবার অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া যান নাই।

আমাদের দেশ ধর্ম্মপ্রধান দেশ। ধর্ম্মান্দোলনের মধ্য দিয়াই আমাদের সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ সাধন হইয়াছে। যে ধর্ম্ম যে সময়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, –বঙ্গ-সাহিত্য সেই ধর্ম্মের সেবা ও পরিচর্য্যা করিয়া তাহার ভাবপুষ্টি ও প্রাধান্য সংস্থাপনের সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছে। কালে, চিরন্তন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লৌকিকধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও পতন সংগঠিত হইয়াছে– কোন কোন ধর্ম্মমতের নাম পর্য্যন্ত চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সাহিত্য, সেই সেই ধর্ম্মের নিদর্শন সংরক্ষিত করিয়া অজ্ঞাতসারে নিজ অঙ্গ পরিপোষণের যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমাদের বীরভূমি এই সকল ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের লীলাভূমি ও প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র। অতি প্রাচীনকালের কথা এখনও প্রত্নতত্ত্বজ্ঞের আলোচনার দ্বারা সম্যক্ পরিস্ফুট হয় নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কথা– অন্যূন সহস্র বৎসরের কথা– আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে আমাদের দেশে বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহার নিদর্শন রক্ষা করিয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম, এখন আমাদের দেশ হইতে একেবারে বিতাড়িত হইলেও, ইহা আমাদের দেশে যে এককালে বিশেষরূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন, বৌদ্ধ-প্রাবল্যের সহস্র বৎসর পরেও, প্রতি পল্লীতে দেখিতে পাইতেছি। ইহা এখন অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে আমাদের দেশে ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধধর্ম্মাচরণের নামান্তর মাত্র। আমাদের বীরভূমে এমন পল্লী নাই যেখানে ধর্ম্মরাজ পূজার ব্যবস্থা নাই। এই ধর্ম্মরাজ পূজার প্রচলন জন্য বঙ্গ-সাহিত্যে 'ধর্ম্মমঙ্গল' বা তদ্‌ভাবসূচক

বহু গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়াছে। এই ধর্ম্মমঙ্গলাখ্য কাব্য রচয়িতাগণের মধ্যে **ময়ূরভট্ট** আদি কবি বলিয়া স্বীকৃত। বীরভূমে সেই ময়ূরভট্ট-বিরচিত 'ধর্ম্মমঙ্গল'-গ্রন্থ এবং **শ্যাম পণ্ডিত** বিরচিত 'ধর্ম্মপুরাণ'-গ্রন্থ মদীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় ১৩০৭ সালে আবিষ্কার করিয়া স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পর এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রচারকল্পে তিনি কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত নহি[১]। তবে আমার পিতৃদেব মহাশয় এই গ্রন্থদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ১৩০৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা "বীরভূমি" মাসিক-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, **নরসিংহ বসু,**[২] **হৃদয়রাম সৌ, ধর্ম্মদাস, বিশ্বনাথ দাস** প্রভৃতি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য, বা ইহার অংশবিশেষ বা এতৎসংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যান রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিলোপের পর হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময় **শৈবধর্ম্মের** প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। বীরভূমের বৈদ্যনাথ (তখন বীরভূমের অন্তর্গত), বক্রেশ্বর, মল্লেশ্বর এবং অন্যান্য শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা-ক্ষেত্র দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বীরভূমবাসী-বিরচিত শিবায়ন গ্রন্থের অভাব নাই। এখনও পর্য্যন্ত ভিক্ষুকগণ অতি প্রাচীনকালের বিরচিত শিব-মাহাত্ম্য সূচক গ্রাম্য-কবির গান গাহিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া থাকে।

শৈব ধর্ম্মের প্রাধান্য মন্দীভূত হইলে **শাক্তধর্ম্মের** অভ্যুত্থান হয়। বীরভূমের অন্তর্গত তারাপুর, ফুল্লরা, কঙ্কালী প্রভৃতি পীঠস্থানের নামেই সুপ্রকাশ। চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা দুর্গা-মাহাত্ম্য প্রচারক গ্রন্থ বীরভূমবাসী বঙ্গ-সাহিত্যে উপহার দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরে উল্লিখিত হইল।

শক্তি-ধর্ম্ম ও ব্যভিচারদুষ্ট **বৌদ্ধতন্ত্রের** প্রাবল্যের সময় যখন দেশে ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার স্রোত অবাধগতিতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন তাহার প্রতিক্রিয়ারূপ প্রবল শক্তির আবির্ভাব হইবার উপক্রম হইল। শক্তিপূজকগণও বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য গান করিয়া ব্যভিচার তরঙ্গের বিরুদ্ধে উজান বাহিয়া সমগ্র দেশ প্রেম-বন্যায় প্লাবিত করিবার উপক্রম করিলেন। জগতের শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি বীরভূমবাসী **জয়দেব** ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালের সাধক-কবি **চণ্ডীদাস** এই প্রতিক্রিয়ার সাধক ও প্রবর্ত্তক। জগদ্বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিদ্বয়- "মধুর কোমলকান্ত পদাবলী" রচয়িতা শ্রীজয়দেব গোস্বামী এবং ভগবৎ-প্রেমের সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণকারী অদ্বিতীয় কবি চণ্ডীদাস–যাঁহার মর্ম্মস্পর্শী ভাষা 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া মনপ্রাণ আকুল' করিতে থাকে– সাহিত্যে যে কি স্বর্গীয় সম্পদ্ দান করিয়াছেন, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক মনে করি না।

যখন জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতির কবিত্বশক্তি ও ভগবৎ-প্রেমের পুণ্য-

প্রভাবে হৃদয়হীন দেশ সম্যক্‌রূপে কর্ষিত হইয়া গেল, সেই সময় বীরভূমের একচক্রায় প্রেমের অবতার **শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু** ও নবদ্বীপে **শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের** শুভ আবির্ভাব হইল। চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাস্বর দীপ্তালোকের রশ্মি-রেখা সম্পাতে প্রেম-সরোবরে অগণিত শতদল যুগপৎ প্রস্ফুটিত হইয়া সমগ্র ভুবন আলোকিত এবং অপূর্ব্ব সৌরভে ক্ষুদ্র মানবচিত্তকে প্রমত্ত করিয়া তুলিল। নিতাই চাঁদের স্নিগ্ধ রশ্মির সুখস্পর্শে একেবারে শত শত কুমুদ দিগ্‌দিগন্ত সমুদ্ভাসিত করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। গৌর নিতাই-এর প্রেম পীযূষধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া ক্ষীণপ্রাণ ও হীনবুদ্ধি মানবের মুগ্ধচিত্ত স্ফূর্ত্তিলাভ করিল-- ফলে, দেশময় গ্রামে গ্রামে একাধারে অগণিত ভক্তকবি ও প্রেমিকের উদ্ভব হইল।

প্রেমাবতার শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর[২] আবির্ভাবে পবিত্রীকৃত বীরভূমি এ-বিষয়ে সমধিক ভাগ্যবান। তাঁহারা এই দেশপ্লাবী অমৃতস্পর্শী প্রেমবন্যায় অভিসিঞ্চিত হইয়া, সেই প্রেম প্রকাশের প্রচেষ্টায় বঙ্গ-সাহিত্য যে কিরূপ পরিপুষ্ট করিয়াছেন, তাহা ভাষায় সম্যকরূপ বর্ণন করা যায় না।

তৎকালীন বীরভূমির অন্তর্গত সমগ্র মনোহরসাহী পরগণা, বলিতে কি সমগ্র বীরভূমি, তারস্বরে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে গান ধরিলেন, তাহার তুলনা নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা, আমাদের **জ্ঞানদাস, নয়নানন্দ দাস, লোচন দাস, জগদানন্দ, কৃষ্ণপ্রসাদ, নৃসিংহবল্লভ, অকিঞ্চন দাস, কান্ত দাস, মুকুদানন্দ, চন্দ্রশেখর, শশীশেখর, বিশ্বম্বর, যাদবেন্দু, স্বর্ণলালী** প্রভৃতি অগণিত বৈষ্ণব কবির নাম করিয়া ধন্য হইতে পারি।

পরম বৈষ্ণব শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রবর্ত্তিত গড়াণহাটি এবং তদানীন্তন বীরভূমের অন্তর্গত মনোহরসাহী পরগণার দেশবিখ্যাত পদকর্ত্তা **জ্ঞানদাস** প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত মনোহরসাহী কীর্ত্তনই প্রধান। এই কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক, পরিপোষক ও গায়কগণ, বঙ্গসাহিত্যে যে পদাবলী উপহার দিয়াছেন, তাহা জগতের যে-কোন সাহিত্যে দুর্ল্লভ। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান একচক্রা বীরচন্দ্রপুরে পরম বিরক্ত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, দাসঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি মনস্বীবৃন্দ সম্মিলনে ভগবৎ-মাহাত্ম্য সূচক গীত রচনায় এবং ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় বঙ্গ-সাহিত্যের যে অঙ্গপুষ্টি হইয়াছে, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত।

লৌকিক ধর্ম্মালোচনায় বীরভূমি অনবহিত নহে। মনসা, শীতলা, ওলা প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা বীরভূমে যথেষ্টরূপ প্রচলিত আছে। ইতর শ্রেণীর মধ্যে এই সকল লৌকিক দেবতার পূজা-পদ্ধতি আবদ্ধ রহিলেও, ইহাদের মাহাত্ম্য-সূচক গ্রন্থের অভাব নাই। মনসার মাহাত্ম্য-প্রচারক গ্রন্থ মনসামঙ্গল গ্রন্থের আজ পর্য্যন্ত ৬০/৭০ জন রচয়িতার নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে, আমাদের বীরভূমের **বিষ্ণুপাল** রচিত মনসামঙ্গল গ্রন্থ, উপাখ্যান বর্ণনায় অপরাপর অনেক গ্রন্থ অপেক্ষা

অতি বৃহৎ। এই গ্রন্থখানি এখনও অপ্রকাশিত— এমন কি, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে ইহার নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই!

জাতি-বিজ্ঞান বিষয়ক কুলজী-শাস্ত্রপ্রসঙ্গ বিষয়ে **ঘনশ্যাম মিত্র** ও **শ্যামদাসের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।**

সত্যনারায়ণ ব্রতকথা, সুদামা চরিত্র, ধ্রুব চরিত্র প্রভৃতি সন্দর্ভশাখায় **রামভদ্র, অমরসিংহ, জয়দেব, বেচারাম, দ্বিজ পরশুরাম, নন্দলাল,** প্রভৃতি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভাগবতদাস ঘোষ প্রণীত গঙ্গারস্তব, **দ্বিজ রামকান্তের** বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্য, **বংশীদাসের** অনিল পুরাণ, **শ্রীকান্ত মিত্রের** নামাবলী প্রভৃতি উল্লেখ করা আবশ্যক।

ভারতচন্দ্রীয় যুগে ভাষার মধ্যে যখন অজস্রভাবে অবাধগতিতে অশ্লীলতার প্রখর স্রোত প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, সেই সময় ভারতচন্দ্রের বংশের অপর এক শাখার বীরভূমবাসী **গঙ্গানারায়ণ,** অশ্লীলতাবিবর্জ্জিত 'ভবানীমঙ্গল' নামক সুবৃহৎ সুলিখিত কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ এ-যাবৎ অপ্রকাশিত রহিয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যে অশ্লীলতা ভারতচন্দ্রীয় যুগের নিদর্শন বলিয়া এতদিন বিঘোষিত হইতেছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে সত্য নহে। পরন্তু, ধনী-বিশেষের অমার্জ্জিত রুচির কতিপয় কবির দুষ্ট রচনা মাত্র। এই গ্রন্থ, আমাদের রতন-লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

বীরভূমে বহুসংখ্যক কবি-সঙ্গীত রচয়িতাগণের আবির্ভাব হইয়াছে। **অক্ষয় ঠাকুর, ছিরু ঠাকুর** (সৃষ্টিধর ঠাকুর), **খোড়া নন্দ, লালু নন্দলাল, নিতাই দাস, জীবন উড়ে, বনোয়ারী চক্রবর্ত্তী** প্রভৃতি কবি-সঙ্গীত রচনা করিয়া, দেশমধ্যে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণযাত্রার পালা রচনার প্রবর্ত্তক **পরমানন্দ অধিকারী** বীরভূমেরই অধিবাসী।

চরিত-গ্রন্থ রচয়িতাগণের মধ্যে 'জয়দেব'-রচয়িতা **বনমালী দাস** ও **"কনকধাম"** রচয়িতা **রুক্মিণীকান্ত মিত্রের** নাম উল্লেখযোগ্য, রুক্মিণীকান্তের স্বহস্তলিখিত সুবৃহৎ "কনকধাম" (চৈতন্য-চরিত) ও অন্যান্য নানাবিধ সন্দর্ভ ও গান, আমাদের রতন-লাইব্রেরীতে সুরক্ষিত আছে।

মহারাজা **নন্দকুমার রায়,** দেওয়ান **কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গণেশ, জগমোহন, উত্তমদাস, মনমহেশ, ভূতনাথ, দুর্গারাম** প্রভৃতি, শ্যামা ও উমাবিষয়ক গান, রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত, বীরভূমবাসী কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইতে গৌড়ীয় ভাষায় অর্থাৎ

বঙ্গভাষার কবিতায় অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও অল্প নহে। রাসদাস বিরচিত শ্রীমদ্ভগবদগীতার অনুবাদ, গিরিধর ও প্রাণকৃষ্ণ দাস প্রণীত 'গীত-গোবিন্দে'র অনুবাদ, দ্বিজ মাধবেন্দ্রের 'ভাগবতামৃত', নয়নানন্দ ঠাকুরের "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" গ্রন্থের অনুবাদ "শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব" প্রভৃতি গ্রন্থ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

জগদানন্দ ঠাকুরের 'শ্যামচন্দ্র চন্দ্রোদয়' ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'রামচন্দ্র চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

এতদ্ব্যতীত, নদেরচাঁদ পাল প্রণীত রামশক পাঁচালী ও বহু পল্লীকবির রচিত গান, যাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের নাম উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করি।

পদাবলী সংগ্রহ-গ্রন্থের মধ্যে রাধামুকুন্দ ঠাকুরের "মুকুন্দানন্দ" গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ইহা, আলঙ্কারিক সূত্রানুযায়ী গ্রথিত একটি বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ-গ্রন্থ। এই গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। গ্রন্থের আকার তাদৃশ বৃহৎ না হইলেও, ইহাতে "পদকল্পতরু" প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক নূতন বৈষ্ণব-কবির পদাবলী সন্নিবেশিত আছে।

বীরভূমে প্রাচীন বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের নিদর্শন, রতন-লাইব্রেরীতে সংগৃহীত বহু প্রাচীন পুঁথির সহিত রক্ষিত দলীল, সনন্দ, দানপত্র, পত্রাবলী ইত্যাদি বৈষয়িক ও ব্যবহারিক ব্যবস্থা বিষয়ক যাবতীয় কাগজ-পত্র হইতে, অল্পাধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইয়া পিতৃদেবের সম্পাদকতায় Types of Early Bengali Prose নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এইজন্য এই স্থলে আমরা তদ্বিষয়ের পুনরালোচনা করিলাম না।

তথ্যসূত্র

(১) ১৩৩৭ সালে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায়, এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার আদর্শ পুঁথি আধুনিক।

(২) পরবর্তী অধ্যায়ে 'একচক্রা-প্রসঙ্গে', শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য : এই অধ্যায় রচনায়, পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়-রচিত প্রবন্ধাবলী ও আমাদের রতন-লাইব্রেরীর পুঁথির তালিকা হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি— গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় খণ্ড

ইংরাজাধিকারে বীরভূমি

প্রথম অধ্যায়

বীরভূমে পাশ্চাত্য বণিক্

পূর্ব্বানুবৃত্তি— অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে ইংরাজগণ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষভাবে বীরভূমের শাসনভার গ্রহণ করিবার কথার ইঙ্গিত মাত্র করিয়া আমরা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পরিসমাপ্তি করিয়াছি[১]। এই অংশে, মুসলমান আমলের কথা শেষ হইলেও তাহদের ভাগ্য বিপর্যয়ের সূচনার বহু পূর্ব্ব হইতেই যে পাশ্চাত্য বণিক্ সম্প্রদায় বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগমন করিয়া বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারতের, তথা বঙ্গের, নানাস্থানে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সূত্রপাত করিয়াছিল, ভারতবর্ষের বা বঙ্গের ইতিহাসের পাঠকগণ তাহা সম্যক্‌রূপে বিদিত আছেন। মুসলমান আমলের শেষাংশের কথা বর্ণন-প্রসঙ্গে, বীরভূমের এই বণিক্ সম্প্রদায়ের কথা বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য। কিন্তু বিষয়বিভাগ সৌকর্য্যার্থ আমরা স্বতন্ত্র ও বিশদভাবে এই বণিক্-সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করিবার উদ্দেশে, সে-সময় এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। এখন আমরা এই পাশ্চাত্য বণিক্-সম্প্রদায়ের, বীরভূমে বাণিজ্য-প্রচেষ্টার কথা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্ব সূত্রের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম।

বীরভূমের বাণিজ্য-সম্পদ —— পলিমাটিময় অনুগঙ্গ প্রদেশ হইতে প্রস্তর ও কঙ্করময় সুদূর দেওঘরের পাহাড় ও জঙ্গলময় সুবিস্তীর্ণ বীরভূম প্রদেশ ভাগ্যান্বেষী পাশ্চাত্য বণিক্‌গণের সতর্ক ও সন্ধানী দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। এই নিমিত্ত, ইংরাজ ও ফরাসী বণিক্ সমূহ ক্রমে ক্রমে বীরভূমে আসিয়া লৌহ, তসর, রেশম, গালা, নীল, কার্পাস প্রভৃতির ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া লইল।

ইংরাজ বণিকের "মানদণ্ড" ক্রমে কি ভাবে "রাজদণ্ড" রূপে পরিণত হইল, কি ভাবে Factor ক্রমে Collector এ পরিণত হইল[২]– তাহা বঙ্গের ও ভারতের ইতিহাসের সর্ব্বজনবিদিত সাধারণ কথা। আমরা সে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। কেবল মাত্র, বীরভূমে সাক্ষাৎভাবে যে সকল বণিক্-সম্প্রদায় এখানে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে এ জেলার

বিভিন্ন স্থানে কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান অধ্যায়ে কেবল মাত্র তাঁহাদেরই কথা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি।

ইংরাজ, ফরাসী ও অপর কয়েকজন স্বতন্ত্র বণিক্ ব্যতীত পর্ত্তুগীজ ওলন্দাজ বা দিনেমার বণিকের নাম বীরভূমি প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং, আমরা ইংরাজ বণিকসঙ্ঘ (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) ও ফরাসী বণিকসঙ্ঘের উৎপত্তি ও এ-দেশে আগমনের কথা, সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া এই বণিক্-সম্প্রদায়ের বীরভূমে প্রচেষ্টার কথা লিপিবদ্ধ করিব। এতৎপ্রসঙ্গে স্বতন্ত্র বণিকের কথাও বিবৃত হইবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী — সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে এক জন ইংরাজ পর্য্যটক, ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিয়া এদেশের ধন-সম্পদ এবং ইউরোপীয় বণিক্গণের বাণিজ্যের সুবিধার কথা প্রচার করেন। এই সংবাদে লুব্ধ হইয়া কতিপয় ইংরাজ বণিক ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজ্ঞী এলিজাবেথের নিকট ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্য এক অনুমতি-পত্র বা সনন্দ গ্রহণ করেন। এই বণিক্-সম্প্রদায় **ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী** নামে খ্যাত। ক্রমে, এই কোম্পানী বল সঞ্চয় করিয়া ১৬০৮, ১৬৩১ এবং ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে, নানা উপলক্ষে দিল্লী সম্রাটের প্রসন্নতা লাভ করিলেন এবং তাঁহারা সুরাট নগরকে বাণিজ্যের কেন্দ্র করিয়া দুর্গাদি নির্ম্মাণ দ্বারা ইহাকে সুরক্ষিত করিয়া তুলিলেন। তদনন্তর তাঁহারা শাহজাহান বাদসাহের নিকট বিনা শুল্কে বাঙলায় ব্যবসায় করিতে এবং বালেশ্বর ও হুগলীতে কুঠী স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু আওরঙ্গজেব, ইংরাজ বণিক্দের উপর "জিজিয়া কর" ধার্য্য ও অন্যান্যরূপ অত্যাচার করিলে তাঁহারা হুগলী পরিত্যাগ করিয়া মাদ্রাজে প্রস্থান করিলেন। ইহার পর, তাঁহারা বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকা কর দিয়া সর্ব্ববিধ শুল্কের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। অতঃপর তাঁহারা হুগলীর পরিবর্ত্তে গঙ্গার পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কালীঘাট—এই তিন খানি গ্রামের মালিকানা স্বত্ব ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এইরূপে তাঁহারা বাৎসরিক প্রায় ১১৯৫ টাকা রাজস্বের পরিবর্ত্তে প্রথম জমিদারী স্বত্ব অর্জ্জন করিয়া কুঠী নির্ম্মাণ করিলেন[৩]। ইহার অল্পকাল পরই, তাঁহারা তাঁহাদের নবক্রীত স্থান সুরক্ষিত করিবার জন্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে বাদসাহের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিলেন এবং তদানীন্তন ইংলণ্ডের রাজা উইলিয়মের নামানুসারে ইহার নাম রাখিলেন— **ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ**[৪]।

অতঃপর আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর প্রায় ৪০ বৎসর কাল, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত ইংরাজ বণিকগণ কলিকাতার জন্য বাঙলার নবাবকে এবং মাদ্রাজের জন্য কর্ণাটের নবাবকে যথারীতি কর প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ব্যবসায়-

বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। তখন তাঁহারা দেশের কোনরূপ শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হন নাই, বা এরূপ করিবার তাহাদের কোনরূপ কল্পনা ছিল বলিয়া মনে হয় না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর ভারতে ব্যবসায়ে অত্যধিক লাভের কথা শুনিয়া অপর কতকগুলি ইংরাজ বণিক্ এইরূপ কোম্পানী গঠন করিয়া ভারতে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে এই সকল কোম্পানী একত্র হইয়া **সম্মিলিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী** নামে একটি বৃহত্তর কোম্পানী গঠন করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট কেবল তাঁহারাই ভারতে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করেন।

ফরাসী বণিক্ — ফরাসী বণিকগণও ইংরাজদের প্রায় সমকালেই ভারতে বাণিজ্য করিতে আগমন করেন। তাঁহারা প্রথমে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে সুরাটে, ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডীচারীতে এবং ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে কুঠী স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত, মাহী ও কারিকেল প্রভৃতি কয়েকটি স্থানেও তাঁহাদের কুঠী সংস্থাপিত হয়। পণ্ডীচারীতেই ফরাসীগণ তাঁহাদের বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থাপন করেন। ইহা এখনও পর্য্যন্ত ভারতে ফরাসী-অধিকৃত স্থান সমূহের রাজধানী রহিয়াছে। কলিকাতার একুশ মাইল দূরবর্ত্তী চন্দননগরও ফরাসিগণের অধিকারে রহিয়াছে[৫]। ইংরাজ ও ফরাসী—এই দুই বণিক্ সম্প্রদায়ের বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। ইউরোপে ফরাসী ও ইংরাজে যুদ্ধ বাধিলে ভারতেও তাঁহারা প্রকাশ্যে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসিগণের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কর্ণাটের যুদ্ধ তাহার প্রমাণ। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ও ইংরাজদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে, ফরাসিগণ পণ্ডীচারী পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া নিরাপদে বাণিজ্য-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন[৬]।

বীরভূমের ফরাসী কুঠীয়াল — ফরাসী বণিক্গণ বীরভূমে বহুদিন হইতেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে মন্-লি-সিনর (Mon Le Seigneur) বীরভূমে আসিয়া সুরুলে, তদানীন্তন কালের খ্যাতনামা আনন্দচন্দ্র গোস্বামীর নিকট কয়েক বিঘা ভূমি গ্রহণ করেন। ইহাতে তিনি একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাই কুঠী বা আড়ং বলিয়া প্রচারিত করেন। এই কুঠীতে তিনি ফরাসী পতাকা উড্ডীন করিয়া কুঠীর সংরক্ষণ জন্য প্রহরী নিযুক্ত করেন। পূর্ব্বে ফরাসী বণিক্গণ গোমস্তার মধ্যস্থতায় কার্য্য করিতেন। তদনন্তর তিনি দালালের মধ্যস্থতায় সূতার **গড়ার কাপড়** (দেশী সূতার ছোট বা খাটো কাপড়) তৈয়ারি করিবার জন্য বাৎসরিক ১২৫০০০্ টাকা দাদন দিতে লাগিলেন এবং গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া তন্তুবায়দের উপর মহশীস দিয়া দাদনের টাকার পরিবর্ত্তে **গড়ার কাপড়** আদায় করিতেন। অনাদায় হইলে, কখন কখন তাহাদের দণ্ডবিধান করিতেন এবং

কোম্পানীর দালালের মত প্রায় সমান ভাবেই দেশে কর্ত্তৃত্ব করিতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ফরাসিগণ সাধারণতঃ গোমস্তার মধ্যস্থতায় তাঁহাদের কারবার চালাইতেন—স্বয়ং কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত রহিতেন না। একমাত্র সিনর সাহেবই কেবল তাঁহার নির্ম্মিত আড়ংএ অবস্থান করিতেন বলিয়া কথিত হয়। অনুমান ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এই আড়ং পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। তৎপরে তাঁহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই এবং তাঁহার অনুপস্থিতকালেও কোনরূপ দাদন প্রদত্ত হয় নাই।

মিঃ চৌবন ও মিঃ আরিঅর (Messrs Chauban and Arrear) ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে এই দুইজন ফরাসীর কর্ত্তৃত্বে সুপুরে একটি আড়ং বা কুঠী স্থাপনের সংবাদ অবগত হওয়া যায়। তাঁহারাও তাঁহাদের কুঠীতে ফরাসী পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত বীরভূমের তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ সারবার্ণ (Mr. Sherburne) তাঁহাদিগকে ফরাসী পতাকা উড্ডীন করিতে নিষেধ করেন এবং তাঁহার আদেশ যাহাতে অবিলম্বে ও নির্ব্বিচারে প্রতিপালিত হয়, তন্নিমিত্ত তিনি জোর করিয়া এই কুঠীর পতাকা তুলিয়া লইবার জন্য তদানীন্তন Assistant Collector Mr. Arbuthnot কে সুপুরে প্রেরণ করেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ও ফরাসীর যুদ্ধ বাধিলে তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট, পূর্ব্বোক্ত দুইজন ফরাসী বণিকের নিকট বৃটিশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবেন না এবং অপর কোন নূতন কার্য্যে লিপ্ত হইবেন না—এইমর্ম্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি সুপুরে অবস্থিত ফরাসীদের একটি ভগ্নগৃহ অধিকার করিয়া লন। অতপরঃ সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে মিঃ চীপের (Mr. John Cheap) উপর, ফরাসী বণিকগণের সুপুরের কুঠী পরিচালনার ভারার্পণ করা হয়[৭]।

বীরভূমের ইংরাজ কুঠীয়াল— মন্বন্তরের পরে দেশে যে কিরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল তাহার বিশদ পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে[৮]। সমগ্র দেশ জঙ্গল ও পতিত ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল-দস্যুতস্করগণ সমগ্র দেশ তাহাদের লীলাভূমি করিয়া তুলিয়াছিল! কিন্তু এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহাদের বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হয় নাই! পরন্তু, সমধিক উৎসাহের সহিত তাহারা ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিতেছিল। এই কোম্পানী রেশমের কারবার একচেটিয়া করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাহাদের এই ব্যবসায়-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য তাহারা একজন Commercial Agent বা ব্যবসায়িক প্রতিনিধি নিযুক্ত করে। ইনি নিজেও স্বতন্ত্রভাবে কোম্পানীর জ্ঞাতসারেই ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পারিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কোম্পানীর এই কার্য্যে প্রায় সাড়ে চারি হইতে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার কারবার চলিত। কোম্পানী এই ব্যবসায়ের জন্য

প্রচুর পরিমাণে দাদন দিয়া দেশের সমস্ত শিল্পীকে হস্তগত করিয়া কার্য্য চালাইত। রাইপুরের বর্ত্তমান সিংহ-বংশের পূর্ব্বপুরুষ লালচাঁদ সিংহ মহাশয়, তাঁহার পূর্ব্বনিবাস চন্দ্রকোণা অঞ্চল হইতে প্রায় হাজার ঘর তন্তুবায় আনয়ন করিয়া সুরুলের নিকটবর্ত্তী তাঁহার বাসস্থান রাইপুর ও তৎসন্নিহিত গ্রামগুলিতে স্থাপন করেন। এই হাজার ঘর তাঁতি, প্রতিদিন হাজার থান করিয়া **গড়ার কাপড়** (দেশী সূতার ছোট বা ঠেঁটি কাপড়) চীপ্ সাহেবের নিকট বিক্রয় করিত। ইহাতে তিন পক্ষই যথেষ্ট লাভবান হইত।

এই সকল শিল্পীদের সর্ব্ববিধ স্বার্থ রক্ষা কোম্পানীর কর্ত্তব্য বলিয়া তাহাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় অত্যাচার হইলে ব্যবসায়িক প্রতিনিধি কালেক্টরের গোচরীভূত করিয়া তাহার প্রতিকার সাধনে তৎপর হইতেন।

একবার ডাকাইতের হস্ত হইতে তন্তুবায়গনকে রক্ষা করিবার জন্য ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইলামবাজারে একদল সৈন্য প্রেরিত হয় এবং ইহার অব্যবহিত পরই একদল দস্যু কোম্পানীর মালপত্র লুণ্ঠন করিয়া লয়। কোম্পানীর প্রতিনিধি গভর্ণর জেনারলকে এই কথা নিবেদন করিলে, তিনি সেই স্থানের জমিদারকে অপহৃত দ্রব্যাদি ফিরাইয়া দিতে, অথবা দস্যুতস্করদিগকে ধরিয়া আনিতে আদেশ প্রদান করেন। পরন্তু ইহাও আদেশ দেন যে অচিরেই এই আদেশ প্রতিপালন না করিলে, তাঁহার জমিদারীর কতকাংশ বিক্রয় করিয়া অপহৃত দ্রব্যের মূল্য আদায় করা হইবে। এই ভাবে সরকার বাহাদুর, কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতেন[১]।

(ক) **মিঃ চীপ্** (Mr. John Cheap) নামক Bengal Civil Service ভুক্ত একজন ইংরাজ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে বীরভূমে সর্ব্বপ্রথম রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি প্রধানতঃ বোলপুরের দুই মাইল পশ্চিমে এবং সদর সিউড়ীর বিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত সুরুল নামক গ্রামের উত্তর পশ্চিমাংশের বিশাল ডাঙ্গায় তাঁহার ব্যবসায়-কেন্দ্র করিয়া তথায় সুবৃহৎ কুঠী ও কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সুরুলে চীপ্ সাহেবের বিশাল কুঠীর ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। এই কুঠীর সংলগ্ন স্থানে তিনি বহু গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া চতুঃপার্শ্বে জলাশয় খনন করিয়াছিলেন। ফলে, সে সময় চীপ্ সাহেবের কুঠী একটি দুর্গের ন্যায় মনে হইত। এই কুঠী পাহারা দিবার জন্য সদাসর্ব্বদা সিপাহী নিযুক্ত থাকিত। ইহা এখন সালের জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

চীপ্ সাহেব, তাঁহার ব্যবসায় উপলক্ষ ব্যতীত দেশের লোকের সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশিয়া তাহাদের বিবাদ-বিসম্বাদ আপোষে নিষ্পত্য করিয়া দিতেন— দস্যু তস্করদিগের হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন। দেশবাসিগণও আন্তরিক

প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে যথাসাধ্য উপঢৌকনাদি দিয়া আনন্দলাভ করিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম করিলেও রেসিডেন্ট বা প্রতিনিধিগণের স্বতন্ত্রভাবে কারবার করিবার কোনরূপ বাধা ছিল না। জন চীপ্ সাহেব নিজে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি এই জেলায় সর্ব্বপ্রথম নীলের চাষের প্রবর্ত্তন করেন এবং ইউরোপ হইতে যন্ত্রাদি আনয়ন করিয়া, এদেশে উন্নততর প্রণালীতে গুড় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। তিনি স্বনামে যে কারবার চালাইতেন, সেই কারবারের নাম এতদঞ্চলে বহুদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

চীপ্ সাহেব এ দেশের অন্যবিধরূপেও অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে সিউড়ী হইতে সুরুল ও তথা হইতে বর্দ্ধমান ও গনুটিয়া এবং সুরুল হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত— এই চারিটি সুদীর্ঘ পথ প্রস্তুত করিয়া বীরভূমবাসীর পরম উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

জন চীপ্ সাহেব সুদীর্ঘ ৪১ বৎসরকাল রেসিডেন্টের কার্য্য করিয়া ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ৬২ বৎসর বয়সে গনুটিয়ার কুঠীতে পরলোকগমন করেন। এখানে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন— দেশের লোক তাঁহার দর্শন পাইলেই যেন কৃতার্থ হইত!

(খ) মিঃ ফ্রুসাড় (Mr. Frushard)– ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর Commercial Resident বা ব্যবসায়িক প্রতিনিধি, ঠিকা প্রথায় কার্য্য করিবার জন্য তাঁহার অধীনে Agent বা দালাল নিযুক্ত করিতে পারিতেন। রেশমের উৎকর্ষের জন্য পাশ্চাত্য প্রদেশে বীরভূমের একটি বিশেষ খ্যাতি ছিল। এই জন্য রেশমের ব্যবসায়ের প্রসার সাধন কল্পে কোম্পানীর সর্ব্বপ্রথম সমধিক মনযোগ আকৃষ্ট হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর, তাঁহাদের রেশমের কারবার পর্য্যবেক্ষণ জন্য মিঃ ফ্রুসাড় নামক একজন শ্রমশীল যুবককে Agent বা দালাল নিযুক্ত করেন; কিন্তু পরে তাঁহাকে কার্য্যভার হইতে বিদায় দিয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে অনুমতি দেন। মিঃ ফ্রুসাড় অতঃপর ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তর তীরে গনুটিয়ায় তাঁহার রেশমের কারবারের স্থান নির্ব্বাচিত করিলেন। এখানে তিনি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ এডওয়ার্ড হে'র নিকট ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা মূল্যে গনুটিয়ার কুঠী ক্রয় করিলেন। এখানে গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে পাইকস্ত প্রজাস্বরূপ গণ্য করিয়া লইলেন এবং ইহার দুই বৎসর পর, কোম্পানী পুনরায় তাঁহাকে Commercial Agent পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহার মাত্র দুই বৎসর পরই, ময়ূরাক্ষী নদীতে প্রবল বন্যা

হইলে তাঁহার কুঠীর গৃহাদি নষ্ট হইয়া যায়। ফলে, তাঁহার আনুমানিক ১৫০০০্ পনর হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছিল। উপরন্তু, নদীর উত্তরতীরে বাঁধ দিবার জন্য তাঁহাকে ব্যয় বাহুল্য করিতে হইয়াছিল। নদীর তীরে তিনি বড় বড় পাকা পোস্তা গাঁথিয়া এবং কুঠীর চতুর্দ্দিক বহু কোণবিশিষ্ট প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া, তাঁহার সুবিস্তীর্ণ কুঠীর প্রাঙ্গণ-ক্ষেত্র সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। কুঠীর অভ্যন্তরক্ষেত্র এতই বৃহৎ যে একখানি নাতিবৃহৎ শহর বলিলেও চলে। এই কুঠীতে তখন প্রত্যহ চারি হাজার লোক কাজ করিত। এই সময় তিনি স্বাধীনভাবে নিজেই ব্যবসায় করিতেছিলেন বলিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করে নাই। বলিতে কি, দেশের লোকেরা তাঁহার নিকট সর্ব্ববিধ দ্রব্যাদির মূল্য অতিশয় বর্দ্ধিতহারেই গ্রহণ করিত[১০]।

মিঃ ফ্রুসার্ড উষ্ণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তদুপরি, তিনি এ দেশের কৃষিজীবি ও প্রজাগণের সাধারণ প্রকৃতির কথা সম্যক অবগত ছিলেন না। তবে তিনি পরম উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি ধন সঞ্চয় করিতে পারিবেন—এই বিশ্বাসে অদম্য উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। এ জন্য তিনি খরচের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই নির্ব্বিচারে দায়িকসূত্রে আবদ্ধ হইতে ইতস্ততঃ করিতেন না। ফলে, তাঁহাকে অল্প লাভে অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। তাঁহার বিবেচনাহীনতার পরিচয় স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সে-কালে যে জমি ।০ চারি আনা খাজনায় বিঘা প্রতি বন্দোবস্ত বা বিলি হইত, সেই জমি তিনি ৸০ বার আনা হিসাবে বীরভূমের রাজার নিকট খাজনা দিবার অঙ্গীকারে বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন। বীরভূমের, তথা নগরের রাজা, তখন সমগ্র বীরভূমের অধিস্বামী ছিলেন। এইরূপ অতিরিক্ত হারে খাজনা দিয়া বন্দোবস্ত লইলেন বটে, কিন্তু তিনি অল্পদিনের মধ্যেই খাজনা বাকী ফেলিলেন। এই খাজনা অনাদায়ের জন্য বীরভূমের রাজাও তাঁহার দেয় রাজস্বও দিতে পারিতেছেন না বলিয়া তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ কীটিং-এর নিকট অনুযোগ করেন। কালেক্টর কিন্তু মিঃ ফ্রুসাডের বিরুদ্ধে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না–তাঁহার কারখানার দ্রব্যাদি বা তৎসম্পর্কীয় ভূমি ক্রোক করিয়া বাকী পড়া খাজনাও আদায় করিতে পারিলেন না। কেননা, ইহাতে রেশমের কারবারে বাধা পড়িবে। তাহার ফলে, বোর্ড-অব-ট্রেড তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন। এই নিমিত্ত, তিনি বোর্ড-অব-ট্রেডে তাঁহার অভিযোগ বর্ণনা করিয়া পাঠাইলেন। তিনি বোর্ডের নিকট জানাইলেন যে কুঠীর সম্পত্তি ক্রোক করা চলে না; আর কুঠীর বর্ত্তমান মালিকও তাঁহার এলাকার বাহিরে বাস করেন বলিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তারও করিতে পারেন না। এই জন্য তিনি মিঃ ফ্রুসাডের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিতেছেন না।

মিঃ ফ্রুসাড্ সাহেবও নীরব ছিলেন না। তিনিও কোর্ট-অব-ডিরেক্টরদিগকে তাঁহার পক্ষ হইতে অভিযোগ জানাইলেন এবং লর্ড কর্ণওয়ালিসও ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অভিযোগ বিশেষরূপ সদয়ভাবে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। মিঃ ফ্রুসাডের অভিযোগের মূল কথা এই যে, সরকার বাহাদুর যেন রাজাকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার নিকট সমগ্র প্রাপ্য খাজনার দায় হইতে তাঁহাকে একেবারে মুক্ত করিয়া দেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় জানান যে, তিনি একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এইবারে তিনি তাঁহার চরম প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি বলিলেন যে তিনি অত্যধিক হারে খাজনা দিয়া ভূমি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পরে, জঙ্গল কাটিয়া তাহা কর্ষণোপযোগী করিতে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহাও মূল ধন হইতে গৃহীত বলিয়া তাহার সুদ দিতে হইতেছে। বন্যায় তাঁহার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার কারখানা মাত্র চারিবৎসর কাল চলিতেছে; কিন্তু এখনও কোনরূপ লাভ হয় নাই। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি মূলধনের মাত্র ২০০০৲ টাকা পরিশোধ করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে(১৭৯০ খৃষ্টাব্দে) খরচ চালানই অসম্ভব হইবে। সর্ব্বশেষে তিনি বলিলেন–"এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া আমি একপ্রকার নির্ব্বাসনে কাল কাটাইতেছি এবং কোন সাধারণ স্থানেও বাহির হইতে পারি না। আমি আজ ১০ বৎসর কাল দেশত্যাগ করিয়া আসিয়াছি–অথচ ফিরিয়া যাইবার কোনরূপ সংস্থান পর্য্যন্ত নাই! জীবন ধারণ করিব, তাহারও তেমন আয় নাই!"

বীরভূমের তদানীন্তন কালেক্টর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না এবং প্রতিপদেই তাঁহাকে বাধা দিতেন। কিন্তু ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে দুষ্ট গ্রহরূপে দেখিলেও, তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতেন না। পরন্তু, তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

লর্ড কর্ণওয়ালিস দেখিলেন যে অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে Mr. Frushard আর রেশম কুঠী চালাইতে একেবারেই অক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং অচিরে যে কোন সময়েই কুঠী বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহা বিবেচনা করিয়াই লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন। ফলে, তাঁহার সর্ব্ববিধ দুঃখের অবসান হইল। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ তাঁহাকে বাকী রাজস্বের দায় হইতে মুক্তি দিলেন এবং অতঃপর তাঁহার খাজনার হার অর্দ্ধেক কমাইয়া দিলেন। কলেক্টরকে আদেশ দেওয়া হইল যে মিঃ ফ্রুসাডের নিকট প্রাপ্য টাকার পরিমাণমত নগরের রাজা তাঁহার দেয় খাজনা হইতে রেহাই পাইবেন।

দালাল-প্রথার কার্য্যে যথেষ্ট লাভ হইত। বেতনভোগী কর্ম্মচারী রাখিয়া কোম্পানী সেরূপ লাভবান হইতে পারিতেন না। এই রেশমের কারবারে বোর্ড-অব-ট্রেডের প্রদত্ত মূলধন ব্যতীত ফ্রুসাডের নিজেরও কতক মূলধন নিয়োজিত

ছিল। তদুপরি, কুঠীর যাবতীয় গৃহাদিও তাঁহার নিজ ব্যায়ে প্রস্তুত। সুতরাং বোর্ড-অব-ট্রেডের ক্ষতির কোন আশঙ্কার কারণ রহিল না। যদি কোনরূপ দুর্য্যোগ বশতঃ কারবারের ঘাট্‌তি হইত, তাহা হইলে বোর্ড-অব-ট্রেড, এই কুঠী জামিন স্বরূপ বিবেচনা করিয়া নিশ্চিত রহিতেন।

মিঃ ফ্রুসাড্‌ এখন বিপুল ঋণভার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বীরভূমের একজন গণ্যমান্য স্থায়ী অধিবাসীরূপে পরিচিত হইলেন। তাঁহার মত একজন উৎসাহী ও কর্ম্মী পাশ্চাত্য-বণিক্‌, কোম্পানীর পক্ষে দেড় লক্ষ এবং গভর্ণমেন্টের আশ্রয়ে রহিয়া নিজের পক্ষেও প্রায়ই তদ্রূপ পরিমাণ অর্থ নিয়োগ পূর্ব্বক, কুঠীরকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত তিনি স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের বিপক্ষতাচরণ সত্ত্বেও পল্লী-অঞ্চলের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিলেন। বলিতে কি, তিনি তাঁহার কুঠীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে একাধারে জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন। চোর, ডাকাইত প্রভৃতির দমন করিতেন—ব্যাঘ্রাদি বন্য জন্তুর উপদ্রব হইতে বহু পল্লী রক্ষা করিতেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি কুঠীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বহু বিস্তৃত স্থান কর্ষিত করিয়া পল্লীবাসীর সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি, বীরভূমের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের প্রায় বহু জঙ্গলময় স্থানে তিনি রেশমের শাখা-কুঠী স্থাপন করিয়া তাঁহার ব্যবসায়ের প্রাসর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেন্টের অনুরোধ বশতঃ নগরের রাজা তাঁহাকে ১৫০০্‌ টাকা মাত্র খাজনায় ২৫০০ বিঘা জমি ১২ বৎসরের জন্য প্রজা বিলি করেন। এই খাজনা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া ৩৪১১্‌ টাকায় পরিণত হইয়াছিল।

তিনি তাঁহার অংশে বাৎসরিক ১২০০০্‌ টাকা কমিসন প্রাপ্ত হইলেও, এই টাকা হইতে মূলধনের সুদ উশুল দিয়া তিনি চারি হাজার টাকা মাত্র প্রাপ্ত হইতেন।

মিঃ ফ্রুসাড্‌ ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তদনন্তর পূর্ব্বোল্লিখিত মিঃ চীপ্‌ সাহেব (১৮০৭-২৮ খৃঃ) গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে ৩৪১৫্‌ টাকা খাজনায় এই কুঠী ইজারা লন। বাকী-খাজনার দায়ে গভর্ণমেন্ট কলিকাতায় ১৫৮০০্‌ টাকায় এই সুবৃহৎ কুঠী খরিদ করেন।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল গনুটিয়ার কুঠীতে চীপ্‌ সাহেবের মৃত্যু হইলে—

(গ) **মিঃ সেক্সপিয়র (Mr. Shakeaspere 1828-35)** এই কুঠীর Commercial Resident রূপে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করেন। এই সময় গভর্ণমেন্ট এই কুঠীতে রেশমের কারবার পরিচালনে বিরত হন।

ইহার পর, এই কুঠী কলিকাতার এক ইংরাজ কোম্পানীর অধিকারে ছিল। একজন পাশ্চাত্য কর্ম্মচারী এই কারবার পরিদর্শন করিতেন। কেবল গুটি হইতে সূতা নিষ্কাসন করিবার জন্যই ২৪০০ জন লোক নিযুক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত, পলু পোকা প্রতিপালন ইত্যাদি ব্যাপারেও বহুলোক নিযুক্ত থাকিত। ফলতঃ, সে সময় এই কুঠী হইতে ১৫০০০ হাজার লোক প্রতিপালিত হইত। ইহাতে বাৎসরিক প্রায় ২৪০০০০০৲ টাকার রেশম প্রস্তুত হইত। এই কুঠীর এখন সে দিন নাই—এখন ইহা চরম দশায় উপনীত হইয়াছে[১১]।

বীরভূমে অপরাপর পাশ্চাত্য বণিক্— অপরাপর কয়েকজন পাশ্চাত্য বণিক[১২] বীরভূমে ভাগ্যান্বেষণের জন্য আগমন করেন। মিঃ ফারকুহর (Mr. Farquhar) ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে বাৎসরিক ৭৬৫৲ টাকা খাজনায় তদানীন্তন বীরভূমের লোহামহল ইজারা লন। ইংরাজী ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর আমলে ইন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, দেশীয় উন্নত উপায়ে লৌহ কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্খা করিয়া বর্দ্ধমান কৌন্সিলের হাত দিয়া সরকারের নিকট প্রথম চারি বৎসর কাল বিনা শুল্কে কর্ম্ম চালাইবার পর পঞ্চম বর্ষ হইতে বার্ষিক ৫০০০৲ টাকা শুল্ক প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু এইরূপ শুল্ক প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া তাহা যথা নিয়মে প্রদান করা এক প্রকার অসম্ভব বুঝিয়া সরকার উক্ত দরখাস্তে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইন্দ্রনারায়ণ এ কার্য্যে আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

সমার হিট্‌লী কোম্পানী (Summer Heatly and Co.) পঞ্চকোটে (তখন বীরভূমের অধীন ছিল) এবং বীরভূম জেলার স্থানে স্থানে লৌহ প্রস্তুত করিবার স্বত্ব উপভোগ করিতে থাকিলে মট্ এবং ফারকুহর কোং (Motte and Farquhar & Co.) ইংরাজী ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশে কোম্পানীর জমিদারী সমূহে লৌহ প্রস্তুত ও তাহা বিনা শুল্কে বিক্রয় করিবার আদেশ প্রার্থনা করিয়া সরকারকে এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। ফারকুহর কোম্পানী প্রথমতঃ মানভূম জেলার ঝরিয়া নামক স্থানে কয়লার ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তৎকালে বীরভূমে উৎকৃষ্ট ও উপযোগী প্রস্তর প্রাপ্তির কথা শ্রবণ করিয়া তিনি অবিলম্বে ঝরিয়া পরিত্যাগ করেন এবং যে সর্ত্তে ঝরিয়ার কয়লার ব্যবসায় করিবার সম্মতি পাইয়াছিলেন, সেই সর্ত্তে ইংরাজী ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বীরভূমের বিভিন্ন স্থান হইতে লৌহ নিষ্কাশন ও ব্যবসায় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। বীরভূমে তাঁহার এই ব্যবসায়ের বিক্ষিপ্ত স্থানসমূহ সমবেতভাবে **লৌহ মহল** বা **লোহা মহল** নামে পরিচিত হইল। ফারকুহর কোম্পানী ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে ইংলণ্ড হইতে আনীত দ্রব্যের চারি পাঁচগুণ মূল্যে এ দেশজাত লৌহের গোলা

গুলি সরবরাহ করিতে সম্মত হন। তখনও বীরভূমি, ইংরেজদের করতলগত হয় নাই। শেষে যদিও এই সমস্ত সর্ত্তের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তথাপি তদানীন্তন বীরভূমের মুসলমান অধিপতি নগররাজ ও অন্যান্য মুসলমান জায়গীরদারগণ তাঁহার এই ব্যবসায়ের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন। ফারকুহর কোম্পানী ইংরাজ সরকারকে বহু অনুরোধ উপোরোধ করিলে পর, সরকার ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে চুল্লী নির্ম্মাণ এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য ১৫০০০৲ পনর হাজার টাকা সাহায্য করেন। এই কোম্পানী ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বীরভূমে তাঁহাদের কারবার পরিচালনা করেন। কিন্তু কতদূর কি করিয়াছিলেন তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে, শুনিতে পাওয়া যায় যে রাজাও জায়গীরদারগণ **লৌহ মহলের** রাজস্ব তাঁহাদের প্রাপ্য বলিয়া বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হন। ফারকুহর সাহেব লৌহ সংক্রান্ত কারবার পরিত্যাগ করিয়া, ঠিক্ এই সময় ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফল্‌তার বারুদের কারখানায় কার্য্য করিতে গমন করেন। ফারকুহর সাহেবের ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই **লোহা-মহলের** ইজারা ছিল। তদনন্তর এই লোহা-মহল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন লোকের সহিত স্বতন্ত্রভাবে বন্দোবস্ত করা হয়। এই সমস্ত লোক ইচ্ছানুযায়ী কর বৃদ্ধি করিলে বহুতর গোলযোগ উপস্থিত হয়। ইহার ফলে, সেই সেই লাটের মালিকগণ এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহা-মহলের মালিকের সহিত বিবাদ আরম্ভ করেন। এই বিবাদ সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হয় এবং লাটের মালিক ও লোহা-মহলের মালিক স্বতন্ত্র বলিয়া মীমাংসিত হয়[১৩]।

S.G.T. Heatly সাহেবের "Contributions towards a History of the development of the Mineral Resources of India" নামক পুস্তকে লিখিত বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, ফারকুহর কোম্পানী দ্বারা প্রস্তুত কাঁচা লোহা কলিকাতায় ৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইত। বালেশ্বর এবং ইংলণ্ডে প্রস্তুত সেই প্রকারেরই লোহা যথাক্রমে সাড়ে ছয় টাকা ও দশ টাকা হইতে এগার টাকা মণ দরে বিক্রয় হইত। ইহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, বীরভূমের এই লৌহ কারবার যদি বিলুপ্ত না হইত, তাহা হইলে অন্যান্য দেশে প্রস্তুত লৌহের মত লৌহই, এখানে সস্তায় মিলিত সন্দেহ নাই।[১৪]

সর্ব্বপ্রথম আর্স্কাইন (Erskine & Co.) কোম্পানী, ইলামবাজারের **লাক্ষার** চাষের কারবার হস্তগত করেন। কোন প্রকার অনিষ্টাশঙ্কা হইলে সুসজ্জিত সৈন্য দ্বারা ইলামবাজারের গালার কারখানা পরিরক্ষিত হইত। তখন সবেমাত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শতাধিক বর্ষ ধরিয়া আর্স্কাইন এণ্ড কোং, এই **লাক্ষা-শিল্পটিকে** করতলগত করিয়া রাখিয়াছিলেন। রেশম ও

সূত্র-শিল্পের স্বত্বাধিকারী মিঃ জন চীপ্ (Mr. John Cheap) সাহেব আর্স্কাইন (Erskine) সাহেবের সহিত যোগদান করেন এবং লাক্ষা শিল্পটিকেও নিজেদের হস্তগত করেন। তাঁহার নির্ম্মিত ছোট কুঠী এখনও সুরুলে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে জন চীপ্ প্রথম বীরভূমে আগমন করেন। তাঁহার পর একে একে দুই একজন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীভুক্ত ইংরাজ বীরভূমে আসিয়া দেখা দিতে লাগিলেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ১৯ বৎসর বয়সে ডেভিড্ আর্স্কাইন (Mr. Devid Erskine) নামক জনৈক শ্রমশীল যুবক Free Merchants Charter (ইংলণ্ডে কোর্ট অব ডিরেক্টরদিগের নিকট হইতে কোম্পানীর জমিদারীভুক্ত স্থানে মুক্তভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার আদেশ-পত্র) সহ আসিয়া জন চীপের সহিত এক যোগে এই লাক্ষা-শিল্পের উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করেন। এই সময় এই স্থানের নীলের চাষও একটি লাভজনক ব্যবসায় ছিল। জন চীপ্ সাহেব আর্স্কাইন সাহেবকে মূলধন স্বরূপ কিছু অর্থ প্রদান করিয়া দারোন্দা (Daranda) নামক স্থানে একটি নীলের ক্ষেত্র ক্রয় করিয়া দেন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি নীলের চাষ ও ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থোপর্জ্জন করেন। লাক্ষা-শিল্পটি যাহাতে আরও উন্নত হয়, তজ্জন্য তাঁহারা ইহাতে যথেষ্ট অর্থ নিয়োজিত করিলেন। এইভাবে তাঁহারা শিল্পগুলির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিলেন। ফলে, এই জেলার স্থানে স্থানে এবং বিভিন্ন জেলায়ও দুই একটি করিয়া নীলকুঠী, লাক্ষা কুঠী ও রেশম কুঠীর সংখ্যা বাড়িয়া উঠিল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে গনুটিয়ার রেশম কুঠীতে চীপ্ সাহেবের মৃত্যু হয় এবং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইলামবাজারের গালার কুঠীতে আর্স্কাইন সাহেব পরলোক গমন করেন। ডেভিড্ আর্স্কাইনের মৃত্যুর পর ৩৫ বৎসর পর্যন্ত্য এই শিল্প 'আর্স্কাইন এণ্ড কোং'র কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। পরে ঐ কোম্পানী উঠিয়া যায়। ডেভিড্ আর্স্কাইনের কনিষ্ঠ পুত্র হেন্‌রী আর্স্কাইনের ভাগিনেয় উইলিয়ম ওয়াকার ফারকুহরসন (William Waker Farquharson) এবং ত্রিহুতের ক্যাম্বেল (Campbell) সাহেব একযোগে হেন্‌রীর নীল ও লাক্ষা কারবারের অংশ ক্রয় করিয়া ফারকুহরসন ও ক্যাম্বেল কোম্পানী নাম দেন[১৫]।

মিঃ জন চীপ্, ডেভিড্ আর্স্কাইন প্রভৃতি— সেকালে নীল চাষ একটি অতিশয় লাভজনক ব্যবসায় ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তদানীন্তন ব্যবসায়িক প্রতিনিধি মিঃ জন চীপ্ (Mr. John Cheap) সাহেব সর্ব্বপ্রথম বীরভূমে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে নীল চাষের প্রবর্ত্তন করিয়া নানা স্থানে কুঠী স্থাপন করেন। Devid Erskine সাহেবও সুরুল গ্রামের ছয় মাইল পশ্চিমে দারোন্দা গ্রামে এবং পরবর্ত্তীকালে ইলামবাজারে এইরূপ নীলকুঠী স্থাপন করেন। পরে রাসায়নিক নীল রঙ প্রবর্ত্তন হইলে এই সকল নীলকুঠী ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্রমশঃ বিলুপ্ত

হইয়া যায়। কেবলমাত্র সুপুরের কুঠী প্রায় একশত বৎসর চলিয়া ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বন্ধ হয়।

এখন বীরভূম জেলায় আর একটিও নীলকুঠী নাই। পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত নীলকুঠীগুলি নিম্নলিখিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল স্থানে এখনও নীলকুঠীর ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয় — (১) খয়রাশোল, (২) সিমুলিয়া, (৩) হরিশকোপা, (৪) বিষণপুর, (৫) ইলামবাজার, (৬) সুপুর, (৭) দড়ি মৌড়েশ্বর, (৮) সেকপুর, (৯) নূতনগ্রাম, (১০) আলিনগর, (১১) দারোন্দা, (১২) ভুরকুণ্ডা, (১৩) ভবানন্দপুর, (১৪) মাস্তুল, (১৫) গাঙ্গপুর, (১৬) পাঁচ সওয়া, (১৭) সিউপুর প্রভৃতি।

Sherwill সাহেব তাঁহার বীরভূমের জরিপের রিপোর্টে বীরভূমের নীলকুঠীর সংখ্যা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন— পরগণা আকবরসাহী—১, পঃ বারবকসিংহ-—১, পঃ ভুরকুণ্ডা—৩, তলুক হুকমাপুর-১, তপ্পে হরিপুর—৩, খটঙ্গা—১, তপ্পে কুণ্ডহিত কড়েয়া—২, তপ্পে মহম্মদাবাদ—১, পঃ বড়রা—১, পঃ সুপুর—১ ও পঃ সেনভূম—৬ মোট সংখ্যা—২১[১৬]।

নাঙ্গুলিয়া গ্রামে সিউড়ী-দুমকা রাস্তার উত্তরে একটি নীলকুঠীর ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ নীলকুঠীই Sherwill সাহেব বর্ণিত তালুক হুকমাপুরের নীলকুঠী বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানকালে খটঙ্গায় নীলকুঠীর ভগ্নাবশেষ কিছুই লক্ষিত হয় না।

মিঃ পিটারসন (Mr. Peterson) ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এ-দেশে ইক্ষুর চাষের প্রসারতা সাধন জন্য আগমন করেন। তিনি বীরভূমের জমি ইক্ষু-চাষের পক্ষে সমধিক উপযোগী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তথ্যসূত্র

(১) বীরভূমের ইতিহাস – গ্রন্থকার, ১ম খন্ড, ৮ম অধ্যায়, ১০৮ পৃঃ

(২) Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report –Introduction by F. D. Ascoly M.A., I.C.S. p 72

(৩) Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report by F.D. Ascoly M.A., I.C.S. p 16; Introduction to the Regulations of the Bengal Code by C.D.Field, pp 6-7

(৪) ভারতবর্ষের ইতিহাস - শ্রী শিবরতন মিত্র, ১৯৮ পৃঃ

(৫) ভারতবর্ষের ইতিহাস - শ্রী শিবরতন মিত্র, ১৯৯ পৃঃ

(৬) Indian State Railway Magazine, Feb 1928, pp 336-40 and March pp 392-93

(৭) O'Malley's Birbhum pp 24-25

(৮) বীরভূমের ইতিহাস – গ্রন্থকার, ১ম খন্ড – ৮ম অধ্যায়, (ও ২য় খন্ড- ২য় অধ্যায়)

(৯) Birbhum Gazetteer – L.S.S. O'Malley pp 21-22

(১০) O'Malley's Birbhum Gazetteer, pp 22-23

(১১) (a) Sir W.W. Hunter's Statistical Account,

(b) Sir W.W. Hunter's Annals of Rural Bengal,

(c) O'Malley's District Gazetteer

(d) Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum 1924-32 – Rai Bahadur B.B. Mukherjee, pp 76-78

(১২) Indian State Railway Magazine–March, 1928 pp 392-93

(১৩) Tagore Law Lecture (1874-75) – A. Phillips, pp 320-22

(১৪) প্রবাসী ১৩৩৫ ফাল্গুন ৬৪৩-৪৪ পৃঃ, ও Birbhum Gazetteer pp 25, 68-69

(১৫) প্রবাসী ১৩৪৪ ফাল্গুন ৬০৭-০৮ পৃঃ, Birbhum Gazetteer pp 75-77, বীরভূমি (নবপর্য্যায় ১৩১৭)— ৫০৭-৫১৬; ৫২৫-৫৩২ পৃঃ।

(লৌহ, লাক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় শিল্প সম্বন্ধীয় কথা পরবর্ত্তী খণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়াছে)

(১৬) (a) General Remarks on the District of Birbhum in the Revenue Survey Report, 1849-52 – W.S. Sherwill.

(b) O'malley's Birbhum.

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেওয়ানী আমলে বীরভূমি (১৭৬৭—৯২ খৃঃ)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী আমল — ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদসাহ সাহ আমলের নিকট বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার 'দেওয়ানী'-পদ লাভ করিবার কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি[১]। এই পদবলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন। এই দেওয়ানী লাভের মাত্র ৫ পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর** নামে খ্যাত দেশব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ হওয়ায় সমগ্র বঙ্গের, তথা বীরভূমের, যে কিরূপ মর্ম্মস্পর্শী দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয়ও ইতঃপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে[২]।

এই মন্বন্তর-প্রসঙ্গে তদানীন্তন বীরভূমের Supervisor Mr. Higginson ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের ২২-এ ফেব্রুয়ারী তারিখের রিপোর্টে এই মন্বন্তরের জন্য বিপন্ন বীরভূমবাসীদিগের নিকট হইতে বাকী রাজস্ব আদায় বন্ধ রাখিবার আদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কোম্পানীর কাউন্সিল রাজস্ব আদায় একেবারে বন্ধ করিতে অসম্মত হইয়া জানাইয়াছিলেন যে আপাততঃ রাজস্ব আদায় স্থগিত রাখিলেও পরবর্ত্তী বর্ষে সুচারুরূপে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে, বাকী রাজস্ব যেন অনাদায়ী না থাকে[৩]।

দেশময় দুর্ভিক্ষ ও পতিত জমি জঙ্গলময় হওয়ায় বন্য হিংস্র জন্তুর যেমন প্রাদুর্ভাবে লোক বিপর্যস্ত হইয়াছিল, তেম্‌নি দস্যু তস্করের উৎপাৎ ও উৎপীড়নেও দেশের লোক অত্যধিক মাত্রায় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের গতি প্রতিরোধ করিবার দেশে তৎকালে কোন প্রবল শক্তি বর্ত্তমান না থাকায়, তাহারা এখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিল। বীরভূমের তদানীন্তন রাজা তাহাদের দস্যুবৃত্তি দমন করতে একেবারেই অসমর্থ–তাহারা কোম্পানীর সংগৃহীত রাজস্ব রাস্তায় লুণ্ঠন করিয়া লইতে লাগিল—আর কোম্পানীর ব্যবসায়-বাণিজ্য তাহাদের দৌরাত্ম্যে একপ্রকার অচল হইয়া পড়িল। এমন কি, তাহাদের দারুণ অত্যাচারে অনেক কুঠীও বন্ধ হইয়া গেল।

(১) Mr. G.R. Foley (1786) —তখন বীরভূম ও বিষ্ণুপুর মুর্শিদাবাদের অধীন ছিল; কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপে অত দূরবর্ত্তী দেশের তত্ত্বাবধান করা অসম্ভব বুঝিয়া কোম্পানী ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দস্যু তস্করের অভিযানের বিরুদ্ধে বীরভূমের রাজাকে সাহায্য করিবার জন্য British Civil Officer Mr. G.R.Foley কে নিযুক্ত করেন।

(২) Mr. W. Pye (1786) — অতঃপর লর্ড কর্ণওয়ালিস বীরভূম ও বিষ্ণুপুরকে একটি স্বতন্ত্র ইংরাজশাসিত জেলারূপে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিয়া ১৭১৮ খৃষ্টাব্দের ২৯এ মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা গেজেটে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। তদনুসারে Mr. W. Pye নামক একজন ইংরাজ বিষ্ণুপুরের ও পূর্ব্বোক্ত Mr. G.R. Foley পরিদর্শিত বীরভূমের —এই দুই সম্মিলিত জেলার (United District) কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে তাঁহাকে স্থানান্তরে গমন করিতে হয়। তাঁহার এই স্বল্পকাল পরিমিত কার্য্যকালেও, বিষ্ণুপুরের নিকট কোন কোন স্থান দস্যুগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

(৩) Mr. Sherburne (March 1787-88)— ইহার পর, মিঃ সারবার্ণ, সম্মিলিত জেলার কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন। তিনি দেড় বৎসর কাল এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার সময় সম্মিলিত বীরভূম-বিষ্ণুপুর জেলার সদর (Head Quarter) বিষ্ণুপুর হইতে সিউড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। তাঁহার অধীনস্থ বীরভূম জেলার রাজস্ব আদায়ের সৌকর্য্যার্থ, তাঁহারই তত্ত্বাবধানে যে চিঠা বা আনুমানিক হস্তবুদ সর্ব্বপ্রথম প্রস্তুত হয়, তাহাই **সারবার্ণ সাহেবের চিঠা বা ১১৯৩ সালের চিঠা** নামে খ্যাত। এই চিঠার নাম বা পরিচয় ভিন্ন ইহার এখন আর কোন অস্তিত্ব নাই—এসম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। তবে তাঁহার নানা দোষ থাকা স্বত্ত্বেও তিনি যে এ কার্যের অগ্রণী তাহা অস্বীকার করা যায় না। মিঃ সারবার্ণ অল্পকাল মাত্র এই পদে নিযুক্ত রহিয়া বীরভূম ও বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বহু পরিমাণে শান্তি স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। অরাজকতার পরিবর্ত্তে তিনি দেশময় সুরক্ষিত কুঠী ও স্থানে স্থানে কোম্পানীর সিপাহী ও সৈন্যদল রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সৈন্য দলের গমনাগমনের সুবিধার জন্য তিনি সুন্দর রাস্তাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহার ফলে, কলিকাতা হইতে সুদূর মফঃস্বলে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়াছিল। তাঁহার এত কর্ম্মতৎপরতা স্বত্বেও ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বীরভূমের সংগৃহীত ৩০,০০০ টাকা রাজস্ব কলিকাতা লইয়া যাইবার কালীন ভারপ্রাপ্ত পাঁচজন সশস্ত্র প্রহরীকে অজয় নদের তীরে দস্যুগণ নিহত করিয়া সমগ্র টাকা লুণ্ঠন করিয়া লয়[৪]।

এই ঘটনার অব্যবহিত পর Mr. Sherburneএর নামে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনীত হয়। তদনুসারে কোম্পানী বাহাদুর, মিঃ সারবার্ণকে পদচ্যুত

করিবার ও অবিলম্বে তাঁহার কর্ম্মভার বুঝাইয়া দিয়া প্রেসিডেন্সীতে গিয়া আশ্রয় লইবার আদেশের সারাংশ জ্ঞাপন করিবার জন্য বোর্ডের উপর আদেশ করেন[৫]। ফলে, ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মিঃ সারবার্ণ অসাধুতার অভিযোগে কর্ম্মচ্যুত হইলেন।

এখন যে স্থলে সিউড়ীর জেলখানা, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সেখানে কাছারী ও ৩০/৪০ বিঘা ভূমি বেষ্টিত স্থানে বসতবাটি ছিল। সারবার্ণ সাহেব এই স্থলের কুঠীতে বাস করিতেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট ২০০ টাকা মূল্যে কালেক্টর সারবার্ণ সাহেবকে উক্ত ভূমি বিক্রয় করেন; কিন্তু বিক্রয়কার্য্য সমাধা হইবার পূর্ব্বেই, তিনি কর্ম্মচ্যুত হইয়া এ জেলা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান বলিয়া, উহা পূর্ব্ববৎ সরকারেরই সম্পত্তি রহিয়া যায়[৬]।

(৪) Christopher Keating– সারবার্ণের নিকট হইতে মিঃ ক্রিষ্টোফার কীটিং, ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখ এই জেলার কর্ম্মভার গ্রহণ করিলেন। ইহার পর, পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে সমাগত দস্যুদলকে দমন করিবার জন্য কিছুকাল ধরিয়া তাঁহাকে বহু সংখ্যক সশস্ত্র সৈন্য রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। তিনি নামে কালেক্টর বা রাজস্ব-সংগ্রাহক মাত্র রহিলেও, প্রকৃতপক্ষে নিজ এলাকা মধ্যে সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা বা Civil Governorএর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। প্রতিবৎসর শীতকালে শস্য-সংগ্রহের সময় তিনি প্রতি সৈন্যদলের অধিনায়ককে তাঁহার কর্ম্মস্থলের মধ্যে ঘাটি বা প্রবেশ-পথের একটি করিয়া তালিকা দিতেন। যতদিন দস্যুগণের (সাধারণতঃ শীতের প্রারম্ভ হইতে বর্ষাগমের সময় পর্য্যন্ত) এদেশে রহিবার আশঙ্কা রহিত, ততদিন এই সিপাহিগণ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট প্রবেশ-পথগুলি সংরক্ষিত করিত। অবশ্য ইহাতে কোম্পানীর ব্যয়বাহুল্য হইত। এই জন্য তাঁহারা সৈন্য-সংখ্যার হ্রাস করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ইহার উত্তরে তিনি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছিলেন যে সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস করিলে, তিনি তাঁহার অধীনস্থ জেলার শান্তিরক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কেননা, বীরভূমের দক্ষিণ-পশ্চিম ও সমগ্র পশ্চিমাংশ প্রদেশ বহু বিস্তৃত গভীর জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। এই জঙ্গলময় প্রদেশ হইতে দলে দলে দস্যুগণ আসিয়া লুণ্ঠন ও অত্যাচার দ্বারা বীরভূমবাসীকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত করিত। তাহাদের অত্যাচারের ফলে বহু জনপদ একেবারে জনশূন্য হইয়া যায়। কত কত শিল্প বিনষ্ট হয়। কত নগর মাত্র সামান্য কয়েকটি কুটিরসমষ্টিতে পরিণত হয়। অজয় তীরবর্ত্তী ইলামবাজার ইত্যাদি নগর লুণ্ঠন সমাধা করিয়া তাহারা বীরভূমের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করে। এমন কি, তাহারা তিন সহস্র লোক দলবদ্ধ হইয়া সিউড়ীর কালেক্টর সাহেবের আবাসের মাত্র দুই ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত বহু গ্রাম ও নগরাদি লুণ্ঠন করিয়া বহুলোকের প্রাণ বিনাশ করে। এই সকল কথাই এখন আমরা বিশদরূপে বর্ণণা করিতেছি।

দস্যু-দলন—কীটিং সাহেবের আগমনের পর দুই মাস অতিবাহিত হইতে না হইতেই, পাঁচ শত শক্তিশালী একদল দস্যু সিউড়ীর ৮/১০ মাইল দূরবর্ত্তী একটি গঞ্জ বা বাজারে আসিয়া, নিকটস্থ প্রায় চল্লিশটি গ্রামের লোককে নিহত বা বিতাড়িত করিয়াছে—এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি অবিলম্বে তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সৈন্যদলকে সমবেত করিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পাহাড়িয়া লোকেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া চারি পাঁচ শত করিয়া দলে দলে ঘাটি বা প্রবেশ পথে অবস্থিত রক্ষী-সৈন্যদলের গণ্ডি ভাঙ্গিয়া জেলার মধ্যে প্রবেশ করে এবং গ্রামগুলি লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হয়। প্রবেশ-পথের রক্ষক সৈন্য দলকে পূর্ব্বেই একত্র করা হইয়াছে। এখন শিক্ষিত সৈন্যদলের সাহায্য জন্য, দেশীয় সৈন্যদল গঠন করিয়া ইহার পুষ্টিসাধন করা হইল। ইহাতেও আশঙ্কা দূরীভূত হইল না। এই নিমিত্ত কর্ত্তৃপক্ষ পার্শ্ববর্ত্তী জেলার কালেক্টরগণকে তাঁহাদের অধীনস্থ সৈন্যদলকে প্রেরণ করিবার আদেশ করেন। অতঃপর সমবেত সমগ্র সৈন্যদলের সহিত দস্যুদলের এক খণ্ড-যুদ্ধ হয়। ফলে, দস্যুদল তখন পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল।

এই ঘটনার অল্প কয়েক মাস পরই, ইলামবাজার নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রামখানি ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে দস্যুদল কর্ত্তৃক প্রকাশ্য দিনমানে লুণ্ঠিত হয়। এই লুণ্ঠনকারী দস্যুদল তরবারি ও বন্দুক দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া বীরভূম অঞ্চলে এক প্রকার স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত যথেষ্ট সুশিক্ষিত সৈন্য ব্যতী ত সহজে ইহাদের উচ্ছেদ সাধন করা সম্ভবপর ছিল না।

ইলামবাজার লুণ্ঠনের অব্যবহিত পরই বর্ষাগমের সূত্রপাত হইলে দস্যুগণ স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। এই সুযোগে কীটিং সাহেব ঘাটি বা প্রবেশ-পথ সমূহ সুরক্ষিত করিয়া তাহাদের পুনরাগমনে যথেষ্টরূপ বাধা প্রদান করিবার অভিপ্রায়ের কল্পনা করলেন ও তদনুসারে নভেম্বর মাস মধ্যেই ছয়টি মূল ঘাটি বা প্রবেশ-পথ অধিকার করিয়া লইলেন এবং দস্যুগণ যাহাতে অজয়নদ অতিক্রম করিয়া বীরভূমে প্রবেশ করিতে না পারে, তদুদ্দেশে বিষ্ণুপুরে এবং ইলামবাজারে স্বতন্ত্র দুই দল সৈন্য রক্ষিত করিলেন। কিন্তু এত করিয়াও দস্যুগণকে বাধা দেওয়া গেল না! এমন কি, কীটিং সাহেব বীরভূমের ভার গ্রহণ করিবার সময় এদেশ যেরূপ উপদ্রুত হইতেছিল, এত চেষ্টা আয়োজনের পর এখনও প্রায় পুনরায় পূর্ব্ববৎ অবস্থাতেই পরিণত হইল! সৈন্যদলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত করিয়া রাত্রিযোগে নানাস্থানে প্রেরণ করা হইল; কিন্তু তাহারা দস্যুগণকে আয়ত্তাধীনে আনিতে পারিল না। এমন কি, প্রধান প্রধান গ্রাম বা নগরগুলিকেও এপর্য্যন্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না! তদানীন্তন সেনাধ্যক্ষ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৫এ নভেম্বর তারিখে লিখিয়াছেন যে সিউড়ীর সরকারী অফিস সমূহ পাহারা দিবার জন্য মাত্র চারি জন রক্ষকের

অধিক দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে, তিনি পুনরায় লিখিয়াছিলেন যে এই জেলার মধ্য দিয়া কলিকাতায় খাজনা প্রেরণ কালে রক্ষী-সৈন্য দিতে তিনি আদৌ সমর্থ নহেন।

ইহার পাঁচ ছয় মাস পরে, ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে দস্যুগণ বীরভূমের তদানীন্তন রাজধানী রাজনগর হস্তগত করে। এই নিমিত্ত বিষ্ণুপুর হইতে দ্রুত সৈন্যচালনা করিয়া বীরভূম রক্ষা করিতে একদল সৈন্য প্রেরণ করিবার জন্য জরুরী ডাক প্রেরিত হয়। অতঃপর এই ভাবে পরিপুষ্ট রক্ষিদল যাবতীয় ঘাটি বা প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। এই জন্য দস্যুরা বীরভূমে প্রবেশ 'করিতে অসমর্থ হইয়া অজয় নদের পরপারে দক্ষিণ অঞ্চলে সমবেত হয়। তদঞ্চলের অধিবাসীরা নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য আন্তরিকভাবে ব্রিটিশ সৈন্যের সহায়তা করলে, দস্যুদলের বিলোপ সাধন হয়। অতঃপর বীরভূম দস্যুদলেব আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আশ্বস্ত হইল।

বন্য জন্তুর উপদ্রব—বীরভূমবাসীর দুঃখ, কেবলমাত্র দস্যু বা ডাকাইত দলনের দ্বারাই সম্পূর্ণরূপ নিবৃত্তি হইল না! তাহারা বন্য জন্তুর উপদ্রবে প্রায় তুল্যরূপই উৎপীড়িত হইত। মন্বন্তরের পর বন জঙ্গলের অত্যধিক বৃদ্ধির জন্য বন্য জন্তুর লীলাস্থল প্রসারিত হয়। গোচর ভূমি একেবারে বন-জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গেল। গ্রামবাসীরা তাহাদের ছোট ছোট কুটিরগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জেলার কেন্দ্র স্থলে আসিলেও তাহাদের চতুর্দ্দিকে বুভুক্ষ হিংস্র জন্তুর উপদ্রব কমিল না। কৃষকগণের পরিবারবর্গাদি রক্ষা করিবার জন্য সরকার বাহাদুর এক এক বাঘের মাথার জন্য তিন মাস ধরিয়া পুরস্কার ঘোষণা করিলেন[৭], কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। বন্য জন্তুর ভয়ে লৌহ প্রস্তুতকারকগণ তাহাদের লৌহ গলাইবার জন্য কয়লা প্রস্তুত করিতে আর বনে কাষ্ঠ সঞ্চয় করিতে আসে না[৮]। বহু কুঠিও এইজন্য পরিত্যক্ত হইল এবং গৃহপালিত পশ্বাদি ক্রয় বিক্রয়ের হাট বাজারও বন্ধ হইয়া গেল। পাহাড় হইতে সমতল ভূমি পর্য্যন্ত যেখানে গবাদি পশুর বিশ্রামস্থল ছিল ও তাহাদের আহার্য্য সংগ্রহ হইত তাহাও পতিত ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল[৯]। নির্জ্জন পথে ডাকবাহককে হিংস্র বন্য জন্তু নির্ভয়ে বিনষ্ট করিতে লাগিল। এই নিমিত্ত, লর্ড কর্ণওয়ালিস বিভিন্ন ভূস্বামিগণকে তাঁহাদের স্ব স্ব সীমানার মধ্য হইতে এই বন্য জন্তু বিতাড়িত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কোন ফল হইল না দেখিয়া তিনি সরকারী হইতে অর্থ মঞ্জুর করিয়া বীরভূমের মধ্য দিয়া একটি নূতন সামরিক রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিলেন[১০]।

বন্য হস্তীর উপদ্রবে দেশবাসিগণ বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল! এই জেলায় প্রত্যক্ষ ভাবে বৃটিশ রাজত্বের সূচনার প্রারম্ভেই তাহাদের, বর্ব্বর ও বন্য হস্তী

বিতাড়িত করিবার প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল। জন্ম মৃত্যুর দুই বৎসরের হিসাব বহিতে দেখা যায় যে ৫৬টি গ্রাম বন্য হস্তীর উৎপাতে একেবারে উচ্ছন্ন হইয়া জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে[১১]। এই নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব এই সকল হস্তী বিতাড়নের জন্য অতিমাত্রায় চেষ্টান্বিত হইলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের লিখিত রিপোর্টে জানা যায় যে দুইটি পরগণার মধ্যে ৫৬ খানি গ্রাম বন্যহস্তী একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছে এবং অন্যত্র প্রায় ৪০ খানি গঞ্জ বা বৃহৎ গ্রাম বন্য জন্তুর উৎপাতে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে! এই সকল বন্য হস্তীকে ধরিবার জন্য তদানীন্তন বীরভূমের রাজা মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের মধ্যস্থতায় ভাইসরয়ের পোষা হস্তী কিছুদিনের জন্য বীরভূমে প্রেরণ করিতে কোম্পানীকে অনুরোধ করেন; কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। তখন অগত্যা বীরভূমের রাজা কোম্পানীকে হস্তীর দারুণ অত্যাচারের জন্য দেয় রাজস্ব কমাইয়া দিবার নিমিত্ত আবেদন করিলেন। তদানীন্তন কালেক্টর রাজা বাহাদুরের এই কথার পোষকতা করিয়া ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর নিকট রিপোর্ট করেন যে তিনি অভিযোগের বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে অবিলম্বে কোন বিহিত ব্যবস্থা না হইলে অন্য অন্য পরগণার ভূস্বামিগণও তুল্যরূপ বিপন্ন হইবেন[১২]।

দেওয়ানীপ্রাপ্ত কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ের পন্থা নির্দ্দেশ—দেশের এইরূপ অবস্থায় প্রজাবর্গের নিকট সমগ্র কর সংগ্রহ করা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই নিমিত্ত বীরভূমের রাজা ও অন্যান্য ভূস্বামিগণ সময়মত কোম্পানীকে তাহাদের প্রাপ্য সমগ্র রাজস্ব কোনমতেই দিতে সমর্থ হইত না। অবশ্য কোম্পানী এইজন্য বাকীদার রাজা বা ভূস্বামিগণকে আটক রাখিয়া তাঁহাদের জমিদারী সাময়িকভাবে অপরের নিকট ইজারা দিয়া, অথবা ক্ষেত্র অনুসারে জমিদারী বিক্রয় করিয়াও প্রাপ্য কর সংগ্রহের ব্যবস্থা করিত। কিন্তু এইরূপ পন্থা সকল ক্ষেত্রে সুগম ছিল না। সুতরাং রাজস্ব আদায় বাকী পড়িত। এ দিকে কিন্তু কোম্পানীকে নিয়মিত ভাবে বাঙলার নবাবের নিকট রাজস্ব প্রদান করিতে হইত[১৩]। এই দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কোম্পানী একটি স্থায়ী ফলপ্রদ উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজস্ব আদায়ের এই প্রচেষ্টার কথা এবং চিরস্থায়ী রাজস্ব বন্দোবস্তের কথাই পরবর্ত্তী দুইটি অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

তথ্যসূত্র

(১) বীরভূমের ইতিহাস-গ্রন্থকার ১ম খণ্ড, অষ্টম অধ্যায় ১০৫ পৃঃ

(২) বীরভূমের ইতিহাস-গ্রন্থকার ১ম খণ্ড, অষ্টম অধ্যায় ১০৪ পৃঃ

(৩) Birbhum – L.S.S. O'malley pp 16-17

(৪) Calcutta Gazettee 16th Oct. 1788, Thursday.

(৫) W.W. Hunter's Bengal Manuscript Records Part I, p 159 No. 1451, 31st Oct 1788.

(৬) Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum 1924-32, p 107

(৭) (a) Letters from the Accountant General to the Collector of Birbhum, dated 29th December 1790 and 28th January 1791, B. R. R.

(b) Annals of Rural Bengal – Sir W.W. Hunter. p 65.

(৮) Annals of Rural Bengal – Sir W.W. Hunter. p 69.

(৯) (a) Letters from Collector of Birbhum to the Board of Revenue, dated 9th October 1789, B. R. R.

(b) Annals of Rural Bengal – Sir W.W. Hunter. p 69.

(১০) (a) Letters from Board of Revenue to the Collector of Birbhum, dated 11th February 1789, 30th April 1790, B. R. R.

(b) Annals of Rural Bengal – Sir W.W. Hunter. p 65-66.

(১১) (a) Letters from Collector of Birbhum to the Board of Revenue, dated April 1790, B. R. R.

(b) Annals of Rural Bengal – Sir W.W. Hunter. p 66.

(১২) L.S.S. O'malley's Birbhum.

(১৩) Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report – 1812 F.D. Ascoly M.A., I.C.S. p 74-75

তৃতীয় অধ্যায়

বীরভূমের রাজস্ব—পূর্ব্বকথা

রাজস্ব নির্ণয়ের পূর্ব্বতন প্রচেষ্টা—পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা বলিয়াছি যে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী মোগল বাদসাহের নিকট সন ১১৭২ সাল বা ইংরাজী ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার জন্য ২৬০০০০০৲ ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে, ইহার মধ্যে বীরভূমের রাজস্ব আদায়ের ভারও তাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী—এই দেওয়ানী ভার গ্রহণের পর হইতে, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত, কেবল মাত্র সুনিয়মিতভাবে রাজস্ব আদায়ের জন্যই তাঁহাদের প্রচেষ্টা সম্যক্‌ভাবে সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই প্রচেষ্টার কথাই এই অধ্যায়ে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাদের বঙ্গদেশের তথা বীরভূমের রাজস্ব-নির্ণয়ের পূর্ব্বতন প্রচেষ্টার কথাও জানা আবশ্যক।

হিন্দু অধিকারকালে আমাদের দেশে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য সংবাদের কথা বিশদভাবে জানিবার উপায় না রহিলেও মনু প্রভৃতির ধর্ম্ম-শাস্ত্রে কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মনু, জমির উৎপন্নের ষষ্ঠ, অষ্টম এবং ক্ষেত্র অনুসারে দ্বাদশ ভাগের ভাগ রাজস্ব স্বরূপ রাজার প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল কথা, এই স্থানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবগত হইতে হইলে আমরা পাঠকগণকে Mr. Arthur Phillips M.A. প্রণীত Land Tenures of Lower Bengal নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দের Tagore Law Lecture[১] গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

অতঃপর শেরসাহ (১৫৩২-৩৮ খৃঃ) রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার পর সম্রাট্ আকবর, রাজা টোডরমল্লের দ্বারা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অন্যান্য বিশাল সাম্রাজ্যের সহিত বঙ্গদেশের রাজস্ব

আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। এই সকল কথা আবুল ফজল প্রণীত আইন–ই–আকবরী নামক গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছি[২]।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের তদানীন্তন নবাব সাহসুজা রাজস্ব বন্দোবস্তের পুনঃ সংস্কার করেন। ইহাই মোগল আমলের দ্বিতীয় রাজস্ব বন্দোবস্তের ব্যবস্থা। ইহাতে তিনি পূর্ব্ব বন্দোবস্তের উপর শতকরা ১৫॥ সাড়ে পনর টাকা করিয়া কর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

সাহ সুজার পর, মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ এবং তাঁহার পর, কাশীমআলি খাঁ রাজস্ব বন্দোবস্তের সংস্কার সাধন করেন। আমরা শেষোক্ত দুই সুবাদারের বীরভূম সংক্রান্ত রাজস্ব-সংস্কারের কথা পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে বর্ণন করিব। মোগল শাসনের প্রারম্ভ হইতে ইংরাজের দেওয়ানী গ্রহণের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের রাজস্বের সংস্কার সাধনকালে ক্রমে এইরূপ হারে রাজস্ব পরিবর্দ্ধিত হয় ঃ—

১৫৮৮—১৬৫৮	খৃঃ	পর্য্যন্ত অর্থাৎ	৭৬ বৎসরে	শতকরা বৃদ্ধি	১৫½	টাকা
১৬৫৮—১৭২২	”	”	৬৪	”	১৩½	”
১৭২২—১৭৫৬	”	”	৩৪	”	২৯	”
১৭৫৬—১৭৬৩	”	”	৭	”	৪০	”[৩]

বীরভূমের রাজস্ব—মুসলমান আমল—দেওয়ানী গ্রহণের পূর্ব্বে, মোগল আমলে মুর্শিদকুলী খাঁ কর্ত্তৃক বঙ্গের যে রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাহাতে যে সকল জমিদারীর খাজনা একাএকভাবে সুবাদারের কোষাগারে প্রদত্ত হইত, সেই সকল জমিদারী খাল্‌সা নামে অভিহিত হইত। তিনি (১৭২২-৬৩ খৃঃ) বঙ্গের সমগ্র খালসা ভূমি ২৫টি এহ্‌তিমাম বা বৃহৎ জমিদারী-বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সমগ্র বঙ্গের এই ২৫ বিভাগের মধ্যে বিস্তৃতি বা পরিমাণ হিসাবে বীরভূমি পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছিল। তৎকালে বঙ্গে মুসলমান অধিকৃত জমিদারীর মধ্যে বীরভূমিই সর্ব্ব বৃহৎ। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে মুর্শিদকুলী খাঁ বীরভূমির তদানীন্তন পাঠান ফৌজদারীকে নূতন করিয়া বীরভূমি অধিকারের সনন্দ প্রদান করেন[৪]। বীরভূমের জমিদারের সনন্দ অন্যান্য জমিদারের সনন্দের মতই ভাষায় লিখিত হইলেও, ইহার বিশেষত্ব ছিল। এই জমিদারী ঝাড়খণ্ডের (দেওঘর অঞ্চল) অসভ্য বর্ব্বরদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাঠান বংশীয় ফৌজদারগণের সহিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এই ফৌজদারগণ আবার 'ঘাঁটি' বা প্রবেশ-পথ রক্ষা করিবার জন্য যে সকল স্থায়ী সৈন্য নিযুক্ত করিতেন, তাহাদিগকে নগদ বেতনের পরিবর্ত্তে লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন।

কিন্তু মোগল শাসন-প্রথার অননুমোদিত বলিয়া, বিশেষতঃ সৈন্য ও রাজস্ব-বিভাগ একত্র রাখা সমীচীন নহে বলিয়া পরবর্ত্তীকালে নবাব কাশীম আলি ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে (১১৬৮ সাল) সৈন্যদিগকে বেতনের পরিবর্ত্তে প্রদত্ত নিষ্করভূমি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। ইহাতে যে নূতন কর সংগৃহীত হইতে লাগিল, তাহা কেফায়েৎ নামে সুবাদারের কোষাগারে প্রদত্ত হইত।

তদানীন্তন বীরভূমের জমিদারীর পরিমাণ ৩৮৫৮ বর্গ মাইল এবং ইহা ২২টি পরগণায় বিভক্ত, ও ইহার রাজস্ব ৩৬৬৫০৯৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁ'র মৃত্যুর পর, বীরভূমের রাজা স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে তাঁহাকে অবিলম্বে দমন করিয়া ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেয় রাজস্বের উপর ৬৮২২২৲ টাকা[৫] 'আবয়াব' স্বরূপ বৃদ্ধি দিতে বাধ্য করিলেন।

Mr. Grant-এর পরগণাওয়ার 'আওশল তুমারী জমায়' দেখা যায় যে তাহাতে বীরভূমের ২২টির পরিবর্ত্তে ২৫টি পরগণা এবং রাজস্বের পরিমাণ ৩,৭৭,৬৪৫৲ টাকা; তদুপরি ৬৫০৮৲ টাকা তৌফির (গুপ্ত) জমা। এই ৩৭৭৬৪৫৲ টাকা–৩৬৬৫০৯৲ টাকা = ১১১৩৬৲ টাকা ৩টি পরগণা নূতন সংযুক্ত হওয়ায় উক্তরূপ বৃদ্ধি হইল। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ৬৮২২২৲ টাকা আবয়াব এবং পূর্ব্ব রাজস্ব ৩৭৭৬৪৫৲ টাকা, মোট ৪,৪৫,৮৬৭৲ টাকা বীরভূমের রাজস্ব স্বরূপ নির্ণীত হয়। এই রাজস্ব বীরভূমের ১/৩ ভূমির রাজস্ব স্বরূপ বলা যাইতে পারে। কেননা, অবশিষ্ট ২/৩ অজয় নদের তীরবর্ত্তী সমগ্র ভূমিখণ্ড রাজা নিষ্কর স্বরূপ ভোগ করিতেছিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নবাব কাশীম আলি তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। ইহাতেও দেয় রাজস্ব প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। এতদ্ব্যতীত, পূর্ব্ববর্ণিত কেফায়েৎ হস্তবুদ হইতেও তিনি বহু পরিমাণ রাজস্ব বর্দ্ধিত করেন। ইহাতে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল যে এইভাবে বাজেয়াপ্তের ফলে ৮,৯৬,২৭৫৲ পরিমাণ টাকা বীরভূমের রাজস্ব বর্দ্ধিত হইল। ফলে, এখন বীরভূমের দেয় মোট রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইল— ১৩,৪২,১৪২ টাকা[৬]।

নবাব কাশীম আলি এইভাবে সমগ্র (১৭৬৩ খৃঃ) বঙ্গের জন্য ৪৫,২৩,৫৬৩৲ টাকা কেফায়েৎ স্বরূপ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে, একা বীরভূম হইতে তাহার পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ৮,৯৬,২৭৫৲ টাকা বর্দ্ধিত হইয়াছিল[৭]।

এই কেফায়েৎ রাজস্বের পরিমাণ যে অত্যন্ত অধিক, তাহা পরবর্ত্তীকালে বীরভূমের দেয় রাজস্বের ন্যূনতা সাধনই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এসম্বন্ধে Mr. Grant তাঁহার Fifth Reportএ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে (১১৭২ সাল) কেফায়েৎ রাজস্বের পরিমাণ কমাইয়া ৩,৮১,১০৭৲ টাকা করা হয়। এই পরিমাণ টাকাই সাধারণ রাজস্বের সহিত সংযুক্ত করিয়া ১৩,৪২,১৪২৲ টাকার

পরিবর্ত্তে, সমগ্র রাজস্ব (৪,৪৫,৮৬৭৲ টাকা রাজস্ব + ৩,৮১,১০৭৲ টাকা কেফায়েৎ) মোট ৮,২৬,৯৭৪৲ টাকা করা হয়।

ইহার ১১ বৎসর মাত্র পরে, অর্থাৎ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে (বাঙলা ১১৮৩ সাল) আমরা দেখিতে পাই যে, বীরভূমের সর্ব্বপ্রকার রাজস্ব কমাইয়া মাত্র ৫,৩১,৩২১৲ টাকায় পরিণত করা হইয়াছিল। এই টাকা হইতেই ভূস্বামীর মাসহারা, ফৌজদারী কাছারীর ব্যয় প্রভৃতি বাবত ১,৭১,৫৩১৲ টাকা দেওয়া হইত। এই সময়ে জানা যায় যে বীরভূমে ১,০৮,৭৭১৲ বিঘা বাজে জমীন ও ৯৭৮৪ জন 'থানাদার' বা সৈনিক প্রতিপালনের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ১,২৭,১১৭ বিঘা পরিমিত জমি নির্দ্দিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত, মালগুজারী হইতেও ১,৪৪,৮২৫ টাকা আদায় দেখান হইয়াছিল। ইহা হইতেই আবার ৪,১১,৪১৩৲ টাকা পলাতকা প্রজার নিমিত্ত অনাদায় দেখান হইয়াছিল। যাহা হউক, ফলে, ১১৮৮ সালে ৮০,০০০৲ টাকা বর্দ্ধিত করিয়া বীরভূমের দেয় রাজস্ব ৪,৫০,০০০৲ টাকায় পরিণত করা হয়। এই সময় হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে কর্ম্মচারিগণ প্রায় ৮,০০,০০০৲ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল[৮]।

ইংরাজ আমলে বীরভূমের রাজস্ব (১৭৬৫-৮৭ খৃঃ)— ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজস্ব সংগ্রহের ভার সম্পূর্ণরূপে রেজাখাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। এই সময় রাজস্ব সংগ্রহের কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী না থাকায় রাজস্ব আদায়ের জন্য অত্যধিক প্রজাপীড়ন হইত[৯]। এই জন্য কোম্পানী ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম স্থানীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ ঠিকমত রাজস্ব সংগ্রহকার্য্য না করায় বড়ই অসুবিধা হইল। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার জন্য কোম্পানী ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং রাজস্ব সংগ্রহের ভার গ্রহণ ও Committee of Circuit গঠন করেন। ইঁহারা সময় সময় এক এক স্থান পরিদর্শন করিতেন। এই সময় বীরভূমের রেসিডেন্ট মিঃ ইয়ং সাহেবের অধ্যক্ষতায় বীরভূমে লাখেরাজ বাজে-জমীর একটি তালিকা প্রস্তুত হয়।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করিলে মোগল-প্রথা অনুবর্ত্তনে বীরভূমের নগর-রাজবংশের তদানীন্তন রাজার উপর রাজস্ব আদায়ের ভারার্পণ করা হয়। সেই সময় বীরভূম জেলা মুর্শিদাবাদ হইতে পরিদর্শিত হইত। নগর-রাজ্যের সহিত সর্ত্ত ছিল এই যে বীরভূমের সমগ্র রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ে দিতে না পারিলে, তাঁহার বীরভূম জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া রাজস্ব আদায়ের ভার অপরের উপর ন্যস্ত করা হইবে। সে সময় বঙ্গের তদানীন্তন গভর্ণর Mr. Harry Verelst দরবারের রেসিডেন্ট Mr. Richard Becher এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে অন্ততঃপক্ষে প্রত্যেককে ৩ বৎসরের

জন্য রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করা উচিত। এই সময়ের মধ্যে তিনি যথাযোগ্য ব্যবহার করিলে, তাঁহাকে এই আদায়ের ভার পুনরায় দেওয়া যাইতে পারিবে। এই সময় বীরভূমের রাজস্ব ৩ বৎসরের জন্য নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল-

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ	–	৭,২৫,০০০ টাকা
১৭৭০	”	৭,৬৮,৪০০ টাকা
১৭৭১	”	৮,১১,৮৭৯ ৶ ১০ টাকা

ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে কেফায়েৎ হস্তবুদ ৮,৯৬,২৭৫ টাকা সহ কাশীমআলি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মোট রাজস্ব ১৩,৪২,১৪২ টাকা হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত ৩ বৎসরের বীরভূমের রাজস্বের পরিমাণ কত কম! সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই সমগ্র ১৩,৪২,১৪২ টাকা ১৭৬৩-৬৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আদায় হইবার কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এইরূপ রাজস্বের ন্যূনতার প্রধানতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

মন্বন্তরের প্রায় ৪ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ন্যূনাধিক ৬০০০ ছয় হাজার গ্রাম্য মণ্ডলের উপর সমগ্র বীরভূমের জমি কর্ষণ ও রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পিত ছিল। মন্বন্তরের পর, অর্থাৎ ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে কৃষকেরা দেশ দেশান্তরে চলিয়া গেল। ফলে, বীরভূমের প্রায় এক চতুর্থাংশ গ্রাম একেবারে জনশূন্য হইয়া গেল এবং পূর্ব্বোক্ত মণ্ডলের সংখ্যা ৬০০০এর পরিবর্ত্তে, ৪৫০০ সাড়ে চারিহাজারে পরিণত হইল! অর্থাৎ প্রায় ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপভাবে লোক দেশত্যাগী হইয়া গেলে এই ১৫০০ দেড় হাজার গ্রাম্য মণ্ডলের অধীনস্থ ভূমি ও গ্রাম জনশূন্য হইয়া জঙ্গলে পরিণত হইয়া গেল! পুরাতন গ্রাম্য মণ্ডলগণও, তাঁহাদের স্ব-স্ব সীমার মধ্যে খাজনা আদায়ে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইলেন না। প্রাচীন জমিদারগণও এইরূপে মণ্ডলগণের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট খাজনা আদায় না পাইয়া, তাঁহারাও তাঁহাদের দেয় রাজস্ব ইংরাজ দেওয়ানকে দিতে অসমর্থ হইলেন। মণ্ডলগণের ন্যায় জমিদারগণও আত্মরক্ষার জন্য এইরূপ অভিযোগ করায় তাঁহারা আপততঃ নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মণ্ডলগণ নির্ম্মমভাবে দেওয়ানী কারাগারে আবদ্ধ হইলেন[১০]। হান্টার সাহেব তাঁহার Annals of Rural Bengal নামক গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন– "When the British undertook the direct management of the District nearly 20 years after the famine, they found the jail filled with revenue prisoners not one of whom had a prospect of regaining his liberty. For this state of things, the Raja was not alone responsible, while the Country every year became a mere total waste,

the English Governor constantly demanded an increased land tax. In 1771 more than one third of the culturable land was returned in the public accounts as deserted. In 1776 the entries in this Column exceeded one half of the whole of cultivated area— 4 acres, lying waste for every seven that remained under cultivation."

দেওয়ানী গ্রহণের পরই ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ রাজস্ব আদায়ের জন্য বৃটিশ 'সুপারভাইসর' নিযুক্ত করেন। মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় যে Provincial Council গঠিত হইয়াছিল, তাহারই তত্ত্বাবধানে ইঁহারা কার্য্য করিতেন। এই সময় Warren Hasting রাজস্ব আদায়ের নব প্রথা উদ্ভাবনাদির জন্য গভর্ণর জেনারেলের Provincial Councilএর member লইয়া গঠিত Committee of Revenueএর সভাপতি নিযুক্ত হন। ইঁহারই সমকালে 'খাল্সা' বা সমগ্র বঙ্গের রাজস্ব আদায়ের প্রধান কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত সুপারভাইসর বা পরিদর্শকগণ তখন হইতেই রাজস্বের সংগ্রাহক বা **কালেক্টর** নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ হন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর তারিখ ১৭৭২-৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫ বৎসরের জন্য বীরভূম, হুগলী, মেদিনীপুর, যশোহর ও কলিকাতার রাজস্ব আদায়ের ভার, (তিনি পূর্ব্ব ভূস্বামী বা অন্য যিনিই হউন না কেন,) উচ্চমূল্যে ডাককারীকে (Highest Bidder) বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। এই ভাবে যে সকল প্রাচীন জমিদার রাজস্ব আদায়ের ভার হইতে বঞ্চিত হন, তাঁহাদিগকে আদায়ী রাজস্ব হইতে গ্রাসাচ্ছাদন দিবার ব্যবস্থা করা হয়[১১]।

এই পাঁচ বৎসর কালে বীরভূমের হস্তবুদ কাগজে নিম্নলিখিত রূপ রাজস্ব নির্দ্ধারণ ও আদায় প্রদর্শিত

বৎসর	গভর্ণমেন্ট নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব [সিক্কাটাকা[১২]]	নিট আদায়
১৭৭২ খৃঃ	৯,৯৪,১৩০৲	৫,৫২,০৭০৲
১৭৭৩ "	১০,৩০,৮৯০৲	৬,২৩,৬৫০৲
১৭৭৪ "	১০,১৭,৯৯০৲	৫,২৫,৩৩০৲
১৭৭৫ "	১০,০৯,৮৩০৲	৫,৩৯,৯৭০৲
১৭৭৬ "	১১,১৪,৮২০৲	৬,৩৩,৫০০৲

বীরভূমের তদানীন্তন কলেক্টর Mr. E. G. Drake-Brockman I.C.S. তাঁহার Notes on the Early Administration of the District of

Birbhum নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কয় বৎসরে বীরভূমে গড় বার্ষিক ৫,৩৭,০৬৫৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছিল[১৩]।

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে 'পঞ্চসনা' বা পাঁচশালা (Quinquennial Settlement) বন্দোবস্তের সময় উত্তীর্ণ হইলে পর ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইজারাদারগণের সহিত বাৎসরিক রাজস্ব বন্দোবস্ত করা হয়। ইহাতে পঞ্চসনার ব্যবস্থা অনুযায়ী কেবল মাত্র উচ্চ মূল্যে ডাককারীকে (Highest Bidder) যে দেওয়া হইত তাহা নহে, পুরাতন ভূস্বামীগণের দাবী অগ্রগণ্য করা হইত। Provincial Council কর্ত্তৃক এই রাজস্ব আদায়কার্য্য ভালরূপ চলিল না। সেইজন্য পূর্ব্বোক্ত Committee of Revenue (পরবর্ত্তীকালে Board of Revenue নামে খ্যাত) কলিকাতায় নবভাবে গঠিত করা হয়। ইহাতে কোম্পানীর পাঁচজন অভিজ্ঞ ইংরাজ কর্ম্মচারী সম্মিলিতভাবে গভর্ণর জেনারলের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের অধীনে রহিয়া কর্ম্ম করিতেন। পূর্ব্ববর্ত্তী Provincial Councilএর সভাপতিগণ Councilএর উপদেশ মত বিভাগীয় Commissionerএর ন্যায় কর্ম্ম করিতেন এবং প্রত্যেক জেলায় ইংরাজ কালেক্টর রাজস্ব আদায় করিতেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাই কিছুকাল ধরিয়া প্রচলিত ছিল। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ২৯এ এপ্রিল তারিখে William Taylor সাহেবকে বীরভূমের বন্দোবস্তের জন্য এক আদেশ প্রদত্ত হয়। (A letter was written to William Taylor directing him to make a settlement at Birbhum, April 29, 1782)[১৪]। নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৭৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১১৮৯ সালে) প্রথম Settlement হইল। ইহাতে এই জেলার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব পরিবর্দ্ধিত হয়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৯এ সেপ্টেম্বর তারিখ ১১৯০ সালের জন্য William Taylor সাহেব হিসাবাদি পাঠাইলে তাহা গৃহীত হয়[১৫]। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বীরভূমের জমিদার তাঁহার সহিত ১১৯১ সালের বন্দোবস্ত শেষ নিষ্পত্তির নিমিত্ত এক আবেদন করেন[১৬]। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৬এ মে তারিখ বীরভূমের জমিদার তাঁহার জমিদারী ইজারা লইবার জন্য এবং আমীনকে পুনরাহ্বানের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া এক আবেদন করিলে তাহা গৃহীত হয়[১৭]। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে Board of Revenue এর পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল Warren Hasting আলোচনা করেন। তিনি এই ব্যবস্থার প্রণালী অনুমোদন করিলেও বাৎসরিক রাজস্ব বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন না। কেন না, Court of Directors বিলাতে স্পষ্টভাবেই দীর্ঘকালের জন্যই রাজস্ব বন্দোবস্তের আদেশ দেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের শেষাংশে Court of Directors তাঁহাদের কার্য্য সুনির্ব্বাহ জন্য-

(১) Board of Council,
(২) Board of Revenue,
(৩) Board of Trade এবং
(৪) Board of Military Affairs—

এই কয় বিভাগে বিভক্ত করেন। ইহাই পরবর্ত্তীকালে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের (Permanent Settlement) পূর্ব্ব সূচনা মাত্র। কেননা, দেওয়ানী গ্রহণের পর ২১ বৎসরকাল মধ্যে তাঁহারা রাজস্ব আদায়ের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তাঁহারা অবিলম্বে এককালে ১০ বৎসরের জন্য রাজস্ব বন্দোবস্তের আদেশ প্রদান করেন। তাঁহাদের এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহারা লর্ড কর্ণওয়ালিসকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দান করিয়া ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারল করিয়া পাঠান। তিনি কিন্তু এদেশে আসিয়া অত শীঘ্র ডিরেক্টরগণের আদেশমত কার্য্য করা সুবিধাজনক মনে করিলেন না। কেননা, তিনি লক্ষ্য করিলেন যে কলিকাতার Board of Revenue এবং প্রত্যেক জেলার কালেক্টরগণ এতদর্থে যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অসম্পূর্ণ— তাহার উপর নির্ভর করিয়া চিরস্থায়ী বা দীর্ঘকালস্থায়ী রাজস্ব বন্দোবস্ত করা চলে না। এইজন্য তিনি আপাততঃ এতদর্থে আবশ্যকীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে পূর্ব্ববৎ বাৎসরিক Settlement-প্রথায় কার্য্য চলিতে লাগিল[১৮]।

রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারগণের কর্ম্মভোগ— মোগল আমলে রাজস্ব অনাদায় থাকিলে জমিদারগণের যে কি দুর্গতি হইত, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে! রাজস্ব প্রদানের ত্রুটির জন্য জমিদারগণকে কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। তথায় তাঁহারা যথেষ্ট পানাহার পাইতেন না- কেবল মাত্র জীবনরক্ষার জন্য যৎসামান্য আহার্য্য প্রাপ্ত হইতেন। তাহাও আবার অভক্ষ্য অপেয় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করা হইত। মুর্শিদকুলি খাঁ'র ইহাই সাধারণ ব্যবস্থা ছিল। এ বিষয়ের জন্য তিনি নাজির আহম্মদ ও সৈয়দ রেজা খাঁ নামক দুইজন লোক নিযুক্ত করেন। নাজির আহম্মদ জমিদারগণকে কখনও তে-কাঠায় বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিত, কখনও বা কোড়া প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিত। আবার তাঁহাদিগকে গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখিত এবং শীতকালে তাঁহাদের নগ্ন দেহে জল সিঞ্চন করিত!

রেজা খাঁ একটি খাদ খনন করিয়া তাহা নানাবিধ পূতিগন্ধময় আবর্জনায় পূর্ণ করিয়া এক নক্কারজনক নরকুণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহাকেই রেজা খাঁ উপহাসচ্ছলে হিন্দুরাজগণের জন্য 'বৈকুন্ঠ বা বেহেস্ত' বলিত। রাজস্ব

বাকী-ফেলা জমিদারগণকে হস্তপদ বন্ধন করিয়া এই নক্কারজনক পূতিগন্ধময় নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিত। আবার, কখনও বা তাহাদের ঢিলা ইজারের মধ্যে মার্জ্জার প্রবেশ করাইয়া তাঁহাদের উরুদেশ ক্ষতবিক্ষত করা হইত এবং গো-দুগ্ধে ও মেষ-দুগ্ধে অত্যধিক লবণ মিশ্রিত করিয়া জোর পূর্ব্বক পান করান হইত, ইত্যাদি[১৯]।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানী গ্রহণের পর হইতেই বাকীপড়া জমিদারগণের প্রতি এবম্বিধ কায়িক দণ্ডদানে বিরত হইলেন। তাঁহারা জমিদারগণকে কারাগারে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের যাবতীয় সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহাদের নিযুক্ত কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে বাকীপড়া জমিদারগণের রাজস্ব আদায় করিয়া লইতেন। এই সময় জমিদারগণের কারাবাস কতকটা নজরবন্দীর মত ছিল। বলা বাহুল্য যে, ইহাতে কোম্পানীর নিযুক্ত পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণের উৎকোচের মাত্রা প্রবলভাবেই চলিতে লাগিল। যে জমিদার তাহাদের সন্তোষবিধান করিতে পারিতেন, তিনি অচিরেই মুক্তিলাভ করিয়া স্বীয় জমিদারীতে পূর্ব্ববৎ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারিতেন। জমিদারগণ কখন কখন নিজ গৃহে কখন কখন বা কালেক্টরের তত্ত্বাবধানে জেলার সদরে[২০] এবং কখন কখন বা জেলে বন্দী রহিতেন। এখানেও সেই উৎকোচ! রাজকর্ম্মচারিগণের সন্তোষবিধান করিতে পারিলে জামিনে অচিরেই মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন। তৎকালে ইহাই ছিল সাধারণ বিধি[২১]। এইভাবে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বীরভূমের রাজা তাঁহার জমিদারীর অধিকার হইতে সাময়িকভাবে বঞ্চিত হইয়াছিলেন[২২]।

পরবর্ত্তীকালে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেসন দ্বারা বাকীফেলা জমিদারগণের কারানিক্ষেপ প্রথা রহিত হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে বাকীপড়া জমিদারী প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিবার বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়।

বীরভূমে রাজস্বহ্রাসের হেতু— ইংরাজগণের দেওয়ানী গ্রহণের পর প্রায় বিশ বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু বীরভূমের রাজস্ব এখনও স্থায়ীভাবে নির্ণীত হইল না। পরন্তু, ক্রমেই তাহার হ্রাস ঘটিতে লাগিল। মন্বন্তরের পর হইতেই জনসংখ্যা হ্রাস, দেশব্যাপী অনাবাদী, বা পতিত জমির ক্রমবৃদ্ধি ও পলাতকার সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হওয়ায় বীরভূমের রাজস্ব কমিবার প্রধানতম হেতু বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হয়।

মণ্ডলগণের মধ্যস্থতায় মালগুজারি আদায় করিবার প্রথার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই মণ্ডলগণ অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। প্রজাগণের উপর তাঁহাদের অশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ইঁহারা খাজনার নিরিখ নির্ণয় করিয়া দিতেন এবং ভূস্বামিগণের ক্ষতি করিয়াও নিজেদের প্রাপ্য অত্যধিক ও অতিরিক্ত পরিমাণে

আদায় করিতেন। এ সম্বন্ধে সার জন সোর (Sir John Shore,পরবর্ত্তীকালে Lord Teignmouth) ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন– In almost every village, according to its extent, there is one or more head ryot known by a variety of names in different parts of the Country, who has, in some measure, the direction and superintendece of the rest. For distinction, I shall confine myself to the term 'Mandal'; he assists in fixing the rent, in directing the cultivation, and in making the collections. This class of men, so apparently useful, seem greatly to have contributed to the growth of the various abuses now existing and to have secured their own advantages both at the expense of the zemindar landlord, renter and inferior ryots. Their power and influence over the inferior ryots is great and extensive; they compromise with the farmer at their expense and procure their own rents to be lowered without any diminution in what he is to receive, by throwing the difference upon the lower ryots, from whom it is exacted by taxes of various denominations. They make a traffic in Pattas, lowering the rates of them by private stipulations and connive at the separation and secretion of lands. If any attempt is made to check the abuses, they urge the ryots to complain and sometimes to resist.

তাঁহাদের আচরণ সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে– "In Birbhum a striking instance of this has been exhibited when an attempt was made to equalize the assessment of the ryots by moving the burthen from the lower class, and resuming the illegal profits of the Mandals, an immediate opposition was made and the complainants came to Calcutta. The Government was obliged to interfere with a military force to anticipate disturbance; and at present the ryots are apparently averse to an arrangement proposed for their benefit, and upon principles calculated to ensure it. On a former occasion, when a general measurement was attempted by the Zeminder of the same

district as a basis of a general and equal assessment, the Mandals by a contribution, prevailed upon him to forego it."[২৩]

মণ্ডলগণের এইরূপ অনাচার ও ষড়যন্ত্রের ফলেও বীরভূমের রাজস্বের পরিমাণ কমিয়া যাইবার অন্যতম প্রধান হেতু বলিয়া মনে হয়।

এতদ্ব্যতীত, বীরভূম বা নগররাজের অত্যধিক পরিমাণ নিষ্কর ভূমি বৃত্তিস্বরূপ দানও[২৪] রাজস্ব হ্রাসের অন্যতম প্রধান হেতু। Mr. Grant এর Fifth Reportএ অবগত হওয়া যায় যে ১,০৮,৭১১ বিঘা এইভাবে নিষ্কর বা বাজেজমীন রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৯৭৮৪ জন থানাদার ও সৈন্যগণের জন্য ১,২৭,১১৭ বিঘা পরিমিত ভূমি চাকরাণ স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। পরবর্তী ১৩ বৎসর কাল ধরিয়া নগররাজ আরও অনেক ভূমি বাজেজমীন স্বরূপ নিষ্কর দান করিয়াছিলেন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে এই বাজেজমীনের পরিমাণ ২,১৭,৯০৭ বিঘা হইয়াছিল। কিন্তু বাজেজমীন দপ্তরে মাত্র ২২,৯১৯ বিঘা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল[২৫]।

বীরভূমের রাজস্ব (১৭৮৭-৯৩ খৃঃ পর্য্যন্ত)— আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে বলিয়াছি যে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বীরভূম-বিষ্ণুপুরকে একটি সম্মিলিত জেলারূপে পরিণত করেন। Mr. G. R. Foley (Civil officer and Collector) প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন। তাঁহার পরই Mr. Sherburne সাহেব বীরভূমের কালেক্টর পদ লাভ করিয়া দেড় বৎসরকাল কার্য্য করেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধীয় কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই বীরভূমের জমিদারী সংক্রান্ত বিশেষ অনুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহার আদেশানুযায়ী বীরভূমের জমিদারগণ তাঁহাদের মহালের হাল, হকিয়ত, চিঠা ইত্যাদি যথাসম্ভব দাখিল করেন। তিনি প্রায় ৩০০ তিনশত আমীন নিযুক্ত করিয়া বীরভূমের জরিপ ও বিভিন্ন পরগণার মালগুজারি নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। এতদর্থে তিনি যে চিঠা বা হস্তবূদ প্রস্তুত করেন, তাহাই এখনও সারবার্ণ সাহেবের চিঠা বা ১১৯৩ সালের চিঠা নামে খ্যাত রহিয়াছে। Mr. Ernst এই কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য নিযুক্ত হন। বীরভূমের তদানীন্তন কালেক্টর Mr. E. G. Drake-Brockman সাহেব তাহা ব্যবহারের অযোগ্য বিবেচনা করিলে রেভিনিউ বোর্ডের আদেশমত নষ্ট করা হয়। সারবার্ণ সাহেবের জরিপ কার্য্য অবশ্য বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রাণালীসম্মত হয় নাই। তবে তৎপূর্ব্বে বীরভূমের জমি-জমার পরিমাণ কিছুই জানা ছিল না; কিন্তু ইহা হইতে একটা আনুমানিক জমি-জমার পরিমাণ নির্দ্ধারণের সহায়তা করিতে পারিত। মিঃ সারবার্ণের এইরূপ জরিপের ফলে বীরভূমের ৬,৫০,০০০\ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। এতদিন বাৎসরিক বন্দোবস্ত হইত; এখন হইতে ১০ দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত

করিবার কল্পনা হইল। তবে, প্রথম বৎসর মাত্র ৬,১১,০০০৲ টাকা আদায় করা হইবে বলিয়া মতামত প্রকাশিত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণের তুলনায় এই রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ তিনি অত্যন্ত সঙ্গত (very moderate) বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে বীরভূমের জমিদারী হইতে ৭,৫০,০০০৲ সাড়ে সাত লক্ষ টাকার কম আদায় হইবে না এবং ইহাতেও রাজার প্রায় ১,০০,০০০৲ একলক্ষ টাকা বার্ষিক প্রাপ্য হইবে।

গভর্ণর জেনারেল ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের জন্য বীরভূমের ৬,১১,৩২১৲ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিলেন এবং নগরের রাজার নিকট হইতে তাঁহার বকেয়া প্রাপ্য রাজস্ব পরিশোধ করিবার ও প্রজাগণকে যথারীতি পাট্টা দান করিবার অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন। এই পরিমাণ রাজস্ব ইংরাজ সরকারকে দিবার অঙ্গীকার করিলেও রাজা যথেষ্ট পরিমাণ মালগুজারি আদায় করিতে পারিতেন না। এইজন্য রাজা প্রায়ই কালেক্টরকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেন [Letter from Collector Keating to Sir John Shore, dated 14th April 1790;[২৬]]। নগররাজ বর্দ্ধিতহারে খাজনা আদায় করিতে আরম্ভ করিলে পূর্ব্বোক্ত মণ্ডলগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ফলে, তাহাদিগকে দমনের জন্য সশস্ত্র সৈন্যের প্রয়োজন হইয়াছিল।

তথ্যসূত্র

(১) Published by Thacker, Spink & Co..

(২) বীরভূমের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—গ্রন্থকার—৮০, ৮৭-৯১ পৃঃ

(৩) Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report
– F.D. Ascoli M.A. I.C.S, p. 28

(৪) বীরভূমের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—গ্রন্থকার ৯০ পৃঃ

(৫) খাসনবিসী ৩৯৯২৲, জেরমতহুত ৫০০৲, চৌথ মারাঠা ৬৩৭৮০৲
= ৬৮২২২৲ টাকা

(৬) পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত রাজস্ব ৪,৪৫,৮৬৭৲ + বাজেয়াপ্ত জমীর ৮,৯৬,২৭৫৲
= ১৩,৪২,১৪২৲ টাকা। এই পরিমাণ টাকা প্রকৃত পক্ষে কখনও আদায় হইয়াছিল কিনা তদ্বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন – গ্রন্থকার।

(৭) Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum 1942–32— Rai Bahadur B. B. Mukherjee D.L.R. pp 24–45

(৮) Grant's Analysis of the Finances of Bengal.

(৯) এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে – গ্রন্থকার

(১০) Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum 1924–32 , Rai Bahadur B. B. Mukherjee D.L.R. p 45.

(১১) Bengal Munscript Records, Vol I Sir W. W. Hunter, Introduction pp 17–19.

(১২) ১ সিক্কাটাকা = ১^{১}/১৫ কোম্পানী বা বর্ত্তমান টাকা

(১৩) Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum 1924-32, Rai Bahadur B. B. Mukherjee D.L.R. p 47.

(১৪) Bengal Manuscript Records, Vol I, Sir W. W. Hunter p 41

(১৫) Bengal Manuscript Records, Vol I – Sir W. W. Hunter p 76

(১৬) Bengal Manuscript Records, Vol I– Sir W. W. Hunter p 96

(১৭) Bengal Manuscript Records, Vol I– Sir W. W. Hunter p. 115

(১৮) Bengal Manuscript Records, Vol I— Sir W. W. Hunter Introduction pp- 17–22

(১৯) ক) Stuart's History of Bengal.

খ) রিয়াজ-উস-সালাতিন (অনুবাদ, রামপ্রাণ গুপ্ত)

গ) Bengal Manuscript Records, Vol I- Sir W. W. Hunter, Introduction, footnote pp 89, 95

ঘ) মুর্শিদাবাদের ইতিহাস – নিখিলনাথ রায় – ৩৭৪-৭৬ পৃঃ

(২০) সিউড়ীতে কালেক্টরের কুঠীর সন্নিকট হুসনাবাদ পল্লীতে বা কুঠীর পূর্ব্বপার্শ্বে, রাজনগরের জমিদারের নজরবন্দী অবস্থায় থাকার কথা শুনিতে পাওয়া যায় – গ্রন্থাকার

(২১) Bengal Manuscript Records, Vol I- Sir W. W. Hunter, Introduction, pp 89–91.

(২২) Bengal Manuscript Records, Vol I- Sir W. W. Hunter, Letter No 120, p 41.

(২৩) ক) District Gazetteer— L. S. S. O'malley pp 85-86.

খ) Analysis of the finance of Bengal— Fifth Report.

(২৪) পরবর্ত্তী ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য –গ্রন্থকার

(২৫) ক) Fifth Report.

খ) Notes on the Early Rėvenue Administration in the District of Birbhum – E. G. Drake- Brockman I. C. S.

(২৬) Bengal Manuscript Records, Vol II- Sir W. W. Hunter p 777.

চতুর্থ অধ্যায়

বীরভূমের রাজস্ব—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত

প্রারম্ভিক কথা— বৃটিশ পার্লামেন্টে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব আদায়ের স্থায়ী ব্যবস্থা করিবার জন্য পিট্ সাহেব একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন। ইহাই Pitt's Act of 1784 নামে পরিচিত। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে কোর্ট-অব ডিরেক্টর কর্ত্তৃক সুদীর্ঘ মন্তব্য দ্বারা ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আদেশ প্রেরিত হয়। সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একটি আকস্মিক ঘটনা নহে। দেওয়ানী গ্রহণের পর বিশ বৎসরেরও অধিককালের অভিজ্ঞতার ফলে পার্লামেন্ট কর্ত্তৃক আইন প্রণয়ন দ্বারা রাজস্ব আদায়ের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কর্ণওয়ালিস্ এদেশে গভর্ণর জেনারল স্বরূপ আগমন করিয়া অতিরিক্ত সংবাদ ও সন্ধান সংগ্রহ করিয়া ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement) ঘোষণা করেন। বলাবাহুল্য যে ১১৯৩ সালের চিঠার বনিয়াদেই বীরভূমের রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। ডিরেক্টরগণ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে এ-দেশের আইন, রীতিনীতি ও দেশপ্রথার (Custom) এবং Local system of land rights in Bengal-এর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই, এই বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা, প্রকৃতপক্ষে বাঙলার, তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আলোচিত হইবার যোগ্য। একটি ক্ষুদ্র জেলার ইতিহাসে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। তবে, এইস্থানে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক মনে করি। জমিদারগণ আবহমানকাল হইতে যে স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, সেইস্থানে তাঁহারা দেশ-প্রথামত রাজা বা ভূস্বামী বলিয়া সম্মানিত হইতেন। আবার মুর্শিদকুলী খাঁ'র সময় বা অন্যান্য মোগল সুবাদারগণের সময় রাজস্ব আদায়ের বিপর্য্যয়ের ফলে পেস্কাস্[১] গ্রহণান্তর জমিদারী হস্তান্তরিত বা পূর্ব্বাধিকারীর সহিত পুনর্বন্দোবস্ত করিয়া যে সনন্দ প্রদান করিতেন এবং সেই সনন্দের বলে যাঁহারা ভূস্বামী বলিয়া পরিচিত হইতেন, তাঁহারা এই দুই প্রকার অধিকারবিশিষ্ট জমিদারগণকে সমপর্য্যায়ে

ফেলিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন[২]।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত– ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দশশালা বন্দোবস্ত জন্য নিয়মাবলী প্রচারিত হয় এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখ প্রেরিত কোর্ট-অব-ডিরেক্টরগণের আদেশ মত ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ্চ তারিখে বাঙলার এই দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement) বলিয়া ঘোষিত হয়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি যে মিঃ সারবার্ণ সাহেবের নির্দ্দেশমত বাৎসরিক বন্দোবস্তে গভর্ণর জেনারেল ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের জন্য ৬,৫০,০০০৲ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারণ অনুমোদন করেন।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে নগররাজ বাহাদুর-উল-জমা খাঁ'র মৃত্যু হইলে তাঁহার নাবালক পুত্র মহম্মদ-উল-জমা খাঁ পিতৃতক্তে আসীন হন। ইংরাজ সরকার ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে বীরভূমের কালেক্টরকে নির্দ্দেশ দেন যে জমার উপর নিরিখে যথারীতি পেস্‌কাস্ প্রদান করিলে, মহম্মদ-জমা-খাঁকে যেন বীরভূমের জমিদার স্বরূপ ভূষিত বা (Invest) গণ্য করা হয়[৩]। এই নাবালক রাজার জমিদারী তত্ত্বাবধান জন্য বীরভূমের তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ কীটিংকে Manager বা সরবরাহকার এবং লালা (বাবু) রামনাথ ভাদুড়ী[৪] নামক একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে তাঁহার দেওয়ান স্বরূপ নিযুক্ত করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্তের কথা হইলে এই রামনাথই কীটিং সাহেবকে আবশ্যকীয় রাজস্ববিষয়ক সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহারই বলে কীটিং সাহেব সায়ার[৫] আদায় বাদে বীরভূমের জন্য ৬,৫০,০০০৲ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত করেন। ইহাই বীরভূমের চিরস্থায়ী রাজস্ব বলিয়া গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে সারবার্ণ সাহেব বীরভূমের মোটামুটি জরিপ জমাবন্দী করিয়া যে হস্তবুদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী রামনাথ ভাদুড়ী রাজস্ব সংক্রান্ত হস্তবুদের পরিমাণ ইত্যাদি স্থিরীকৃত করেন।

এই মোটামুটি জরিপে, জমিদারীর খণ্ড খণ্ড লাট বা পরগণার পরিমাণ বা সীমা নির্দ্ধারিত হয় নাই। জমিদারের খাস জমির পরিমাণ, জমিদার প্রদত্ত নিষ্কর ও চাকরাণ ভূমির পরিমাণও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এই চাকরাণ ও নিষ্কর ভূমি দেশ-প্রথা বা প্রচলিত আইনসঙ্গত ভাবে দেওয়া হইয়াছিল কি না, তাহারও কোন নির্ণয় হয় নাই। প্রত্যেক গ্রামের সীমাও অনির্দ্দিষ্ট রহিয়া গেল। যাহা জরিপ হইয়াছিল, তাহা বিঘা হিসাবে নির্ণয় হইলেও নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ যোগ্য নহে। সর্ব্বোপরি, রাজস্বদায়ী জমিরও কোন সঠিক পরিমাণ নির্ণয় হয় নাই। তখন পতিত ও অনাবাদী জমিরও কোন পরিমাণ জানিবার চেষ্টা করা হয় নাই।

এইরূপে যথারীতি ভাবে কোনরূপ বিশেষ তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া বা কোন জরিপ-জমাবন্দী দ্বারা হস্তবুদ প্রস্তুত না করিয়া, কেবলমাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের আদায়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়াই রাজস্ব নির্ণীত হওয়ায়, অল্পকাল পরেই সীমানা নির্দ্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে পরবর্ত্তীকালে মহা অনর্থের সূচনা সৃষ্টি করিয়াছিল। ইংরাজ সরকারও এ-বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিতেন না-জমিদারেও না! ফলে, বলশালী জমীদার দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাইয়া জোর পূর্ব্বক সীমানা বর্দ্ধিত করিয়া অধিক পরিমাণ ভূমি দখল করিয়া লইত[৬]।

যাহাই হউক, সারবার্ণ সাহেব বীরভূমের জমিদারীর ৭,৫০,০০০৲ টাকা আয় অনুমান করিয়া ৬,৫০,০০০৲ টাকা জমীদারের দেয় রাজস্ব বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ইহাতে রাজার শতকরা ১৩৲ টাকা হিসাবে, লক্ষ টাকা লাভ থাকিবার কথা।

পরবর্ত্তীকালে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জমীদারী ক্রোক করিবার জন্য বিশেষ ভাবে নিযুক্ত Mr. Ernst লিখিয়াছিলেন যে বীরভূমের জমিদারীর আয় সর্ব্বসমেত ৮,১১,৫২০৲ টাকা এবং নয়াবাদ (নূতন আবাদী) জমীর খাজনা ৬০,৫৮৪৲ মোট ৮,৭২,১০৪৲ টাকা অর্থাৎ ৭$^{১}/_{২}$ লক্ষ টাকা সরকারী রাজস্ব প্রদান করিয়া, প্রায় ১$^{১}/_{৪}$ লক্ষ টাকা জমীদারের লাভ থাকিবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর— চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কিছুকাল পর্য্যন্ত বাকীদার জমীদারগণকে কারারুদ্ধ করিয়া বা নজরবন্দী রাখিয়া তাঁহাদের সম্পত্তির ভার গ্রহণ পূর্ব্বক রাজস্ব আদায় করা হইত এবং প্রাপ্য রাজস্ব উশুল হইয়া গেলেই জমীদার নিজ সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া যথাপূর্ব্ব ভোগ করিতে পারিতেন। কিন্তু ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ৩নং রেগুলেসনের বলে এই কারাদণ্ডের ব্যবস্থা রহিত করিয়া বাকীপড়া সম্পত্তি প্রকাশ্য ভাবে নীলাম করিয়া প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার ফলে, বাকীদার জমীদারগণ তাঁহাদের সম্পত্তি হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইলেন— অনেকেই পথের ভিখারী হইলেন।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে বীরভূম স্বতন্ত্র জেলা বলিয়া ঘোষিত হইলে পর, বীরভূমের তদানীন্তন ভূস্বামী নগররাজ নাবালক মহম্মদ-উল-জমা খাঁ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর নিকট হইতে সমগ্র বীরভূমির জমিদারী স্বত্ব লাভের জন্য সনন্দ প্রাপ্ত হন। তিনি বীরভূমের রাজস্ব বাবদ বার্ষিক ৬,৫০,০০০৲ টাকা করিয়া দিবার অঙ্গীকার করিলে তাহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তরূপে গৃহীত হইল। তাঁহার পিতা বাহাদুর-উল-জমা খাঁকে রাজস্ব অনাদায়ের জন্য প্রেসিডেন্সীতে প্রায়ই কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইত। এই হেতু তাঁহাকে তাঁহার সম্পত্তির ভার হইতেও সাময়িক ভাবে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। এই সময় তাঁহাকে "রাজা"-উপাধি

হইতেও চিরতরে বঞ্চিত করা হয়[৭]।

মহম্মদ-উল-জমা খাঁ'র রাজ্য গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই বীরভূম জমিদারীর বহু টাকার রাজস্ব বাকী ছিল এবং বীরভূম জমিদারীর ভার গ্রহণ করিবার অল্প দিনের মধ্যে তিনি এরূপ বাকী রাজস্বের ঋণে জড়িত হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার সম্পত্তি প্রায়ই ক্রোক করা হইত এবং তাঁহাকে একাধিকবার কারাগারে আবদ্ধ রহিতে হইয়াছিল। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের এক কিস্তির দেয় ৩৩,৫৪৮৲ টাকা বাকীর জন্য মহম্মদ-জমা খাঁকে আবদ্ধ করিয়া ও তাঁহার জমিদারী ক্রোক করিয়া লালা রামনাথ ভাদুড়ীকে তৎপরিচালনের ভার অর্পণ করা হয়। তদনন্তর জমিদার মে মাসে বীরভূমের কালেক্টরের মধ্যস্থতায় বাকী রাজস্ব আদায় দিবার সময় প্রার্থনা করিয়া কারাদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভের আবেদন করেন[৮]।

কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি মত রাজস্ব আদায় দিতে পারিলেন না। ফলে, বাকী রাজস্ব ও ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁহার সম্পত্তি ক্রমেই লাটে লাটে নীলামে বিক্রয় হইতে লাগিল।

অব্যবস্থা ও ব্যয়বাহুল্য জন্যই জমিদারের বাকী রাজস্ব যথা নিয়মে পরিশোধিত না হইবার প্রধানতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে বীরভূমের জমিদারের ৪০,০০০৲ টাকা বাকী রাজস্বের জন্য প্রথম লাট বিক্রয়ের তালিকা বোর্ডের নিকট অনুমতির জন্য প্রেরিত হয়[৯]।

অতঃপর ক্রমেই বীরভূমের জমিদারী লাটে লাটে নীলামে বিক্রয় হইতে লাগিল এবং সমগ্র বীরভূমের একজন জমিদারের পরিবর্ত্তে ক্রমেই জমিদারের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিতে লাগিল।

পূর্ব্বে মিঃ সারবার্ণ সাহেবের সময় যে হস্তবুদ বা চিঠা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে প্রতি পরগণার জন্য হস্তবুদ বা দেয় রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। এখন এই লাটে লাটে স্বতন্ত্র ভাবে বিক্রীত লাটগুলির দেয় রাজস্বের পরিমাণ তদনুসারেই নির্ণীত হইয়াছিল।

এইভাবে নগররাজের জমিদারী দ্রুতগতিতে বিক্রীত হইতে লাগিল। কালেক্টর দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার দেয় রাজস্ব ২০,০০০৲ টাকার দায় হইতে অব্যাহতি দেন। ইহার পর তিনি পুনরায় বাকী পড়া ৯০,৭৬৯৲ টাকা পরিশোধ করিবার জন্য সময় প্রার্থনা করেন। এইজন্য গভর্ণমেন্ট স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া প্রজাগণের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। ইতিমধ্যে রাজাকে, তাঁহার দেয় রাজস্ব আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ রাখা হয়।

ইহার অল্পদিন পরই তিনি ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ তারিখে ৭০,৫৩৬ টাকা বাকী রাজস্বস্বরূপ আদায় দিয়া অবশিষ্ট ঋণ দুই মাস পর চৈত্রমাসে পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার করিলে তাঁহাকে উক্ত ৬ই মার্চ্চ তারিখে কারাদণ্ড হইতে মুক্তিদান করা হয়। ঐ সময় তিনি খোস কোবালার দ্বারা পরগণে দড়ি মৌড়েশ্বর, তালুক মল্লারপুর ও তপ্পে সাহালামপুর– এই তিনি পরগণা মাত্র ১ বৎসরের দেয় রাজস্ব মূল্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বিক্রয় পূর্ব্বক সে যাত্রা মুক্তিলাভ করেন! এই কোবালা দৃষ্টে বোঝা যাইবে যে মহম্মদ-জমা খাঁ স্বেচ্ছাকৃত দোষের জন্য কিভাবে বে-কায়দায় পড়িয়া মাত্র ১ বৎসরের মালগুজারী টাকার পরিবর্ত্তে অমন বহু মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিলেন! ইহাতে তিনি কেবলমাত্র কয়েক মাসের জন্য কারাদণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। আবার বৎসরের শেষে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ পর্য্যন্ত তাঁহার দেয় বাকী রাজস্বের পরিমাণ ২,০০,০০০ দুই লক্ষ টাকায় পরিণত হইল! আমরা নিম্নে খোস কোবালা ও দখলী পরওয়ানার অবিকল প্রতিলিপি এইস্থলে উর্দ্ধৃত করিলাম–

কোবালা

সুস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীমদনগোপাল বসু ওলদে শ্রীকৃষ্ণরাম বসু এবনে ঁদয়ারাম বসু সাকিম সহর কলিকাতা ষুতানুটীর শ্যামবাজার সদুদার চরিতেষু লিখিতং শ্রীরাজা মহাম্মদ জমা খাঁ বাহাদুর ওল্‌দে শ্রীরাজা বাহাদুর জমা খাঁ এবনে ঁদেওয়ান বাদির্জ্জমা খাঁ জমিদার পরগণে বিরভূম ও গয়রহ কস্য মহালাত জমিদারী বিক্রী কোয়ালা পত্রমিদং সন ১২০২ বার সত্ত দুই সালাব্দে লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে আমার জমিদারি মতালকে খালসে সরিফা পরগণে বীরভূম ও গয়রহর মালগুজারির সরবরাহ দিতে না পারিয়া আমার জমিদারীর মধ্যে পরগণে দড়ি মৌড়েশ্বর সদর জমা মালগুজারি ৫৩৯৪৸/১৬ তিপান্ন হাজার নয়সত্ত চারি টাকা তের আনা ষোল গণ্ডা তপ্রে সাহা আলমপুর সদর জমা মালগুজারি ৪৯৩২২।৮ ওনপঞ্চাশ হাজার তিনশত বাইশ টাকা চারি আনা আট গণ্ডা ও তালুক মল্লারপুর স্বদর জমা মালগুজারি ১৬৬৯১॥/১ সোল হাজার ছয়সত্ত একানব্বই টাকা নয় আনা এক গণ্ডা একুনে তিন মহলে সদর জমা মালগুজারি ১১৯৯১৮॥৶৫ এক লক্ষ উনিশ হাজার নয় সত্ত আঠার টাকা এগার আনা এক পাই এই মহলাত মজকুরিন জমিদারী সামদায় চতুসিমাবিচ্ছিন্ন সজস্থল তরি ও খুস্কি রাইয়াত ও খামার ও চাকরান ও আয়মা সপ্রাজ্ঞ সবিজে সরিক্ষে আরাজীয়াত হাশীল ও পতিত লাএক ও নালাএক দড়ি ও সাবেক আবাদী ও গর আবাদী ও বঞ্জর ও পুষ্কর্ন্নী ও ডোবা ও বাগাত ও খাল ও নদী ও বিল ও ঝিল ও জঙ্গল ও জলকর ও বোনকর ও ননকর ও বৃক্ষাদি ফলা অফলা ও গয়রহ সেত্তায় মহুরাই

দেবোত্তর, ব্রহ্মত্তর, পিরান ও ফকিরান ও লাখেরাজ ও মহাত্রান মাতবর সনন্দ ষুরত সদর বহালি যে আছে তাহা বাদে পূর্ব্বাপর অবধী আম্মল মাম্মল মাফিক দরবস্ত মহালাত মজকুরেন জমিদারী সবসে ও খোলাসা চিত্রে সেচ্ছাপূর্ব্বক তোমার নিকে মবলগে ১১৯৯১৮॥৶৫ এক লক্ষ ওনিষ হাজার নয়সত্ত আঠার টাকা এগার আনা এক পাই সিক্কা বায়জনওক্ত পুরা ওজন পোন বাহাতে বিক্রয় করিলাম পোনবাহার টাকা বেবাক গোপালদাস হরেকৃষ্ণ দাস সাহার কোটীর মারফরত কলিকাতা মোকামে নগদ দস্তুরদস্ত পাইয়া– আপন কাবেজে আনিয়া আমার জমিদারীর বাকী আদায় কারন দৌলাত মদার কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের রিবনিয়ো বোরডের কাছারিতে দাখিল করিলাম মহালাত মজকুরেন জমিদারী ...... আমার জমীদারি হইতে খারিজ সদর মপশ্বল দপ্তরে আপন নামে জমীদারি লেখাইয়া মহালাত মজকুরেন জমীদারির সকল হক জে কি আমার দখলে ছিল তাহা তুমি আপন দখল ও কাবেজে আনিয়া আবাদ তবদুদ করিয়া সন বর সন সদর বন্দবস্ত ষুরত মালগুজারি করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে দান বিক্রয়ের সর্ত্তাধিকারি হইয়া পরম সুখে ভোগ করহ–মহলাত মজকুরেন জমিদারীর সহিত আমার কিম্বা আমার ওয়ারিশানে কোন দাও নাই কশ্বিনকালে আমি কিম্বা আমার ওয়ারিশ্বান কেহ কোন দাও করে কিম্বা করি সে ঝুটা ও বাতিল এতদর্থে মহালাত জমীদারি বিক্রয় কোয়ালা লিখিয়া দিলাম ইতি সন সদর তারিখ

২৩ মাঘ

আশামী	সদর জমা মালগুজারি
পরগণে–	
দড়ি মৌড়েশ্বর	৫৩,৯০৪৸/১৬
তপ্রে সাহাআলামপুর	৪৯,৩২২। ৮
তালুক মল্লারপুর	১৬,৬৯১॥/১
	১,১৯,৯১৮॥৶৫

ইসাদি–

শ্রীগুরুপ্রসাদ দত্ত	শ্রী রামশঙ্কর দেবস্য	শ্রীরামকুমার দত্ত
সাং মণ্ডলাগ্রী	সাং রাজবন হাট	সাং মণ্ডলাই
পঃ পাণ্ডয়া	পঃ ভুরশীট্র	পঃ পাণ্ডুয়া[১০]

দখলি পরবানা

জিলে বিরভোমের পরগণে দরি মৌড়েশ্বর ও তপ্রে সাহআলামপুর ও তালুক মল্বারপুরের মস্তাবোরানা ও কটকিনা দাবান ও পাটয়ারিয়ান ও মণ্ডলান কোতদয়ালান ও বায় . . . . (ছেঁড়া). . .. ও বাসিন্দাগণ প্রতি বিদানন্দ আগে

পরগণে বিরভোম ও গয়রহর জমীদার শ্রীরাজা মহাম্মদ জমা খাঁ আপন জমীদারির মধ্যে দরবস্ত ঐ তিন মহলাত মজকুর আপন রাজীতে সহর কলিকাতার শ্যামবাজারের শ্রীমদন গোপাল বষুর নিকট বিক্রয় করিয়া আপন জমিদারী হইতে খারিজ করিয়া দিলেক অতয়েব লেখা জাইতেছে তোমরা বষু মজকুরকে মহলাত মজকুরে জমিদার ওস্তোয়ার জানিয়া বষু মজকুরের আমলার নিকট রূষি হইয়া করার ওআক্কাই মপশ্বলের নওমাজীমা কাগজ পত্র দিবা কোন বিশয় পূশীদা না করিয়া মহলাত মজকুরের আবদ তবদুদে মুকেষদ হইয়া বরোক্ত খাজনার সরবরাহ করিবে কোন বিষয় তফাহুত না হয় ইহাতে তাগীদ জানিবা ইতি সন ১২০৩ সাল সন ১৭৯৬ রেজী তারিখ ১৪ই আপরেল মোতালকে ৪ বৈশাখ–[১১]।

ক্রমেই অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইল তাহাতে মহম্মদ-জমা খাঁ'র পূর্ব্বের স্বচ্ছল অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আর কোন উপায় রহিল না। তাঁহার কর্ম্ম-শৈথিল্য ও চরিত্রহীনতা সংশোধনের কোনরূপ আশা নাই দেখিয়া, মমতাবশতঃ তাঁহার মাতা ও চারিজন পিতৃব্য কালেক্টরের মধ্যস্থতায় বোর্ড-অব-রেভিনিউএ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য আবেদন করেন।

এই নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব ১৭৯৪ খৃঃ ৪ঠা নভেম্বর তারিখে ২৪ নং পত্র দ্বারা বোর্ডকে জমিদারের কর্ম্ম-শৈথিল্য, দুশ্চরিত্রতা এবং বিষয় তত্ত্বাবধানে অযোগ্যতার কথা লিখিয়া, তাঁহাকে জমিদারী পরিচালনের অযোগ্য (Disqualified Zemindar) বলিয়া ঘোষণা করিতে অনুরোধ করেন। [Letter from Collector of Birbhum, reporting the neglect and profligacy of the zemindar, and his incapacity to manage his estates and recommending his being disqualified. Nov 4, No 24 [১২]]

এ-সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেব বোর্ডের নিকট যে রিপোর্ট করেন তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইল। ইহা হইতে মহম্মদ-জমা খাঁ'র সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যাইবে–

"With respect to the existence of the just and sufficient grounds of disqualification no doubt can, I think, be entertained. The profligacy of the zeminder's character is notorious. The whole tenor of his conduct exhibits proofs of egregious folly and weakness and in no instance are they more clearly manifested than in the selection he had made of official servants and confidants among whom stands foremost in his

favour and affection, one Rai Charan Raj– a man possessed of infinite low cunning and intrigue and unrivalled in the arts of fraud and litigation and of a numerous tarin of sycophants and selfish designing people, eager to seize every advantage they can derive by administering to the gratification of his passions. To enforce the propriety of the measure it may be proper to add that the zemindary debts last year incurred, not for want of resources in his zemindary but entirely for his own mismanagement and extravagance amounted to upwards of a lakh of Rupees and as his conduct ever since has been far from indicating any intention of reducing the expenses his debts at the end of the year, if left ot his own discretion can not possibly, I conceive, fall short of a lakh and half of Rupees. Such are the existing grounds for the disqualification of the zemindar, which, the pressing and pathetic remonstrances of his family asserting on the conviction, I feel that it can alone prevent the utter ruin– have induced me to propose,' [১৩]

ইহার ফলে, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ১০ নং রেগুলেসনের বলে বিধিমত রাজার বিরুদ্ধে অযোগ্যতার অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং তাঁহার নিজের কর্ম্ম-শৈথিল্য ও দুশ্চরিত্রতার জন্যই তিনি এইরূপ অর্থসঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া অভিযোগের হেতু স্বরূপ বর্ণন করা হয়। তিনি যথারীতি রাজস্ব আদায় করিয়া লইলেন; কিন্তু সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় না দিয়া তাহার অযথা অপব্যবহার করিলেন।

এই নিমিত্ত, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে Mr. Ernst সাহেব এই বীরভূমের জমিদারী ক্রোক করিতে এবং বাকী রাজস্ব আদায়ের জন্য কোন্ কোন্ সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইবে তাহার বিশেষ ভাবে তালিকা করিতে নিযুক্ত হন। Mr. Ernstএর উপর সপরিষদ গভর্ণর জেনারল কর্ত্তৃক ২৬এ মে তারিখ ২৭ নং পত্রদ্বারা সমগ্র বীরভূম জমিদারীর ভার অর্পিত হয় [Letter from Governor General in Council approving of the entire charge of the Birbhum Zemindary being vested in Mr. Ernst, May 26; No 27[১৪]।] মহম্মদ-জমা খাঁকে অযোগ্য (Disqualified) বলিয়া ঘোষণা করা হইলে পর, সরকার হইতে তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট মাসিক ভাতা দিবার বন্দোবস্ত করা হয়। মহম্মদ-জমা খাঁর

দারুণ অর্থকষ্ট হইলে, তাঁহার পরিবারবর্গেরও অর্থকষ্টের সীমা রহিল না! সেইজন্য তাঁহারা ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৯এ এপ্রিল তারিখ ইংরাজ-সরকারে, রাজাকে দৈনিক যে ৫০৲ টাকা করিয়া ভাতা প্রদত্ত হইত, তাহা হইতে তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য কিয়দংশ দিবার প্রার্থনা করেন। বীরভূমের কালেক্টর প্রকৃত অবস্থা বর্ণন করিয়া বোর্ডকে, রাজপরিবারবর্গের ভরণপোষণ জন্য কিছু পতিত জমি জায়গীর স্বরূপ দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু বোর্ড তাহাতে সম্মত হইলেন না। তবে, অনুমতি করিলেন যে মহম্মদ-জমা খাঁকে দৈনিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা করিয়া ভাতা দিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা তাঁহার নিজের জন্যই ব্যয়িত হইবে এবং তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য উপরন্তু মাসিক ১,০০০৲ হাজার টাকা করিয়া প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন [Letter from Collector of Birbum, stating the situation of the late Raja's family and recommending that a small jaigir of waste lands may be granted for their maintenance. May 15, 1795. No 24.

Letter to Collector of Birbhum, stating that the Board cannot approve his prososition respecting the appropriation of any part of the Zemindar's lands as a Jaigir, but directing that the Rs. 50/- per diem heretofore granted, be applied to his own maintenance and Rs. 1000/- per mensem to the support of his family. May 15, 1795[১৫]।]

অতঃপর বীরভূমের বিশাল জমিদারী কিস্তি কিস্তি লাটে লাটে বিক্রয় হইতে লাগিল। ফলে, মাত্র ৬/৭ বৎসরের মধ্যেই বীরভূম জমিদারী ২৩৩ জনের অধিকারে ২২২ টি মহালে বিভক্ত হইল[১৬]! ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত পঞ্চশালা বহি (Quinquennial Register) হইতে এই সংবাদ অবগত হওয়া যায়। এই বইখানি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন লাটের অন্তর্গত মৌজা, পরিমাণ ও জমা লিখিত আছে। কিন্তু তাহা কোন তৌজি নম্বরভুক্ত তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই। এখন নগররাজের মাত্র সারট দেওঘর (পূর্ব্বে বীরভূমির অন্তর্গত, বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণাভুক্ত) এবং গনুটিয়া এই দুইটি মহাল তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিল। সারট দেওঘরের সম্পত্তির আয় তত্রস্থ খাটোয়ালগণের নিকট হইতে বীরভূমের কালেক্টর রাজস্ব আদায় করিতেন এবং মিঃ ফ্রুসাড (Mr. Frushard) নামক ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীভুক্ত একজন দালালকে গনুটিয়া মহাল ইজারা বিলি করা হইয়াছিল[১৭]। এই ভাবে দেখা গেল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাত্র ৬/৭ বৎসর কাল মধ্যেই সমগ্র বীরভূম জমিদারী বহু অংশে বিভক্ত হইয়া

পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বীরভূমের জমিদারও তাঁহার পৈত্রিক জমিদারী হইতে চিরতরে বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন। আমরা এইস্থানে বীরভূম জমিদারীর নীলাম বিক্রয়ের একটি তালিকা প্রদান করিলাম। ইহাতে কোন্ বৎসর কয়টি নূতন মহাল কত রাজস্বে বিক্রীত হইয়াছিল তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

বৎসর	বিক্রীত লাট ও নবগঠিত মহালের সংখ্যা	দেয় রাজস্বের পরিমাণ
১৭৯০	৬৭	১৪,৯০৮৶১০
১৭৯১	৪	৪,৩২৪।৶
১৭৯২	২	১৪০৶
১৭৯৩	১	৪৪৯।৵০
১৭৯৪	১১	২৮,৬৮৪।/০
১৭৯৬	২	৬৮,৭১৫॥৶১০
১৭৯৭	২৫	১০৬,১২৭৸৶
১৭৯৮	৬৫	১,৮৮,১২৭॥২
১৭৯৯	৬২	৬৮,৯৪০॥৶৭
১৮০০	১১	১,৪৪৩৸১
১৮০১	৪০	৫৫,৭০৬॥৶৪

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশু প্রত্যক্ষ ফল— প্রজাবর্গের অধিকারে জমা জমির কোনরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ না করিয়াই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। তদুপরি, রাজস্ব নির্দ্ধারণের পরিমাণ যে অত্যধিক মাত্রায় করা হইয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করা চলে না। আবার সেই পরিমাণ টাকা পুরামাত্রায় আদায় করিতে যে কঠোর ব্যবস্থা করা হইত, তাহাও স্বীকৃত সত্য।

নবাব কাশীম আলির সময় হইতেই রাজস্বের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। ৭,১৮,৮২৮৲ টাকা আদায় করিয়া সে সময়ে জমিদারের নিজের জন্য মাত্র ৮৯,০০০৲ টাকা লাভ রাখা অসম্ভব ছিল। তদুপরি, টাকা আদায়ের মাসিক কিস্তিবন্দীর ব্যবস্থাও হারাহারি মত নির্ণীত হয় নাই। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে আবার দেখা যায় যে বীরভূমের হস্তবুদের পরিমাণ কমাইয়া জমিদারের লাভ মাত্র, ৭৩,০০০৲ হাজার টাকা করা হইয়াছিল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে মন্বন্তরের পর বীরভূমের ১/৩ অংশ ভূমি 'পতিতে' পরিণত হইয়াছিল। তদুপরি, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির জন্য দুঃখকষ্টের বিরাম ছিল না। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখের চিঠিতে কালেক্টর সাহেব বোর্ড-অব-রেভিনিউএ লিখিয়াছিলেন যে অত্যধিক বন্যায় বহু গৃহ, গবাদি পশু ও দ্রব্যাদি ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এই দেশব্যাপী দুরবস্থার জন্য তিনি বোর্ডের আদেশ লইয়া প্রজাগণের সাহায্য জন্য ৬০,০০০৲ ষাট হাজার টাকা তাকাবী ঋণ স্বরূপ প্রদান করেন। বোর্ডও এ বিষয় অবগত হইয়া জমিদার

ও ইজারাদারগণের প্রতি আদেশ দেন যে তাঁহারা যে প্রজাবর্গের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতে কোনরূপ কঠোরতার প্রশ্রয় না দেন [Letter to Collector of Birbhum, directing him to take care that the Zemindars and farmers of such Districts as have suffered from inundation, do not enforce with severity their demands upon the raiyats. March 22, 1788 no 13[১৮]]

আবার ১৭৯১ খৃষ্টাব্দেও দারুণ অজন্মা হইলে বোর্ড-অব-রেভিনিউ সে বৎসর জন্য প্রায় ৬০,০০০ ষাট হাজার টাকা রাজস্ব হইতে অব্যাহতি দেন [Letter from Collector of Birbhum, submitting result of inquiries respecting amount of suspensions necessary in consequence of the late drought, also a statement of balances due on account of year 1198 April 6, 1792 No. 9[১৯]] দেশের এইরূপ অবস্থায় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী লক্ষ্য করিলেন যে দেওয়ানী প্রাপ্তির পর হইতে পূর্ব্বোক্ত কারণসমবায়ে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। এইজন্য তাঁহারা যতদূর সম্ভব উচ্চহারে রাজস্ব নিরিখ ব্যবস্থা করিয়া জমি-জমার কোনরূপ বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই, রাজস্ব আদায়ের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। জমিদার কেবল কোম্পানীর অর্থ আদায় করিয়া দিতে লাগিলেন; কিন্তু নিজের লাভের মাত্রা নিতান্তই শূন্য হওয়ায় তিনি ক্রমেই দুর্ব্বল ও অসহায় অবস্থায় পড়িলেন। এই সকল কারণ এবং মহম্মদ-জমা খাঁ'র ব্যক্তিগত অসংযত ব্যবহার ও অনাচার জন্য বঙ্গের অন্যতম প্রাচীন অখণ্ড জমিদারী বীরভূমি অচিরেই খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যেন ধূলিকণায় পরিণত হইয়া গেল! জমিদারগণের প্রতি শারীরিক দণ্ড প্রয়োগের পরিবর্ত্তে সম্পত্তি নীলামের প্রথার প্রচলনের ইহাই আদি ও প্রত্যক্ষ ফল[২০]।

এতৎ প্রসঙ্গে অন্যান্য কথার সহিত বীরভূমের Settlement Officer (1924-32) Rai Bahadur Bijoy Behari Mukherjee (বর্ত্তমানে Director of Land Records and Survey) তাঁহার Final Report এর ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "It is difficult to trace estates which have been kept intact since the Permanent Settlement till today. The profit to the Zemindars depended first on the margin of error in their favour in the Hastabood taken as the basis of assessment; secondly on the uncultivated area which was left included within the estate yet not assessed to revenue, being unproductive and thirdly on the quality of areas held under invalid grants and

fourthly, on the capacity of the soil to bear additional rent. That at the time the margin of profit was rigorously low can be judged from the effect already discussed. The hereditary aristocracy received the severest blow, the traditions they stood for. disappeared and the whole social organism received a shock to which much of the dismemberment of the cultural and economic trends which has gone on since then can be traced."

পরবর্ত্তীকালে বীরভূমের রাজস্ব– ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বীরভূমের রাজস্বের বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। তবে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৮৯৪১ একর পরিমিত ভূমির ১৫৩টি খুচরা লাখেরাজ মহাল বাজেয়াপ্ত করিলে, ইহা হইতে ১৩১৪৯।০ টাকা খাজনা বৃদ্ধি হইয়া মূল রাজস্বের সহিত সংযুক্ত হয়। বীরভূমের মহাল হইতে আর কোনরূপ রাজস্বের আয় বর্দ্ধিত হয় নাই। অতঃপর ক্রমে জেলার সীমানার পরিবর্ত্তন এবং ভিন্ন জেলা হইতে এ-জেলায় অন্তর্ভূক্ত মহালের রাজস্ব বীরভূমের মূল রাজস্বে সংযুক্ত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

পরবর্ত্তীকালে মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান হইতে নিম্নলিখিত তৌজি বীরভূমে স্থানান্তরিত হইলে যে রাজস্ব বর্দ্ধিত হয়, তাহা এই স্থলে প্রদর্শিত হইল–

মহালের নম্বর	বোর্ডের আদেশ	কোথা হইতে আসিল	রাজস্বের পরিমাণ
৬০৭ হইতে ১১৫৭ নং তৌজি	১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ ২০৮ নং আদেশ	মুর্শিদাবাদ	৩,৩০,৯৯১৶৬
১১৬১ হইতে ১২১৬ নং তৌজি	১৯১৩ খৃষ্টাব্দ	বর্দ্ধমান	২.৩২১॥৵৯৫
১২১৭ হইতে ১২২৭ নং তৌজি	১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২০এ মার্চ্চ ১০৮৮টি ও এ নং আদেশ	মুর্শিদাবাদ	৩৭৯৪৩।১১

মন্তব্য– এইভাবে বীরভূমের অন্তর্ভূক্ত তৌজি মধ্যে একমাত্র ১১৫২ নং তৌজি কুমারপ্রতাপ হইতেই বীরভূমের রাজস্ব ১,৮২,১৩৪৸৪ পাই টাকা বর্দ্ধিত হয়।

ইহার পর ১৯২৪–৩২ খৃষ্টাব্দে অজয়, সাল ও ময়ূরাক্ষী নদীতে দিয়াড়া সেটেলমেন্টের দরুণ নূতন গঠিত অস্থায়ী ষ্টেট সমূহের জন্য কিয়ৎ পরিমাণে রাজস্ব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান জরীপে যে স্বত্বলিপি (Records of Right) প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে বীরভূমের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মহাল বা তৌজি সংখ্যা, পরিমাণ ও রাজস্ব নিম্নে প্রদর্শিত হইল–

কোন রেজিষ্টারির অন্তর্ভুক্ত মহাল	সংখ্যা	আয়তন	রাজস্ব
A Part I	১১০৪	৯,৫২,৩৮৪.০৬	১০,৩২,১৮৭৵৫
K. M. Estates	৬	৭৫১.৫৯	৩০৪৫।৶৮
T. S. Estates	৭৪	৭৬৪০.৮৫	৩৭৪৪৷৶০
A Part II	৩০৮	১০৭৩৩৮২৭	
B Part I	৩৯১	২৩৯৫৭.৪১	
B Part II	১৯	৬২০৯.৩৮	
B Part III	১০৫.০১		
River area out Side the reocrds.		১৭,১১১৮৮	
		১১১৫৪৯৮.৪৫	১০৩৮৯৭৭।৶১

একর অর্থাৎ

১৭৪৩ বর্গ মাইল

মন্তব্য– চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় রোড-সেস্ প্রথা প্রচলিত ছিল না। রোড-সেস্ প্রথা প্রচলিত হইলে পর, বীরভূমে এই বাবতে ১৫৯১২৫৲ টাকা আদায় হইয়া থাকে[২১]।

তথ্যসূত্র

(১) বিষ্ণুপুরের রাজার নিকট ১৮৬ মোহর পেস্‌কাস্‌ গ্রহণের কথা উল্লেখ আছে
Bengal Manuscript Records– Sir W. W. Hunter,
Introduction, p 40

(২) B. M. Records– Sir W. W. Hunter, Introduction Chs. I and II

(৩) Bengal Manuscript Records Vol I– Sir W. W. Hunter
Letter No. 1539, p 167

(৪) ইঁহার নিবাস নাটোর। জাতি ব্রাহ্মণ। ইনি, রাজস্ব সংগ্রহের জন্য মুর্শিদাবাদ হইতে বীরভূমে প্রেরিত হন। এই লালা রামনাথ ভাদুড়ী মহাশয় নগরের তদানীন্তন রাজা মহম্মদ আসাদ-জম্মা-খাঁকে তাঁহার বহু টাকা দেয় রাজস্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সুযোগ করিয়া দেন। ইহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ভাদুড়ী মহাশয়কে লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবার ইচ্ছা করেন; কিন্তু তিনি তাহার পরিবর্তে ভাণ্ডীরবন, বীরসিংহপুর, আড়াইপুর ও রায়পুর– এই চারিটি মৌজা পুরস্কার স্বরূপ প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি তাহা নিজে গ্রহণ না করিয়া ভাণ্ডীরবনের গোপালজীউর নামে উৎসর্গীকৃত করেন এবং ঐ সম্পত্তির লভ্যাংশ হইতে গোপালজীউর, বিভাণ্ডেশ্বর মহাদেব ও বীরসিংহপুরের কালিকাদেবীর সেবা-পূজা ও নিয়মিত ভোগাদির ব্যয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া ধন্যতা লাভ করেন। ইনি ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ভাণ্ডীরবনের ভাণ্ডীশ্বর শিবের সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইঁহার নামে এখনও ভাণ্ডীরবনের পর্ব্বোপলক্ষে ও বীরসিংহপুরের কালীপূজায় সঙ্কল্প হয়। উক্ত মন্দির ব্যতীত ইনি ভাণ্ডীরবন হইতে সিউড়ীর উপকণ্ঠস্থিত হুসনাবাদ পর্য্যন্ত প্রায় ছয় মাইল দীর্ঘ পাকা রাস্তা তৈয়ারি করাইয়া দেন। ইঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য সংবাদ "কতিপয় প্রসিদ্ধ স্থান" প্রসঙ্গে "ভাণ্ডীরবন" দ্রষ্টব্য।—গ্রন্থকার

(৫) রাজস্ব ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে বা বাবে (Item) আদায় অর্থ– গ্রন্থকার

(৬) Bengal Manuscript Records, vol I – Sir W. W. Hunter,
Introduction pp. 85–88

(৭) (a) Bengal Manuscript Records – Sir W. W. Hunter,
Letter Nos. 1186, 1187 dated 17th. April and 26th.
March 1786 repectively.
(b) Settlement Report. p 49.

(৮) Bengal Manuscript Records– Sir W. W. Hunter,
Letter Nos. 2296. 2707, 2708, 2327 and 2328.

(৯) Bengal Manuscript Records– Sir W. W. Hunter,
Letter Nos. 2835, 2852

(১০) Types of Early Bengali Prose– Siva Ratan Mitra. Pub:-
By the Cal. University. pp 94-96

(১১) Types of Early Bengal Prose– Siva Ratan Mitra, p 67

(১২) Bengal Manuscript Records, Vol II, Sir W. W. Hunter
Letter no 4207, p 87

(১৩) Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum 1924-32– Rai Bahadur B. B. Mukherjee D. L. R. P 50.

(১৪) Bengal Manuscript Records Vol II Sir W. W. Hunter Letter No 4734, p 125 (1795)

(১৫) Bengal Manuscript Records Vol II– Sir W. W. Hunter Letter Nos. 4711 and 4712, p 123.

(১৬) বর্ত্তমান কালে মোট জমিদারীর সংখ্যা ৪৪১০- গ্রন্থকার

(১৭) ইহার কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে – গ্রন্থকার

(১৮) Bengal Manuscript Records Vol I– Sir W. W. Hunter Letter no 1333, p 150

(১৯) Bengal Manuscript Records vol I- Sir W. W. Hunter Letter No. 2694, p 241

(২০) Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum, 1924-32- Rai Bahadur B. B. Mukherjee D. L. R

(২১) Final Reports on the Survey and Settlement Operation in the District of Birbhum 1924-32– Rai Bahadur B. B. Mukherjee, D. L. R. pp 55-56

পঞ্চম অধ্যায়

নগররাজ-পরিবারের পরিণাম

আমরা প্রথম খণ্ডে মহম্মদ জওহর-জমা খাঁ'র ও তাঁহার মাতা রাণী বক্সনের[১] নগরের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের কথা বলিয়া নবম অধ্যায় শেষ করিয়াছি। তাহার পর হইতে এখন আমরা এই রাজপরিবারের দারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা অতি বেদনার সহিত লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেছি।

মহম্মদ জহর-জমা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে নগরের অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিচালনা করিয়া ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁহার সময়ে নগরের রাজগৌরব কিছুই ছিল না। বহু বিস্তৃত বীরভূম রাজ্যের অধীশ্বর সামান্য ক্ষুদ্রতম জমিদারের ন্যায় কালযাপন করিতেন। ইঁহার পাঁচ পুত্র – অজহর-জমান খাঁ, অতহর-জমান খাঁ, সমসুদ-জমান খাঁ, সফর-জমান খাঁ ও শ্রীমহম্মদ জান-আলম খাঁ। এই পাঁচ পুত্রের মধ্যে মহম্মদ জান-আলম খাঁ (রাজা সাহেব) এখনও বর্ত্তমান আছেন। অজহর-জমান খাঁ'র অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। অতহরের ইয়াকুদ-জমান খাঁ নামে এক পুত্র ছিল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়। সমসুদ-জমান খাঁ'র দুই পুত্র – কমরুজ্জমা খাঁ ও বদরুজ্জমা খাঁ। বদরুজ্জমা খাঁ'র প্রায় ১৬ বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হয়। সফরজ্জমান খাঁ'র তাহেরুজ্জমা খাঁ নামে এক পুত্র ও রাফিয়া খাতুন (চুনকীবিবি) বিবি নামে এক কন্যা। কমরুজ্জমা তাঁহার এই পিতৃব্যের কন্যা রাফিয়া-খাতুন বিবিকে বিবাহ করেন। তিনি এখন সবরেজিষ্টার পদে নিযুক্ত আছেন। ইঁহার এক পুত্র আসাদ-জমা খাঁ।

মহম্মদ জান-আলম খাঁ'র বয়স ৬৬ বৎসর। তাঁহার সাবিয়া খাতুন, জাবিয়া খাতুন ও মতেজা খাতুন বিবি নামক তিনি কন্যা ও সুলতান আলম খাঁ নামক এক পুত্র। মহম্মদ সুলতান আলম খাঁ'র দুই পুত্র- মহম্মদ নূর আলম খাঁ ও মহম্মদ রফিকুল আলম খাঁ। মহম্মদ সুলতান আলম খাঁ ১৩৪৩ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ তারিখ, মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে, পরলোক গমন করেন।

এখন কেবল মাত্র ২৬৪ B-1 No. লাখেরাজ রাজনগর মহালের মাত্র

৶১০ আনা অংশ নগর-রাজবংশের অধিকারে আছে। অবশিষ্ট ৸১০ আনা অংশ হেতমপুর রাজ রামরঞ্জন ট্রাষ্ট-ষ্টেটের অধিকারে আসিয়াছে।

নগর-রাজবংশের ৶১০ আনা মধ্যে মহম্মদ জান-আলম খাঁ (রাজা সাহেব) একা ৵০ আনার সরিক, ,১৭॥ গণ্ডার তাহেরুজ্জমা খাঁ, ,৮৸-র রাফিয়া খাতুন বিবি। ,৩৸ অংশ সফর জমান খাঁ'র পত্নী নূরজান বিবির ছিল; পরে তাঁহার পুত্র কন্যার অধিকারে আইসে।

মহম্মদ জান-আলম খাঁ'র রাজনগর মধ্যে কিছু নিষ্কর জমি এবং সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত তপে সারট দেওঘর মধ্যে কিছু সম্পত্তি আছে। ইহা হইতে তিনি আনুমাণিক বাৎসরিক ৩০০৲ তিন শত টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নগর রাজবংশের অপর কাহারও কোনরূপ ভূসম্পত্তি নাই। মহম্মদ জান-আলম খাঁ রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষের নিকট নিজের নির্ম্মিত বাটিতে বাস করেন। মহম্মদ জান-আলম খাঁ নগরের বর্ত্তমান রাজবংশীয়গণের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়াই সাধারণে তাঁহাকে 'রাজাসাহেব' বলিয়াই অভিহিত করিয়া থাকে এবং তিনি এই রাজবংশের বংশধর বলিয়া গভর্ণমেন্টের নিকটও যথারীতি সম্মানিত হন।

নগর রাজবংশীয়গণের সাহায্যকল্পে ইংরাজ প্রদত্ত বৃত্তি– যে নগররাজ সমগ্র বীরভূমি মধ্যে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন, সেই ববংশীয়গণের অধিকাংশকেই অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাসে, একেবারে ভূমিশূন্য হইয়া সামান্য অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মহম্মদ-উল-জমা খাঁ বিষয়-কার্য্য পরিচালনায় আইন অনুসারে অযোগ্য (Disqualified) বলিয়া ঘোষিত হইলে, সরকার বাহাদুর তাঁহার নিজস্ব ব্যয়ের জন্য ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে দৈনিক ৫০৲ টাকা হিসাবে ও পরিবার বর্গের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য মাসিক ১০০০৲ হাজার টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন[২]। ইহার কয়েক মাস মাত্র পরই ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ই তারিখে বোর্ড-অব-রেভিনিউ এই মর্ম্মে পুনরাদেশ প্রদান করেন যে, মহম্মদ-উল-জমা খাঁকে যে ভাতা দৈনিক প্রদত্ত হইতেছিল, তাহা প্রচলিত রহিবে; কিন্তু তাঁহার বিধবা জননী ভাতা পাইবেন না। তাঁহার নিজস্ব যে ভূসম্পত্তি আছে, তাহাই তিনি পুরা অধিকারে রাখিবার নির্দ্দেশ পাইবেন – Letter to Collector of Birbhum in reply, authorising the payment of the allowences, with the exception of the widow of the late Raja, who is to be left in possession of the lands held by her, September 18[৩]। কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া আবেদন করিলে সরকার তাঁহাকে মাসিক ২০০৲ দুই শত টাকা করিয়া পেনসন দিবার আদেশ দেন Letter from Secretary to

Government, authorising a pension of Rs. 200/- per mensem for the maintenance of the widow of the late Asad Zaman Khan, former Zemindar of Birbhum, September 30[৪]।

১৮০২ খৃষ্টাব্দের ৩১এ আগষ্ট তারিখ গভর্ণমেন্ট অবগত করেন যে মহম্মদ জমা খাঁ'র পরিবারবর্গের জন্য অতঃপর মাসিক ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা করিয়া দেওয়া হইবে – Letter to Collector of Birbhum, communicating orders of Government for the payment of a pension of Rs. 500/- a month for the support of the family of the late Raja Muhammad Zaman Khan, August 31[৫]।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ১৫ই তারিখে ৫৮ নম্বর চিঠির দ্বারাই বীরভূমের কালেক্টর পেনসন বন্ধ করিয়া দেওয়ায়, তাহা পুনঃ প্রদানের জন্য এক দরখাস্ত করিবার কথা জানা যায় Letter from Collector of Birbhum, reporting on a petition from the family of the Raja of Birbhum on the discontinuance of their pensions and requesting the payment of them, August 15, no. 58–[৬]। ইহার পর, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট, রাণী করিমনের পুত্রবধূ সাহরণ বিবিকে মাসিক ৮৲ আট টাকা করিয়া বৃত্তি দিবার আদেশ দেন। রাণীর মৃত্যুকাল হইতে যে পেনসন বাকী পড়িয়াছিল তাহাও দিবার আদেশ দেন[৭]।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে খাতিফন্নেসা বিবির মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার কন্যা রাজ বিবি ও নেওয়াজ বিবিকে মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা হিসাবে পেনসন দিবার আদেশ হয়[৮]।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-জমা খাঁ'র পত্নী উত্তম কুমারী ও মহম্মদ দাওরাউল-জমা খাঁ বোর্ড-অব-রেভিনিউ-এর নিকট এক আদেবন পত্র প্রেরণ করেন। ইহাতে উত্তম কুমারী প্রার্থনা করেন যে রাজা আসাদ জমা খাঁ'র পত্নী কুঞ্জুফতেমা ও মহম্মদ-জমা খাঁ'র পরিবারবর্গকে যে পূর্ব্ব প্রদত্ত পেনসন বন্ধ হইয়াছে, তাহা তাঁহাকেই দেওয়া হউক এবং দাওরাউল-জমা খাঁ প্রার্থনা করেন যে রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে যে পেনসন দেওয়া হইত, তাঁহাদের মৃত্যু হওয়ায় সেই পেনসন তাঁহাকেই দেওয়া হউক। ইহার উত্তরে বোর্ড-অব-রেভিনিউ তাঁহাদিগকে যে পত্র দেন তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত হইল– In consequence of the distressed situation of the family of Muhammad Zaman Khan, the Governor General in Council was induced in 1802, 20th August to grant them a pension of Rs. 500/- per mensem for

their support to be distributed among the members of the family in the manner proposed by the Collector of Birbhum Mr. Cancle (20th April). The Court of Directors were subsequently pleased to confirm these pensions for a limited time, but they directed that they should only continue "For the lives of respective pensioners (9th August 1805, nos. 37 and 38) and that each individual proprietor be resumed on his or her desease"[৯]. This order was communicated to the family in due course.

The circumstances of the family and the liberality which Government has always shown in case of real distress have induced the Governor General in Council, notwithstanding, the above quoted orders of the Court to renew some of the pensions in whole or in part, when sufficient grounds to authorise the measure have been brought forward. This very circumstance renders it more imperative to guard, against any unnecessary expense or abuse the feeling and spirit by which the Government have been guided.

In the present case it does not appear to the Board that any ground for favourable consideration exists. It is stated in your letter that Ootam Kumari in addition to her pension of Rs. 25/- per month has property in Bhagalpore which must, it is concluded add sufficient to her income to provide for the maintenance of herself and dependants.

In regard to the Raja himself, it seems out of the question that any recommendation should be submitted to the Government in his behalf.

Under the circumstances the Board cannnot forward either of the applications of the petitioners to the notice of His Lordships in Council[১০]!

জীবন্নেসাবিবিকে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১৯এ মার্চ্চ তারিখের গভর্ণমেন্ট অর্ডার অনুসারে তাঁহার স্বামীর প্রাপ্য কেবলমাত্র তাঁহাকেই দেওয়া হইয়াছিল– তাঁহার

পুত্রদিগকে নহে। এই পেন্‌সন্‌ ব্যতীত তাঁহার মাতা যে ৪৲ চারি টাকা করিয়া মাসিক পেন্‌সন্‌ পাইতেন, তাহাও তিনি পাইতে পারেন না – এই মর্ম্মে বোর্ড আদেশ দেন[১১]।

বিবি রজফন্নেসা স্বামী মিয়া ফয়েজ-জমা খাঁ যে মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইতেন, তাহা গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে দিবার আদেশ দেন[১২]।

বোর্ড অব-রেভিনিউ আদেশ দেন যে রাণী উত্তম কুমারী ও অন্যান্য ৫ জনকে যে পেন্‌সন্‌ বা বৃত্তি দেওয়া হইতেছিল, তাহা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের জীবিত কাল পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইতে থাকিবে[১৩]।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে মরিয়ম বিবি তাঁহার মাতা পিয়ম রাণীকে প্রদত্ত পেন্‌সন্‌ এবং রহমৎজমা খাঁও তাঁহার মৃত পিতাকে প্রদত্ত পেন্‌সন্‌ পাইবার জন্য উভয়ে প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের আবেদন অগ্রাহ্য হয়[১৪]।

এই সময় বিবিও তাঁহার মৃত স্বামীকে প্রদত্ত পেন্‌সেন্‌ তাঁহার পুত্রগণকে দিবার জন্য প্রার্থনা করেন। ইহাতে বোর্ড বলেন যে 4.1.25 তারিখের ৮১ নং চিঠিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে পেন্‌সন, জীবন্নেসা পর্য্যন্তই পাইবে– তাঁহার পুত্রেরা নহে[১৫]।

অতঃপর, রাজা মহম্মদ-জমা খাঁ'র পত্নী রাণী জহুরাণকে যে ৯৲ নয় টাকা হিসাবে পেনসন দেওয়া হইত, তাহাই তাঁহার পৌত্র ওয়াজির আলি পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। বোর্ড তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করেন, এবং আদেশ দেন যে অপর কেহ ন্যায়তঃ দাবী না করিলে পেন্‌সনের বাকীপড়া টাকা তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে[১৬]।

অতঃপর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দেও বীরভূম হইতে নিম্নলিখিত রূপ পেন্‌সন্‌ নগররাজ-পরিবার মধ্যে বিলি হইবার কথা অবগত হওয়া যায় ঃ–

গভর্ণমেন্টের ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের আদেশমত – (১) নগররাজের কন্যা সখিনা বিবি জীবিতকাল পর্য্যন্ত মাসিক ৩১।/০ টাকা হিসাবে – এবং (২) ২।১২।১৮৮৩ তারিখের আদেশমত নিয়াজ বিবি জীবিতকাল পর্য্যন্ত মাসিক ৩১।/০ টাকা হিসাবে প্রাপ্ত হন[১৭]।

তথ্যসূত্র

(১) দাওয়ারা-জমা খাঁ'র দুই পত্নী ছিল- ১মা পত্নীর নাম রাণী বক্সন, ২য়া পত্নীর নাম রাণী রজফন্নেসা; কিন্তু ভুলক্রমে প্রথম খন্ডের ১১১ পৃষ্ঠায় তাঁহার হুরমতন্নেসা বিবি নামে একমাত্র পত্নীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে- গ্রন্থকার

(২) Bengal Manuscript Records Vol II- Sir W. W. Hunter Letter nos. 4711 and 4712, p 123

(৩) Bengal Manuscript Records Vol II- Sir W. W. Hunter Letter no 5064, p 152 (1795)

(৪) Bengal Manuscript Records Vol II- Sir W. W. Hunter Letter nos. 9494, pp 247-248 (1800)

(৫) Bengal Manuscript Records Vol IV- Sir W. W. Hunter Letter no. 955, p 57

(৬) Bengal Manuscript Records Vol IV- Sir W. W. Hunter Letter no. 13378, p 266

(৭) Council Chamber, Letter No. 1340 dated 6.9.1817

(৮) Letter No 94, 2. 12. 1813– Murshidabad, Board of Revenue L. P.

(৯) Vide also Hunter's Bengal Manuscripts Records Vol IV Letter No 13015, p 232.

(১০) Board of Rev. L. P. Letter No. 1216 dated 30-4-1824

(১১) Lettei No. 81 from the Board of Revenue L. P dated 4-1-1825

(১২) Letter No. 667, 22-6-1826– Council Chambei.

(১৩) Letter No. 2761 dated 14.7.1826- from the Board of Revenue L. P.

(১৪) Letter Nos 1116 and 1167 dated 27.3.1827- from Board of Revenue L. P.

(১৫) Letter No. 2699 dated 6. 7. 1827 from Board of Revenue L. P.

(১৬) Letter No. 142 dated 21.7.1838 from Secy. to the Sadar Board of Revenue to the Commissioner of Revenue for the Division of Murshidabad.

(১৭) পিতৃদেবের স্মারক-লিপি

ষষ্ঠ অধ্যায়

নগররাজ প্রদত্ত বৃত্তি

পাঠান রাজগণের শাসন-পদ্ধতির কথা আমরা পূর্ব্বেই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি[১]। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে পাঠান শাসকগণ সৈনিকগণের বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি প্রদান করিতেন। অন্যান্য কর্ম্মচারীর বেতনাদির পরিবর্ত্তেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইত। পাঠানবংশীয় নগররাজগণ এই প্রথাই সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিয়া সমগ্র বীরভূমিতে বহুবিধ প্রকারের বহুবিধ কার্য্যের জন্য নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। এই অধ্যায়ে আমরা সেই সকল ভূমিদানের কতক পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছি।

মিঃ গ্রান্ট তাঁহার Fifth Reportএ লিখিয়াছেন যে ১০৮৭৭১ বিঘা বাজেজমীন বলিয়া দপ্তরভুক্ত করা হইয়াছিল। তদুপরি ৯৭৮৪ জন থানাদার বা সৈনিকদিগের ভরণপোষণ জন্য ১২৭১১৭ বিঘা চাকরাণ স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে এইভাবে আরও বহু পরিমাণ জমি প্রদত্ত হয়। ফলে, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ২১৭৯০৭ বিঘা জমি বাজেজমীন বা নিষ্কর বলিয়া জানা গিয়াছিল; কিন্তু ইহার মধ্যে কেবলমাত্র ২২৯১৯ বিঘা জমি বাজেজমীন রেজিষ্টারী বা তায়দাদভুক্ত করা হইয়াছিল[২]।

ইংরাজ, বীরভূমির ভার গ্রহণ করিলে পর, সর্ব্বপ্রথম যে নিষ্করভূমি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছিল, সেই সময় নিষ্করদারদের বা বৃত্তিভোগীদের রাজদত্ত সনন্দ পরীক্ষা করিয়া পরগণায় পরগণায় যে বাজেজমীন দপ্তর ও তায়দাদের হিসাব বহি করা হইয়াছিল, তাহা দৃষ্টে এই রাজদত্ত নিষ্কর ভূমির পরিমাণ কতক অনুমান করা যায়। এই তায়দাদভুক্ত জমিই নিষ্কর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান জরীপে এই বৃত্তিধারীর বা নিষ্করভূমি অধিকারীর সংখ্যা ৯৬১৫ জন নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সকল বৃত্তিভোগী নিষ্করদার সমগ্র জেলার মধ্যে ৮১১০.৬৫ একর ভূমির মালিক ২১৪ জন। তাঁহারা নিষ্কর ভূমি প্রজাবিলি করিয়া খাজনা আদায় করেন। অবশিষ্ট সকলেই নিজে নিজে চাষ করিয়া থাকে[৩]।

হিন্দু ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য মুসলমান রাজগণ বহু নিষ্করভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ভাণ্ডীরবনের দেবোত্তর সেবাকার্য্যের জন্য বাংলার ১১৭২ সালে রাজা আসাদ-উজ্জমান খাঁ লাট হুকমাপুর মধ্যে ভাণ্ডীরবন, গোপালপুর, বীরসিংহপুর, রাইপুর আরাইপুর প্রভৃতি মৌজা দেবোত্তর স্বরূপ দান করেন। ইহা এখন বর্দ্ধমানরাজের অধীনে আছে।

ময়নাডালের মহাপ্রভুর সেবার ব্যবস্থাদির জন্যও অনুমান ১২০০ বিঘা ভূমি নিষ্কর দিবার কথা অবগত হওয়া যায়। সেই নিষ্করদারগণ এখনও পর্য্যন্ত সেই সমস্ত নিষ্করভূমি ভোগ করিয়া দেবসেবার অনুষ্ঠান অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন।

বক্রেশ্বরে প্রাপ্ত নগররাজ প্রদত্ত সনন্দ বা ছাড়ের অনুলিপি এই –

বক্রেশ্বরে প্রাপ্ত সনন্দের অনুলিপি

তপে হরিপুরের এতমান্দার ও কর্ম্মচারি ও কোতওয়াল ও জমানদারান্ সুচরিত্রেষু——

আগে মৌজে ডিহি বক্রেশ্বরের গোপিনাথ শর্ম্মা ও রামজীউ শর্ম্মা ও লক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মা ও জয়চন্দ্র শর্ম্মা ও রাজ্জিধর শর্ম্মা জাহির করিলা জে– উক্ত ডিহি বক্রেশ্বর– দেবত্তর মৌজা দরবস্ত ও চক গঙ্গারামের ডিহি ও চক শিবপুর- – সাবীক বীররাজার দত্ত ঁবক্রেশ্বর নাথ শিবঠাকুরের নিষ্কর দেবোত্তর মুদ্দাৎ পুরুষ ২ হইতে ঁজীয়ের সেবা পূজা করিয়া দখলীকার আছে বীররাজার দত্ত সনন্দ রাখে এক্ষণ বক্রেশ্বর মেলাতে হুজুরের লোক লস্কর হাতী ঘোড়াতে বাজারে জুলুম হাঙ্গামা করে এজন্য দরখাস্ত করি বক্রেশ্বরের মেলাতে জুলুম না করে তেঁহায় যেমত হুকুম অতএব উক্ত ডিহি বক্রেশ্বর দরবস্ত দেবত্তর মৌজা ও চক গঙ্গারামে ডিহি ও শিবপুর সাবিক বীররাজার দেওয়া যথার্থ্য তাহার সনন্দ রাখে উক্ত শর্ম্মা পাণ্ডা মজকুরেরা পুরুষ ২ মুদ্দ্যত হইতে ঁজীউর সেবা পূজা করিয়া দখলীকার আছে ও বক্রেশ্বরে যে বাজার হয় তাহাতে খাজনা আদায় করিয়া দখলিকার আছে উক্ত দেবত্তর বৃত্তি বেশাদে কেহ জুলুম হাঙ্গামা করিবে না ও কখন শর্ম্মা মজকুরদিগকে তলপ করিবে না যেন পাণ্ডা মজকুর সাবেক সুরত ঁজিয়ের সেবা পূজা করিয়া পুত্রপৌত্রাদি ভোগ দখল করে। পরত্তালিগি মুন্সী রেয়াজুদ্দীন মহম্মদ ইতি সন ১১৭২ সাল তাঃ ৯ই ফাল্গুন[৪]।

নামো-সাপুরে এইরূপ একটি বৃত্তিদানের সনন্দ দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যায় যে শিবলিঙ্গ ঠাকুরের সেবাইত একজন মুসলমান। তিনি একজন ব্রাহ্মণ পূজারী রাখিয়া সেবা-পূজাদি চালাইতেছেন। মাকর্দ্দমা করিয়া এই মুসলমান সেবাইতকে অধিকারচ্যুত করা সম্ভবপর হয় নাই।

খুষ্টিকুড়ীর হজরত সৈয়দ সা কারমাণীর সমাধির জন্য নগররাজ প্রচুর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। খুষ্টিকুড়ীর এই সমাধি, কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেরই পরম শ্রদ্ধার স্থান[৫]।

নগররাজ যে সকল নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় —

ক) হিন্দুদিগকে

(১) দেবোত্তর ও শিবোত্তর– দেব সেবার জন্য প্রদত্ত ভূমি

(২) ব্রহ্মোত্তর– ব্রাহ্মণের ভরণপোষণ জন্য প্রদত্ত এবং
বৈষ্ণবোত্তর– বৈষ্ণব সাধুমহান্তগণের সেবার জন্য প্রদত্ত ভূমি

(৩) মহত্তরান— ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতির পণ্ডিত বা সাধু মহান্তগণের সেবার জন্য প্রদত্ত ভূমি

(৪) খোস্‌বাস— কোন গ্রাম-বিশেষ উপযুক্ত লোককে বাস করাইবার নিমিত্ত প্রদত্ত ভূমি

খ) মুসলমানদিগকে—

(১) পিরাণ ও পিরোত্তর— কোন মুসলমান পীর বা সাধুর আস্তানা রক্ষা করিবার জন্য প্রদত্ত ভূমি। এই ভূমি পরিচালনার ভার একজন মাতোয়ালীর উপর ন্যস্ত থাকে। তিনি ইহা হস্তান্তরিত করিতে পারেন না।

(২) ফকিরাণ— মুসলমান অতিথি ফকিরগণের সেবা ও বাসস্থানের জন্য প্রদত্ত ভূমি

(৩) চিরাগী— মুসলমান পীরগণের আস্তানায় বা মস্‌জিদে নিত্য আলো দিবার ব্যয়ভার নির্ব্বাহ জন্য প্রদত্ত ভূমি

(৪) নজারত— বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিন পীরের আস্তানায় সির্ন্নি প্রদানের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রদত্ত ভূমি

(৫) খয়রাতি— ভিক্ষা দিবার জন্য প্রদত্ত ভূমি

(৬) খানাবাড়ি— যোগ্য মুসলমানগণকে কোন গ্রামে বাস করাইবার জন্য প্রদত্ত ভূমি

(৭) মোল্লাকী — মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকগণের নিজের ভরণপোষণ এবং

তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে মাদ্রাসা স্কুল পরিচালনের ব্যয়ভার জন্য প্রদত্ত ভূমি

(৮) **আজানদারী**— মস্‌জিদে উপাসনা করিবার সময় নির্দ্দেশ করিয়া মুসলমানগণকে আহ্বান করিবার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিকে ভরণপোষণ কল্পে প্রদত্ত ভূমি[৬]।

এই সকল বৃত্তি কোন-না-কোন সৎকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য সমগ্র বীরভূমি ব্যাপিয়া প্রায় প্রতি গ্রামেই প্রদান করা হইয়াছিল। সেই সকলের সম্পূর্ণ তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভবপর নহে।

গ্রামের সীমানা-সরহদ্দ ঠিক রাখিবার জন্য **সীমানাদার**, খাজনা আদায়ে **গোমস্তার** কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য **হালসানা** বা **পাইক**, গ্রাম্য-দেবতার পূজক **পুরোহিত**, দেবকার্য্যে ছাগবলি দিবার ও অন্যান্য কার্য্য করিবার জন্য **কর্ম্মকার**, **কুম্ভকার**, **নাপিত**, **মালাকার**, **ধোপা**, জমিদারী কাছারীতে সর্ব্বদা প্রহরা দিবার জন্য **অষ্টপ্রহরী**, জমিদারের পালকী বহনের জন্য **কাহার**, জমিদারী কাছারী পরিষ্কার করিবার জন্য **ঝাড়ুদার**, আমীনের জমী পরিমাপ কালীন চেন বহনকারী **রৌসগীর**, জমিদারী কাছারীর বিছানা বা ফরাস করিবার জন্য **ফরাস**, এবং জমিদারী কাছারীতে আলো দিবার জন্য নিযুক্ত **রৌসনগীর**– আর কতই নাম করিব ?

ইহারা সকলেই স্ব-স্ব কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিবার জন্য বংশানুক্রমে নগর রাজের নিকট সনন্দ দ্বারা বৃত্তিভূমি লাভ করিয়াছিল[৭]।

মহম্মদবাজার থানার মধ্যে মৌজা দেওয়ানগঞ্জ (জে. এল. নং ৫৬) এবং নিশ্চিন্তপুর (জে. এল. নং ৩৭) – এই দুই মৌজা, জমি সেচনের জন্য নির্ম্মিত বাঁধ ও সেচের পুষ্করিণী সংস্কৃত অবস্থায় রাখিবার জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়। মৌজা মোলপুর গ্রাম হইতে হনুমান বিতাড়িত করিবার জন্যও এক প্রকার বৃত্তি প্রদান করা হইয়াছিল ! বর্ত্তমান জরীপে তাহা রহিত হইয়াছে[৮]।

পূর্ব্বে আমরা যে সকল বৃত্তিদানের কথার উল্লেখ করিয়াছি তদ্ব্যতীত কয়েকটি বৃহত্তর পরিমাণে বৃত্তিদানের কথা এইস্থানে উল্লেখ করিতেছি –

(১) **থানাদারী**— বীরভূমে চিরস্থায়ী রাজস্ব-বন্দোবস্তের সময় এই থানাদারী জমি বা তৌজি বর্ত্তমান থাকিবার কথা জনা যায়। পরবর্ত্তীকালে ঐ জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে জমিদারের সীমানার মধ্যে এই থানাদারী জমি ছিল, তাহারই সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এই থানাদারী জমি সমগ্র জেলা মধ্যে ৬৭টি তৌজিভুক্ত হইয়াছিল। এই

থানাদারী জমি সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে –

ক) যে জমি পৃথকভাবে চিহ্নিত করা চলে না, কিন্তু মূল মহালের মালিকের অধিকারে আছে।

খ) যেখানে মূল মহালের জমিদারের অধীনে আছে; কিন্তু জমি চিহ্নিত করা চলে না।

গ) যেখানে মূল মহালের জমিদার ও থানাদারী জমির মালিক পৃথক্ অথচ জমিও পৃথক করা চলে না।

সেটেলমেন্ট অফিসারের অভিপ্রায় মত কালেক্টর বোর্ডকে এই সব গোলযোগের কথা বিবৃত করিলে, বোর্ড-অব-রেভিনিউ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখ ২৮২৪টি-এ নম্বর পত্রদ্বারা এই থানাদারী জমির যে পৃথক্ তৌজি নম্বর ছিল, তাহা রহিত করিয়া মূল মহালের সামিল করিবার আদেশ দেন। তদনুসারে উপরিউক্ত দুই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ৬৫টি তৌজি মূল মহালের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখন মূল মহালের রাজস্বের সহিত থানাদারী তৌজির নম্বর পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশিত হইতেছে। বাকী ১ ও ১০ নং – এই দুই তৌজির জমি চিহ্নিত করা সম্ভবপর হওয়ায় এই দুই নম্বর তৌজি মূল মহালের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই[১]।

(২) দপ্তরী-চাকরাণ– রাজা আহম্মদ-জমা খাঁ বাঙলা ১১৬১ সালের ২রা মাঘ তারিখে (ইং ১৭৫৫ খৃঃ) ৩২৫ ॥৪ বিঘা জমি ১২ জন দপ্তরীকে রাজ-কাছারীতে দপ্তরীর কাজ করিবার জন্য বৃত্তিস্বরূপ দান করেন। ইহার পার্শী সনন্দের মর্ম্মানুবাদ এই স্থলে দেওয়া হইল –

রাজার আদেশ

পরগণা খর্গি, সাহলামপুর, কুণ্ডহিত, খটঙ্গা, ননী, সেনভূম ওগয়রা এই পরগণার মধ্যে ৩২৫ ॥৪ বিঘা জমি রাজনগর অধিবাসী সেখ বারান, সেখ দারকু, সেখ মমরাজ আলি খাঁ, সেখ বাঁকু প্রভৃতিকে ফরাসী জায়গীরস্বরূপ দিবার আদেশ হয়। ইহারা তপশীলভুক্ত জমি কর্ষণ করিবার জন্য পুষ্করিণী আদি খনন করিবে এবং পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিতে থাকিবে। এই তপশীলভুক্ত জমি চিরস্থায়ীভাবে তাহাদিগকে দেওয়া হইল এবং নিম্নলিখিত পরিমাণ জমি স্বতন্ত্র ভাবে দখল করিতে থাকিবে। ইহারা সেরেস্তার কাগজাদি দপ্তরীবন্দী করিবার জন্য দায়ী রহিবে। পূর্ব্বোক্ত জমির আয় ব্যতীত তাহারা সেরেস্তায় উপস্থিত থাকাকালীন ভাতাস্বরূপ দৈনিক ৵০ পণ করিয়া কড়ি পাইবে। এই বার জন দপ্তরী পালাবন্দীপূর্ব্বক ছয় মাস কাল করিয়া কাজ করিতে থাকিবে। তাহাদের দৈনিক ভাতা ৵০ পণ করিয়া কড়ি সরকার হইতে বন্ধ হইলে তাহাদিগকে আর

রাজ সেরেস্তার মহাফেজখানায় কাজ করিতে হইবে না। ইহারা এই তপশীলভুক্ত জমি চিরস্থায়ীভাবে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিতে থাকিবে এবং ঐ জমির উৎকর্ষ সাধন জন্য পুষ্করিণী খনন করিতে পারিবে।

তপশীল

ক্রমিক নম্বর	নাম	বিঘা	কাঠা
১	সেখ বারান	৩১	।২
২	সেখ দারকু	২৯	
৩	সেখ মমরাজ	২৮	
৪	সেখ বাঁকু	২৭	
৫	আলি খাঁ	২৬	
৬	সেখ জীতু	৩০	
৭	সেখ জাহাজ	৩০	
৮	সেখ হারু	২৫	
৯	সেখ খুদু	২৪	।৪
১০	সেখ বাহাদু	২৬	
১১	সেখ হাতু	২৪	।৪
১২	সেখ দারাবু	২৯	॥৪
	মোট	৩২৫	॥৪ বিঘা

এই সকল জমি খয়রাশোল থানা মধ্যে – বারাবন, বুধপুর, লোকপুর, আলিয়াৎ, আনন্দপুর, কামালপুর, সিংডাঙ্গা, হরিপুর ও চক মধুপুর

দুবরাজপুর থানা মধ্যে – কয়থানপুর, দৌলপুর ও চাপা নগরী

ইলামবাজার থানা মধ্যে- গোলটিকুরি

সিউড়ী থানা মধ্যে – আরাইপুর, পতণ্ডা, বিদেয়পুর, জুনুদপুর এবং মহম্মদবাজার থানা মধ্যে – কামারপুর ও রাউতাড়া মৌজায় বিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বর্ত্তমান জরীপের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৭০ বৎসর ধরিয়া এই জমি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য ক্রমাগতই কালেক্টর, কমিসনর ও বোর্ড-অব-রেভিনিউ-এর মধ্যে পত্র ব্যবহার চলিয়াছিল। কিন্তু তাহা

বাজেয়াপ্ত করা সম্ভবপর হয় নাই।

ইংরাজ-সরকার বীরভূমির কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিবার পর অবধি এই দপ্তরিগণ তাহাদের দৈনিক ভাতাস্বরূপ ৴০ দুই পণ করিয়া কড়ি প্রাপ্ত হয় নাই এবং এই কড়ি না পাওয়ার জন্য সনন্দবলে তাহারা ইংরাজ-দপ্তরে কোন কর্ম্ম করিতে বাধ্য ছিল না। কিন্তু নগর রাজদপ্তর সিউড়ীতে স্থানান্তরিত হইলেও তাহারা বীরভূম কাছারীতে চাকরাণ দপ্তরীস্বরূপ বরাবর কাজ করিয়া আসিতেছিল। বিগত ৩০ বৎসরকাল হইতে তাহারা আর স্বয়ং কার্য্য না করিয়া স্বল্পবেতনে তাহাদের পরিবর্ত্তে অপর লোক নিযুক্ত করিয়া অফিসের কর্ম্মনির্ব্বাহ করিত। ইহাতেও তাহারা নিজদিগকে তত ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিত না। কেননা, ছয়মাসকাল নিজ অংশের টাকা অনুমান ২৪৲ টাকা দিয়া ২০ হইতে ৩০ বিঘা জমি ভোগ করা তত ক্ষতিকর ছিল না।

গত জরীপের সময় এই ৭০ বৎসর ধরিয়া যে চিঠিপত্র চলিয়াছিল, তাহা সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বীরভূমের কালেক্টর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২৫এ ফেব্রুয়ারী তারিখের ৬০ নম্বর চিঠির দ্বারা বোর্ডকে পত্র লিখেন। ইহাতে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ঃ–

ক) ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই চাকরাণ দপ্তরিগণের অধিকৃত ৩২৪৸৩ বিঘা জমির জন্য যে একটি তালিকা বা রেজিষ্টারী করা হইয়াছিল তাহা পৃথক তৌজিভুক্ত করা হউক।

খ) এই জমিগুলি ইংরাজ সরকারের অধীনে Servicc Land বলিয়া গণ্য করা হউক।

গ) ভাল কাজ না করিলে এই জমি সরকারীতে বাজেয়াপ্ত করা হউক।

বোর্ড, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ২০এ এপ্রিল তারিখ ও ঐ খৃষ্টাব্দের ২২এ জুলাই তারিখের ৭২০৫ এল, আর-নম্বর চিঠির দ্বারা আদেশ দেন যে এই জমি পৃথক তৌজিভুক্ত করিয়া B-Part III নামক নূতন রেজিষ্টারীভুক্ত করা হউক। B-Part III তে এই একমাত্র জমিই সর্ব্বপ্রথম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই জমি বাজেয়াপ্ত করা হইবে কিনা তাহার ভার কালেক্টরের উপর অর্পিত হইয়াছে।

এইরূপ দপ্তরী-চাকরাণ জমি অন্যান্য জেলায় প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয় না[১০]।

(৩) **ঘাটোয়ালী জমি**— পশ্চিমাঞ্চল হইতে আগত লুন্ঠন-লোলুপ অসভ্য ও বর্ব্বরগণের গতিরোধ করিয়া বঙ্গদেশের মধ্যে তাহাদের অভিযান প্রতিরোধ করাই যে নগরে পাঠান ফৌজদারগণের অবস্থিতির আদি ও প্রধান হেতু, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা বর্ব্বর দস্যুগণের হস্ত হইতে প্রবেশ-পথ রক্ষা

করিবার জন্য নগরের চতুস্পার্শ্বে যে মৃন্ময় প্রাচীর বেষ্টন করিয়া গড় প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহারই স্থানে স্থানে ঘাটি রক্ষা করিবার জন্য 'ঘাটওয়াল' বা পথ-রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর লোক এই পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য বৃত্তি স্বরূপ যে ভূমি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাই 'ঘাটোয়ালী-বৃত্তি' বা 'ঘাটওয়ালী-জমি' নামে পরিচিত।

আমরা Fifth Report হইতে অবগত হই যে ঘাটোয়ালী জমির প্রায় ২/৩ অংশ পরিমাণ ভূমি জাফর খাঁ ঝাড়খণ্ডের (দেওঘর অঞ্চল) দস্যুগণের হস্ত হইতে এ-দেশ রক্ষা করিবার জন্য নগরের রাজা আসাদুল্লা খাঁকে নিষ্কর স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। পরে, এই জমি নবাব কাশীমআলি বাজেয়াপ্ত করিয়া লন এবং এই জমি সনন্দের লিখিত জমির অন্তর্ভুক্ত করিয়া জমা ধার্য্য করিয়া দেন[১১]।

এই ঘাটোয়ালী জমি বীরভূমের একটি বিশেষ প্রকারের জোত বলিয়া পরিগণিত হয়। এই ঘাটোয়ালী-জমির ব্যবস্থাদি সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ২৯নং রেগুলেসন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এই ঘাটোয়ালগণ জমিদারকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং অন্তর্বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য নগররাজকে সাহায্য করিতেন। ঘাটোয়ালী জমিতে ঘাটোয়ালগণের Proprietory Right ছিল না, এই জমি হইতে তাঁহারা খাজনা আদায় করিয়া তাঁহাদের কর্ম্মের বেতন স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। কীটিং সাহেব ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ করেন যে এই ঘাটোয়ালগণ পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষকে প্রদত্ত ঘাটোয়ালী জমি ভোগ করিতেছেন। তদানীন্তন কালেক্টর বোর্ডকে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর তারিখের পত্রে অবগত করান যে ঘাটোয়ালগণকে স্বতন্ত্র তালুকদার স্বরূপ গন্য করা উচিত এবং তাঁহারা জমিদার হইতে পৃথক্‌ভাবে কালেক্টরের নিকট দেয় খাজনা প্রদান করিবেন।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে গভর্ণর জেনারেল কালেক্টরকে এই ঘাটোয়ালী জমির বন্দোবস্ত ও খাজনা আদায় করিতে আদেশ দেন। কিন্তু ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২৯ নং রেগুলেসন বিধিবদ্ধ হইলে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট জমায় পুরুষানুক্রমে এই জমির তালুকদার স্বরূপ গন্য হইলেন এবং একা একা গভর্ণমেন্টের নিকট খাজনা দাখিল করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তবে তাঁহাদিগকে পুলিসের সহযোগিতা করিয়া বা ক্ষেত্রানুসারে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে রহিয়া কাজ করিতে হইবে। গভর্ণমেন্টের খাজনা দিয়া অতিরিক্ত যাহা খাজনা অবশিষ্ট রহিবে, তাহা তাঁহাদের জমিদারদিগকে দিতে হইবে। এই ভাবে তাঁহাদিগকে জমিদারের অধীনস্থ করিয়া রাখা হইল।

পূর্ব্বোল্লিখিত ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২৯ নং রেগুলেসনে কেবল মাত্র সাঁওতাল

পরগণার (তখন বীরভূমির অধীন ছিল) সারট দেওঘরের কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। বীরভূমের অন্যান্য ঘাট তালুক সম্বন্ধে কোন কথা আলোচিত হয় নাই। এই নিমিত্ত বীরভূমের তদানীন্তন সহকারী কালেক্টর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখের পত্রদ্বারা তাঁহার উর্দ্ধতন মুর্শিদাবাদের কালেক্টরকে (তখন বীরভূমি মুর্শিদাবাদের অধীন ছিল) এ বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করেন; এবং বলেন যে বীরভূমের ঘাট-চৌকীদার সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা না হইলে নূতন জমিদার ও পুরাতন ঘাটোয়ালের মধ্যে একটি চিরন্তন বিরোধের হেতু রহিয়া যাইবে। অতঃপর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল তারিখে বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিস সাহেবকে লিখেন যে, যে জমিদারীর মধ্যে ঘাটোয়ালী জমি অবস্থিত আছে তাহার জমিদার সংখ্যা ক্রমেই (জমিদারী নীলাম ও বিক্রয়ের ফলে) বর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহারা দেওয়ানী আদালত হইতে জমি বন্টন করিয়া দখল লন। ফলে, ঘাট চৌকীদারী জমির পরিমাণও কমিয়া যাইতে থাকে। ১১৯৩ সালের (ইং ১৭৮৬-৮৭ খৃঃ) নিকাশী কাগজে আমরা **বাইশ হাজারী মহাল** নামে একটি স্বতন্ত্র মহালের পরিচয় পাই। এই মহালের জমা রাজার খাস পরিচারক, মিস্ত্রী ও ঘাট চৌকিদার এই তিন বাবতে বাইশ হাজার টাকার (২২০০১৸৶৮ টাকা) কর আদায় হইত বলিয়া ইহা **বাইশ হাজারী মহাল** বলিয়া কথিত হয়। আট হাজারী মহালের কথাও উল্লিখিত আছে (২০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

এই নিকাশী কাগজ হইতে জানা যায় যে সে সময় ৩৪৬ জন ঘাটোয়াল ৭৯৪১ বিঘা ২ কাঠা ১০ ছটাক জমির জন্য ৭৮৭৩॥৯ গণ্ডা টাকা জমা প্রদান করেন; বীরভূমের সদর জমা নির্ণয়ের সময় এই মফঃস্বল জমা ধরা হয় নাই। ইহার ১০ বৎসর মাত্র পরে ১২০৩ সালের (ইং ১৭৯৬-৯৭ খৃঃ) কাগজ হইতে জানা যায় যে ২৪৭ জন ঘাটোয়াল ৬৪৩৭।৪॥ কাঠা বিঘা জমির জন্য ৬০০৪/১৬ গণ্ডা টাকা খাজনা দেন। ইহা হইতে বোঝা যায় যে যদিও ঘাট-চৌকীদারের সংখ্যা ৩৪৬ হইতে ২৪৭এ পরিণত হইয়াছে এবং ৭৮৭৩॥৮ পাই টাকা স্থলে ৬০০৪/১৬ গণ্ডা টাকা হইয়াছে, তথাচ ঘাট-চৌকীদারগণ ঘাটোয়ালী জমির উৎপন্ন হইতে মাত্র ষষ্ঠভাগ আবয়াব জমা স্বরূপ দিয়া ঘাটোয়ালী জমি ভোগ করিতেছে।

জমিদারগণ, ঘাট-চৌকীদারের জমি আংশিকভাবে বাজেয়াপ্ত করিলে এই জমিজমার ন্যূনতা হইয়াছে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত রেজিষ্টারী হইতে জানা যায় যে ৪৩২ জন ঘাটোয়াল ১৫২৪ বিঘা জমি ভোগ করেন। ইহার মধ্যে কতক জমি বাঁকুড়া এবং পুনর্ব্বার সাঁওতাল পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইলে ইংরাজী ১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে ৩৩২ জন ঘাটোয়ালের অধীনে ৩২৮৮ বিঘা জমি অধিকারে থাকার উল্লেখ আছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই জমি পুনর্ব্বার পরিমাপ করা হইলে ৩২৮৮

বিঘা স্থলে ৩৮৪০ বিঘা জমি লিপিবদ্ধ হয়। এই সময় দেখা গেল এই ঘাটোয়ালগণ যে জন্য জমি ভোগ করিতেছিল, তাহার আর আবশ্যকতা রহিতেছে না।

১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে জেলা কোর্টের ১০৮ নং মোকর্দ্দমার রায়ে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে সাধারণে কার্য্য করিবার জন্য এই জমি বেতনস্বরূপ দেওয়া হইত এবং তজ্জন্য জমিদার তাহা হস্তগত করিতে পারেন না। এই ঘাট-চৌকীদারী জমি অবশ্য কখনই নিষ্কর ছিল না। পূর্ব্বমত উৎপন্নের ষষ্টাংশ আবয়াব জমা দিয়া ঘাটোয়ালগণ জমি ভোগ করিতেন। এই রায়ের বলে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২নং রেগুলেসন দ্বারা গভর্ণমেন্টের ঐ জমি বাজেয়াপ্ত করিবার অধিকার অস্বীকৃত করা হয়।

এখন বিবেচনার বিষয় হইল এই যে আবয়াব খাজনা বাদে জমিদারগণ অবশিষ্ট রাজস্ব ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পুলিস-বিভাগের জন্য ব্যয় করিতে পারিবে কিনা। তাহা যদি হয়, তবে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১নং রেগুলেসনের ৮ ধারার অধীন চতুর্থ দফার দ্বারা জমি বাজেয়াপ্ত করা যাইতে পারিবে। কিন্তু ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী কালের বন্দোবস্তী মহালের ঘাটোয়ালী জমি বাজেয়াপ্ত করা যাইতে পারিবে না। বীরভূম তাহার পূর্ব্বেই ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বন্দোবস্ত হওয়ার জন্য এই ঘাটোয়ালী জমি গভর্ণমেন্ট বন্দোবস্ত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহার পর, এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করা হয় নাই।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখের ৫৬৪৭-জে নম্বর চিঠির দ্বারা গভর্ণমেন্ট এই প্রশ্ন পুনরুত্থান করেন; কিন্তু আলোচনায় কোন ফল হয় নাই। ইতিমধ্যে ঘাটোয়ালগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া জমির জন্য খাজনা দিতে স্বীকৃত হওয়ায় জমিদার তাহাতে আর কোন আপত্য করিলেন না। গভর্ণমেন্টের তদানীন্তন সপিরষদ ছোট লাট বাহাদুর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে এই ঘাটোয়ালী জমি বাজেয়াপ্ত করিতে ও তাহার করত ধার্য্য করিতে আদেশ দেন এবং নির্দ্দেশ করেন যে জমিদার ও চৌকীদারের মধ্যে নিম্নলিখিত মত চুক্তি করিতে হইবে—

ক) ঘাট-চৌকীদারী জমি ঘাট-চৌকীদারগণের অধীন থাকিবে। এজন্য জমিদার তাঁহাদের নিকট হইতে কোন ফি বা সেলামী আদায় করিতে পারিবেন না।

খ) বর্ত্তমান ঘাটোয়ালগণ তাঁহাদের জীবিতকাল পর্য্যন্ত ঘাটোয়ালী জমির পার্শ্ববর্ত্তী নিরিখ মত জমির খাজনার অর্দ্ধেক পরিমাণ খাজনা দিবেন; তবে তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণ পরবর্ত্তীকালের আইনমত পরিবর্দ্ধিত খাজনা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

গ) ঘাট-চৌকীদারীর নির্দ্দিষ্ট খাজনার মধ্যে জমিদার অর্দ্ধেক এবং গভর্ণমেন্ট অর্দ্ধেক পাইবেন। জমিদারের এই অর্দ্ধেক প্রাপ্য খাজনা চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তী খাজনারূপে গৃহীত হইবে।

ঘ) জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে এই খাজনা মূল মহালের খাজনার সহিত একত্রীভূত হইবে। অন্যথায় পৃথক তৌজিভূক্ত হইয়া ইহার জন্য পৃথক খাজনা দিতে থাকিবে।

ঘাটোয়ালী জমির এই বন্দোবস্ত ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখ সপরিষদ ছোটলাট বাহাদুরের আদেশমত আরম্ভ হয় এবং তাহা ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখের ৮১৫A নম্বর চিঠির দ্বারা বোর্ড-অব-রেভিনিউ তাহাতে সম্মতি দান করেন। এই বাজেয়াপ্তীর সময় যে সকল ঘাটোয়ালের অধীনে এই জমি ছিল, তাঁহাদেরই সহিত উহা বিঘাপ্রতি ন্যূনধিক ২৸০ টাকা করিয়া খাজনায় বন্দোবস্ত করা হয়।

এইরূপে মোট ২৯৯৸৶।৯০ টাকা খাজনা ও সেস্ ৪৭৭।/০ টাকায় ৩৬টি নূতন ঘাটোয়ালী ষ্টেটের (৭০ হইতে ১০৫ নং তৌজি) পত্তন করা হইল।

আমরা এই স্থলে পরগণা, তৌজি নম্বর ও রাজস্ব এবং সেস্ সহ ঘাটোয়ালষ্টেটগুলির নাম প্রদান করিলাম——

পরগণা হরিপুর মধ্যে–

তৌজি নম্বর	ঘাট	খাজনা	সেস্
৭০	শ্রীরামপুর	৪৪৸৩	৮৶০
৭১	মেটেলা	১১৩৲	২৭৸৶০
৭২	বুড়েমা	২৮০৲	৩৪৸৶০
৭৩	গোপালপুর	১৩৫৲	১৫।৶০
৭৪	প্রতাপপুর	৪॥০	॥৶০
৭৫	প্রতাপপুর	১।০	৶০
৭৬	রাঙামেটে, কানমোড়া	১৩৫৲	১৬।০
৭৭	রাঙ্গামেটে, কুশাইপুর, লাটভবানীপুর	৪॥০	।৶০
৭৮	প্রতাপপুর, পদমপুর গাইসাড়া	৫২॥০	৬॥৶০
৭৯	প্রতাপপুর, মুক্তিপুর	৪৮৮৲	৫৩।০
৮০	প্রতাপপুর, লক্ষ্মীপুর	১০।০	২।০

তৌজি নম্বর	ঘাট	খাজনা	সেস্
৮১	হীরাখুনি, জামিরা	৩৫৩৲	৬৩॥৶০
৮২	হীরাখুনি, বেড়েলা	৭৸০	৸০
৮৩	হীরাখুনি	৪৩॥০	৫/০
৮৪	হীরাখুনি, সাজিনা	১৭৲	৩॥৶০
৮৫	হীরাখুনি, ভবানন্দপুর	৬॥০	৸৶০
৮৬	হীরাখুনি, লাউজোড়	১১৲	১/০
৮৭	দুর্ল্লভপুর, মাধাইপুর	৫৩॥০	১১৸৶
৮৮	দুর্ল্লভপুর, চকজুলসো	৫৸০	॥/০
৮৯	দুর্ল্লভপুর, জামথলে, ভাঙ্গু, দুর্ল্লভপুর	২৭॥৵০	৬৷৶০
৯০	দুর্ল্লভপুর, রাজপুর	১৫.	৩৷০
৯১	রাঙ্গামেটে, একতালা, পরিহারপুর, কাঁটাবেড়ে	৫৶০	X
পরগণা বড়রা মধ্যে –			
৯২	পলাসবুনি	১৮॥০	৪/০
পরগণা দড়ি মৌড়েশ্বর মধ্যে –			
৯৩	কুকড়াডিহি	৮৷০	৷০
পরগণা হুকমাপুর মধ্যে –			
৯৪	হীরাখুনি,গামারকুণ্ডু	৮৸০	১৸৵০
৯৫	রাজারপুকুর, নগরী. বেড়গ্রাম	৮০৸/০	১৬৶০
৯৬	শিবরাউত, লক্ষ্মীনারায়ণপুর	৩৭৸০	৪৶০
৯৭	ভাড্ডি, আমলাকুঁড়ি	৩২৬৷০	৫৫৵০
পরগণা খর্ম্নি মধ্যে –			
৯৮	ভাড্ডি, হরিপুর	৫০.	৬॥৶০
৯৯	বাঁধি	২২৮.	৩৭৸৵০
১০০	ভাড্ডি ও এলাটি	৪০৷০	৬॥৵০
১০১	কুকড়াডিহি, চন্দ্রপুর, নিশ্চিন্তপুর	৭৭.	১৫॥৵০
১০২	ঐ	২৫২৸০	৫৩৸৵০
১০৩	কুকড়াডিহি, চন্দ্রপুর	১২৷০	৪/০
১০৪	কুকড়াডিহি, চন্দ্রপুর	২৪৷০	৬৷০
৩ ১০৫	রাঙ্গামেটে, কানমোড়া	১৩৷০	১৷/০

(এই সকল ঘাটোয়ালী জমির ২২৭টি জোতে (Holding) ৪৩৭০ বিঘা জমি নির্দ্ধারিত হইয়াছে[১২]।

[প্রাচীন বীরভূমের কতকগুলি ঘাটোয়াল এখনও সাঁওতাল পরগণার জামতাড়া মহকুমা মধ্যে বাস করেন। এই ঘাটোয়ালগণ এখন আর ঘাটোয়ালের কার্য্য করেন না। এইজন্য তাঁহারা তাঁহাদের অধিকৃত বীরভূমের ঘাটওয়ালী জমীর খাজনা দিতে স্বীকৃত হওয়ায় গভর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ৪-এল, আর নম্বর চিঠির দ্বারা বিঘা প্রতি ১ টাকা হারে খাজনায় বিলি করিতে সম্মত হইয়াছেন। এই সকল জমির পরিমাণ ১৮২.৫৪ একর[১৩]।]

(৪) চৌকীদারী চাকরাণ - এ জেলার প্রায় সকল মৌজাতেই চৌকীদারী জমি আছে। মুসলমান জমিদারগণ প্রতি গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য এই সকল ভূমি নিষ্কর স্বরূপ চৌকীদারগণকে দান করিয়াছিলেন। এই চৌকীদারগণ কেবল যে গ্রাম্য-প্রহরীর কার্য্য করিত তাহা নহে; পরন্তু, তাহারা খাজনা আদায় এবং রাজকর্ম্মচারীগণকে ফৌজদারী ও দেওয়ানী কর্ম্ম করিতে সহায়তা করিত।

প্রায় 'বাইশ হাজারীর' মত ৮০০০ আট হাজার বিঘা জমি নগররাজ কর্ত্তৃক Service বা চাকরাণ জমি স্বরূপ দেওয়া ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যে চিঠা (সারবার্ণ সাহেবের চিঠা) হইয়াছিল সেই সময়(১৭৯০ খৃঃ) বাইশ হাজারি বাজেয়াপ্তি নামে বন্দোবস্ত হয়। ঐ সময় এক সঙ্গে ৮০০০ বিঘাও বন্দোবস্ত হয়। ইহা আট হাজারী মহাল বা Service মহাল বলিয়া জরিপ হইয়াছিল। এতৎসংক্রান্ত কাগজাদি Collector-এর মহাফেজখানায় আছে।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২২ নম্বর রেগুলেসন আইন প্রচলন হইবার কাল পর্য্যন্তও দেশের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (পুলিসের কর্ত্তব্যকর্ম্ম) জমিদারগণই করিতেন। এই রেগুলেসনের পর হইতে দেশের যাবতীয় পাইক, চৌকীদার প্রভৃতি গ্রাম্য-প্রহরিগণ দারোগার তত্ত্বাবধানে কাজ করিতে আদিষ্ট হইল। কিন্তু তাহা হইলেও এই চৌকীদারগণ পূর্ব্বাবধি জমিদারের ব্যক্তিগত যে সকল কার্য্য করিত, তাহাও করিতে লাগিল; তজ্জন্য কোন নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয় নাই।

গভর্ণমেন্টও ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৮ রেগুলেসনে বলিয়াছেন যে এই চাকরাণ জমি মালগুজারি জমির অন্তর্ভূক্ত হইবে। জমিদারগণ এই গ্রাম্য-প্রহরীর কার্য্যের সুনির্ব্বাহ জন্য দায়ী রহিবেন। কিন্তু এ-বিষয় তেমন ফলোদয় হইল না দেখিয়া বীরভূমের জঙ্গল-মহালের জমিদারগণকে সরকার বাহাদুর দারোগার ক্ষমতা প্রদান করেন।

ইংরাজ-আমলের পূর্ব্বেই বৃত্তি-জমি দিয়া কোতোয়াল নিযুক্ত করা হইত।

ইহারা প্রহরীর কার্য্য ব্যতীত যাহাতে ফৌজদারীর অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিত।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাজে-জমিন-দপ্তরে মহালওয়ারী একবাল কাগজে কোন চৌকীদারী জমির উল্লেখ নাই।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল তারিখ ৪৫ নং চিঠির দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে বীরভূমে ১২৪৯৪ জন চৌকীদারের অধীনে জায়গীর স্বরূপ ১৩০৯০৭/ জমি আছে।

অতঃপর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৬ আইনের বলে বীরভূমের চৌকীদারী চাকরাণ জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

পঞ্চায়েত-প্রথা প্রবর্ত্তন দ্বারা বীরভূমের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে কিভাবে এই আইন অনুসারে কার্য্য হইয়াছিল তাহা সর্ব্বজনসুবিদিত কথা; সুতরাং অনাবশ্যক বোধে এই স্থানে তাহার বিশদ বিবরণ প্রদান করিলাম না।

চৌকীদারী চাকরাণ জমির জন্য কালেক্টরের ৮০ নম্বর একটি রেজিষ্টারী আছে। এই রেজিষ্টারী বর্ত্তমান জরীপের সময় সংশোধিত হইয়াছে। এখন ইহার মধ্যে ৩৩১২টি চৌকীদারী চাকরাণ মহাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল মহালের মোট জমির পরিমাণ ৩৫০৭৫.২২ একর এবং জমার পরিমাণ ৭৫৭৬১ টাকা। এই টাকা, জেলাস্থিত ১৭৪টি ইউনিয়নে নির্দ্দেশ মত প্রদত্ত হইয়া থাকে[১৪]।

তথ্যসূত্র

(১) বীরভূমের ইতিহাস- ১ম খণ্ড, ৫১-৫২ পৃঃ
(২) Birbhum Gazetteer, 86
(৩) Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum 1924-32 - Rai Bahadur Bijoy Behari Mukherjee, D. L. R. p 60.
(৪) Types of Early Bengali Prose– Siva Ratan Mitra, P 48
(৫) Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum 1924-32- Rai Bahadur B. B. Mukherjee D. L. R. p 16
(৬) Birbhum Gazetteer, p 91
(৭) O' Mally's Birbhum, p 92
(৮) Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum 1924-32- Rai Bahadur B. B. Mukherjee D. L. R. p 61
(৯) Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum 1924-32- Rai Bahadur B. B. Mukherjee D. L. R. p 109
(১০) Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum 1924-32- Rai Bahadur B. B. Mukherjee D. L. R. p 109-10
(১১) Tagore Law Lecture (1874-75) A. Phillips, pp 209-10
(১২) Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum 1924-32 - Rai Bahadur B. B Mukherjee D. L. R. pp 110-14.
(১৩) Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum 1924-32 - Rai Bahadur B. B Mukherjee D. L. R. pp 118.
(১৪) Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum 1924-32 – Rai Bahadur B. B Mukherjee D. L. R. pp 114-17.

সপ্তম অধ্যায়

নিষ্কর বাজেয়াপ্তী – মালিকানা-হকদারী – থাকম্যাপ-চিঠা

নিষ্কর বাজেয়াপ্তী - ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেসনে যাবতীয় নিষ্কর ভূমিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল -

(ক) বাদসাহী বা তায়দাদ এবং

(খ) তদেতর বা নন্‌-বাদসাহী

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখ কম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের পূর্ব্বে লিখিত সেনানীদিগকে প্রদত্ত জায়গীর এবং মস্‌জিদ আদি, অধ্যাপক, ধর্ম্মকার্য্য বা কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য যেকোন নিষ্কর ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল অথচ পরবর্ত্তীকালে তদ্বাবৎ কোন কর ধার্য্য হয় নাই এবং যাহা পরে বাজেয়াপ্তী মোকর্দ্দমা করিয়া নিষ্কর সাব্যস্ত হয়, তাহাই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩৭ নং রেগুলেসন দ্বারা বাদসাহী সিদ্ধ-নিষ্কর বলিয়া গণ্য হয়।

মিঃ সারবার্ণ সাহেবের চিঠায় প্রথম লাখেরাজ বলিয়া বহু লোক পূর্ব্বের তারিখ দিয়া মোহরযুক্ত সনন্দ দেখাইয়াছিল। এইজন্য অনুসন্ধান করিয়া ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২ নং রেগুলেসন দ্বারা, নির্দ্দিষ্ট দিন মধ্যে, সনন্দ দাখিল করিবার আদেশ দিয়া নোটিশ দেওয়া হয় ও সেই সময় তায়দাদ-রেজিষ্টারী লেখা আরম্ভ হয়। যাহারা নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে সনন্দ দাখিল করিতে অসমর্থ হইল, তাহাদের ভূমি সিদ্ধ-লাখেরাজ বলিয়া সাব্যস্থ করা হইল না। আবার, ক্ষেত্রবিশেষে ইহাও বলা হইয়াছে যে Register of Revenue Free Lands is not Final (Board's Letter No. 34A, dated 17.1.1799).

পূর্ব্বোক্ত নোটিশ ভালভাবে প্রচারিত হয় নাই বলিয়া ১৮০০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় উক্ত মর্ম্মে নোটিশ জারি করা হয়। এই সময় পূর্ব্বোক্ত তায়দাদ রেজিষ্টারীটির সঙ্কলন-কার্য্য সমাপ্ত করা হয়।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে দেওয়ানী গ্রহণের পর হইতে

১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত, জমিদারগণ বা সরকারী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক দাতব্য ও ধর্ম্ম-কার্য্যের জন্য যে ভূমি নিষ্কর স্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৯ নম্বর রেগুলেসন দ্বারা, নন্-বাদসাহী লাখেরাজ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। এই নন্-বাদসাহী নিষ্কর প্রধানতঃ এই দুই শ্রেণীভুক্ত করা হয়–

(১) ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্টের পর হইতে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত। এবং

(২) ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বরের পরবর্ত্তীকালে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি।

গভর্ণমেন্ট অথবা তাঁহাদের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী যে সকল নিষ্কর ভূমি দান করেন নাই বা ভূমির কথা প্রচারিত করেন নাই, তাহা নন্-বাদসাহী বা অসিদ্ধ-নিষ্কর বলিয়া ঘোষিত হয়। Provincial Council কর্ত্তৃক যে নিষ্কর ভূমি প্রদত্ত হয় তাহা সিদ্ধ-নিষ্কর এবং ১০ বিঘার ন্যূন যে সকল জমির আয় প্রকৃতপক্ষে কোন মন্দির, ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মকার্য্য বা দাতব্য কার্য্য ব্যবহৃত হইত এবং যাহা ১১৭৮ সালের পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও ন্যূন-খালাসি সিদ্ধ-নিষ্কর রূপে গৃহীত হয়।

এই রূপ ব্যবস্থার ফলে যে সকল ভূমি 'অসিদ্ধ' বলিয়া প্রচারিত করা হইল, তাহা আবার - (ক) ১০০ বিঘার উপর ও (খ) ১০০ বিঘার নিম্ন – এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল। (ক) প্রথমোক্ত বিভাগকে স্বতন্ত্র তালুক বলিয়া গণ্য করা হইল এবং ইহার জন্য নির্দ্ধারিত খাজনা জমিদারের মধ্যস্থতায় না দিয়া, একা এক গভর্ণমেন্ট বরাবর দিবার ব্যবস্থা হইল। (খ) ১০০ বিঘার ন্যূন জমির জন্য জমিদার লাখেরাজদারের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া লইবেন; কিন্তু তিনি তজ্জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট অতিরিক্ত খাজনার জন্য দায়ী হইবেন না। এইগুলি জমিদারের অধীনস্থ তালুক বলিয়া গণ্য করা হইল।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বরের পর হইতে সনন্দ দ্বারা যে নিষ্কর ভূমি দেওয়া হয়, তাহা ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া তাহা আর (১০০ বিঘার বেশী হউক বা কমই হউক) নিষ্কর বলিয়া গণ্য করা হইল না।

১০ বিঘার কম ভূমি, বোর্ডের আদেশ অনুসারে Resumption Proceeding Case খারিজ করিয়া, নিষ্কর মূল মহালের সামিল করিয়া দেওয়া হয়। ১০ বিঘার বেশী ভূমির জন্য মামলা হইল এবং ৫০ বিঘার উপর জমি, মামলা অন্তে প্রমাণিত হইলে তাহাই লাখেরাজ ভুক্ত হইল। ১১ হইতে ৪৯ বিঘা

ভূমির জন্য যাঁহারা রেহাই পাইল, তাহাই ন্যূন-খালাসী বলিয়া খ্যাত আছে এবং T[illegible] C-খালাসী লাখেরাজভুক্ত হইল। ৫০ বিঘার উপর যেগুলি লাখেরাজ প্রমাণিত হইল, সেগুলি বাজেয়াপ্তী নূতন তৌজিভুক্ত হইয়া জমাযোগ্য হইল।

পূর্ব্বোক্ত নিষ্করদারগণকে বেদখল করিয়া সেই সকল জমি জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া গভর্ণমেন্ট জমিদারগণকে খাজনা আদায় করিবার ক্ষমতা দেন। এইজন্য জমিদারগণ গভর্ণমেন্টের নিকট অতিরিক্ত খাজনার জন্য দায়ী হইলেন না। অল্পকাল মধ্যে মূল মহাল, ক্রমেই বহু জমিদার আংশিকভাবে ক্রয় করিয়া লইলে, তাহা নানাভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং মূল নিষ্করদারও অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীকার হইতে বঞ্চিত হয়। এই হেতু এই সকল নিষ্কর জমিসংক্রান্ত নানাবিধরূপ বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সকল কারণবশতঃ এইরূপ নিষ্কর জমির প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিবার জন্য Resumption Regulationএর প্রদত্ত অধিকার বলে বাজেয়াপ্তী মোকর্দ্দমার কার্য্য আরম্ভ হয়। Resumption Case হইয়া যে সকল জমি ৫০ বিঘার কম প্রমাণিত হইল, কেবল সেইগুলি খালাস হইল (ন্যূন-খালাসী)। আর যেগুলি Resumption Case হওয়ার পর বাদসাহী-লাখেরাজ বলিয়া সাব্যস্থ হইল, সেগুলি সমস্তই পরে Old C-Register ভুক্ত হইয়া লাখেরাজ মহালের তালিকাভুক্ত হইল। এই Old C-Register এখন Land Registration, Reg. B-1 রূপে পরিণত হইয়াছে।

Resumption Proceedingsএর পূর্ব্বে যথাক্রমে Regulation 19 of 1793, Reg. 37 of 1793. Reg. 8 of 1800, Reg. 2 of 1819, Reg. 14 of 1825 আইন দ্বারা প্রথমতঃ নিজ নিজ স্বত্ব প্রমাণের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছিল; কিন্তু ইহাতেও যখন কোন ফলোদয় হইল না, তখন ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে কয়েক বৎসর ধরিয়া এই বাজেয়াপ্তী মোকর্দ্দমার দ্বারা বীরভূম জেলার বহু জমি খাজনার যোগ্য বিবেচিত হইয়া রাজস্বদায়ী মহাল সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

যে সমস্ত লাখেরাজ সম্বন্ধে Regulation II of 1819 অর্থাৎ দোয়েম-কানন অনুসারে বাজেয়াপ্তী মোকর্দ্দমা হইয়াছিল এবং ঐ মোকর্দ্দমার বিচারে যাহা নিষ্কর বলিয়া সাব্যস্থ হইয়াছিল, এ সমস্ত লাখেরাজ সাধারণতঃ দোয়েম-খালাসী লাখেরাজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

মালিকানা - বাজেয়াপ্তীর সময় নন্-বাদসাহী প্রমাণিত হইলে, তাহার জমা ধার্য্য করিয়া পূর্ব্ব মালিকের সহিত বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব হয়। যে সকল মালিক উক্ত ধার্য্য জমায় গ্রহণ করিতে অসম্মত হন, তাঁহাদের ঐ মহাল অপরের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব মালিক থাকার দরুণ ধার্য্য জমায়

শতকরা কয়েক টাকা হারে চিরস্থায়ীভাবে মালিকানা স্বরূপ দেন। ফলে, বাজেয়াপ্তীর পূর্ব্ব মালিক, বিনা কারণে চিরকালের জন্য কতক পরিমাণ টাকা 'মালিকানা' স্বরূপ পাইয়া থাকেন। বীরভূমে গোপালনগর নামে এইরূপ একটি মাত্র মহাল আছে। এই মহালের পূর্ব্ব মালিকগণ উত্তরাধিকারীসহ ঐ মালিকানা গভর্ণমেন্টের নিকট পাইয়া আসিতেছেন। এই 'মালিকানা' স্বত্ব স্থলাভিষিক্তগণ বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে পারেন।

হক্‌দারী - এই মালিকানা স্বত্ব সাঁওতাল পরগণায় হক্‌দারী নামে কথিত হয়। পূর্ব্বে দেওঘর বীরভূমের এলাকা থাকার জন্য বীরভূমের অনেকেরই এখনও দেওঘরে হক্‌দারী স্বত্ব আছে। ইঁহারা সাঁওতাল পরগণা হইতে উক্ত স্বত্ব বাবত যথারীতি অর্থ প্রাপ্ত হন। এই স্বত্ব মালিকানার ন্যায় হস্তান্তরযোগ্য।

থাক্ ম্যাপ ও চিঠা - নিষ্কর Resumption বা বাজেয়াপ্তী কার্য্য সমাধা হইলে পর, অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র বীরভূমির জরীপের ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব্বে এইভাবে সমগ্র বীরভূমির জরীপ কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় নাই। এই জরীপ কার্য্য কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত সূক্ষ্মভাবে সম্পাদিত হয় নাই। পশ্চিম দেশ হইতে বহু মুসলমান ও হিন্দু-লালা-আমীন আনিয়া তাঁহাদের দ্বারাই এই জরীপ করা হইয়াছিল। তাঁহারা কেহই ইংরাজী জানিতেন না। তাঁহাদের জরীপী ম্যাপ ও তৎসংক্রান্ত চিঠাগুলি কতক পারশী ভাষায় ও কতক বাঙলা ভাষায় লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা ফুটগজ হিসাবে জমির পরিমাপ না করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমিত হাত-দাঁড়ায় পরিমাপ করিয়াছিলেন। এই ভাবের পরিমাপ প্রণালী লাঠাকাঠার মাপ বলিয়া পরিচিত। তবে হাতের পরিমাণ প্রায়ই ক্ষেত্রে ২০˝ বিশ ইঞ্চি পরিলক্ষিত হয়। এই হাতের পরিমাপের আদর্শস্বরূপ পিত্তল নির্ম্মিত ইঞ্চিভাগে বিভক্ত হাতকাঠি কালেক্টরের অফিসে রক্ষিত আছে। আবশ্যক হইলে সাধারণে সেই হাতকাঠির পরিমাপের নকল পাইয়া থাকে। এই থাক্‌বস্ত ম্যাপে যে সকল মৌজার ১ জন জমিদার এবং ১টি মাত্র তৌজির অধীন, সেই সকল মৌজাগুলির কেবলমাত্র সীমানা (Boundary Line) নির্দ্দিষ্ট আছে। তবে যে সকল মৌজা একাধিক জমিদারের অধীন ও একাধিক তৌজিভুক্ত, কেবলমাত্র সেইসকল মৌজার ক্ষেত্রবন্টন বা ক্ষেত-বাঁট ম্যাপ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ইহাতে সেই সেই মৌজার স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক কিত্তা জমি প্রদর্শিত হইয়াছে ও স্বতন্ত্র চিঠায় পরিমাপের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত প্রথম রেভিনিউ সার্ভে

রেভিনিউ সার্ভে - থাক্ জরীপের প্রায় অব্যবহিত পরেই Captain Walter Stanhope Sherwill, Revenue Surveyor কর্ত্তৃক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র পাতি সহযোগে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২১এ ডিসেম্বর তারিখে বীরভূমের জরীপ কার্য্য আরম্ভ হয় এবং সমগ্র জেলার এই জরীপ কার্য্য ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৩০এ সেপ্টেম্বর তারিখে সমাধা হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে তাঁহার জরীপ-কার্য্য সমাধার রিপোর্ট প্রদত্ত হয় এবং তাহা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়া সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে। Mr. Sherwill সাহেব সমগ্র জেলার পরগণাওয়ারী জরীপ কার্য্য সমাধা করিয়া ১ ইঞ্চি-স্কেলে সমগ্র বীরভূমের ম্যাপ্ প্রস্তুত করেন। ইঁহার পূর্ব্বে সমগ্র জেলার কোন ম্যাপ্ প্রস্তুত হয় নাই। এই ম্যাপের প্রতিলিপি ক্ষুদ্রাকারে আমরা ১ম খণ্ডে ৩নং মানচিত্রে দিয়াছি। Government Trignometrical Survey মালুঞ্চি মেরিডোরিয়ান সিরিজ হইতে এই ম্যাপ প্রস্তুত ও জরীপের কার্য্য আরম্ভ হয়। দুবরাজপুরের প্রস্তর ক্ষেত্রের একটি উচ্চ প্রস্তরের উপর যে এরূপ একটি Trignometrical Survey Station হইয়াছিল তাহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। Sherwill সাহেবের ম্যাপে Trignometrical Survey Stationএর নাম, লঘিমা, দ্রাঘিমা এবং সমুদ্রগর্ভ হইতে তৎসমুদয়ের উচ্চতা স্বতন্ত্রভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সমগ্র বীরভূমের যাবতীয় পরগণার নাম এবং একর, রুড ও বর্গ মাইলে তাহার স্বতন্ত্র পরিমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, তাঁহার রিপোর্টে প্রতি পরগণায় কত মন্দির, মস্‌জিদ, দুর্গ, নীলকুঠী, চিনি প্রস্তুতের কারখানা, রেশম কুঠী, গ্রাম ও জন-সংখ্যা এবং একরে পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে।

সেরউইল সাহেব কার্য্যান্তে যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সে সময়কার বীরভূম জেলার প্রতি পরগণার বহু তথ্যপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। আমরা এই স্থলে তৎ সমুদয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।

সেরউইল সাহেবের রিপোর্ট লিখিবার সময় দেওঘর প্রভৃতি বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহার সময় বীরভূমের আয়তন ৩১৪২ বর্গ মাইল, পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা ১১০ মাইল, প্রস্থে পূর্ব্বাংশে ৪০ মাইল, মধ্য স্থলে ১৫ মাইল এবং পশ্চিমাংশে ৩০ মাইল অর্থাৎ গড়ে ২৪ মাইল ছিল। তিনি এই জেলাকে পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব্ব-স্থূলতঃ এই তিন প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

পশ্চিম-বিভাগ - পাহাড়শ্রেণী ও জঙ্গলময়। পরগণা সারট, দেওঘর, তালুক পাবিয়া এবং তপ্পে কুণ্ডহিত কড়েয়া ইহার অন্তর্গত। পরিমাণ ১৭০০ বর্গ মাইল অর্থাৎ জেলার সমগ্র আয়তনের অর্দ্ধেক। জেলার এই অংশ সাধারণতঃ সমুদ্র হইতে ১০০০ ফিট উচ্চ, কেবল তেউর পাহাড় ২৫০০ ফিট উচ্চ। এই অংশ দক্ষিণ পশ্চিমে ক্রমনিম্ন হইয়া গিয়াছে এবং প্রায়ই পাহাড় ও প্রস্তরময় এবং কঙ্করপূর্ণ।

মধ্য-বিভাগ - পরগণা পাণ্ড্রা (বড়রা), খর্ন্নি, সাহালামপুর, হরিপুর, মহম্মদাবাদ, হুকমাপুর, জয়নুজাল, সেনভূম, আকবরসাহী, মল্লারপুরের কিয়দংশ, দড়িমৌড়েশ্বর, সাবেক মৌড়েশ্বর, খটঙ্গা, আলিনগর, ভুরকুণ্ডা ও বারবকসিংহ - - মধ্য-বিভাগের অন্তর্গত। আয়তন প্রায় ৭৮০ মাইল। এই বিভাগের পশ্চিমাংশ জঙ্গলময় ও প্রস্তরপূর্ণ হইলেও এই অংশের প্রায় অর্দ্ধেক কৃষিকার্য্যের উপযোগী। ইহার প্রতিবর্গ মাইলের অধিবাসীর সংখ্যা ১৫০ জন।

পূর্ব্ব-বিভাগ - পরগণা স্বরূপসিংহ, ইচ্ছাপুকুর, ফতেপুর, কুতুবপুর, খড়গাঁ, আমডহরা, সুপুর, বারবকসিংহের অধিকাংশ, ভুরকুণ্ডা, আলিনগর, সাবেক মৌড়েশ্বর, দড়ি মৌড়েশ্বরের দক্ষিণ অঞ্চলের অধিকাংশ এবং মল্লারপুরের কিয়দংশ - এই বিভাগের অন্তর্গত। পরিমাণ ৬৩১ বর্গমাইল। এই বিভাগ সমতল এবং কর্ষণোপযোগী। নীল, রেশম প্রভৃতি বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এতদঞ্চলের লোক শিক্ষিত ও সমৃদ্ধশালী। ধান, গুড়, রেশম, নীল প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্য এতদঞ্চল হইতে বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হয়।

রাস্তা - পূর্ব্বে বহরমপুর হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত সিউড়ী, তথা হইতে দেওঘর ও ভাগলপুর পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা আছে। আর একটি সুন্দর রাস্তা পূর্ব্ব-পশ্চিম অঞ্চল দিয়া মুঙ্গের হইতে দেওঘর পর্য্যন্ত। এখান হইতে আবার উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বাদশাহী শড়ক দক্ষিণাংশ দিয়া প্রায় ৮০ মাইল ব্যাপিয়া আছে।

বোলপুর হইতে (বর্দ্ধমান হইতে) বোলপুর - সাঁইথিয়া, মল্লারপুর পর্য্যন্ত রেল রাস্তা।

তপ্পে হরিপুর - পরিমাণ ১১৬.৭৪ বর্গ মাইল, জমি - শস্যোপযোগী; বহু ক্ষুদ্র নদী বা কন্দর পরিসেবিত। পূর্ব্বার্দ্ধে উন্নত ভূমি, দক্ষিণার্দ্ধে গভীর জঙ্গল। উচ্চ ভূমিতে শাল, আসন প্রভৃতির জঙ্গল এবং কঙ্কর ও লৌহ নিষ্কাসনের উপযোগী নানারূপ বীচপাথর (iron ores) অজস্র পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। ইহার উপর দিয়া পরিষ্কার রাস্তা আছে। ধান, চাল, মসিনা, বুট, যব প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। আম, তেঁতুল, কলা, জাম, বেল প্রভৃতি বৃক্ষ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। উচ্চ ভূমিতে চাকল্‌তা, খেজুর, মহুয়া, করঞ্জা ইত্যাদি বৃক্ষ।

নগর, তাঁতিপাড়া ও চন্দ্রপুর - এই পরগণা মধ্যে সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। তাঁতিপাড়া হইতে কলিকাতায় তসর রপ্তানি হয়। এখানে আবগারীর দোকান ও নীলকুঠী আছে। ইহার এক মাইল দক্ষিণে বক্রেশ্বর নদীর তীরে অনেকগুলি উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে। এই স্থানের নাম বক্রেশ্বর-ক্ষেত্র। এই নদীর দক্ষিণ তীরে, প্রায় দুই শত গজ ব্যাপিয়া প্রায় ৩২০টি শিব মন্দির আছে। ইহার মধ্যে ১টি মন্দির কেবল গঠন-সৌষ্টবে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেখিয়া মনে হয় যেন ইহা গয়া ও মধ্য ভারতের মন্দিরের আকৃতির অনুরূপ (বক্রেশ্বর-ক্ষেত্রের স্বতন্ত্র বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য)। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যাহ্নে সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ প্রস্রবণের তাপ ১৬২° ফারণ হিট, সর্ব্বনিম্ন তাপ ১২৮° ফারণ হিট। সেই সময় ছায়াযুক্ত স্থানের তাপ ৭৭° এবং নিকটবর্ত্তী নদীর জলের তাপ ৮৩°। এই জলে ছোট ছোট মৎস্য পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। এই উষ্ণ প্রস্রবণের সংলগ্ন স্থানে অনেকগুলি শীতল জলেরও প্রস্রবণ আছে। এই সমস্ত প্রস্রবণের জল বাহিত হইয়া অদূরবর্তী বক্রেশ্বর নদীতে পতিত হইতেছে। নদী গর্ভের ৬˝ ইঞ্চি নিম্নে, বালুকার নীচে যে জল বাহির হইল, তাহাও অসহ্য তাপযুক্ত। সর্ব্বোষ্ণ প্রস্রবণ হইতে প্রতি মিনিটে প্রায় ১২০ Cubic foot জল নির্গত হয়। এই সকল কুণ্ডের মধ্যে ময়লা ও কর্দ্দমাশ্রিত অসংখ্য ছিদ্র হইতে এই উষ্ণজল উদগত হয়। ১৬০° ডিগ্রী তাপ বিশিষ্ট জলেও সবুজ রঙের শ্যাওলা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেখা গেল ! এই স্থানে বক্রেশ্বর নদী প্রায় ৫০ গজ প্রস্থ। উষ্ণ প্রস্রবণের নীচে বহুদূর পর্য্যন্ত এই নদীর জলের তাপ অনুভূত হয়।

নগরের উত্তরে গভীর জঙ্গল পরিবেষ্টিত আলিগড় নামে একটি মৃন্ময় দুর্গ মারাঠাদিগের গতিরোধ করিবার জন্য বিগত শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহারই সংলগ্ন আবার নগররাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রায় ৩২ মাইল ব্যাপী একটি মৃন্ময় প্রাচীর আছে। ইহা নগর হইতে গড়ে প্রায় ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা এখনও পর্য্যন্ত (১৮৫২ খৃষ্টাব্দ) সুরক্ষিত আছে। ইহা নগরের উপর বিদেশীয়

আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য এবং ঘাটি (প্রবেশ-পথগুলি) সংরক্ষিত করিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১২ হইতে ১৮ ফুট উচ্চ এই মৃন্ময় প্রাচীর মূলতঃ মারাঠাদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এই প্রাচীর নির্ম্মাণ জন্য মাটি লওয়ায় যে খাল বা গর্ত্ত হইয়াছিল, তাহা এখনও দেখা গেল। মূল রাস্তার উপর প্রত্যেক ঘাটিতে কাঠের ফটক এবং তাহাতে ১০০ জন সৈন্য রহিবার উপযোগী স্থান আছে। পূর্ব্বোক্ত প্রাচীর এখন বহু জঙ্গলপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। শত্রু প্রতিরোধের জন্য বহু ব্যয়ে এইরূপ প্রচেষ্টা নিতান্তই নির্ব্বোধের কার্য্য বলিয়া মনে হয়। কেননা, অশ্বারোহী মহারাষ্ট্রীয়গণ ৪/৫ মাইল ঘুরিয়া গেলেই সহজেই নগর প্রাপ্ত হইতে পারিত। লোক-সংখ্যা - প্রতি বর্গমাইলে ২১১.৩৭, পাকাবাড়ীর সংখ্যা ৭৯ এবং ৭৭৭৪টি মৃন্ময় গৃহ।

পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে সিউড়ী হইতে দেওঘর যাইবার সুন্দর রাস্তা। এতদ্ব্যতীত, বহু গ্রাম্যপথ আছে। গৃহপালিত পশু যথেষ্ট; ঘোড়া নাই বলিলেই হয়।

তালুক বড়রা - উত্তরাংশে কুণ্ডহিত কড়েয়া হইতে হিঙ্গলা নদী আসিয়া এই পরগণা মধ্য দিয়া অজয় নদের দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই তালুক মধ্যে - হজরতপুর, রসা, জামালপুর পলপই ও নাকড়াকোন্দা প্রধান স্থান। হজরতপুরে মুসলমানগণের মস্‌জিদ ও বাকীগুলিতে হিন্দুগণের মন্দির আছে। ২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ৮৫° ডিগ্রী তাপবিশিষ্ট একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ইহার জল প্রবাহিত হইয়া দুই মাইল দূরে হিঙ্গলা নদীতে মিশ্রিত হইয়াছে। এই প্রস্রবণ তীরে কামানো পাথরের ধ্বংসোন্মুখ একটি মন্দির আছে। খয়রাশোলে নীলকুঠী ও কৃষ্ণপুরে পুলিশ থানা আছে। এই তালুকের চতুর্দ্দিকেই গো-গাড়ীর রাস্তা দেখা যায়। লোকসংখ্যা - প্রতি বর্গ মাইলে ৩৩১.৮ জন ; অথবা - প্রতি গৃহে ২.৭ জন। অধিবাসীগণ মধ্যে শতকরা ৭৫ জন হিন্দু ও ২৫ জন মুসলমান।

খর্ন্নি - পরিমাণ ৩৫.৫০ বর্গ মাইল। এই পরগণার উত্তর অঞ্চল দিয়া নগর-দুর্গের প্রাচীর কিয়দংশ ব্যাপিয়া আছে।

সাহালামপুর - পরিমাণ ৭৯ বর্গ মাইল। পঞ্চমাংশ কর্ষণের অযোগ্য ও প্রস্তরময়। হরিপুর তপ্পে মধ্যে তাঁতিপাড়া পরগণায় এবং এই পরগণার দুবরাজপুর মধ্যে দুবরাজপুর ও নিকটস্থ স্থানে প্রায় ১ বর্গ মাইল ধরিয়া সুবৃহৎ প্রস্তর-ক্ষেত্র রহিয়াছে। ইহার মধ্যে একটি প্রস্তরের উপর ৬˝ ইঞ্চি মাত্র স্থানে ৪৫˝ ইঞ্চি কোণ করিয়া হেলানভাবে আর একটি সুবৃহৎ প্রস্তর আবহমানকাল ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রবল প্রতাপ উপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ! মনে হয়, যেন এই দুইটি প্রস্তরকে গলাইয়া জোড়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১টি ৬০´ ফুট উচ্চ প্রস্তর আছে,

তাহার উপর দাঁড়াইলে ৭৫ মাইল দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলস্থিত পরেশনাথ পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটস্থ চতুর্দ্দিকেরও সুন্দর দৃশ্য নয়নগোচর হয়। ৩০´ ফুট পরিধিবিশিষ্ট একটি ৬´ ফুট উচ্চ সুবৃহৎ অর্দ্ধ গোলাকার প্রস্তরের উপর একটি মহাদেবের মন্দির স্থাপিত আছে। দৃশ্য অতি সুন্দর। অজয় নদ বাহিয়া কুণ্ডহিত কড়েয়া হইতে নৌকায় কাঠ-কয়লা ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কাঠের গদি আনীত হয়।

এই অঞ্চলের চাপলা গ্রামে হিঙ্গলা নদী অজয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই পরগণা মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর গ্রাম, বাজার ও হিন্দুদিগের মন্দির, মুনসেফী কাছারী, পুলিস থানা ইত্যাদি আছে। এতদঞ্চলে কাপড়, কাঁসার দ্রব্য, গুড়, গালা, কাটা-বাতাসা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

তপ্পে মহম্মদাবাদ - পরিমাণ ১১৫ বর্গ মাইল। সাল, আসন, ভেলা, ধওয়া প্রভৃতি কাঠ প্রচুর। অধিকাংশ জঙ্গলময়। পশ্চিমাংশে প্রায় ৬॥ মাইলব্যাপী স্থানে উচ্চ ভূমিতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। ময়ূরাক্ষী নদী এই পরগণার উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিতা। বর্ষাকালে প্রস্থ প্রায় ৫০০ গজ। অন্য সময়ে কেবল সামান্য মাত্র জল থাকে এবং সমগ্র নদী বালুতে পরিপূর্ণ। সিদ্ধনালা মহম্মদাবাদের নিকট ময়ূরাক্ষী নদীতে পতিত হইয়াছে। এই নদীর বাম তীরে কুমীরদহ গ্রামে বৎসরে প্রায় ৮০টি করিয়া ক্ষুদ্র ডিঙ্গি ও নৌকা প্রস্তুত হয় এবং তাহাতে করিয়া বর্ষার সময় এতদঞ্চল হইতে কাঠ-কয়লা প্রভৃতি লইয়া ভাগীরথী তীরবর্ত্তী কাটোয়া পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। সালের বড় বড় গদি ও নৌকার হালের কাঠ ইহাতে বোঝাই করিয়া চালান হইত। ময়ূরাক্ষী ও সিদ্ধনালার সংযোগ স্থলের ৫ মাইল দূরে তাঁতলই গ্রামে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ইহা ৭৭° হইতে ১৫৫° ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে কয়লা থাকিবার কথা শুনা যায়; কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এখানকার অধিবাসীগণ অধিকাংশই সাঁওতাল বা নিম্ন শ্রেণীর। পশ্চিমাংশে অনেক হিন্দু আছে। এ অঞ্চলে গুড়, তুঁত, নীল, সরিষা, জোনারী, মহুয়া প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই তপ্পের মধ্যে কাল ভালুক, চিতা, বনশূকর, শৃগাল, তিতির, কাদাখোঁচা প্রভৃতি জন্তু ও পাখী দেখা যায়।

বেলপাট্টার সাত্তোর অঞ্চলে বাঘে বহু অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। এতদঞ্চলে বন্য হাতীর দলও আছে। এ অঞ্চলের জমি যেখানে সমতল সেখানে যথেষ্ট ফসল উৎপাদন হয়। পাহাড়ের সংলগ্ন জমি প্রস্তর ও কঙ্করময়। রাস্তা - সিউড়ী-ভাগলপুর রোড।

পরগণা খটঙ্গা - পরিমাণ ৭৯.৭৮ বর্গ মাইল। ১/৩ অংশ প্রায় জঙ্গলময়।

অবশিষ্ট জমি সমতল ও উর্ব্বর। ময়ূরাক্ষী নদী ইহাকে দুইটি অসম ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছে। প্রস্থ - গড়ে ১৫০০ ফিট্ (৫০০ গজ)। প্রধান নগর - সিউড়ী, পুরন্দরপুর, সিমুলে, হরিশকোপা ও বিষ্ণুপুরে ছোট নীলকুঠী আছে। হরিশপুরে চিনির কারখানাও আছে। পুরন্দরপুর এবং ভুতুড়াতে পুলিস চৌকী ও সিউড়ীতে পুলিস থানা।

পরগণা হুক্‌মাপুর - পরিমাণ ২৪.৩২ বর্গ মাইল। খটঙ্গারই মত জমি। ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরে টাঙ্গসুলি বা মোহরপুরে পাথরের খনি আছে। ইহাতে শ্লেটের মত স্তরবিশিষ্ট পাথর দেখা যায়।

পরগণা ননী ও দড়ি-মৌড়েশ্বরের উত্তরাংশ - পরিমাণ ৫৬ বর্গ মাইল। ইহার মধ্য ১/৩ অংশ জঙ্গল ও পাহাড়ময়। এই অঞ্চলের জমি অনুর্ব্বর এবং প্রস্তর ও কঙ্করময় ও জঙ্গলাবৃত। এখানে লৌহ নিষ্কাসিত হইতে পারে এরূপ বীচপাথর (iron ores) বহু পরিমাণে আছে। উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে গভীর খাত বিশিষ্ট অপ্রসস্থ দ্বারকা নদী প্রবাহিতা। বর্ষায় বন্যাপ্লাবিত হইলেও গ্রীষ্মকালে নির্ম্মলজল প্রবাহিত হয়। অনেক দিন পূর্ব্বে ইংরাজ ব্যবসায়ী উক্ত বীচপাথর হইতে লৌহ নিষ্কাসন জন্য ডেউচা গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে ১ মাইল দূরে দ্বারকা নদীর তীরে পাথর চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে একটি Water Mill বসাইবার জন্য পাকা বাঁধ প্রস্তুত করেন ; কিন্তু সেই বৎসরই প্রথম বর্ষায় প্রচণ্ড বন্যা হইলে, কেবল মাত্র কয়েকটি স্তম্ভ ব্যতীত সমস্ত পাকা বাঁধ স্থানচ্যুত করিয়া দেয়। পরগণার সর্ব্বত্রই কঙ্কর ও প্রস্তরময়। সুন্দর রাস্তা আছে।

আকবর সাহী - এই ঘন-বসতি ক্ষুদ্র পরগণার পরিমাণ ২৬ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে, পঞ্চমাংশ মাত্র পতিত। কর্ষণোপযোগী জমি প্রায় সমতল ও উর্ব্বর। আখ, যব, সরিষা, বুট প্রচুর হইয়া থাকে। গমও কিছু কিছু হয়। বহু আম ও তালের বাগান আছে। গ্রামগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গৃহগুলি মৃন্ময়, কিন্তু সুদৃঢ়। গবাদি পশু যথেষ্ট। প্রায়ই ভূমি সেচনের জল পায়। ৮১৩ একর আন্দাজ ভূমি জঙ্গলাবৃত। ২১১১ একর পুষ্করিণী ও নদীগর্ভ। দ্বারকা নদী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে এবং ময়ূরাক্ষী নদী দক্ষিণাংশে এক মাইল পরিমিত স্থান দিয়া প্রবাহিত। নদীর জলে সেচন হয় না। এতদঞ্চলের লোক মধ্য ২/৩ হিন্দু ও ১/৩ মুসলমান।

পরগণা ধাওয়া - এই পরগণার ছয়টি মাত্র হল্‌কায় ৪৩২-১-২৫ একর পরিমাণ জমি আছে। ইহা আকরব সাহী ও খটঙ্গার সহিত জরিপ হইয়াছে। ইহার সমস্ত জমি কৃষিকর্ম্মোপযোগী।

পরগণা মল্লারপুর - ইহার প্রায় ১/৪ অংশ অর্থাৎ প্রায় সমগ্র পশ্চিমাংশ

লোহার উপযোগী বীচপাথরে আবৃত ; তদুপরি জঙ্গল। অবশিষ্টাংশ সমগ্র পরগণাময় ধানের জমি। গুড়, জোনারী, বুট, যব প্রভৃতি শস্যও দ্বারকা নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

পরিমাণ ৩৬.৮৩ বর্গমাইল। দ্বারকা নদী এই পরগণা মধ্যে ৩ মাইল ঘুরিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, কর্দ্দমময় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। বর্ষার সময় ইহার উপর অস্থায়ীভাবে সাঁকো প্রস্তুত করিয়া পারাপারের ব্যবস্থা করা হয়। এই অঞ্চলে বীচপাথর আছে। ইহার মধ্যে কর্দ্দমের ভাগ অধিক। এই অঞ্চলে ভাল লৌহ নিষ্কাসিত হয়। গদি কাঠও পাওয়া যায়। লোকসংখ্যার অনুপাত - ৪/৫ হিন্দু ও ১/৫ মুসলমান।

মল্লারপুর প্রধান গ্রাম। ইহা সমৃদ্ধশালী ও সুন্দর, কিন্তু বহু অস্বাস্থ্যকর পুষ্করিণীতে পরিপূর্ণ।

পরগণা জয়নুজাল - ১/৬ অংশ মাত্র পতিত। পূর্ব্ব-পশ্চিমমাংশে অনুমান ১০,০০০ একর প্রস্তর ও কঙ্করময় স্থানে শালের জঙ্গল; কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ অতিশয় উর্ব্বরা ; সেখানে সেচন দ্বারা গম, ধান, আখ, সরিষা, মসূর প্রভৃতি হয়। এই স্থানের ১/২৫ অংশ অথবা ২০০০ একর পরিমিত স্থানে সেচন উপযোগী করিয়া পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে। এখানে ৩/৫ হিন্দু ও ২/৫ মুসলমান।

পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখী বক্রেশ্বর ও সাল নদী প্রবাহিত। এই সকল নদীর জল হইতে ক্বচিৎ সেচন কার্য্য করা হয়।

পরগণা সেনভূম - ২/৩ অংশ কর্ষণোপযোগী, ১/৩ অংশের (৬৪৩২ একর) স্থানে স্থানে জঙ্গল ও ৩১০৯ একর পরিমিত স্থানে পুকুর ইত্যাদি আছে।

ইলামবাজার ও বারবকসিংহ পরগণার সুরুলের মধ্যবর্ত্তী অজয় নদের তীরে ৬ মাইল ব্যাপী পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত জঙ্গল। পূর্ব্বাঞ্চল পরিস্কৃত। এ-অঞ্চলে চাউল, নীল, তুঁত, গুড় প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

ইলামবাজারের লোকসংখ্যা ২২৩৫। এখানে একটি নীলকুঠী ও বাজার আছে। এখানে গালার সুন্দর সুন্দর গহনা ও খেল্‌না তৈয়ারি হয়। কিন্তু এখন মাত্র ২ জন কারিগরই এই শিল্প একচেটিয়া অধিকার করিয়া রাখিয়াছে।

ইলামবাজারের নিকট অজয় নদ প্রায় সিকি মাইল বিস্তৃত। এই নদের সমান্তরালভাবে কিনারায় ৪ মাইল ধরিয়া বন্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটি বাঁধ রহিয়াছে। দক্ষিণদিকেও এইরূপ একটি বাঁধ আছে।

এই পরগণার মধ্য দিয়া ইলামবাজার ও সুরুল হইতে সিউড়ী পর্য্যন্ত

সুন্দর রাস্তা আছে।

পরগণা দড়ি-মৌড়েশ্বর (দক্ষিণাংশ) - পরগণা দড়ি-মৌড়েশ্বর, মল্লারপুর পরগণাকে উত্তর ও দক্ষিণ - এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। দক্ষিণাংশ জনবহুল ও উর্ব্বর। সিউড়ী-মুর্শিদাবাদ রাস্তার উপর ইহার প্রধান নগর মৌড়েশ্বর অবস্থিত। এই গ্রামের চতুর্দ্দিকে প্রায় ৮০টি পুষ্করিণী আছে। এক মাইল পশ্চিমে, ১ মাইল লম্বা একটি ঝিল আছে।

এখানকার বহু হিন্দু অধিবাসী পলু পোকা পালন করে এবং তাহা হইতে রেশম বাহির করিয়া ইউরোপীয় বণিকগণকে বিক্রয় করে। এখানকার রেশমের রঙ স্বর্ণাভ হরিদ্রা। এই পরগণার বাহিরে উদনগর গ্রামে ময়ূরাক্ষী নদী তীরের নিকট একটি ইউরোপীয় সাহেবের রেশমের কুঠী আছে। ইহার নিকটবর্ত্তী গুমোতেও নীলকুঠী আছে।

সিউড়ী-বহরমপুর রাস্তা, এই পরগণা মধ্যে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছে। ইহা যথাযথভাবে মেরামত করা হয়। প্রস্তাবিত রেলরাস্তা মৌড়েশ্বরের পশ্চিমে এই পরগণা দিয়া নির্ম্মিত হইবে।

পরগণা সাবেক-মৌড়েশ্বর - উত্তমরূপে কর্ষিত। প্রধান উৎপন্ন - ধান, তুঁত, নীল প্রভৃতি। জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৩১৬ জন। ইহার মধ্যে ১/২০ মুসলমান। এই পরগণার উত্তর পূর্ব্বাংশে বুরান গ্রামের নিকট ময়ূরাক্ষী নদী দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই পরগণার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উচ্চ ভূমিতে সাঁইথিয়া নগর অবস্থিত আছে। সেকপুরে একটি নীলকুঠী আছে। সাঁইথিয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে লৌহের খনি থাকার কথা অনুমিত হয়।

পঃ স্বরূপ সিংহ, সাহাজাদপুর, জোয়াস ইব্রাহিমপুর ও ইছাপুকুরিয়া - এই অংশ বীরভূমের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উর্ব্বর। এখানে প্রচুর পরিমাণে ফসল হইয়া থাকে। রেশমের জন্য বহু পরিমাণ ভূমিতে তুঁতের গাছ দেওয়া হয়। রেশমী পোকা হইতে এই স্থানের প্রায় ১/৬ ভাগ লোক রেশম সূতা বাহির করিবার জন্য নিযুক্ত থাকে। এই সকল পরগণা মধ্যে ৬টি ইউরোপীয় ও বহু দেশীয় ব্যবসায়ীর রেশমের কুঠী বা কারবার আছে। দেশীয় লোকের কুঠীর কারবারের তেমন প্রসার নাই। ইউরোপীয় কারবারের মধ্যে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে গনুটিয়ার কুঠীর কারবারই সর্ব্বপ্রধান। এখানে বহুসংখ্যক তাঁত চলিতে থাকে। ইহার অধিকারী কলিকাতাস্থ কোন ইউরোপীয় ব্যবসায়ী। এখানে তত্ত্বাবধান জন্য একজন ইউরোপীয় নিযুক্ত থাকেন। এই অঞ্চলের দক্ষিণাংশের সমস্তই স্থান ব্যাপিয়া ময়ূরাক্ষী নদীর শাখা প্রবাহিত। জনসংখ্যা - প্রতি বর্গমাইলে ৩৪৯ জন মধ্যে ১/৬ ভাগ মুসলমান। এখানকার - বেলগাঁ, ঢেকা, বড়োঞা ও গনুটিয়া

প্রধান ও বৃহৎ গ্রাম।

পরগণা আলিনগর - পশ্চিমাংশ জমি অনুর্ব্বর। ঘাস ও ঝোপ-জঙ্গলে আবৃত। ইহার উত্তরাংশে বক্রেশ্বর নদী প্রবাহিত। পশ্চিমাংশের ও পূর্ব্বাংশের অর্দ্ধেক ভূমি নিম্ন ও কর্ষণোপযোগী। ধান, তুঁত ও নীল প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

বর্দ্ধমান হইতে সিউড়ী আসিবার একটি সুন্দর রাস্তা এই পরগণার উত্তরাংশে অবস্থিত।

পরগণা ভুরকুণ্ডা - আলিনগর পরগণার ঠিক দক্ষিণেই অবস্থিত। ভূমি উর্ব্বর ও ভালরূপে কর্ষিত। কিন্তু অনেক মোটা ঘাস ও ঝোপ-জঙ্গলে কন্টকিত। উত্তর ও পূর্ব্বাংশের তুলনায় গ্রামগুলি ছোট। দশমাংশ পুষ্করিণী। ৮৬৩ একর অর্থাৎ ১$\frac{১}{৪}$-বর্গমাইল পরিমিত শঙ্করপুর নামক গ্রামের ১৬৭ একর পরিমিত স্থানে ১১১টি পুকুর আছে। ইহার মধ্যে ৪৬টি পুকুর পাশাপাশি ও সংলগ্ন। লোকে এই সকল পুকুরের পাঁক সারের পরিবর্ত্তে জমিতে দিয়া থাকে। এখানে ১/১৩ ভাগ লোক মুসলমান। উৎপন্ন দ্রব্য - ধান, নীল ও তুঁত। এখানে বহু আমের বাগান আছে। এই পরগণার মধ্য দিয়া সিউড়ী হইতে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী ভবানন্দপুর গ্রামে নীলের কুঠী আছে।

পরগণা ফতেপুর, গোকুলতা, কুতবপুর, পুরন্দরপুর ও খড়্গাঁ - এতদঞ্চলের ভূমি সমতল ও উত্তমরূপে কর্ষিত। এই পরগণাগুলির মধ্য দিয়া পশ্চিমে সিউড়ী হইতে পূর্ব্বে কাটোয়া পর্য্যন্ত একটি রাস্তা গিয়াছে এবং এই রাস্তা ইলামবাজার হইতে গনুটিয়া ও বহরমপুর পর্য্যন্ত একটি রাস্তা পূর্ব্বোক্ত রাস্তাকে সমকোনে কাটিয়া গিয়াছে।

মাস্তুল ও গাঙ্গপুরে নীলকুঠী আছে। চৌহট্টায় থানা ও সেওগ্রামে পুলিস চৌকী আছে।

পরগণা বারবকসিংহ, আমডহরা, সুপুর পূর্ব্ববর্ত্তী পরগণা সমষ্টির মধ্যস্থিত জমির ন্যায় এখানকার জমি প্রায়ই একরূপ। ভূমি উত্তমরূপে কর্ষিত, গ্রামগুলি বড় এবং গৃহগুলি সুন্দরভাবে গঠিত।

জনসংখ্যা - প্রতি বর্গমাইলে ৩৯২ জন। ইহার মধ্যে ১/৮ ভাগ মুসলমান।

পশ্চিমাংশে ৪৪২৪ একর পরিমিত ভূমি কর্ষণের অযোগ্য। ইহা সুরুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সুরুলে গভর্ণমেন্ট রেসিডেন্সীর চীপ্ সাহেবের কুঠী আছে। বর্দ্ধমান-সিউড়ী রাস্তা, ইলামবাজার-কাটোয়া রাস্তাকে সুরুলেই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে।

পাঁচসওয়ায় এবং সুপুরে নীলকুঠী আছে।

পরগণা বারবকসিংহ মধ্যে সুরুল, সেরাণ্ডি, জলুন্দি, বড়গাঁ, পরগণা সুপুর মধ্যে সুপুর, চন্দনপুর ও পরগণা আমডহরা মধ্যে আমডহরা প্রধান গ্রাম।

সুপুর পরগণায় এ-অঞ্চলকে অজয়ের বন্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ৪॥ মাইল ধরিয়া একটি মাটির বাঁধ দেওয়া আছে।

Sd. W. S. Sherwill
(captain) Revenue Surveyor
1849-52

(মন্তব্য - সেরউইল সাহেব ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে ভাগলপুরের Dy Surveyor Generalকে বীরভূমের অধীন তপ্পে দেওঘরের নিকট রূপা ও তামার খনির আবিস্কারের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন প্রকারের মাটি ও প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সুযোগে কয়লার খনি আবিস্কারের কথাও জানাইয়াছিলেন।)

সেরউইল সাহেব তাঁহার রিপোর্টের সহিত যে একটি বিবরণীমূলক তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে বিবিধ তথ্যের সমাবেশ রহিয়াছে। ঐতিহাসিক ও সাধারণ পাঠকগণ এই তালিকা অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, ৮৫ বৎসর পূর্ব্বের বীরভূমের একটি সুস্পষ্ট চিত্র দেখিতে পাইবেন। তদুপরি, ইহাতে মূল রিপোর্টের ন্যায়ই অনেক কিছু ভাবিবার ও উপলব্ধি করিবার উপকরণ প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই নিমিত্ত আমরা এই স্থলে ১৮৫৩ সালের ১লা জুলাই তারিখে, Revenue Surveyor, Captain W. S. Sherwill স্বাক্ষরিত উক্ত তালিকার সমগ্র অনুবাদ প্রদান করিলাম -

ক্রমিক নম্বর	পরগণা	মন্দির	মস্‌জিদ	দুর্গ	চিনির কুঠি	রেশম কুঠি	নীলকুঠি	গ্রাম সংখ্যা	বর্ত্তমান জমা	মোট আয়তন (একর)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	আকবরসাহী	২৭	০	০	০	০	১	১০৫	১৫০৮৯।৴৫	১৭০৫১-৩-২৪
২	আলি নগর	৯	০	১	০	০	০	২৬৮	৪০৩৫৪।৴৩	৪১৬৫২-২-৩৬
৩	বারবক সিংহ	১৪৪	১	০	০	০	১	১৪৪	৪৫৮৮৩।৫	৪৬৩১০-০-১৪
৪	ভুরকুণ্ডা	২৮	০	০	০	০	৩	১১৫	১৭৮০২॥৴১১	২০৪০৫-১-২৯
৫	ভদ্রপুর	সাহাজাদপুর পরগণার সহিত জরিপ হইয়াছে						১	১২৭০॥৴১০	২২০-১-৩৫
৬	ধাওয়া	০	০	০	০	০	০	৬	১৬৮৸৯	৪৩২-১-২৫
৭	দড়িমৌড়েশ্বর	৩৭	২	০	০	০	০	২৯৭	৫৭৫৯১৸৶৬	৯২৭৬৬-০-০৮
৮	ফতেপুর	১০	৩	০	০	০	০	৬৮	১৯০৭৪।৴৫	১৬৭৬৫-০-১৪
৯	গোকুলতা	স্বরূপসিংহ পরগণার সহিত জরিপ হইয়াছে						২	৩২৫০৸৶৯	১০৮৭-২-০৯
১০	তাঃ হুকুমাপুর	৭	২	০	০	০	০	১২৮	৪৪৯২৸৶১	১৭০৩৬-২-৩৪
১১	তপ্পে হরিপুর	৩৩৪	১০	১	০	০	৩	৩২২	১৬৩৮৬৸৶১	৭৪৭১৬-২-১৪
১২	ইছাপুকুর	১২	৬	০	০	০	০	৩৬	১৭৮৮৮৸১	৯৭৮২-২-১৬

ক্রমিক নম্বর	পরগণা	মন্দির	মস্‌জিদ	দুর্গ	চিনির কুঠি	রেশম কুঠি	নীলকুঠি	গ্রাম সংখ্যা	বর্ত্তমান জমা	মোট আয়তন (একর)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৩	জোয়াস ইব্রাহিমপুর	৯	১	০	০	০	০	৫	৯৮৯ ৷৴০	২৭৩৬-২-০৪
১৪	খর্ন্নি	১২	২	০	০	০	০	১৫৩	৯১১১৶৬	২২৭২৪-৩-৩৫
১৫	খড়্গ্রাম	৮	০	০	০	০	০	৮১	৯৩৭৪৶৬	১৬৪০১-২-০৭
১৬	খটঙ্গা	৬	২	০	২	০	১	৩২৮	৪৮৬১৪৶২	৫৩২৩৭-০-৩৮
১৭	কুতুবপুর	২২	৩	০	০	০	০	৭১	৪২৮৫৯।৯	২৯৮৪৫-০-৩৪
১৮	তঃ কুণ্ডহিত কড়েয়া	১	১	০	০	০	২	৫৬৮	৬৮৬৪৸৴৯	২৫৯৩৬৩-৩-০৪
১৯	কাষ্ঠগড়	দড়ি মৌড়েশ্বর ও স্বরূপ সিংহের সহিত জরিপ হইয়াছে						১৬	২৮৫৭।৴৭	২৬৮৭-৩-০৩
২০	মল্লারপুর	১৬	০	০	০	০	০	৫১	১৮১২২৸৴৯	২৩৫৮৯-০-২৫
২১	তঃ মহম্মদাবাদ	৭	২	০	০	০	১	১৯৭	৩৬৭৫।৴৭	৭২৫০০-২-০৫
২২	মজকুর্ণী	০	০	০	০	০	০	১	১৩৭৯॥৵৬	৫৭৭-৩-৩৪
২৩	ননী	৪০	২	০	০	০	০	১৫২	১৫৪৩৩৸১	৩৬৫৪৩-২-৩৮
২৪	পুরন্দরপুর	০	০	০	০	০	০	৫১	৯১৯৫৶৮	৯১৫৭-০-২৯
২৫	তাঃ পাবিয়া	০	০	০	০	০	০	১৬০	৮৩।৶১১	১৪৬৪৩-৩-১৯

ক্রমিক নম্বর	পরগণা	মন্দির	মস্‌জিদ	দুর্গ	চিনির কুঠি	রেশম কুঠি	নীলকুঠি	গ্রাম সংখ্যা	বর্ত্তমান জমা	মোট আয়তন (একর)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২৬	তাঃ বড়রা(বা পাণ্ডরা)	১৩	২	১	১২	০	১	১০৪	১৫৩৫৬॥৵৭	২৩১৪৩-৩-১১
২৭	তাঃ রুকুণপুর	স্বরূপসিংহ পরগণার সহিত জরিপ হইয়াছে						৬	৩০০১।/৪	৫০৭-০-০৬
২৮	দেওঘর	২২	০	৩	০	০	০	১১৯৯	১৮৪৭২॥/১	৭১৩১৬৭-১-০৬
২৯	সাবেক মৌড়েশ্বর	২৩	০	০	০	০	০	২২৪	৫৩৫৮৭৶১	৪২২৬০-৩-২২
৩০	সাহালামপুর	৭১	৩	০	৩০	০	০	২৯১	৫৩৩৪২৵১	৫০৮২৪-৩-০৪
৩১	সাহ ইসলামপুর	খড়গ্রাম সহিত জরিপ হইয়াছে								
৩২	সাহাজাদপুর	৪	০	০	০	০	০	৮	৭০৪৪৶৩	৫৬১০-১-০৪
৩৩	সুপুর বা সেওপুর	২০	০	০	০	০	১	৪২	১৩৩৫৫।/১১	১২৬৪৩-১-১১
৩৪	সেরপুর	স্বরূপ সিংহের সহিত জরিপ হইয়াছে						১৫	৫৯২২৸/৯	২৭৮৮-২-০১
৩৫	স্বরূপসিংহ	৯৫	৬	০	০	০	০	২৭৩	৭৯০৯২।৵৬	৫৪৮৫১-২-২৪
৩৬	সেনভূম	৮৯	১	০	০	০	৬	১৮৩	৪২২১৩।৵৬	৪৮৭৮৮-১-২১
৩৭	আমডহরা	৮	০	০	০	০	০	৩৪	৪৯৬৫/৫	৩১৩৬-২-৩৩
৩৮	জয়নুজাল	৫৮	১	২	১	০	০	২০৯	৪৮৩৮৩।৬	৫১১৪৬-২-৩১

নবম অধ্যায়

সাঁওতাল বিদ্রোহ

পূর্ব্বানুবৃত্তি - সমগ্র জেলাব্যাপী জরিপকার্য্য সমাধা হইবার অল্পকাল পরই যাযাবর অসভ্য সাঁওতালজাতি সমগ্র বীরভূম মধ্যে যে প্রকার দারুণ অত্যাচার করিয়া দেশবাসীকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল তাহারই বিশদ বিবরণ এখন লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সাঁওতাল জাতি - সাঁওতাল জাতির উৎপত্তি বা তাহাদের আদি বাসস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নহে[১]। এই যাযাবর সাঁওতাল জাতির হাজারিবাগের উত্তর-পশ্চিমাংশে সাময়িকভাবে বাসস্থাপনের কথা অবগত হওয়া যায়। চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তদানীন্তন দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ তোগলকের সেনাপতি সৈয়দ ইব্রাহিম আলির এতদঞ্চলের সাঁওতাল রাজা বা প্রধানগণকে পরাস্ত করিবার কথা বর্ণিত আছে। অতঃপর তাহারা ছোটনাগপুর এবং ক্রমে ঝালদা ও পাতকুম এবং পরে পঞ্চকোট অঞ্চলে আসিয়া উপনীত হয়। এখান হইতে তাহারা সাওন্ত নামক স্থানে আগমন করে। প্রবাদ - এই 'সাওন্ত' নামক স্থানের অধিবাসী বলিয়া তাহারা "সাঁওতাল"-নামে পরিচিত হয়। তৎপূর্ব্বে তাহারা "হড়" (বা মানুষ) নামে পরিচিত ছিল। কালে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দক্ষিণ মানভূম ও দামোদর তীরবর্ত্তী হাজারিবাগ জেলায় আসিয়া বাস করিল ; কিন্তু অধিকাংশ সাঁওতালই উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিয়া এখনকার দিনে পরিচিত সাঁওতাল পরগণা ও তৎসংলগ্ন জেলায় বসতি স্থাপন করিল।

সাঁওতালগণের আগমনের পূর্ব্ব হইতেই এখনকার সাঁওতালপরগণা অঞ্চলে পাহাড়িয়া নামক এক বর্ব্বর জাতি পাহাড়ে পাহাড়ে দুর্গম বন জঙ্গলে মধ্যে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এই পাহাড়িয়াদিগের অধ্যুষিত অঞ্চলই সাঁওতাল পরগণার মধ্যে ৮৬০ বর্গ মাইল পরিমিত উচ্চভূমি ও ৫০০ বর্গমাইল পরিমিত নিম্নভূমি[২] বিশিষ্ট **দামন-ই-কো**[৩] বা (পাহাড়িয়া অঞ্চল) বা সংক্ষেপে **দামন্** নামে পরিচিত।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ সাদারল্যাণ্ড এই অঞ্চলের অধ্যুষিত জাতির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট প্রণয়ন করেন, তাহাতে স্বল্প সংখ্যক মাত্র সাঁওতাল থাকার কথা উল্লেখ আছে। ইহার ১০ বৎসর পরে মিঃ ওয়ার্ডের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে দামনের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বহু সাঁওতালের আবির্ভাব হইয়াছে।

ইহার চারি বৎসর পর, অর্থাৎ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল যে বহুসংখ্যক সাঁওতাল অপর জাতির পক্ষে নিষিদ্ধ দামন-সীমানার মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে। পাহাড়িয়া জাতিরা উচ্চ পাহাড়িয়া জঙ্গলে থাকিতে ভালবাসে। তাহারা উর্ব্বর নিম্নভূমিতে আসিয়া ভূমি কর্ষণের কষ্ট স্বীকার করিতে চাহে না। সাঁওতালগণকে পরিশ্রমী ও কৃষিকার্য্যে অনুরক্ত দেখিয়া ইংরাজ সরকার তাহাদিগকে দামন-অঞ্চলের নিম্নভূমিতে অবস্থান করিতে কোনরূপ আপত্য করিলেন না; পরন্তু ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে সাঁওতালদের বসতি স্থাপনের সুযোগ প্রদানের জন্য মিঃ পন্টেট (Mr. James Pontet) নামক একজন প্রবীণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে পরিদর্শক নিযুক্ত করিলেন। এইবার সাঁওতালগণের যাযাবর-বৃত্তির কতকপরিমাণে অবসান হইল[৪]। এখানে আসিয়া তাহারা নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিবার আশা করিয়াছিল। তাহাদের পরিবার বা সামাজিক জীবনের উপর অন্য কোন সুসভ্য জাতি অত্যাচার করিবে না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইল এবং মন প্রাণ দিয়া কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহারা কল্পনাও করিতে পারে না যে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের প্রতি কিরূপ অকথ্য অত্যাচারের নির্ম্মম হস্ত তাহাদের উপর প্রচণ্ড আঘাত করিবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে।

দামন-অঞ্চল মূলতঃ পাহাড়িয়া জাতির জন্য সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সাঁওতালগণ যদিও ইহার নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশলাভের অধিকার পাইয়াছিল, কিন্তু পাহাড়িয়াগণের মত অন্যান্য কোন বিষয়েই তুল্যরূপ বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই।

ইহার ফলে তাহারা নিতান্তই নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল। তখন সুযোগ বুঝিয়া ধূর্ত্ত মহাজনগণ ও অন্যান্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ তাহাদের প্রতি দারুণ অত্যাচার করিবার সুযোগ পাইল। ২০ বৎসরকাল দারুণ কষ্টে অতিবাহিত হইল, কিন্তু আর চলিল না। অত্যাচারের ফল ফলিল। এবম্বিধ দারুণ অত্যাচারের আশু ফলই - **১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ**।

সাঁওতাল ও মহাজন - দামনের সৃষ্টি হইতে ইহার জন্য পাহাড়িয়াদের সহিত কোনরূপ রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট ছিল না। সাঁওতালগণের আগমনের পর হইতে তাহাদের কর্ষিত ভূমির জন্য কোনরূপ পরিমাপাদি না করিয়াই কেবলমাত্র মৌজায় মৌজায় বিভক্ত করিয়া মিঃ পন্টেট (Mr. James Pontet) নামক একজন

ইংরাজ কর্ম্মচারী সাঁওতালগণের কর্ষিত জমির উপর ৮০,০০০্ টাকা খাজনা নির্দ্ধারিত করিলেন। সাঁওতালগণের অবস্থার উন্নতি দেখিয়া গোলদার, মহাজন ও জমিদারগণের লোলুপ দৃষ্টি তাহাদের উপর পতিত হইল। তাহারা তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া যেন কত কালের অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। সরল ও নির্ব্বোধ সাঁওতাল প্রথমে তাহাদের ধূর্ত্তমি বুঝিতে পারিল না। নিরক্ষর সাঁওতাল, হস্তাঙ্গুলের সংখ্যা ব্যতীত যাহাদের সংখ্যা বোধ নাই, ধূর্ত্ত মহাজনগণের হিসাব-নিকাশের চাতুরি কি করিয়া বুঝিবে? তাহারা সরল প্রাণে তাহাদের বিশ্বাস করিল ; কিন্তু গোলদার ও মহাজনগণের যত প্রকার অন্যায় অত্যাচার, জাল জুয়াচুরি প্রভৃতি কোন অপকর্ম্ম করিতে বাধিল না।

সাঁওতালগণের প্রতি অত্যাচারের মর্ম্মস্পর্শী পরিচয় - নিরীহ সরলপ্রকৃতির সাঁওতালগণের শক্তি-সামর্থ্যের তুলনা নাই। তাহারা পার্ব্বত্য ও জঙ্গলময় প্রদেশ কাটিয়া তাহাকে উর্ব্বরা ও শক্তিশালিনী করিয়া তুলিয়াছে - তাহাদের পরিশ্রমের ফলে এই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আশাতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং তাহারা স্বচ্ছন্দভাবে ভবিষ্যতের জন্যও কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে লাগিল। কিছু কিছু উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয় করিয়াও তাহারা ছেলেমেয়েদের জন্য কাঁসা-পিতলের গহনা ক্রয় করিল। গোহালে গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ সংগৃহীত হইল। সুতরাং, তাহাদের এতদঞ্চলের আগমনের প্রথম অংশে তাহারা বেশ সুখস্বচ্ছেন্দেই দিনাতিপাত করিতে লাগিল। কিন্তু অচিরেই সুখের সমুজ্জ্বল দিনে কৃষ্ণ মেঘ ঘনাইয়া আসিল।

হিন্দু বণিকগণ তাহাদের কষ্টোপার্জ্জিত শস্য ভুলাইয়া হস্তগত করিবার জন্য তাহাদের বাসস্থানের নিকটে নিকটে গুদাম বা আড়ত খুলিয়া বসিল। নানারূপ প্রলোভনেয় দ্রব্যে আড়ত পরিপূর্ণ করিল। সাঁওতালগণ তাহাদের কৃষিজাত দ্রব্য তাহাদের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিল। নিম্নশ্রেণীর বণিক্ এবং ভোজপুরিয়া গোলদারগণ প্রতারণা পূর্ব্বক তাহাদের কৃষিলব্ধ দ্রব্য হস্তগত করিতে লাগিল। শকটপূর্ণ শস্য ও কলসীপূর্ণ ঘৃতের পরিবর্ত্তে সাঁওতালরা অতি অল্পমূল্যের লবণ ইত্যাদি দ্রব্য পাইল। এক জোড়া বলদের পরিবর্ত্তে এক জোড়া কবুতর বা পায়রা পাইল। ছিদ্রতল পাত্রে ঘৃত মাপিয়া, গুরু ওজনের মন সেরে চাল ধান ওজন করিয়া, বণিকেরা প্রতারণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল।

এই মহাজনদের মত সাঁওতালদের কুটিল বুদ্ধি ছিল না। তাহারা শিশুর ন্যায় সরল ছিল। এই সরল-হৃদয় সাঁওতালগণ মহাজনদের নিষ্ঠুরতা বুঝিতে পারিত না। ফলতঃ ব্যবসায়ীরা এইরূপ কুকার্য্য করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ

না করিয়া নিষ্ঠুরতার মাত্রা দ্রুতগতি বাড়াইয়াই চলিল। এইরূপভাবে প্রতারণা করিয়াও তাহারা ক্ষান্ত হইলা না। অন্য উপায়ে সাঁওতালদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিবার চেষ্টা করিল। সরল প্রকৃতি সাঁওতালগণ এইরূপ প্রলোভনে পড়িয়া তাহাদের স্বোপার্জ্জিত সমস্ত দ্রব্যই হারাইয়া বসিল। শেষে, ব্যবসায়িগণ তাহাদের এমন দুরবস্থা করিল যে সাঁওতালদের ঋণগ্রহণ ভিন্ন অন্য উপায় রহিল না। তাহারা সাঁওতালদিগকে অত্যধিক সুদে টাকা ধার দিতে লাগিল, টাকার দরকার না থাকিলেও গায়ে পড়িয়া টাকা ধার দিত। নির্ব্বোধ সাঁওতাল তাহাই লইত। দশ টাকা ধার দিয়া মহাজন সুদ সমেত পনর বিশ টাকা লিখাইয়া লইত এবং টাকা গ্রহণকালে ঐ সুদসমেত টাকা আসল বা মূল ধরিয়া পুনশ্চ তাহার সুদ আদায় করিত। না দিলে সুদূরবর্ত্তী দেওঘর বা ভাগলপুরের আদালতের সাহায্যে পাকা ধান ক্রোক করিয়া আদায় করিত এবং টাকা লইবার সময় ভুল করিয়া বেশী গণিয়া লইতে কুণ্ঠাবোধ করিত না। আদালতের আমলা-পেয়াদের উৎপাতেও তাহারা বিশেষরূপ উৎপীড়িত হইত।

এই সরলপ্রাণ সাঁওতালগণ সময়ে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিত না বলিয়া উত্তমর্ণেরা তাহাদের উর্ব্বর ক্ষেত্র, গরু বাছুর, ছাগল ভেড়া, থালা বাটি সমস্তই আত্মসাৎ করিতে লাগিল। পুলিসের বেশ ধরিয়া ঘর বাড়ী তল্লাস করিয়া সমস্তই লইয়া যাইতে লাগিল। এমন কি তাহাদের পরিবারবর্গের দেহ হইতে কাঁসার গাত্রাভরণও খুলিতে আরম্ভ করিল। এই ঋণই সাঁওতালদের কাল হইল। কেননা, একবার মহাজনের কবলে পতিত হইলে পুরুষানুক্রমে তাহার ফলভোগ করিতে হইত - কোনরূপ মুক্তির সম্ভাবনা ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে একজন সাঁওতাল টাকা প্রতি ৵০ আনা সুদে ২৫৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। এই ঋণের মাত্রা অল্পকালের মধ্যে অত্যধিক স্ফীত হইয়া উঠিল। সে সমগ্র জীবন মহাজনের দাসত্ব করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে পারিল না- তাহার পুত্রও না - তাহার পৌত্রও না !

শান্তি ও প্রাচুর্য্যের পরিবর্ত্তে দুশ্চিন্তা ও নিরাশাই তাহাদের জীবনের চিরসঙ্গী হইল। তাহারা আর আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখিতে পাইল না! নিরাশ হৃদয়ে কতকগুলি সাঁওতাল ঘরবাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। আবার অনেকেই চির দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল।

অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াও তাহারা তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিল না ; বরং ঋণ আরও বাড়িয়া উঠিল। এইরূপ ভাবের ঋণ কি সহজে পরিশোধ হয় ? প্রভুর কাজ করিয়া অন্য কাজে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিলে, প্রভু সঙ্গে সঙ্গে তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আদালতের আশ্রয় লইত। কি করিবে -

মূর্খ, অজ্ঞ ও সরলপ্রকৃতি সাঁওতালগণ পুনরায় দাসত্ব-শৃঙ্খলে ধরা দিল।

সাঁওতালদের এইরূপ অসহনীয় কষ্টের কোনরূপ প্রতিবিধান হইল না। আদালতে হিন্দুদের সমর্থন হিন্দুরাই করিত। কে এই নীচ অসভ্য জাতিদের দয়া দেখাইবে - কে তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা করিবে ? তাহারা প্রত্যেকবার পরাজিত হইয়া ও তাহাদের পাথেয় যথাসর্ব্বস্ব আমলা-পেয়াদাদের দিয়া মলিন ও শুষ্ক মুখে বাড়ী ফিরিত। সাঁওতালদের মাথা রাখিবার তিলমাত্র স্থান রহিল না। মহাজনেরা তাহাদিগকে পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। মানুষেরই ত শরীর ! আর কত সহিবে বা সহিতে পারে! তাহাদের সরল প্রাণ বজ্রের মত কঠিন হইয়া উঠিল।

তাহারা প্রচার করিল যে ইংরাজ-রাজের বিরুদ্ধে তাহাদের কোনরূপ অভিযোগ নাই। তাহাদের যত অভিযোগ - হিন্দু মহাজন, জমিদার ও গোলদারগণের বিরুদ্ধে।

বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইবার অন্যান্য হেতু - যখন সাঁওতালগণ তাহাদের পাহাড় বেষ্টিত জঙ্গলময় ভূমির মধ্যে এইরূপ ভাবে নির্ম্মম মহাজন ও জমিদারগণের অকথ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল, তখনও তাহারা প্রতিকার প্রচেষ্টায় কোনরূপ পন্থা অবলম্বন করে নাই। কিন্তু অবশেষে নিম্নলিখিত কারণ সমবায়ে তাহাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল -

সাঁওতালগণ যখন দাসত্বের নিগড়ে ও ঋণের কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ - মুক্তির কোনরূপই আশার আলো তাহাদের নেত্রগোচর হইতেছে না, সেই সময় দামনের বাহির হইতে যে সংবাদ আসিল তাহাতেই তাহাদের অন্তর মধ্যে চির প্রধুমিত অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

দামনের অদূরবর্ত্তী অঞ্চল হইয়া ই, আই, আর, লুপ-লাইনের রাস্তার মাটির কাজ আরম্ভ হইল। প্রায় ২০০ মাইল ব্যাপিয়া রেল-লাইনের মাটির কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সাঁওতালেরা শুনিল যে কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কি শিশু, কি বৃদ্ধ সকলেই এই রাস্তার কাজে কোঁচড় ভরিয়া অল্পকাল মধ্যে টাকা লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। তাহারা পরিশ্রমে কাতর নহে। প্রচুর পরিশ্রম করিয়াও তাহারা তদনুপাতে অর্থ পাইলেই খুসী। এই নিমিত্ত এই "লোহার ঘোড়া চলিবার রাস্তা" নির্ম্মাণের কার্য্যই তাহাদের ঋণ পরিশোধের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়াই মনে করিল। অনেক সাঁওতাল, যাহারা ভাগ্যক্রমে নিগড়বদ্ধ হয় নাই, তাহারা প্রচুর পরিমাণে অর্থ লইয়া দেশে ফিরিল। তাহাদের স্ত্রীর গায়ে গহনা, আঁচলাদার লালপাড় তাঁতের নূতন শাড়ী - তাহাদের আনন্দ দেখে কে ? কিন্তু যে সকল সাঁওতাল ঋণদায়ে আত্মবিক্রয় করিয়াছে তাহাদিগকে মহাজন ছাড়িয়া দিবে কেন ? সুতরাং তাহাদের অর্থোপার্জ্জনের আশা বৃথা হইল।

এইরূপ "দাস সাঁওতালের" সংখ্যাই বেশী ছিল। অন্য সাঁওতাল রেলের কাজ চলিয়া গেলে দেশে মজুরের অভাব হইল ; সুতরাং মহাজনেরা তাহাদের এই কৃতদাস সাঁওতালগণকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিল না। এইরূপ বিষম সঙ্কটের সময় সাঁওতালগণের যুবক সম্প্রদায়ের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বৃদ্ধগণের নিশ্চষ্টতায় তাহারা আর সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তাহারা বুঝিল যে তাহাদের দুঃখ কষ্টের প্রতিকার তাহাদিগকে নিজে নিজেই করিতে হইবে - অপর কেহ করিবে না।

১৮৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দের সমগ্র শীতকাল ধরিয়া তাহাদের মনে বিদ্বেষভাব প্রধূমিত হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহা মহাজনদের অজ্ঞাতে অচিরেই বনে জঙ্গলে, সাঁওতাল পল্লীতে পল্লীতে বহু বিস্তৃত লাভ করিয়া কেবল মাত্র সামান্য স্ফুলিঙ্গ সংযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এই সময় "সংবাদ প্রভাকর" নামক স্বনামখ্যাত দৈনিক পত্রিকার ৫৩০০ সংখ্যায় ১২৬২ সাল মঙ্গলবার ১৬ই শ্রাবণ তারিখে প্রকাশিত হইল -

জিলা ভাগলপুর ও বীরভূমের অন্তঃপাতি পর্ব্বত সকলে সাঁওতাল নামে অগণ্য বন্যজাতি বাস করে, অতি অল্প দিবস হইল রাস্তাবন্দির সাহেবেরা রাজমহলের নিকট ঐ বন্যজাতিদিগের তিনজন স্ত্রীলোককে বলপূর্ব্বক অপহরণ করাতে তাহারা কতকগুলি লোক একত্র হইয়া উক্ত সাহেবদিগের প্রতি আক্রমণ করতঃ তিনজন সাহেবকে হত্যা করিয়া স্ত্রীগণকে উদ্ধার করে। অন্য অন্য স্থানের রাস্তাবন্দির সাহেবরা ইহাতে ভীত হইয়া স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করেন। এমত জনশ্রুতি যে ঐ সাঁওতালদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি নারকেলবেড়ের সরার অধ্যক্ষ তিতুমিয়ার ন্যায় বুজরুক হইয়া আপন শিষ্যদিগের প্রতি আদেশ করে যে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে আমারদিগের রাজ্য হইবেক। অতএব তোমরা সাহস পূর্ব্বক অস্ত্রধারণ করিয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। কর্ত্তার এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া সাঁওতালেরা নাগরার দ্বারা পর্ব্বতস্থ সমস্ত জাতিদিগের মধ্যে এই আদেশ প্রচার করিবাতে তাহারা ক্রমে ২০/২৫ হাজার লোক দলবদ্ধ হইয়া জিলা বীরভূম আক্রমণ করিবার মানসে আগমন করিতেছে ইত্যাদি। (সিউড়ী রতন-লাইব্রেরীতে রক্ষিত 'সংবাদ প্রভাকরের' ফাইল)

সাঁওতালগণ তাহাদের জাতিগত প্রকৃতি বশতঃ স্ত্রীহরণ ব্যাপারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তাহাদের পূর্ব্ব-নিবাস হাজারিবাগ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া এ-দেশে আগমন করিবার ইহাই অন্যতম হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এখন তাহারা তাহাদের প্রতি যাবতীয় অত্যাচারের প্রতিকারকল্পে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া এতদুদ্দেশে তাহাদের কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিবার জন্য একস্থানে সমবেত হইবার ব্যবস্থা করিল।

তাহাদের এই মানসিক প্রবল উত্তেজনার সময় তাহাদের মধ্যে জনরব হইল যে তাহাদের দেবতা "মারাং বুরু" তাহাদের মধ্যে আগমন করিয়াছে এবং

তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। পূর্ব্বে সাঁওতালেরা অদৃশ্য দেবতার কখন দর্শন লাভের কল্পনাও করে নাই। এখন তাহাদের এই নিতান্ত দুঃসময়ে মারাং বুরুর আবির্ভাবের সংবাদ পাইয়া তাহারা উল্লসিত হইয়া উঠিল। তাহারা সংবাদ পাইল যে ভগ্নাডিহির চুণার নামক সাঁওতালের সিধু, কাহ্নু, চাঁদ এবং ভৈরব (বৈরাত) - এই চারিজন পুত্রের মধ্যে প্রথম দুইজনের নিকট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে মারাং বুরুর আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথমে - মেঘরূপে, তাহার পর অগ্নিরূপে, তাহার পর কুয়াসায় বদনাচ্ছন্ন টোপরবিশিষ্ট মানুষরূপে, প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ মধ্যে ছায়ারূপে, পরে ভূগর্ভোত্থ পর্ব্বতরূপে, পরে শালবৃক্ষরূপে এবং সর্ব্বশেষে সাঁওতালদের মত ক্ষুদ্র ধটি পরিহিত সাঁওতালরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই শেষ আবির্ভাবের সময় দেবতা তাহাদিগকে একখানি পবিত্র গ্রন্থ দিয়াছেন যাহার পত্রে কোনরূপ লিপিচিহ্ন নাই এবং তিনি আদেশ দিয়াছেন যে এই অলিখিত পত্রগুলি সমগ্র সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রচারিত করিয়া দাও এবং বলিয়া দাও যে সকলেই আশু বিপর্য্যয়ের জন্য প্রস্তুত হও, যে বিপর্য্যয়ের ফলে তাহাদের সমস্ত অভাব-অভিযোগের প্রতিকার হইবে এবং তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। গ্রামে গ্রামে এই পত্র বিলি হইবামাত্রই দেশের সমগ্র সাঁওতাল জাতি একলক্ষ্য হইয়া একস্থানে অচিরেই সমবেত হইতে লাগিল।

শালবৃক্ষের পল্লব লইয়া গ্রামে গ্রামে দূত প্রেরিত হইল। সাঁওতালগণকে আর কোন প্রকার বাক্য দ্বারা উত্তেজিত করিবার আবশ্যক হইল না। শালপত্রের নিঃশব্দ আহ্বানই তাহাদের সমবেত হইতে উদ্বুদ্ধ করিল।

সাঁওতালগণের সম্মেলন - রাজমহলের অন্তর্গত লুপ লাইনের বারহারওয়া স্টেশনের ১২ মাইল পশ্চিমস্থ বারহেট বাজার সমগ্র দামনের মধ্যে বৃহৎ ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামের অদূরবর্ত্তী ভগ্নাডিহি নামক গ্রামে সিধু, কাহ্নুর নিকট, দামন ও চতুর্দ্দিকস্থ দূর ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে অসংখ্য সাঁওতাল প্রবল বন্যাস্রোতের ন্যায় সমবেত হইল। সমবেত সাঁওতালগণের অনেকেই প্রথমতঃ জানিতে বা বুঝিতে পারে নাই যে তাহারা কিজন্য সমবেত হইয়াছে - সুভবাবুর (সিধু কাহ্নু) আহ্বানে আসিতে হয়, তাই আসিয়াছে। এখানে সমবেত হইয়া তাহারা তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার ও মহাজনগণের অত্যাচারের কথা আলোচনা করিয়া দৃঢ়তরভাবে স্থির করিল যে আর নয় - সমগ্র মহাজন ও তাহার অনুচর এবং সহচরগণকে একেবারে নির্ম্মূল করিতে হইবে। বলিষ্ঠ যুবক সম্প্রদায় উচ্চকন্ঠে বলিল - এই দীর্ঘদিন ধরিয়া জমিদার, মহাজন, পুলিস প্রভৃতি যাহারাই তাহাদের নির্য্যাতনে সহায়তা করিয়াছে তাহাদের সকলেরই জীবন নাশ কর। বৃটিশরাজ বা তাহাদের কর্ম্মচারীদের প্রতি তাহাদের কোনরূপ আক্রোশ নাই। এখানে তাহাদের প্রতিকারের

কোন উপায় হইতেছে না, সুতরাং তাহারা সমবেতভাবে কলিকাতায় গিয়া উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহাদের প্রতিকার প্রার্থনা করিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রথমে সমবেত সাঁওতালগণের কোনরূপ অত্যাচার বা বিদ্রোহাচরণ করিবার অভিপ্রায় ছিল না।

সিধু, কাহ্নু স্বজাতীয়বর্গকে সমবেত করিয়া লাটসাহেবের নিকট এবং বীরভূম ও ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন-পত্র প্রেরণ করিল। আবেদনের মর্ম্ম এইরূপ ছিল - সূদের নূতন ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সাঁওতাল প্রদেশস্থ অত্যাচারী মহাজনদিগকে নির্ম্মূল করিতে হইবে। আবেদনপত্রে আরও লিখিয়া দিল যে তাহারা আর অপেক্ষা করিবে না।

ইংরাজরাজ ইহাদের এইরূপ ব্যাপারের কথা কিছুই অবগত ছিলেন না বলিয়া তাহাদের আবেদন-পত্র বিফল হইল। পুনঃ পুনঃ আবেদনের ফলে কিছুই প্রতিকার হইল না দেখিয়া তাহারা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিল। সমবেত সাঁওতালগণ সকলেই অশিক্ষিত, কোনরূপ শৃঙ্খলা জানে না। সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইলে কি প্রণালীতে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হয় তাহারও কোন জ্ঞান নাই। এতগুলি সাঁওতালের দীর্ঘদিন একত্র বসিয়া জল্পনা-কল্পনা করিতে গেলে তাহাদের আহার্য্য সংগ্রহেরই বা কি প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহারও কোন ব্যবস্থা নাই। অথচ অন্ধবিশ্বাসী সাঁওতালগণ সকলেই পরম উত্তেজনায় উত্তেজিত রহিয়াছে। দুই একদিনের মত নিজ নিজ খাবার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে ; সঙ্গে তীর, ধনুক, টাঙ্গি, বর্শা প্রভৃতি মাত্র সম্বল। দুইচারিদিন গত হইলে তাহারা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িল এবং তাহারা লুটপাট করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। ইহার অনিবার্য্য ফল - নরহত্যা। উন্মত্ত সাঁওতালগণ যেন এইরূপ লুণ্ঠনে নরশোনিতের আস্বাদ পাইয়া নররক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা তাহাদের সমবেত হইবার স্থান পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে দলে দলে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল।

প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্তের সূচনা হইয়াছে, অথচ তাহার গতিরোধের কোন আশু সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩০এ জুন তারিখে নেতৃদ্বয় সাঁওতালবাহিনীকে কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদান করিল। শুধু নেতৃদ্বয়ের শরীর রক্ষার জন্য ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার সাঁওতাল ছিল, সুতরাং ঐ প্রকাণ্ড দলে কত সংখ্যক সাঁওতাল ছিল তাহার ধারণা করা কঠিন হইবে না। সাঁওতালগণের প্রত্যেকের আহার্য্য ফুরাইয়া গেলে তাহারা ক্ষুধার তাড়নায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারা বনের গাছের পাতা খাইতে লাগিল। বর্ব্বর অসভ্য জাতি ক্ষুধিত হইলে যেরূপ অন্যায় অত্যাচার করে, ইহারাও তদ্রূপ করিতে লাগিল।

কিন্তু নেতৃদ্বয়ের এইভাবে লুন্ঠন ইত্যাদি অত্যাচার করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তাহারা স্থির করিয়াছিল যে, ধনবান ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে আহার্য্য সংগৃহীত করিবে; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সাঁওতালগণের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

ঐ বৎসরেরই ৭ই জুলাই বারার (বর্ত্তমান লুপ-লাইনের পিরপৈঁতি স্টেশনের ছয় মাইল দক্ষিণে) নিকট মহেশপুরের দারোগাসাহেব মহেশলাল (লালা কায়স্থ) শুনিলেন যে বহু সংখ্যক সাঁওতাল তীর ধনুক লইয়া তাহার সীমানার দিকে আসিতেছে। হিন্দু মহাজনেরা দারোগা সাহেবকে উৎকোচ দিয়া বলিল যে, তাহাদিগকে ধরিয়া যেন চুরির অপরাধে জেলে দেওয়া হয়। লোভে পড়িয়া দারোগা সাহেব সাঁওতাল ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। দারোগা সাহেব আসিলে সিধু, কাহ্নু নেতৃদ্বয় বলিল যে তাহাদের লোকজনের খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে। দয়া করিয়া তুমি প্রত্যেক ধনবান লোকের নিকট হইতে কিছু কিছু চাঁদা তুলিয়া তাহাদের সাহায্য কর। কিন্তু হঠাৎ নেতৃদ্বয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল যে দারোগা সাহেব অন্যায়ভাবে তাহাদিগকে চুরির অপবাদ দিয়া ধরিতে আসিয়াছে। দারোগা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ঐ কথা একেবারেই অস্বীকার করিয়া বলিলেন আমি অন্য কাজে যাইতেছি। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি সমস্তই স্বীকার করিয়া ফেলেন যে হিন্দু মহাজনেরা তাহাকে উৎকোচ দিয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। নেতৃদ্বয় ধীর ও শান্তভাবে বলিল - যদি আমাদের কোনরূপ চুরির প্রমাণ পাও ত ধর। দারোগা সাহেব বুঝিলেন না যে সেই মুহূর্ত্তে তাহার কি দশা হইবে। তিনি তাহার মুষ্টিমেয় অনুচরবর্গকে ঐ বিশাল সাঁওতালবাহিণী আক্রমণ করিবার আদেশ দিলেন। যে মুহূর্ত্তে দারোগা সাহেবের মুখ হইতে এই আদেশবাণী বাহির হইল, তন্মুহূর্ত্তেই সিধু নিজ হস্তধৃত বলুয়া অস্ত্রদ্বারা দারোগা সাহেবের মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিল। এই আঘাতেই দারোগা সাহেবকে পাঁচ-কেঠের রাখশী-থানের বটবৃক্ষ তলায় (আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি এই বৃক্ষটি এখনও বর্ত্তমান আছে) সূর্য্যের উদ্দেশে বলিদান দিল এবং অপরাপর সাঁওতালদের হাতে পুলিসের নয় জন লোকও প্রাণ হারাইল।

ইন্‌সপেক্টর হত্যার পর, সাঁওতালগণ দলে দলে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। ইহাদের মধ্যে এক দলের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত মিঃ পন্টেট সাহেবের সাক্ষাৎ হইল। মিঃ পন্টেটকে সাঁওতালেরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত; সুতরাং তাঁহার প্রতি তাহারা কোনরূপ অত্যাচার করিল না। পরন্তু তাঁহাকে পাহাড়ের মধ্যে এক নিরাপদ স্থানে বিদ্রোহের অবসান কাল পর্য্যন্ত লুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিল। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে তাহাদের প্রথমে কোনরূপ দুষ্ট অভিপ্রায় ছিল না।

সাঁওতালগণের অত্যাচার-প্রত্যক্ষদর্শীর কথা* (১) - "এক পক্ষকাল কোনরূপ বাধা-বিপত্তি না পাইয়া মাঝিরা পথে লুট-পাট, খুন-জখম করিয়া সিমড়ার নিকট রাঙামেটেয়ার পাহাড়ের তলদেশস্থ উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া জমা হইল। তাহার পর তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইল - চতুর্দ্দিকস্থ লোকের ঘর-বাড়ী লুটপাট করিতে লাগিল। তাহারা এই স্থান হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী গোড্ডা মহকুমার অন্তর্গত মাহাগামার রাজবাটি লুট করে। পরে লাহাটি গ্রামের (পিরপৈঁতি স্টেশনের ২৪ মাইল দক্ষিণে) এবং নিকটস্থ মহাদেববাথান গ্রামের করম গাছ (গ্রামের বাহিরে রাস্তার ধারে গাছটি এখনও বর্ত্তমান থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছি, তবে ইহার ভিতর অংশ ফাঁকা হইয়া গিয়াছে) তলায় আসিয়া সমবেত হয়। পরে এখান হইতে দুই মাইল মধ্যে তাহারা গামরিয়া গ্রাম লুট করে। তৎপরে তাহারা চারিমাইল দূরবর্ত্তী বারকূপ গ্রাম লুট করিতে যায়। এই স্থানের সাঁওতালেরা গর্ভিনী স্ত্রীলোকেদের উদর চিরিয়া তন্মধ্যস্থিত শিশু সন্তান বাহির করিয়া হত্যা করে। এইখানে দারোগা সাহেবরা আসিলে সিধু, কানু তাঁহাদিগকে এবং সাঁওতালদিগকে তাহাদের নিকট আসিতে বলে। সাঁওতালেরা আপন ভাষায় কথা কহিতে থাকিলে, দারোগা সাহেবেরা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। এদিকে সিধু হুকুম দিল যে তাঁহাদিগকে ধরিয়া যেন অবিলম্বে কাটিয়া ফেলা হয়। তখন বেলা অবসান - সকলে "দারোগাটিকে ত নিলাম - এবার ঐ দারোগার গাঁকে লুট করিব" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা চীৎকার করিতে করিতে বারার নিকট পয়লাপুরে আসিল। ইহার পর তাহারা পাথরগাঁওয়া লুট করিতে যায়। এদিকে সিধু, কান্হু স্বগ্রাম ভগ্নাডিহিতে ফিরিয়া আইসে। পাথরগাঁওয়ার ধামসাই থানার (এখন থানা নাই) দারোগা সাহেব তাহাদের নিকট আসিলে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া কাটিয়া ফেলে (এই স্থানে লীলানাথ মহাদেব বর্ত্তমান)। ইহার পর, তাহারা সুন্দরা নদীর তীরবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত পালারপুরে ফিরিয়া আইসে। ইতিমধ্যে ভাগলপুর হইতে পিরপৈঁতি হইয়া এক সহস্র সৈন্যের এক পল্টন আইসে। পয়লাপুরে লড়াই হয়। বন্দুকে ভালরূপ আওয়াজ হইল না। ইহাতে তাহাদের সাহস আরও বাড়িয়া গেল।

---

* যাবতীয় সাঁওতাল বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে ইংরেজরাজ পাহাড়িয়াগণকে যুদ্ধকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য Captain Fagan এর অধীনে ভাগলপুর Hill Rangers নামে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী গঠিত করেন। গোড্ডা সাবডিভিসনের কুসুমঘাটি নিবাসী চাঁদপাহাড়িয়া ইংরাজের পক্ষে এই বাহিনীতে সৈনিকের ও গুদাম-প্রহরীর কার্য্য করিয়াছিল। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে, সেই ৭০ বৎসর বয়স্ক চাঁদ পাহাড়িয়া পরম উৎসাহের সহিত মদীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নিকট এই বিদ্রোহের কথা যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছিল, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলিয়াই তাহাই যথাযথ ভাবে এইস্থানে লিপিবদ্ধ করা হইল - গ্রন্থকার।

পূর্ব্বেকার বন্দুক এখনকার মত ছিল না। বারুদ জলে ভিজিয়া গিয়াছিল বলিয়া বন্দুকের ভালরূপ কাজ হয় নাই। এই জন্য সাঁওতালেরা অনেক সিপাহী মারিবার সুবিধা পাইয়াছিল। একজন সাহেব আহত হইয়া ভাগলপুর পলাইয়া গেলে, তাহাদের সাহস আরও বাড়িয়া উঠে এবং উন্মত্ত হইয়া তাহারা মহাদেববাথানে আইসে।

সাঁওতালেরা পল্টন দেখিয়া সুন্দরা নদী পার হইয়াই লাহাটি গ্রামে আসিল। পল্টন বেলা ১১টার সময় এই গ্রামের ধারে সুন্দরা নদীর উত্তর তীরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং করমগাছ সন্নিহিত উত্তর পশ্চিম প্রান্তরে তাঁবু ফেলে। সাঁওতালেরা নদীর অপর তীরে বসিয়া পল্টনের কার্য্যকলাপ দেখিতে থাকে। আমি (চাঁদ পাহাড়িয়া) ক্যাপটেন কোপি (Captain Copy) সাহেবের আদেশে অপর তীরে দাঁড়াইয়া চীৎকার পূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম - "কেন তুই লড়ছে ? কেন তুই হুলমাল (হাঙ্গামা) করছে ? আপনার বুতুরু বাতরা (ছেলেমেয়ে) নিয়ে ঘরে থাক।" কিন্তু তাহারা এই চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া কেবল তরবারি ঘুরাইয়া দেখাইয়াছিল। ইহার পর সাহেব সিপাহীদিগকে রসি দুই পশ্চিমে ভাগার ডাঙ্গায় লইয়া যায়। তখন বেলা দুইটা। সাঁওতালেরাও নদীর তীরে তীরে পল্টনের সঙ্গে গিয়াছিল। সাঁওতালদিগকে আবার বোঝান হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা শুনে নাই; বরং বলিয়াছিল - "পুড়খানা (সাদা, সাহেবদের শ্বেতবর্ণ উদ্দেশ করিয়া) সব কাট।" সাঁওতাল সর্দ্দার একহস্তে ঢাল লইয়া ও অপর হস্তে তরবারি ঘুরাইয়া অপর সাঁওতালদের সহিত সমস্বরে বলিয়াছিল "পুড়খানাকে সব কাটব নদীর গর্ত্তে।"

এই কথা শুনিয়া সাহেব গুলি চালাইতে আদেশ দেন। ইহাতে ১৬/১৭ জন সাঁওতালের প্রাণ বিনাশ হয়। সাঁওতালেরা "সাতরা", "নাগরা" বাজাইতে বাজাইতে ৪ মাইল দক্ষিণে চূণাখালিতে পলাইয়া যায়। তৎপরে পল্টন পালারপুরের তাঁবুতে ফিরিয়া আইসে।

ইতিমধ্যে সাঁওতালেরা চূণাখানিতে লুটপাট করিয়া পাথরুলের রাজার ১০টি হাতী লইয়া গিয়া বাঁধিয়া রাখে। পালারপুরে ২ দিন অবস্থান করিলে পর পল্টন তৃতীয় দিবসে এক গোয়ালার নিকট চূণাখানির লুটের সংবাদ পাইয়া বেলা ১২টার সময় সকলেই সেই দিকে অগ্রসর হয় এবং নিকটস্থ পাহাড়ের নিকট বন্দুকে বারুদ পুরিয়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমি (চাঁদসিপাহী) তাহাদিগকে অনেক প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুই হয় নাই। তখন ক্যাপ্টেনের আদেশমত তাহাদের উপর গুলি নিক্ষেপ করা হয়। তাহাতে প্রায় দেড় সহস্র সাঁওতাল মারা পড়ে। বেলা তিনটা পর্য্যন্ত এইরূপ ভীষণ কাণ্ড চলিয়াছিল। পরে

অবশিষ্ট সাঁওতালেরা প্রাণভয়ে এই স্থানের ১৬ মাইল পশ্চিমে সংগ্রামপুরে আসিয়া উপস্থিত হয়। সিপাহীরা চূণাখালির উত্তরে পাঁচগাছিতে ফিরিয়া আইসে। সংগ্রামপুরে সাঁওতালদের অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় সিপাহীরা সেখানে গিয়া, তীর-ধনুকধারী সাঁওতালদিগকে গোলাকার ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখে। ক্যাপ্টেন যখন দেখিলেন যে, সাঁওতালেরা কিছুই বুঝিতেছে না, তখন তিনি তাহাদের উপর গুলি চালাইতে আদেশ দেন। এই স্থানে বহু সংখ্যক সাঁওতালের মৃত্যু হয়। মাত্র ৪০/৫০ জন জীবিত সাঁওতাল প্রাণভয়ে অন্যত্র পলাইয়া গিয়াছিল। চূণাখালির ব্যাপারের তিনদিন পরে সংগ্রামপুরের এই ভীষণ যুদ্ধ হয়। এইস্থলে পল্টন তিনদিন অবস্থানের পর ক্যাপ্টেনের আদেশমত ভাগলপুরে ফিরিয়া যায়।"

প্রত্যক্ষদর্শীর কথা* (২) - "সিধু, কানু, ভৈরব ও চাঁদ - ইহাদের ছেলেপিলে এখনও আছে। আর ভাইদের একজন এখনও বর্ত্তমান। জাতি মুর্ম্মু ঠাকুর (রাজা গোষ্ঠী)। সাঁওতালেরা আনাগোনা করে ও খবর পাঠায় এবং বলে [illegible] /০ আনা করিয়া লইয়া জমি বন্দোবস্ত করিব। পরগণাইতকে ৪/৫ বার চিঠি লিখিয়াছিলাম, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। শেষে লিখিল যে আমার নিকট কাঁড, ধনুক ও হাতিয়ার লইয়া উপস্থিত হও!

মহেশপুরের দারোগা পাঁচকেঠেয় আসিয়াছিল। সাঁওতালেরা শুনিল যে দারোগা ও ভাল ভাল মহাজনেরা আসিয়াছে। উহারা ঠাকুর পূজা করিতে লাগিল এবং সিধু সকল সাঁওতালদিগকে ও দারোগাদিগকে নিকটে আসিতে বলিল। সকলে আসিল। এখানে সাঁওতালেরা নিজ ভাষায় কথা কহিতে লাগিল। অগত্যাই দারোগা কিছুই বুঝিতে পারিল না। এদিকে সিধু হুকুম দিল যে উহাদিগকে ঘিরিয়া কাটিয়া ফেল। তখন বৈকাল বেলা। পরে বলিল যে দারোগাটিকে ত নিলাম, এবার ঐ দারোগার গাঁকে লুট করিব। এই বলিয়া তাহারা বারার নিকট পঁয়লাপুরে আসিল। বর্ষার জন্য সিপাহীদের বন্দুকের ভাল কাজ হইল না বলিয়া সাঁওতালেরা অনেক সিপাহী মারিয়াছিল। ইহাতে সাঁওতালেরা অত্যন্ত সাহসী হইল এবং উন্মত্ত হইয়া মহাদেব বাথানে আসিয়া সমবেত হইল। বৈদ্যনাথপুরের নিকট টেঙ্গরের ক্ষেতরী বাবু ঘাটোয়ালকে কাটিল।

সিধু, কানু মালখান পরগণাইতকে পরওয়ানা দিল - "পরগণাৎ বারে

---

* গোড্ডা মহকুমার অন্তর্গত লাহাটি গ্রামের ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ নবীন চন্দ্র দাস মহাশয় প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মদীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়কে সাঁওতাল বিদ্রোহের চাক্ষুস ঘটনার কথা যেভাবে বর্ণনা করেন, তাহাই এইস্থলে প্রদত্ত হইল - গ্রন্থকার।

বারে তোমাকে যে হুকুম দিয়াছি সে সমস্ত শেষ করিয়া অবিলম্বে হাজির হও। তুমি কিছুতেই শুনিতেছ না কেন ? আমি অগ্রে গিয়া তোমাকে কাটিব, পরে অন্য কথা।" আমি (নবীন দাস) নিজে কেড়তে এই পরওয়ানা প্রথমে পাঠ করিয়া পরগণাইতকে শুনাইয়াছিলাম। আমার বাবা পরগণাইতকে যাইতে উপদেশ দিলেন। পরগণাইত নিজে না গিয়া নিজের ভাই ও অন্যান্য প্রজাদিগকে সুভবাবুর (সিধু, কানু) নিকট পাঠাইয়া দিল।

পাঁচকেঠের পলায়িত লোক আসিলে আমরাও দুইক্রোশ পশ্চিমে বিসনপুরে ৫ দিন থাকিলাম।

সাঁওতালেরা পরে পাথরগাওয়ায় যায়। বাবা বারণ করা সত্ত্বেও আমি বিসনপুর হইতে কেড় দেখিতে আসিলাম যে তথায় কি হইয়াছে। আসিয়া দেখিলাম যে পরগণাইত আছে। পরগণাইত আমাকে আসার জন্য ভৎর্সনা করিতে লাগিল এবং বলিল যে সে নিজেও এখন নিরাপদ নহে। আমি বলিলাম - তবে দাদা, আমি কি উপায় করি ? এদিকে সাঁওতালেরা বানের মত ছুটিয়া চলিতেছে। তখন পরগণাইত আপনার ভাগিনেয়কে, সাঁওতালেরা চলিয়া গেলে, ধীরে ধীরে পার করিয়া দিতে বলিল (ঐ ব্যক্তি এখনও জীবিত)। ফারাকে ফারাকে গ্রামের বাহিরে আমাকে পার করিয়া দিল। বলিয়া দিল যে হাকিম আসিলে পর আসিবে। আর আসিও না।

আমরা পাঞ্জয়ারার নিকট একটি গ্রামে আসিয়া শ্বশুরবাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। কারণ এদিকে শুনিলাম যে পূর্ব্ব ভাগলপুরের পল্টনে হইবে না - পশ্চিম হইতে পল্টন আসিলে পর সাঁওতালদের সহিত লড়াই হইবে। এদিকে গোড্ডার নিকট সাহেবগঞ্জে সাঁওতালেরা জমা হইল। এইখানে পাঁজয়ারার রাজার সিপাহীর সহিত লড়াই হইল। হাতী প্রভৃতি পলাইয়া গেল। কিন্তু শেষে রাজা মারা পড়িল। সাঁওতালদের সহিত আঁটিতে পারিল না। বাকী সিপাহী পলাইয়া গেল।

পরে, আমরা আমাদের আদি বাসস্থান সারেট সারজল পার হইয়া ভাগবান্দে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পরে জামতাড়ার নিকট বেউঢ়া গ্রামে পল্টনের সহিত লড়াই হইল। ভয়ে জামতাড়ার রাজা প্রভৃতি সকলে পলাইয়া গিয়াছিল। সাঁওতালেরা বড়াকর পার হয় নাই বলিয়া পাড়ুরার রাজা পলাইয়া যায় নাই। করোর (কর্ণপুর) বর্গী রাজা পলাইয়া গিয়াছিল। এখানে লড়াই হইয়াছিল। সাপচালায় যত মুলুকের সাঁওতাল জড় হইয়াছিল। এই লড়াই বড় জবর লড়াই। অত বড় পাহাড়কে হাতাহাতি পল্টনেরা ঘিরিয়াছিল। সাঁওতালদের মেয়েদিকে ছাড়িয়া দিয়াছিল - ছেলেদিগকে রেহাই দেয় নাই।

কানু সাপচালায় ধরা পড়ে। সিধু পূর্ব্বেই ধরা পড়িয়াছিল" - ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষদর্শীর কথা* (৩-৫) - এক বৃদ্ধ সাঁওতাল বলিয়াছিল - "হুলমালের কারণ ইয়াদ নাই। সিধু কানু ভগ্নাডিহি গ্রামে জন্মাইয়াছিল। ইহারা সুভা ঠাকুর হইল। কারণ রাতেই লোক বড়, রাতেই লোক ছোট হয়। সেইজন্য সিধু কানু দেবতা। যথা - কেউ হাকিম, কেউ কোট বাবু - যদিও সেই একই লোক। আমাদের ২ গাড়ী চাউল ও ৩/৪ কুড়ি মহিষ ও গরু কোন দিকে কি হইয়া গিয়াছিল। আমার বয়স তখন ১৪/১৫ বছর।"

(৪) বনয়ারী সাঁও বলিয়াছিল - "ব্রাহ্মণ সূর্য্যের পাঠা ; আর সূর্য্য সাঁওতালদের উপাস্য দেবতা। ডোম, কুলু, নাপিত, কামার, গোয়ালা, কাহাল ইত্যাদিকে সাঁওতালেরা রেহাই দিত, কাটিত না। কারণ ইহাদের দ্বারা সাঁওতালদের উপকার হইত। সাঁওতালেরা বলিত - বন্দুকের ধূমাকে জল করিয়া দিব। জমি বাড়ুক তবে জমা বাড়িবে, বাপ দাদা বন কাটিয়া জমি তৈয়ারি করিয়াছে ইত্যাদি। তাহারা মহাজনদিগকে পায়ে হইতে কাটিতে কাটিতে বলিত যে এই জাড়ুই, রোদাড়ী ইত্যাদি নেই। দেশে এক বৎসর ধরিয়া মানুষ্য ছিল না - দেশ জঙ্গলময় হইয়া গিয়াছিল। তখন রেল হয় নাই, পরেই রেলের সুরু হয়।

পাঁচকাঠিয়ার মহেশলাল দারগা হাঙ্গামা থামাইতে চেষ্টা করে। বলে তোরা হাকিম। তোদের বাসনা পূর্ণ করিব ; কিন্তু তারা বলে তা নয়, রাজ্য দাও। কিন্তু দারগা বলে - আমি তোদের জন্য হাকিমের নিকট লড়িব, কিন্তু কি হয় বলিতে পারি না। সাঁওতালেরা ইহা শুনিল না - তাহাকে রাখশী-থানে বলি দিল।

লীলাতড়ের সাঁওতালেরা মহাজনীর জন্য তিলিদের বিরুদ্ধে সুভাবাবুর নিকট (সিধু কানু) নালিশ করে। ধনী মাঝি সুভবাবুকে বুঝাইয়া বলিবে বলিয়া সাহস দিয়াছিল। মহাজন ধনী মাঝির সহিত গেল। সুভা স্নান করিয়া কাছারী করিল। ধনী মাঝি ও ডেহুয়ার দেশমাঝি মহাজনকে মাঝে করিয়া সুভার নিকট উপস্থিত হইল। সুভ উক্ত মহাজনকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। মহাজন বলিল যে হুজুর খাতক যাহা বলিবে তাই আমার মঞ্জুর, কারণ আমার কথা আপনি বিশ্বাস করিবেন না। সাঁওতালেরা বলিল যে আমরা ইচ্ছায় দিয়াছি জোর করিয়া লয় নাই। এইজন্য সুভা বিচার করিয়া তাহাকে ছুটি দিলেন এবং তাহাকে চাউল, ডাল, বাসন ইত্যাদি দিয়াছিলেন। তখন আষাঢ় মাস। ডাকেতা হইতেই লুটপাট আরম্ভ। পরে লহড়িয়া বাজার, মহাগামা, পাথরগাওয়া, বারকুপ এবং শেষে চতুর্দ্দিকে

---

* প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে লাহাটি নিবাসী বৃদ্ধ বনয়ারী সাঁও ও নয়ান দাস এবং ডেও গ্রামের ৬০ বৎসরের জনৈক সাঁওতালের নিকট তাহাদের চাক্ষুষ ঘটনার কথা শুনিয়া, মদীয় পিতৃদেব যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাও এই স্থলে প্রদত্ত হইল - গ্রন্থকার।

লুটপাট আরম্ভ হয়। পরে দেশমাঝি পরগণাইত, সর্দ্দার ইত্যাদি হাকিমকে খবর দিল।

পালারপুরের উত্তরে মহাদেববাথানে সিপাহীরা তাবু খাটাইল। ভাগার মাঠে লড়াই হইল। পশ্চিমে সাহেব, পূর্ব্বে সাঁওতাল। সাহেব বলিল - আমাদের সহিত পারিবি না, ঘর যাও। সাঁওতালেরা বলিল আমরা পারিব - আমরাই রাজা। ইহার পরই যুদ্ধ হইল। ইহাতে বহু সাঁওতাল নিহত হয় ও অনেকে বনে জঙ্গলে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করে। অনেক সাঁওতাল সারেট বামন-গাওয়ায় আসিল। এখানেও লড়াই হইলে অনেক সাঁওতাল মরিল। ইহার পর বাঁশকুলী ইত্যাদি লুঠ করিয়া তাহারা গোরতপুর পাহাড়ে বা সাপচালা পাহাড়ে ছেলেমেয়ে লইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। পরে ইহাদের গতি জানিতে পারিয়া 7 Camp পল্টন ইহাদিগকে তিন দিক দিয়া আক্রমণ করিল। অনেক সাঁওতাল পলাইয়া গেল, কতকগুলি লড়াই করিয়া প্রাণ হারাইল।"

(৫) নয়ান দাস স্বচক্ষে সাত গাড়ী সাঁওতালদের মুণ্ড লইয়া যাইতে দেখিয়াছিল। সাঁওতালেরা মহাজনদের এক একটি করিয়া আঙ্গুল কাটিয়া বলিত যে এম্‌নি করিয়া টাকা বাজাস্‌। পরে গলা কাটিয়া ফেলিত। দাড়ীওয়ালা লোককে ভাল পাঁঠা বলিয়া কাটিয়া দেবতাকে মুণ্ড উপহার দিত। হাঙ্গামার শেষে সাঁওতালদের সাওয়া ঘাস খাইতে হইয়াছিল। তাহারা ২/৪টি ধান খুটিয়া বাহির করিয়া ১ হাঁড়ী জলে ফেলিয়া অন্নের জল প্রস্তুত করিয়া খাইয়াছিল। এক টাকা দামের কুঠার /১ এক সের চাউলে বিক্রয় হইয়াছিল। পেটের জ্বালায় ওলের গাছ খাইত। ৪ মাস ধরিয়া লবণ পাওয়া যায় নাই। অনেক লোক অন্নাভাবে মরিয়া গিয়াছিল। এইজন্য পর পর দুই বৎসর জমি আবাদ হয় নাই। লোকের ভীতি অনেক কাল যায় নাই ইত্যাদি।

বিদ্রোহী সাঁওতালগণের অগ্রগতি-বর্ত্তমান বীরভূমি অভিমুখে - এইভাবে দারুণ অত্যাচার করিতে করিতে সিরু মাঝি এক[৫] সুবৃহৎ বিদ্রোহী সাঁওতাল দল লইয়া বীরভূমের সদর সিউড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া সকলেই ঘর বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইয়া গেল। ডাক বন্ধ হইয়া গেল। দেওঘর হইতে সিউড়ীর ডাক লুট হইল। ডাকবাহক অর্দ্ধমৃত অবস্থায় একটি শালবৃক্ষের শাখা লইয়া ফিরিয়া আসিল। সাঁওতালেরা গ্রামকে গ্রাম পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিল। প্রায় ৩০টি গ্রাম একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। একদল সাঁওতাল প্রথমতঃ চন্দ্রপুরে আসিয়া রামধন মণ্ডল ও তাহার পুত্রকে ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের খুটায় পরাইয়া বলিদান করিল। পরে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে লুকায়িত লোকদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিল। তাহারা টাকা পয়সা লুট করিয়া কোমরে বাঁধিয়া রাখিত। রথের দিন কুমড়াবাদের

বহু লোককে কাটিয়া তাহাদের মুণ্ড রথের চতুর্দ্দিকে ঝুলাইয়া দিয়াছিল। ইহাতেও তাহারা ক্ষান্ত হইল না। কাঁচা শস্য সমস্তই নষ্ট করিয়া দিল। জমিদার মহাজনদের প্রাণ ত গেলই, উপরন্তু তাহাদের জন্য ছোট ছোট দুগ্ধপোষ্য শিশুও রেহাই পাইল না। এই সঙ্গে কয়েকজন ইংরাজ পুরুষ ও নারীর প্রাণ বিনষ্ট হইল ! এতদঞ্চলে তখন সাহেবদের নীল, রেশম ইত্যাদির অনেকগুলি ফ্যাক্টরী বা কুঠী ছিল। সেখান হইতে সাহেবরা প্রাণভয়ে নৌকা যোগে পলাইয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা করিল। জমিদার প্রাণভয়ে পলাইয়া জলমধ্যে আশ্রয় লইলেও তাহার সর্ব্বশরীরে তীর বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিল। পরে, জল হইতে তাহার মৃতদেহ উঠাইয়া পাথরে রাখিয়া চারিখণ্ডে কাটিয়া ফেলিল। কাটিবার সময় বলিল - এই জাড়ুই (জাড় বা শীতকালে দেয় সূদ)। এই রোদাড়ী

(রৌদ্র বা গ্রীষ্মকালে দেয় সূদ)। হতভাগ্য নারায়ণপুরের জমিদারকে বরাকর নদীতে খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল। প্রথমে তাহার হাঁটু হইতে পা দুইটি কাটিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল - "এই চারি আনা" অর্থাৎ সিকিভাগ সূদ দেওয়া হইল। পরে কটিদেশ কাটিয়া ফেলিয়া ঐভাবে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল - "এই আট আনা" অর্থাৎ অর্দ্ধেক সূদ দেওয়া হইল। তাহার পর বাহু যুগল কাটিয়া "বার আনা" অর্থাৎ বার আনা সূদ দেওয়া হইল। শেষে দেহ হিতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া বলিয়াছিল "ফরকতি" অর্থাৎ ঋণ সম্পূর্ণরূপ পরিশোধ হইল[৬]। কুটিল মহাজনের কৃতকর্ম্মের উত্তেজনায় সাঁওতালগণ কর্ত্তৃক যে ভীষণ নরহত্যার অভিনয় হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে !

সিউড়ী আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা - সাঁওতালগণ বর্ত্তমান বীরভূম জেলার প্রায় সমগ্র উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ব্যাপিয়া দলে দলে প্রবল বন্যার ন্যায় নিরীহ দেশবাসীর প্রতি অত্যাচার করিতে করিতে সিউড়ীর অদূরে ময়ূরাক্ষী নদীতীরবর্ত্তী স্থানে আসিয়া বহু দল সমবেত হইল। এইবার তাহারা ঠিক যেন তদানীন্তন কালের সমগ্র সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূমের রাজধানী সিউড়ী আক্রমণ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য উদ্যত হইল। সিউড়ী যেন সাঁওতালগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইবার মত হইল। এইজন্য তাড়াতাড়ি উপযুক্ত প্রহরীর দ্বারা জেলখানা সংরক্ষিত হইবার ব্যবস্থা হইল।

প্রথমে এই অসভ্য বর্ব্বর সাঁওতাল জাতির বিদ্রোহ দমন করা কোনরূপ কষ্টসাধ্য বলিয়া ইংরাজ গভর্ণমেন্ট মনে করেন নাই। লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের Final Minuteএ এই হাঙ্গামাকে "A local out-break and little looked for" বলিয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাহারা প্রথমেই তাহাদিগকে দমন করিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক মনে করেন

নাই। তদুপরি সে সময়ে এই সামান্য কার্য্যের জন্য সৈনিক নিযুক্ত সম্ভবপর হয় নাই। কেননা, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সুশিক্ষিত সৈন্য অন্যত্র নিযুক্ত ছিল। এখন কিন্তু সিউড়ীর অদূরবর্ত্তী স্থানে এবং নগর, মহম্মদবাজার প্রভৃতি স্থানে সাঁওতালগণ তাহাদের দুর্ব্বৃত্তাচরণে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। সুতরাং আর নিশ্চেষ্ট থাকা চলিল না। সে সময়ে কর্ম্মব্যতীত দেশরক্ষার ভারও কালেক্টরগণের উপর ন্যস্ত ছিল। ইহাতে সৈন্যাধ্যক্ষগণের বিদ্রোহ দমনে স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম করিতে তাহাদের একটু অসুবিধা হইত।

সাঁওতালগণের কোন শৃঙ্খলা ছিল না। তীর ধনুক ব্যতীত কোন অস্ত্র ছিল না। এখন ইংরাজ সেনা দেখিয়া তাহারা বুঝিল যে তাহাদের সুশিক্ষিত সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করা আদৌ সম্ভব নহে। তাই তাহারা ঝোপে জঙ্গলে, পাহাড় পর্ব্বতে, আত্মগোপন করিয়া করিয়া সুযোগ মত ইংরাজ সেনাদিগকে আক্রমণ করিত। দুই এক ক্ষেত্রে তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ দুই এক ক্ষেত্রের কৃতকার্য্যতাই তাহাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইল। তাহারা মনে করিল-সমগ্র বৃটিশ সৈন্যকে এইভাবে তাহারা ধ্বংস করিতে পারিবে।

সাঁওতালগণের দারুণ অত্যাচারের কথা শুনিয়া গভর্ণমেন্ট আর চুপ করিয়া থাকিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে মেজর ভিন্‌সেন্ট জারভিসের অধীনে একদল সৈন্য নব-চালিত রেলপথে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত প্রেরিত হইল। পরে, বৃষ্টিতে ভিজিয়া সৈন্যদল সিউড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রাবণ মাসের প্রথমেই গভর্ণমেন্ট অত্যাচারীর প্রবল প্রতাপের কথা শুনিয়া Major General G. Bর সহিত আরও সৈন্য প্রেরণ করেন। হিন্দু মহাজনেরা ইংরাজদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সহযোগী কর্ম্মচারীরূপে কাজ করিতে লাগিল এবং সৈন্যদের রসদ বা খোরাকী যোগাইতে লাগিল। মুর্শিদাবাদের মহারাজা একদল শিক্ষিত হস্তী পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া বর্ষাকালে সৈন্য যাতায়াতের খুবই সুবিধা হইয়াছিল। সাঁওতালগণ শিক্ষিত সৈন্যদের সন্মুখীন হইতে পারিল না। ময়ূরাক্ষী নদীর অপর পারে পলাইয়া গিয়া আশ্রয় লইল। সে সময় বর্ষাকাল - নদীতে প্রখর স্রোত বহিতেছিল। ইংরাজেরা প্রথমতঃ বন্দুকের ফাঁকা শব্দ করিল। সাঁওতালেরা তাহাতে সাহস পাইয়া তীর ছুড়িল; কিন্তু তীর বেশীদূর আসিল না। পরে যখন তাহারা নদী পার হইয়া আসিবার জন্য অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল, তখন তাহাদের উপর প্রচণ্ড গুলি-বৃষ্টি করা হইল। তাহাতে বহু সংখ্যক সাঁওতাল প্রাণ হারাইয়া নদীর বন্যায় ভাসিয়া গেল। অবশিষ্ট যাহারা রহিল, তাহাদের মধ্য কতকগুলি পলাইয়া গিয়া নিজদের প্রাণ রক্ষা করিল; আর কতকগুলি ইংরাজের হাতে ধরা পড়িল। প্রথমে কানুর ফাঁসি হয়। পরে, সিধুকে তাহার স্বগ্রামে ধরিয়া লইয়া গিয়া বহুসংখ্যক

সাঁওতাল ও অপরাপর জাতির সন্মুখে মিঃ পোটেন্ট (Mr. Potent) সাহেব তাহার ফাঁসি দেন। অপরাপর সাঁওতালদিগকে সিউড়ীর দক্ষিণে উন্মুক্ত ময়দানে সর্ব্বজন সন্মুখে ফাঁসি দেওয়া হয়।

সিউড়ী অঞ্চলের কথা বর্ণনা করিতে হইলে সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে তাহাদের অত্যাচার, উৎপাত ও নির্য্যাতনের কথা পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। আমরা এই স্থলে একজন প্রত্যক্ষদর্শী গ্রাম্য কবির স্বহস্ত লিখিত সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে একটি কবিতা[৭] মুদ্রিত করিলাম। কবি মহম্মদবাজার অঞ্চলের লোক। মহম্মদবাজার ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তরাংশে অবস্থিত। সুতরাং সাঁওতালগণ নদী নালার দ্বারা কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত না হইয়া সোজাসুজি ভাবে পাটজোড়, কুমড়াবাদ, পরিহারপুর প্রভৃতি ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরবর্ত্তী অঞ্চলে বিশেষ ভাবে উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল - মহম্মদবাজার হইতে লবণ ইত্যাদি দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া লইবে। এই সময় Sergeant Gillon মহম্মদবাজার রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের বীরভূমের তদানীন্তন কালেক্টর Mr. R. I. Richardson সাহেবের দৈনিক-লিপিতে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে - "Sergent Gillon reports from Muhammad Bazar that all is quiet there. I have directed him to keep a white flag flying as a signal that "all is well", a signal which a sepoy from the top of my house can see distinctly, should the flag be lowered, a detachment of sepoys can be ready for a start by the time a messenger may arrive."

"Should unfavourabel news continue to be received from the Nugger direction, 100 men under Major Nemhard will be despached to Dubrajpur to hold that place."

অথ বিদ্রোহী সাঁওতালগণের কবিতা

ষুন ভাই, বলি তাই, সভাজনের কাছে
শুভবাবুর[৮] হুকুম কখন এসে কখন লোটে থাকা হল্য ভার।
হলো সব দুভ্যাবনা - হলো সব দুভ্যাবনা, রাড় কান্দনা, সবাই ভাবে বসে
ঘড়া ঘটি মাটিতে পোতে কখন লিবে এসে।
বলে ভাই রাখিব কোথা - বলে ভাই রাখিব কোথা, জেথা সেথা, এই কথা ষুনি
রাখে ত মোলুক সলা ষুলুক ভাবতেছে কোম্পানী।

বেটাদের সক্তি শোনে - বেটাদের সক্তি শোনে, প্রজাগণে, কইছে ধিরে ধিরে
জিনিষ ছেড়ে পালাও না ভাই সভাই থেক ঘরে।

আমাদের আছে গোরা - আমাদের আছে গোরা, সাঙ্গিন চড়া, জামাজোড়া গায়
বন্দুকেতে গোলি পোরা তুড়ুক স্বয়ার তায়।

বেটারা থাকে কোথা - বেটারা থাকে কোথা, সর্ত্ত কথা, ষুধায় তোমাদেরে
কেহ বলে দেখে এলাম মোরাক্ষির ধারে।

আছে সব জড় হয়ে - আছে সব জড় হয়ে, পূর্ব্ব মুয়ে, তির মারিছে গাছে
কত শত কর্ম্মকার সঙ্গেতে এনেছে।

তিরের ফলি বানাইতে - তিরের ফলি বানাইতে[৯], বরাত মতে, জখন জেমন কয়
হাতে হাতে যোগাইছে ফলা পাছে টানা হয়।

বেটাদের পোসাক চড়া - বেটাদের পোসাক চড়া, কপ্নী পরা, লইতে[১০] বেড়া বুকে
ভাড়ের উপর পূজা করে কোক ছাড়িছে মুখে।

আগেতে লাগড়া পিটে - আগেতে লাগড়া পিটে, কাটে ছেটে, মদে মাসে ভরা
প্রথমে বাঁষকুলি দিয়ে পল্যগা জে ডেরা।

দেখে সব লোক পালায়ছে- দেখে সব লোক পালায়ছে, টোকা পেছে, নয়ে নটাইখান
কেহ বলে রান্দা রইল বড় মাছের খান।

বলে ভাই পালা পালা - বলে ভাই পালা পালা, একি জালা, করে কলরব
বেচারামকে কেটে বেটারা রক্তমুখ সব।

আর কি হাকিম মানে - আর হাকিম মানে, বনে বনে, রাস্তা পেলে শোজা
সাদিপুরে লোটাল গিয়ে কাপড়ের বুজা[১১]।

জথা উচিত বুচকা বেন্দে- যথা উচিত বুচকা বেন্দে, নিল কান্দে, জত মনে ছিল।
রাতারাতি হাতাহাতি কাপিষ্টাকে গেল।

সকলি এমনী ধারা - সকলি এমনী ধারা, দেয় লাগড়া, অহর্নিশী পিটে
খাবার বেলায় সাঁওতালদের মেয়েছেলে জুটে।

বলে ভাই রাজা হব - বলে ভাই রাজা হব, টাকা পাব, করিয়া মন্ত্রণা
দুদিন বাদে পুড়াইল গিয়ে নাঙ্গুলের থানা।

ঐ কথা ষুনে - ঐ কথা ষুনে, সিফাইগণে, বন্দুক নিল হাতে
দারগা মুন্সির সঙ্গে দেখা হইল পথে।

মনেতে ভয় পেয়ে - মনেতে ভয় পেয়ে, পশ্চিম মুয়ে[১২], অম্নি গেল ফিরে
পড়েরপুরে মোকাম কৈল গয়ারামের ঘরে।

জত সব চেলের গোলা - জত সব চেলের গোলা, ভাঙ্গি তালা, সকল বার করিল
মড়া পেটে চড়া দিয়া খিটন[১৩] যে লইল।

তখন সিফাই ঘেরা - তখন সিফাই ঘেরা, সাঙ্গিন চড়া, কাপ্তান সহিত
নদির উপান্তে আশি হইল উপনিত।

জত সব সিফাইগণে - জত সব সিফাইগণে, ভাবে মনে, হয়ে স্যার স্যার
দেখে যুনে মৌরাক্ষি উভয়ে না হয় পার।

তির বর্ষা ত্বয়ার আছে - তির বর্ষা ত্বয়ার আছে, আপন সাজে, রন নাইখ বাজে
নদির ধারে সাঁওতালরা লাগড়া বাজায় নাচে।

সেখানে সার্দ্দ[১৪] কার - সেখানে সার্দ্দ কার, পারাপার, দুকুল বহে বাণ
হাতেতে কিরিচ ধ'রে দেখিছে কাপ্তান।

দেখিয়া বহুত সেনা - দেখিয়া বহুত সেনা, কি মন্ত্রণা, করে দুই জনে
বন্দুক ত্বয়ার[১৫] রাখ কহে সিফাইগণে।

দণ্ড চ্যার ছয় পরে - দণ্ড চ্যার ছয় পরে, কয় হল্যদারে[১৬], যুফেদারের প্রিতি[১৭]
লির্ণয়[১৮] করিতে দুরপীনে[১৯] আন সির্ঘ্রগতি।

বলে উঠিল গজে - বলে উঠিল গজে, হাউদা মাঝে, নয়নে দুরপীন
ঝাড়ে ঝোড়ে[২০] আছে সাঁওতাল কোষ[২১] দুই তিন।

কিছুদুর পিছে[২২] হাট - কিছুদুর পিছে হাট, বলে ঝাট, সাহেব গেল চল্যে
পবন বেগে ধায় সাঁওতাল পালায় পালায় বলে।

করিয়া বহু দম্ফ - করিয়া বহু দম্ফ, দিল ঝম্ফ, পড়িল লদির[২৩] জলে
সাতারিয়া পার হইল হাজার সাঁওতালে।

বলে সব মার মার - বলে সব মার মার, ধর ধর এই মার্ত্র রব
আজি সিহুড়ি জেলা লোটব গিয়ে করে পরাভব।

জাব সব জেহালখানা - জাব সব জেহালখানা, দিব থানা, মুক্ত করিব চোরে
শুভবাবু রাজা হবেন জ্যজ সাহেবকে মেরে।

আমারা ঘুচিব মাঝি - আমারা ঘুচিব মাঝি, কাজের কাজি, মহুর করব বশ্যে
কৃষ্ণ শৌওর দোকান ভেঙ্গে সয়াপ খাব র্কশে।

বলে সির্দ্ধত্তর - বলে সির্দ্ধত্তর, আশু ধর, আর বিলুম্ব[২৪] কেনে
কর্ম্মপাকে পল্য[২৫] সাঁওতাল সিফাএর মাঝখানে।

বেটারা তুচ্ছ্য[২৬] জাতি - বেটারা তুচ্ছ্য জাতি, নাইখ বুর্দ্দি[২৭] কিবা জানে টের
আচম্বিতে[২৮] হুকুম হাঁকে[২৯] বলিয়া ফয়ের।

আলি হুকুম পেয়ে - আলি হুকুম পেয়ে, সিফাই জেয়ে, বন্দুক হাতে তোলে
পঞ্চাষ পঞ্চাষ গোলি মারে এক কালে।

জেমন তারা খসে - জেমন তারা খসে, আশে পাসে, তেমনি গোলি ছুটে
পিষ্টেতে[৩০] বাজিয়া[৩১] কারু পার হইল পেটে।

অন্য সাঁওতাল জত - অন্য সাঁওতাল জত, কত শত পলাইয়া গেল
কুড়ি আঠ লয়[৩২] সাঁওতাল তারা শেই দিনেতে মোল।

তখন পালায় সাঁওতাল - তখন পালায় সাঁওতাল, করিয়া বিকল[৩৩], পিছে নাহি চায়
সলাখ পাহাড়ে জেয়ে শুভকে জানায়।

শুনে সব দুস্ক[৩৪] মনে - শুনে সব দুস্ক মনে, পরদিনে, কৈল্ল একাকার
জব্দি হইতে আনায় সাঁওতালস্বস্ব দ্রাদশ[৩৫] হাজার।
নাহিক মৃত্যু ভয় - নাহিক মৃত্যু ভয়, সদা রয়, ধেনুকেতে চড়া
লগর[৩৬] মোকামে জেয়ে বাজায় নাগেড়া।
শুনে সব লোক পালাইল - শুনে সব লোক পালাইল, বিসম হল্য, তামলি পৃদ্যার[৩৭]
সতগোপ গোওলা পালায় কান্দে[৩৮] নয়ে ভার।
পালায় সব বুড়াবুড়ি - পালায় সব বুড়াবুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, হাতে লয়ে লড়ি[৩৯]
মস্যলমান ফকির পালায় মুখে পাকা ডাড়ি[৪০]।
মুখেতে বলে আল্যা[৪১] - মুখেতে বলে আল্যা, বিষমল্যা, একি বেটাদের তির
এ বিপদে রক্ষা করহে সর্ব্বপ্রির[৪২]।
বলে প্রাণ জায় - বলে প্রাণ জায়, হায় হায়, কি বিপদ হইল
কালু সেখের মা কেন্দে বলে আমার মরিগ[৪৩] কোথা গেল।
জত সব মাথায় ঝুড়ি - জত সব মাথায় ঝুড়ি, কেঁথা ধুকুড়ি, উর্দ্দমুখে[৪৪] ধায়
হঁজট লেগে পোড়ে কেহ গড়াগড়ি জায় !
ঐ সাঁওতাল - ঐ সাঁওতাল, এল সাঁওতাল, কাটিলেরে সাঁওতালে
আজি রক্ষা নাই ভাই কি আছে কাপালে।
তখন হরষ্য মোনে[৪৫] - তখন হরষ্য মোনে, সাঁওতালগণে, রাজবাড়ী সোন্দায়[৪৬]
মানুষ কাটা পড়িল সেইদিন কুড়ি দুই আড়ায়।
পরে সাঁওতালগণ - পরে সাঁওতালগণ, হ্রিষ্ট মোণ[৪৭], দেয় টাঙ্গিতে সান
লাওজোড়ে নাড়া বেটাকে দিল বলিদান।
গেল কুমড্যাবাদে - গেল কুমড্যাবাদে, সকল ফদে, হইল একাকার
ঘরে অগ্নি দিয়ে বেটারা কল্যে ছারখার।
পোড়াইলে ধানের গোলা - পোড়াইলে ধানের গোলা, তিল জুল্যা[৪৮], সরিসা আদি জত
গরু মহিষ ছাগল ফেঁড়া[৪৯] পুড়িল কত শত।
পূর্ব্বে হনুমান - পূর্ব্বে হনুমান, লঙ্কাখান, জেমতে পোড়ায়
ঘরাঘরি অগ্নি দিয়ে সাঁওতাল বেড়ায়।
ঐ গ্রাম নিবাস - ঐ গ্রাম নিবাস, সাধু দাশ, তার সঙ্গে জনাচারি
সিহুড়ি আসি জজ্যের কাছে বলেছ বিনয় করি।
আরত্য প্রাণ বাঁচেনা - আরত্য প্রাণ বাঁচেনা, কি মন্তনা, কছ্যেন হুজুর বস্যে
ঘর কর্ণ্যা পুড়ায়ে আমার ভাইকে কাটলে সেষে।
সিঘ্র উপায় কর - সিঘ্র উপায় কর, সাঁওতাল মার, রাখ প্রজাগণ
টাঙ্গির চোটে মোলূক কেটে পতিত কল্যে বোন।
সাহেব ওস্যামনে - সাহেব ওস্যামনে, সিফাইগণে, বলয়ে বচন
অতি সিঘ্র জাও তোমারা কর গিয়ে রণ।

কথা শুনে তখন - কথা শুনে তখন, জত সিফাইগণ, বন্দুক হাতে লিল
রাতারাতি সিফাইগণ কুমড়াব্যাদকে গেল।
যুর্দ্দ জেই মতে - যুর্দ্দ জেই মতে, বিস্তারিতে, হবে বহুত ক্ষণ
আকাশের চাঁদ কোথা ধরয়ে বামন।
বেটারা ধেনুক ধরে - বেটারা ধেনুক ধরে, তির মারে, করে মার ২
সঙ্গেতে কুকুর আছে হাজারে হাজার।
সাহেব হুকুম দিলে - সাহেব হুকুম দিলে, ফয়ের বলে, যুনে সিফাইগণ
হাজারে হাজার সাঁওতাল মারে ততক্ষণ।
অমনি ভগড়্যা হয়ে - অমনি ভগড়্যা হয়ে, পূর্ব্বমুয়ে, পালাইয়া জায়
পাটজোড় মোকামে আসি নাগড়া বাজায়।
লাগড়ার সন্দ শুনে - লাগড়ার সব্দ শুনে, সর্ব্বজনে, পালায় সর্ত্তরে
জনা দষ বাগিড়ে গোওাল সেইদিনেতে মারে।
লোকের কি জন্তনা[৫০] - লোকের কি জন্তনা, কি লর্ঞ্ছনা, কল্যেরে সাঁওতালে
কত গর্ব্ভবতি রাস্তায় পুসুবিল[৫১] ছেলে।
এমনি সর্ব্বত্তরে[৫২] - এমনি সর্ব্বত্তরে, লোট করে, বেড়ায় সাঁওতাল
মনিস্য কা কথা দেবতা পালান গোপাল।
ভাণ্ডিবোন ছেড়ে - ভাণ্ডিবোন ছেড়ে, পালান দোড়ে, পূজুরির মাথায়
বিরসিংহপুরের কালিমাএর বলিহারি জাই।
১২৬২ বারষ বাসষ্টী সাল - বারষ বাসষ্টী সাল, বরসাকাল, বানের বড় বির্দ্দি[৫৩]
আব্দারপুরে মানুষ কেটে কল্যে গাদাগাদী।
কাটিলে বিষ্ণুপুরে - কাটিলে বিষ্ণুপুরে, হারা তাঁতিরে, প্রিয়েযুলার মাঠে
বিপন গোপকে তিরিয়ে মারলে পখুরের ঘাটে।
লোটীলে কুলকুড়ি - লোটীলে কুলকুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, লাগড়া দেয় সেশে
দেবু রায়কে তেড়ে ধল্যে আখবাড়িতে এশে।
পুঙ্গাতে[৫৪] দেয় বাড়ি - পুঙ্গাতে দেয় বাড়ি, বস্ত[৫৫] উলঙ্গ করিয়ে
জাদু মাঝি চেনাপ[৫৬] ছিল তেয় দিল ছাড়িয়ে।
ধল্যে চন্যা মাঠে - ধল্যে চন্যা মাঠে, পখুর কাটে, দাশী গোওালেনি
কাটের[৫৭] ভিতরে মাগি হারাল্য পরানি।
জত সব সাঁওতালগণে - জত সব সাঁওতালগণে, কাটের মোনে[৫৮], জতমাটি ছিল
ওখড়িয়া[৫৯] সকলমাটী চাপাইয়া দিল।
পরে ধেনুক ধরে - পরে ধেনুক ধরে, তার উপরে, নাচিতে লাগিল
ফুল্যাইপুরের ডাঙ্গালেতে সিফাই দেখিতে গেল।
অগ্নি কোক ছাড়িয়ে - অগ্নি কোক ছাড়িয়ে, পশ্চিম মুয়ে[৬০], পলাইয়া গেল
আলান চকের নন্দ্র দাশের গরু ঘেরি লিল।

তখন নন্দ্র দাস - তখন নন্দ্র দাস, করে হুত্যাষ, মাথায় ঘা মারে
বলে গোধন ছাড়াইতে পরি তবেই আসিব ফিরে।
তখন বস্ত ছাড়ি - তখন বস্ত ছাড়ি, কপ্নি[৬১] পরি. সাঁওতাল সাজিল
চুন মুখান পাতে ভরি কড়চে[৬২] গোজিল।
হাতে ধনুর্বান - হাতে ধনুর্বান, টাঙ্গিখান, কান্দেতে লাগিয়ে
সাঁওতালের বুলি[৬৩] জানি এই সাহষ করিয়ে।
সাঁওতালের সঙ্গে - সাঁওতালের সঙ্গে, নানারঙ্গে, কথায় ভুলিয়ে
জল খওা ছলনা করি আনিল ছাড়িয়ে।
রাই কৃষ্ণদাশে ভনে - রাই কৃষ্ণদাশে ভনে, সংক্ষেপনে, কিছু লেখা হল্য
বিস্তার নিখিতে হল্যে অনেক বাহুল্য।
কাএস্ত কোলে জন্ম মোর রাই কৃষ্ণদাশ
কুলকুড়ি গ্রামে মোর হয় জে নিবাষ।
জেলা বিরভূম তাহে নোনি পরগণা
লাট রাম তাহে নাঙ্গুলের থানা
আমি ভাবি মোনে - আমি ভাবি মোনে, সাঁওতালগণে রাখিলে জে মুক্ষ্যাতি
জে কিছু লিখিলাম আমি সকলি ত সত্তি।
কথা মিথ্যা লয় - কথা মিথ্যা লয়, সর্ত্ত হয়, এই জে বিবরণ
হরি হরি বল দিন গেল অকারণ।
১২৬২ বারষ বাশষ্টী সাল - বারষ বাশষ্টী সাল, এই গোলমাল, বড় ভাবনা মনে
কুলকুড়ি লোট হয় ২৩ শ্বাবনে।

এই সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন সংক্রান্ত ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তদানীন্তন কালেক্টর Mr. R. I. Richardson সাহেব মহোদয় বর্দ্ধমান বিভাগের কমিসনর সাহেবের নিকট যে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন এই স্থলে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম। পাঠকগণ ইহাতেই সঠিক বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

বিদ্রোহ দমনে রিচার্ডসনের রিপোর্ট

আমি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২০এ জুলাই হইতে ৩০এ জুলাই পর্য্যন্ত বীরভূমে বিদ্রোহী সাঁওতালগণের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার ভার প্রাপ্ত হই। ২০এ জুলাই প্রাতে ৫৬ এন, আই দলের একদল সিপাহী Mr. Ensign Morrisএর অধীনে সিউড়ীর ৭ মাইল উত্তরপশ্চিমাংশে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরবর্ত্তী নাঙ্গুলিয়া গ্রামে প্রেরণ করা হয়। আমি Mr. Ensign Morrisকে বিদ্রোহী সাঁওতালদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে এবং সম্ভব হইলে, যাহাতে তাহারা ময়ূরাক্ষী নদী পার

হইয়া আসিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সতর্ক রহিতে উপদেশ প্রদান করিলাম।

নগর - নগররাজ, সাঁওতালগণ কর্ত্তৃক নগর আক্রান্ত হইবার কথা লিখিলে ২১এ প্রাতে আমি নিজে Lieutenant Rikes এবং পূর্ব্বোক্ত দলের কতকগুলি সিপাহী লইয়া সিউড়ীর চৌদ্দ মাইল দূরবর্ত্তী নগর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমরা সেখানে বেলা ২টার সময় পৌঁছিলাম। সেখানে মধ্যরাত্রে শুনিলাম যে আমাদের অনুপস্থিতকালে সাঁওতালেরা নগর আক্রমণ করিবে। ঠিক সেই সময়েই নাঙ্গুলিয়া হইতে মরিস সাহেব সংবাদ দিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে একদল সিপাহী দিয়া তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি না করিলে তিনি সিউড়ী ফিরিয়া যাইবেন। আমি বাধ্য হইয়াই সিউড়ী ফিরিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম যে Ensign Morris কেবল আমাকেই সৈন্য চাহিয়া ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু তিনি আমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকেও অতিরিক্ত সিপাহী পাঠাইতে লিখিয়াছেন। তিনি উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সিউড়ী অভিমুখে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে Lieutenant Dilumain অতিরিক্ত সৈন্য লইয়া মিঃ মরিসেন সহিত মিলিত হইলেন এবং উভয়েই নাঙ্গুলিয়া যাত্রা করিলেন। নগর হইতে আসিবার সময় আমি লেঃ রাইকসকে উপদেশ দিয়াছিলাম যে বিদ্রোহীরা নগর আক্রমণ করিলে সাহায্যকারী সৈন্য না পৌঁছা পর্য্যন্ত তিনি কেবল আত্মরক্ষা বা প্রতিরোধ করিবেন - বিদ্রোহীদিগকে কোন মতেই আক্রমণ করিবেন না। কিন্তু তিনি আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া নগরের তিন চারি মাইল পূর্ব্ব-পশ্চিমে সমবেত বিদ্রোহী সাঁওতালগণকে মাত্র ৩৫ জন সিপাহী লইয়া আক্রমণ করিলেন। তাহারা পলাইয়া গেল ; কিন্তু তখন তাহারা দুইটি গ্রাম ভস্মীভূত করিয়া দিল। তিনি প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন যে প্রায় ২/৩ হাজার সাঁওতাল সমবেত হইয়া নগরের অন্তরবর্ত্তী গাঙ্গমূড়ী নামক স্থান লুট করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাঁহার গুলি বর্ষণে বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইল - তিনি নগরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহার অনুপস্থিতকালে নগর আক্রান্ত হইয়াছে এবং তাঁহার সুবাদারকে পশ্চাদগামী করিয়াছে। লেঃ রাইকস রাজবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিদ্রোহীরা যথেচ্ছা নগর লুন্ঠন করিতে লাগিল। ২২এ জুলাই তারিখ বেলা ৩টার সময় মেজর নিম্‌রড লেঃ টুলমিনের অধীন ২৫ জন সিপাহী নগর অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। সিউড়ী হইতে ৪ মাইল মাত্র গিয়া তাহারা পর্য্যুদস্ত দলকে সিউড়ী প্রত্যাগত হইতে দেখিতে পাইল। এইজন্য লেঃ টুলমিন সাহেব আরও সিপাহী লইবার জন্য সিউড়ী প্রত্যাগমন করিলেন। সার্জেন্ট মেজরের সহিত আরও ৪০ জন সিপাহী প্রেরিত হইল। এই সমবেত সিপাহী দল ২৩এ তারিখ প্রাতঃকালে লেঃ রাইকসকে উদ্ধার করেন।

নাঙ্গুলিয়া - এদিকে ২০এ তারিখ দুই প্রহরের সময় প্রায় ২০০০

হাজার সাঁওতালের সহিত একটি যুদ্ধ হইয়া গেল। সাঁওতালগণ ময়ূরাক্ষী নদী পার হইয়া অগ্রসর হইল এবং লেঃ ডিলুমেনের শিবিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। লেঃ ডিলুমেন সেই সময় তাঁহার ৩৫ জন বাছা বাছা সিপাহী লইয়া সন্মুখীন হইলেন এবং অতিরিক্ত সিপাহী দল উপস্থিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে মরিসকে তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। প্রথমে মাত্র ১০০০ সহস্র বিদ্রোহী দৃষ্টিগোচর হয় ; কিন্তু নাকাড়া বাজাইবা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে আরও ৮০০ শত সশস্ত্র বিদ্রোহী সাঁওতাল তাহাদের সহিত সংযুক্ত হইল। তাহাদের দুই দল একত্রীভূত হইয়া তরবারি সঞ্চালন করিতে ও তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। লেঃ ডিলুমেন তাঁহার সৈন্যদিগকে 'প্রস্তুত' হইতে এবং গুলি করিতে আদেশ দিলেন। ১০ মিনিটের মধ্যেই বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া নদীতীর অভিমুখে পলায়ন করিল। এদিকে, তাহাদিগকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া যে পর্য্যন্ত না তাহারা নদীর অপর তীরে উপনীত হইয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রমাগতই গুলিবর্ষণ করিল। বিদ্রোহিগণের মধ্যে প্রায় ২০০ শত লোক হত বা জলমগ্ন হইয়া গেল। রণক্ষেত্রে মাত্র ৬১ জন মৃত দেহ দৃষ্ট হইয়াছিল।

বিদ্রোহিগণ পলাইয়া গেল। এইজন্য নাঙ্গুলিয়া হইতে লেঃ ডিলুমেনকে সসৈন্যে সিউড়ী ফিরিতে আদেশ দেওয়া গেল। কেননা, সেই সময় নগরে সিপাহী সৈন্য পাঠাইতে হইয়াছিল বলিয়া সিউড়ী সহর রক্ষা করিবার জন্য মাত্র ২৭ জনের অধিক সিপাহী ছিল না। ২৬এ তারিখ লেঃ টুলমিন শুনিলেন যে নগরের ৮ মাইল উত্তরে বাঁশকুলী ও বিন্দাবনী নামক দুইটি গ্রামে বিদ্রোহিগণ তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতেছে। এই শুনিয়া তিনি খয়রাশোল হইতে লেঃ টুক্সকে তাঁহার সহিত বামদিক হইতে আক্রমণ করিবার জন্য মিলিত হইবার আদেশ দিলেন এবং তিনি নিজে দক্ষিণ দিক হইতে আক্রমণ করিবেন জানাইলেন। এই উদ্দেশ্যে ২৭এ তারিখ ৬ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে লেঃ টুলমিন ও লেঃ রাইকস ১০৬ জন সিপাহী সহ যাত্রা করিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে একটা নালার নিকট উচ্চ ভূমিতে ৮০০০ সাঁওতাল সমবেত হইয়াছে। এই নালা অতিক্রম করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। কেননা, গুলি বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই বন্যা স্রোতের মত ৮০০০ বিদ্রোহী তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে, পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করা ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন উপায় রহিল না। কিন্তু গভীর জঙ্গলে, বর্ষার কর্দ্দমে পলায়ন করা সুবিধাজনক হইল না। ফলে, লেঃ টুলমিন ১৩ জন সিপাহীসহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অবশিষ্ট সিপাহিগণ জঙ্গলের নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লেঃ রাইকস্ সহ নগর এবং তথা হইতে সিউড়ীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই যুদ্ধে ৩০০ শত সাঁওতাল নিহত হইয়াছিল।

এই বিপর্য্যয়ের পর, নগরে আরও কিছু সৈন্য প্রেরণ করা উচিত ছিল ; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। কেননা, মাত্র ১০০ সিপাহী সিউড়ী সংরক্ষণের জন্য নিযুক্ত ছিল। সিউড়ী সে সময় প্রতি মুহূর্ত্তেই আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা। নগরের এই আক্রমণের সময় নগরের তদানীন্তন রাজা, সৈন্য বা রসদাদির দ্বারা কোন প্রকারের কোন সাহায্য করেন নাই। লেঃ টুলমিনের মৃত্যু শোচনীয়[৬৪]!

Sd. R. I. Richardson.

(Offg. Collector)

2.8.55.

বিদ্রোহিগণ এইভাবে পরাস্ত হইয়াও যুদ্ধ করিতে বা দেশব্যাপী লুণ্ঠন কার্য্য করিতে বিরত হইল না। তখন দেশে সামরিক আইন প্রচলন করিবার কথা Sir Fransis Halliday প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু Sir Barnes Peacock ও Sir J.P. Grant সাহেবদ্বয়ের অভিপ্রায় মত ভারত গভর্ণমেন্ট ইহাতে সন্মত হন নাই। তবে, স্থানীয় গভর্ণমেন্টকে বিদ্রোহী সাঁওতালগণের প্রতি একটি নোটিশ জারি করিয়া তাহাদিগকে ১০ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিতে আহ্বান করিবার নির্দ্দেশ দেন। ফলে, ১৫ই আগষ্ট তারিখে নোটিশ জারি করা হয় এবং তাহাতে আশ্বাস দেন যে, যে সকল বিদ্রোহী প্রত্যক্ষভাবে কোনরূপ নরহত্যা করে নাই বা দলপতির কার্য্য করে নাই তাহাদিগকে গভর্ণমেন্ট ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তাহারা ইহাতে কর্ণপাত করিল না - অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করিল ও প্রায় ১ মাস ধরিয়া অত্যাচার করিল। এখন বিদ্রোহারম্ভের প্রায় ৫ মাস পরে ১০ই নভেম্বর তারিখ সামরিক আইন জারি করিবার অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত হইল -

"Whereas certain persons of the tribe of Santhal and others inhabitants of the Rajmahal Hills of the Damin-i-koh and of certian Perganas is the district of Bhagalpur, Murshidabad and Birbhum and owing allegiance to the British Government are and for some time past have been in open rebellion against the authority of Government and whereas soon after the 1st outbreak of the said rebellion a proclamation was issued offering a free pardon to all who should come in and submit within a period of 10 days except ringleaders and persons convicted of murder, not withstanding which act of clemency the great body of the rebels have not availed themselves of the

offer of mercey thus held out but continue in rebellion ; where-fore it has become necessary for the speedy and effectual suppression of this rebellion that advantage should be taken of the season to commence systematic military operations against the rebels for which purpose it is expedent that Martial Law should be declared and that the functions of the ordinary Criminal Courts of Judicature should be partially suspended in the said Districts.

"It is hereby proclaimed and notified that the L.G. of Bengal in the exercise of the authority given to him by Reg. X of 1804 and with the assent and concurrence fo the President in Council does hereby establish Martial Law in the following Districts of Bhagalpur as lies in the right band of the river Ganges, so much of the District of Murshidabad as lies on the right bank of the river Bhagirathi; the District of Birbhum :- And that the said L.G. does also suspend functions of the ordinary Criminal Courts of Judicature within the districts above described with respect to all persons Santhals and others owing allegiance to the British Government in consequence of their either having been born or being residents within its territories and under its pretection who after the date of this proclamation and within the districts above described shall be taken in arms in open hostility to said Government or shall be taken in the act of opposing by force of arms the authority of the same or shall be taken in actual commission of any overt act of rebellion against the state;

"And that the same Lieutenant Governor does also hereby direct that all perosn, Santhals and others owing allegiance to the British Government, who after the date of this proclamation, shall be taken as aforesaid shall be tried by Court Martial; and it is hereby notified that any person convicted of any of the said crimes by the sentence of such Court will be

liable under see 3 Rg. X of 1804 to the immediate punishment of death."[৬৫]

বেড়াজালে বিদ্রোহী সাঁওতাল - পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গভর্ণমেন্ট প্রথমতঃ এই বিদ্রোহে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই ; কিন্তু এখন ৫ মাস কাল অতিবাহিত হইলেও যখন তাহা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইল না এবং আহ্বান মত তাহার বশ্যতাও স্বীকার করিল না, তখন গভর্ণমেন্ট আর নিশ্চেষ্ট না রহিয়া বর্ষান্তে General Lloyd and Brigadier General-Birdএর অধীনে চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য দ্বারা এক প্রকাণ্ড বেষ্টনী প্রস্তুত করিয়া ক্রমে তাহা স্বল্পায়ত করিতে করিতে যাবতীয় সাঁওতালগণকে একত্র করিয়া যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। যে সকল সাঁওতাল Grand Trunk Road বা দামোদর নদী অতিক্রম করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদিগকেও এই বেষ্টনী মধ্যে আবদ্ধ করা হইল। ফলে, সমগ্র সাঁওতাল এখন পরাস্ত হইয়া পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল। এই সাঁওতালদের নেতাগণের মৃত্যুদণ্ডের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বিদ্রোহে অন্যূন ১০,০০০ সাঁওতাল নিহত হয়। এখন হইতে তাহারা আর কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবার সাহস করে নাই। এখন তাহারা তাহাদের যে দুঃখ, দুর্দ্দশা ও অত্যাচারের প্রতিকার জন্য বিদ্রোহাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহারই প্রতিকারের প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিল[৬৬]।

সাঁওতাল পরগণা গঠন - ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সরকারীভাবে সাঁওতাল বিদ্রোহের সম্পূর্ণ শান্তির কথা বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল। অতঃপর, Major General Lloyd C. B and Brigadier-General Bird কে গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের কর্ম্মতৎপরতা ও সফলতার জন্য ধন্যবাদ দিয়া সমবেত সৈন্যদলকে বিদায় প্রদান করেন। General Lloyd বর্ব্বর ও বিপথগামী সাঁওতালগণের দমনকালে যথেষ্ট বিচারনা, ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী হইতে সামরিক আইন তুলিয়া লওয়া হয়। ইহার পর আবার সামান্য আকারে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু শীতকালের অবসান হইতে না হইতেই তাহা নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। অতঃপর Hon. Mr. (Sir A.) Eden C. S. তাহাদের অভিযান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত হন। ফলে, Non Regulation District সাঁওতাল পরগণা গঠিত হয় (Act 37 of 1855 and 10 of 1857)। এখন হইতে সাঁওতাল পরগণা বা দুম্‌কা জেলা ভাগলপুরের কমিসনরের অধীনে একজন ডেপুটি কমিসনর দ্বারা শাসিত হইতে আরম্ভ হয়।

দামন-ই-কো নামে যে পৃথক জেলা ছিল তাহাও উঠিয়া গেল। এই

সময়ে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে XXXVIII আইন পাশ হইয়া তিন বৎসর বলবৎ ছিল। ইহাতে যে যে অঞ্চলে সামরিক আইন প্রচলিত ছিল, সেই সেই অঞ্চলের অপরাধিগণকে জঘন্য অপরাধের জন্য আশু বিচার করিয়া দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা হইয়াছিল[৬৭]।

তথ্যসূত্র

১) সাঁওতাল জাতি ও তাহাদের সামাজিক প্রথা ইত্যাদি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 'জাতি-প্রসঙ্গে' প্রদত্ত হইয়াছে - গ্রন্থকার।

২) The Story of an Indian Upland - F. B. Bradley-Birt. B. A, I. C. S. p.159

৩) The Skirts of the hills - অথবা - পাহাড়িয়া অঞ্চল।

৪) The Story of an Indian Upland F. B. Bradley - Birt. B. A, I. C. S. Ch VI.

পাঠকগণকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি যে তখন সমগ্র সাঁওতাল পরগণা বীরভূমের অন্তর্গত ছিল এবং সাঁওতাল বিদ্রোহের পরই সাঁওতাল পরগণা নামক নূতন জেলার সৃষ্টি হয় - বীরভূমের ইতিহাস-গ্রন্থকার ১ম খণ্ড ৭-৮ পৃঃ.

৫) অপর এক দল ভাগলপুর অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং তৃতীয় দল বর্ত্তমান লুপ লাইনের নিকটবর্ত্তী মহেশপুর হইতে সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল এবং লুপ লাইনের পূর্ব্বাংশে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া দারুণ অত্যাচার আরম্ভ করে। এই সকল কথা পরে বর্ণিত হইয়াছে - গ্রন্থকার।

৬) The Story of an Indian Upland F. B. Bradley-Birt. B. A, I. C. S. p.198

৭) ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে কবি স্বয়ং এই কবিতাটি মদীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়কে স্বহস্তে লিখিয়া তাঁহার স্বর্গনিবাসী উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় দ্বারা পাঠাইয়া দেন। পিতৃদেব ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ তারিখ ইহা প্রাপ্ত হন। এই কবিতাটি আমাদের রতন-লাইব্রেরীর ২০৯৬ সংখ্যক পুঁথি শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে - গ্রন্থকার।

৮) সুবাদার শব্দের অপভ্রংশ। এখানে সিধু, কানু ৯) প্রস্তুত করিতে ১০) ঘর-বোনা কাপড় ১১) বোঝা বা মোট ১২) মুখে ১৩) খাইল ১৪) সাধ্য ১৫) প্রস্তুত ১৬) হাবিলদার ১৭) প্রতি ১৮) নির্ণয় ১৯) দূরবীণ ২০) ঝোপ ঝাপে ২১) ক্রোশ ২২) পশ্চাৎ ২৩) নদী ২৪) বিলম্ব ২৫) পড়িল ২৬) তুচ্ছ ২৭) বুদ্ধি ২৮) হঠাৎ ২৯) বলে ৩০) পৃষ্ঠেতে ৩১) লাগিয়া ৩২) আট নয় কুড়ি ৩৩) আর্ত্তনাদ ৩৪) দুঃখ ৩৫) দ্বাদশ ৩৬) বীরভূমের প্রাচীন রাজধানী নগর ৩৭) তামুলি ও পোদ্দার জাতি ৩৮) স্কন্ধে ৩৯) ছড়ি বা লাঠি ৪০) দাড়ী ৪১)আল্লা ৪২) সত্যপীর ৪৩) মুরগী ৪৪) ঊর্দ্ধমুখে ৪৫) হর্ষমনে ৪৬) গুটি গুটি প্রবেশ করে ৪৭) হৃষ্টমনে ৪৮) জোনার ৪৯) ভেড়া ৫০) যন্ত্রণা ৫১) প্রসবিল ৫২) সর্ব্বদিকে ৫৩) বৃদ্ধি ৫৪) পাল্লাতে ৫৫) বস্ত্র ৫৬) জানা শুনা, পরিচয় ৫৭) মাঠে জল বাহির হইবার নর্দ্দমা ৫৮) মুখে ৫৯) তুলিয়া ৬০) মুখে ৬১) কৌপীন ৬২) কোচড় ৬৩) ভাষা

৬৪) পিতৃদেবের স্মারকলিপি - গ্রন্থকার

৬৫) Calcutta Review Vol. XXV and XXXV pp 11-16

৬৬) Calcutta Review Vol. XXXV and XXXVI pp 11-16

৬৭) Calcutta Review Vol. XXXV and XXXVI pp 11-16

দশম অধ্যায়

সাঁওতাল বিদ্রোহ - দ্বিতীয় প্রস্তাব

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের অগ্রগতি ও অত্যাচার - আমরা নবম অধ্যায়ের ৫ নং তথ্যসূত্রে বিদ্রোহী সাঁওতালগণের অগ্রগতি-প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, বিদ্রোহী সাঁওতালগণ কলিকাতায় গিয়া লাটসাহেবের নিকট তাহাদের অভাব-অভিযোগ জানাইবার জন্য বীরভূম অভিমুখে অগ্রসর হয়।

বিদ্রোহিগণ কিন্তু, আরও দুইটি বৃহৎ দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহার মধ্যে একদল - স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অভিযেগাদি জানাইবার জন্য ভাগলপুর অভিমুখে অগ্রসর হয়। তৃতীয় দল - বর্ত্তমান লুপ-লাইনের মুরারই স্টেশনের পশ্চিমাংশে অবস্থিত মহেশপুর হইতে পাকুড়, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল এবং পূর্ব্বাংশে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথপুর, জঙ্গীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া দারুণ অত্যাচার করে। তাহাদের অত্যাচার বা লুন্ঠন-ক্রিয়ার প্রণালী পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত প্রণালীরই অনুরূপ। সুতরাং, ঐ সকল কথার পুনরাবৃত্তি করা অনাবশ্যক।

এই সময়, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত দৈনিকপত্র "সংবাদ প্রভাকরে"* । অতি তৎপরতার সহিত, বিশেষভাবে এতদঞ্চলের অত্যাচারের বিবরণই দিনের পর দিন প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আমরা সেই সময়কার "সংবাদ প্রভাকর' হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সমূহ অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহা হইতে পাঠকগণ এতদঞ্চলের সাঁওতালগণের গতিবিধি ও অত্যাচারাদির বিবরণ ইত্যাদির কথা অবগত হইতে পারিবেন। এই উদ্ধৃত অংশ সমূহ পাঠ করিয়া কৌতূহলী পাঠকগণ তৎকালের প্রচলিত গদ্য-রচনার আদর্শও লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

* বীরভূম রতন-লাইব্রেরীতে রক্ষিত ফাইল - গ্রন্থকার।

সংবাদ প্রভাকর

(১)

৫২৮৯ সংখ্যা, বুধবার, ৩রা শ্রাবন, ১২৬২ সাল, ইং ১৮ই জুলাই ১৮৫৫, শকাব্দাঃ ১৭৭৭॥ দানিশাব্দা ১০৫ - রাজমহল, অরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর ইত্যাদি স্থান হইতে আমরা গত দুই দিবস যে সমস্ত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে পার্ব্বতীয় বিদ্রোহিদিগের ভয়ানক অত্যাচার ব্যতীত আর কোন কথাই লিখিত নাই। প্রজারা কেবল ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতেছে, ভাগলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রস্থান করিয়াছেন ; আমলা লোক কে কোথায় আছে তাহার কিছুই নিরূপন নাই, অনেকেই আপনাপন যথা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করণে বাধ্য হইতেছে .... আমরা নিম্নভাগে অরঙ্গাবাদ ও জঙ্গীপুর সংবাদদাতাদিগের পত্র প্রকাশ করিলাম -

(ক) অরঙ্গাবাদ, ১১ই জুলাই ১৮৫৫

অদ্যকার সংবাদ অতি ভয়ানক, রাজ বিদ্রোহিগণ অরঙ্গাবাদের পশ্চিম ৫/৬ ক্রোশ ব্যবধানের মধ্যে আসিয়া গোঁদাইপুর, শাহাবাজপুর, কালিকাপুর, ঝিকরহাটি, নস্করপুর ইত্যাদি গ্রাম সকল লুট করিতেছে, প্রজাদিগের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ পূর্ব্বক দগ্ধ করিতেছে অনেকের প্রাণ সংহার করিয়াছে। এরূপ অত্যাচার কুত্রাপি হয় নাই, আমড়ার মহারাজের জামাতা শ্রীযুত গোপীনাথ পাঁড়ে মহাশয় রাজধানী হইতে ঝিকরহাটি নামক গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন, দুরাত্মারা তথায় তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া গুরুতররূপে আঘাতি করিয়াছে ও বহু অর্থ এবং দ্রব্যাদি লুট করিয়া লইয়াছে, রাজ জামাতা অতি সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য লোক, তাঁহার যখন এরূপ অবস্থা হইয়াছে তখন প্রজার দুঃখ বিবরণ কি বর্ণনা করিব ! এই বিষয় লিখিতে কাষ্ঠের লেখনীও ক্রন্দন করিতেছে।

অদ্য ৫০০ পদাতিক সিপাহী ৫০টা হস্তি এবং ৪০ জন অশ্বারোহি সৈন্য মুরশিদাবাদ হইতে মোং অরঙ্গাবাদে উপস্থিত হইয়া বেলা দুই প্রহরের সময়ে ঘটনা স্থানে গমন করিয়াছে, এই সেনারা যদ্যপি বিদ্রোহকারিদিগকে দমন করিতে পারে তবে মঙ্গল নচেৎ দুরাত্মাদিগের অত্যাচারে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্তের প্রজাদিগকে মহা ক্লেশ ভোগ করিতে হইবেক, অত্যাচারের সীমা থাকিবেক না, অনেকের প্রাণ বিয়োগ ও বহু লোকের সর্ব্বস্বান্ত হইবেক। ....

(খ) জঙ্গীপুরের পত্র, ১২ই জুলাই ১৮৫৫

রাজমহলের পাহাড় হইতে সাঁওতাল নামক জাতীয় বহু লোক একত্র

দলবদ্ধ হইয়া জঙ্গীপুরের অন্তঃপাতি পোকর নামক গ্রামের ৮ ক্রোশ পশ্চিমে আগমন পূর্ব্বক কয়েকগ্রামের প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুট করিতে করিতে অদ্য পলাসির (পল্‌সা) নিকটে আসিয়া রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারী সাহেবদিগের গৃহাদি দগ্ধ করিয়াছে এবং একজন দারেগা, ১৫ জন বরকন্দাজ ও কয়েকজন প্রজাকে হত করিয়াছে, কত ব্যক্তি আঘাতিত হইয়াছে তাহার নিরূপণ হয় নাই। এমত জনরব যে দুরাত্মারা অদ্য এখানে আগমন করিবেক এতদ্বার্ত্তা অবগত হইয়া অরঙ্গাবাদের আসিষ্টান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সৈন্যের নিমিত্ত বহরমপুরে পত্র লিখিয়াছিলেন, অদ্য সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে বোধহয় আমারদিগের নিকটেই এক ভয়ানক যুদ্ধ হইবেক। রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ পলাসি হইতে প্রাণভয়ে প্রস্থান করিয়া জঙ্গীপুরে আসিয়াছেন কিন্তু এখানকার প্রজারাও পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। ....

৫৬ গণিত দেশীয় পদাতিক সেনারা এখান হইতে বাস্পীয় শকট যোগে বৰ্দ্ধমানে গমন করিয়াছে, তাহারা তথা হইতে অরঙ্গাবাদে যাইবেক। সেনার নিমিত্ত দানাপুরেও পত্র গিয়াছে। বিদ্রোহ ব্যাপার ক্রমে অতি ভয়ানক হইয়াছে. আমরা গত দিবস সন্ধ্যার সময়ে একেবারে সাতখানা পত্র পাইলাম সকল পত্রই এই বিষয়ে পরিপূর্ণ। একজন পত্র প্রেরক লেখেন রেইলওয়ে সংক্রান্ত কোন সাহেব কর্ম্মচারী সেন্টল জাতীয় কোন স্ত্রীকে হরণ করাতে এই ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। অপর পত্র প্রেরক লেখেন যে মেং পোনেট (Mr. James Pontet) সাহেব রাজস্ব সংগ্রহ নিমিত্ত কঠিন নিয়ম করাতে এই ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, দুরাত্মারা কালী স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার সন্মুখে দারোগা প্রভৃতিকে বলিদান দিয়াছে এবং তাহার চক্ষু খুলিয়া লইয়াছে তাহাদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে আমারদিগের রাজপুরুষেরাও বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন, রথের দিবসে মিলেটরী সংক্রান্ত কার্য্যালয় বন্ধ হয় নাই।

(২)

(ক) ৪ঠা শ্রাবণ ১২৬২ সাল - ভাগলপুর ১১ই জুলাই

...... বর্গির হেঙ্গামা অপেক্ষা এই ব্যাপারকে অতি ভয়ানক বলিতে হইবেক সম্পাদক মহাশয় আমি হত সর্ব্বস্ব হইয়া ছিন্ন বসন পরিধান পূর্ব্বক এক কর্ম্মকারের গৃহে বসিয়া আপনাকে এই পত্র লিখিলাম।

(খ) আমড়া, ১৩ জুলাই

সম্পাদক প্রবর ! পর্ব্বতবাসিদিগের ভয়ানক অত্যাচারের বিষয় লিখিতে

বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে ; তাহারা ঝিকরহাটিতে আসিয়া যে নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছে বোধহয় ব্যাঘ্রাদি পশুরাও তদ্রূপ করে না, অনলদ্বারা গৃহাদি দগ্ধ করিয়াছে, যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই কাটিয়াছে এবং যথাসর্ব্বস লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

সাঁওতাল জাতিদিগের বিলক্ষণ ঐক্য আছে, কোন বিপদ সময়ে তাহারা যদ্যপি পর্ব্বতের উপর নাগরা ধ্বনি করে তবে এক ঘন্টার মধ্যে ৪/৫ হাজার লোক অস্ত্র ধরিয়া একত্র হয়, যে জাতি মধ্যে এরূপ একতা সেই জাতির নিকট সৈন্য রাখা কত আবশ্যক তাহা মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন। .... কি কারণে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে তাহাও নিশ্চয় হয় না, কেহ বলে তীতুমীরের ন্যায় দুইজন যবন বুজরুক ব্রিটিশ অধিকার অপহরণের স্বপ্ন দেখিয়া এই ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে, কিন্তু দুরাত্মারা যখন কালীপূজা করিয়া তাঁহার সন্মুখে নরবলি দিতেছে, তখন যবনের দ্বারা এই ব্যাপার হয় নাই, কেহ বলে যে রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা সাঁওতাল জাতীয় স্ত্রীলোক ধরিয়া বলাৎকার করিয়াছিল তাহাতেই তাহারা ঐক্য হইয়া যুদ্ধ সজ্জা করিয়াছে, কেহ আবার বলেন যে রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে অত্যাচার হইয়াছিল। যাহা হউক বিস্তারিত জ্ঞাত হইয়া আমি পরে লিখিব।

(৩)

৫২৯৩ সংখ্যা, ৮ই শ্রাবণ ১২৬২ সাল ; ২৩ জুলাই ১৮৫৫

(ক) মুরশিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট মেং টুগুড সাহেব লেপ্টেনান্ট গবরনর সাহেবের নিকটে যে পত্র লেখেন তাহা ইংলিসম্যান প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে .... 'তিনি ১৪ই জুলাই তারিখে সৈন্য লইয়া পল্‌সায় উপস্থিত হয়েন সেখানে রাজবিরোধিদিগকে দেখিতে পান নাই, তাঁহার গমন করিবার পূর্ব্বেই সাঁওতালেরা ঐ গ্রাম লুট করিয়া মহেশপুরাভিমুখে যাত্রা করে, সেনারা ধান্যক্ষেত্র দিয়া গমন ও নদী নালা পার হইতে বিস্তর ক্লেশ পায় ; কিন্তু পল্‌সাতে তাহারা বিশ্রাম করে নাই; একেবারে মহেশপুরে গিয়া ১৫ তারিখে প্রাতঃকালে এক সরোবরের নিকটে প্রায় ৪/৫০০০ হাজার সাঁওতালকে আক্রমণ করে, ঐ দলের অধ্যক্ষ সিদু ও কিনু তাঁহারদিগের আদেশক্রমে সাঁওতালেরা তীর ছুড়িয়াছিল তাহাতে কেবল ৫ জন সেপাই অল্পাঘাতি হইয়াছে, বিপক্ষদিগের একশত হত ও একশত নিহত হওয়াতে তাহারা অতি বেগে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সেনারা তাহারদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে পারে নাই।'............

(খ) জঙ্গীপুর, ৩ শ্রাবণ

সম্পাদক মহাশয়, সাঁওতাল জাতিরা বেলিয়া ও পল্‌সা ও পুকুড় ও মহেশপুর ইত্যাদি কতিপয় গ্রাম দগ্ধ ও লুট করিয়া বহু প্রজার প্রাণ বিনাশ ও অর্থ এবং দ্রব্যাদি গ্রহণ পূর্ব্বক জঙ্গীপুরাভিমুখে আগমন করিতেছে যাহাকে সন্মুখে দেখিতেছে তাহাকে ছেদন করিতেছে, লোক সকল নিজ নিজ গ্রামাদি হইতে পলাইয়া আসিতেছে, এখানকার লোকেরাও সুস্থ নহেন কখন কি হয় কখন কি হয় এই চিন্তায় তাহারা একপ্রকার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে, বহরমপুর হইতে ৫০০ সিপাহী মহেশপুর গিয়া ২/৩ শত সাঁওতালকে হত করিয়াছে, অধুনা তাহাদিগের দলে কত লোক আছে এ পর্য্যন্ত তাহা নিশ্চয় হয় নাই, এই প্রকার অত্যাচার ব্যাপার কোনকালে শ্রুত হই নাই, দৃষ্টিও করি নাই , যে সকল লোক এখানে আসিয়াছে তাহারদিগের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়।

(৪)

৫২৯৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার ৯ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ২৪ জুলাই ১৮৫৫

মহেশপুরের যুদ্ধ

আমরা রাজমহল হইতে গত দিবস যে কয়েকখানা পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তত্তাবতেই মহেশপুরের ১৬ তারিখের যুদ্ধ বিবরণ লিখিত আছে, সাঁওতাল লোকেরা টাঙ্গি, ঢাল, তীর, বরছা প্রভৃতি যে সকল অস্ত্রাদি ফেলিয়া গিয়াছিল তাহা চারি পাঁচ গাড়ী হইবেক তাহারদিগের প্রায় তিন শত ব্যক্তি আঘাত হইয়াছে, আমরা সাহাবাজপুরের পত্র নিম্নভাগে প্রাকাশ করিলাম -

সাহাবাজপুর, ১৮ই জুলাই

সম্পাদক প্রবর, সাঁওতালদিগের ভয়ঙ্কর অত্যাচারে দুস্তার দুঃখ পারাবারে নিমগ্ন হইয়াছি ; প্রাণভয়েও কাতর আছি গত দিবস মেং সেন্ট জর্জ্জসাহেব কতকগুলীন লোক লইয়া এখানে আসিয়া সাঁওতাল লোকদিগকে আক্রমণ করেন, তাহাতে এক প্রকার সংগ্রাম হয়, বিপক্ষেরা শ্রাবণের ধারার ন্যায় তীর বর্ষণ করিতে থাকে, তদ্দৃষ্টে আমরা কম্পান্বিত হইয়াছিলাম কিন্তু সেই তীর উক্ত সাহেবের অধীনস্থ লোকদিগের বিশেষ হানি কিছুই হয় নাই একটা তীর একজন সাহেবের ললাটে পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহা টুপির উপর পতিত হওয়াতে টুপিই উড়িয়া গিয়াছে, সাহেবেরা বন্দুক ধরিয়া সাহসিকরূপে যুদ্ধ করাতে বিপক্ষেরা এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছে। ফলতঃ জঙ্গলের পথ দিয়া অন্যদিকে বাহির হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিবেক তাহারা জঙ্গলাপথ সকল বিলক্ষণ জ্ঞাত

আছে, ইংরাজ সেনাদিগের কি সাধ্য যে সেই জঙ্গলে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহারদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, এক্ষণে ঐ জঙ্গলে যাইলে একপ্রকার জ্বর হয়, বিপক্ষেরা যখন রাজসেনাদিগকে দৃষ্টি করিয়াও ভীত হয় নাই সাহসিকরূপে অত্যাচার করিতেছে, যুদ্ধ সময়ে তীরাদি অস্ত্র চালনা করে তখন এই বিদ্রোহ শীঘ্র নিবারণ হয় এমত বোধ হয় না।

(৫)

৫২৯৮ সংখ্যা, শনিবার ১৩ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ২৮ জুলাই ১৮৫৫

৫৬ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক সেনারা বীরভূমের অন্তঃপাতী সুরুই নামক স্থানে উত্তীর্ণ হইয়া সাঁওতালদিগের দমনার্থ ইতস্ততঃ স্থানে গমন করিয়াছে, কেবল ৯০ জন সিপাহী সুরুইয়ে আছে, পুলিসের লোকেরা পরাক্রম প্রকাশ নিমিত্ত সাঁওতাল বলিয়া প্রায় কয়েকজন দুঃখী প্রজাকে কারাবদ্ধ করিয়াছে, তাহারা কেহই সাঁওতাল নহে, বিপক্ষেরা কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিবেক না ; কেবল লুট করিয়া বেড়াইবেক, একারণ তাহাদিগকে দমন করা ভার হইয়াছে সেনারা যে দিকে যায় তাহারা সেইদিকে থাকে না অন্যদিকে গিয়া প্রজার প্রাণনাশ ও দ্রব্যাদি অপহরণ করে, ক্ষেত্রের কার্য্য একেবারে রহিত হইয়াছে, হস্তি, অশ্ব ও সেনারা ধান্যক্ষেত্র সকল দলন করিতেছে অতএব দুর্ভিক্ষ্য হইবেক অন্নাভাবে চারিদিগে হাহাকার শব্দ উঠিবেক, রাজমহল, অরঙ্গাবাদ, জঙ্গিপুর, বৈদ্যনাথপুর, বীরভূম, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, পাবনা এবং বরিশাল প্রভৃতি স্থানে যখন বিদ্রোহোপস্থিত হইয়াছে, তখন প্রজাদিগের অল্প অনিষ্ট হইবেক না। .... বীরভূম হইতে কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে কালেক্টর সাহেব জমিদারদিগের বিদিতার্থ এরূপ পরয়ানা প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহারা সেনাদিগের নিমিত্ত আহারাদি প্রস্তুত করিবেন, এই পরয়ানা পাইয়া জমিদারেরা অতিশয় ভীত হইয়াছেন, সাঁওতালেরা দেশসকল ভস্মসাৎ করিয়াছে কোনও গ্রামেই হাট বাজার ও প্রজালোক নাই, তাঁহারা কোথায় হইতে সেনাদিগের খাদদ্রব্য সংগ্রহ করিবেন। গভর্ণমেন্ট মুর্শিদাবাদ হইতে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিলেই উত্তম হয়, নচেৎ জমিদারদিগের সাধ্য নাই যে তাহারা রসদ দিতে পারেন ২১ জুলাই তারিখে বিপক্ষেরা বীরভূমের ১১ খানা গ্রাম লুট করিয়াছে তাহাতে বিস্তর প্রজা হত ও আহত হইয়াছে।

দেওঘর হইতে আমারদিগের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে সাঁওতাল জাতিরা তিনটা থানা লুট করিয়া ডেপিউটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিল যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেক তাহাতে তিনি অতিশয় ভীত হইয়া মহকুমা পরিত্যাগ করণে বাধ্য হইয়াছেন।

(৬)

৫৩০০ সংখ্যা, মঙ্গলবার ১৬ই শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ৩১ জুলাই ১৮৫৫

রাজসেনারা দুই এক স্থানে যুদ্ধ করিয়া দুই চারি শত সাঁওতালের প্রাণ সংহার করিয়াছে বটে কিন্তু তাহারদিগের অত্যাচার নিবারণ না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে, কালিকাপুর হইতে আমারদিগের সম্ভ্রান্ত সংবাদদাতা মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

...... এই হেঙ্গামায় এ অঞ্চলের নীলকর, রাস্তাবন্দির সাহেবেরা প্রায় তাবতেই আপন আপন বিবিদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া আপনারা আশঙ্কিতরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং এতদ্দেশের বাঙ্গালিরা সাহেবদিগের এইরূপ ভয় দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া স্ত্রীপুত্র পরিবারদিগকে লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিতেছে। জিলা বীরভূমে প্রায় মনুষ্য নাই বলিলেই হয়, তথাকার রাজকর্ম্মচারি ও আমলাগণ আপন আপন পরিবারদিগকে বাটি পাঠাইয়া দিয়াছেন, বাসেন্দা লোক সকল আপন ২ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে, গভর্ণমেন্টের স্কুল বন্ধ হইয়াছে এবং রাজকার্য্য প্রায় স্থগিত হইয়াছে কালেক্টর সাহেব কাছারি হইতে সরকারী টাকার সিন্দুক স্থানান্তরে রাখিয়াছেন সাঁওতাল জাতিরা যদ্যপি অত্যাচারি সাহেবদিগের অত্যাচারের প্রতিফল দিয়া ক্ষান্ত হইত তবে ক্ষতি ছিল না, কারণ যাহারা বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব নষ্ট করে তাহাদিগের প্রাণবধ করিলেও ক্রোধানল শীতল হয় না, কিন্তু অসভ্যজাতিরা প্রজাপুঞ্জের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিতেছে, তাহারা যে যে গ্রাম দিয়া আসিতেছে সেই গ্রাম লুট ও অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিতেছে, শত শত মানুষ্যের প্রাণ নষ্ট করিতেছে, এই ভয়ানক ব্যাপার এখানকার রাজকর্ম্মচারিরা রাজধানীতে লিখিয়া পাঠাইলে পর ৭/৮ দিবসে ক্রমে ক্রমে পাঁচশত সিপাহী এখানে আসিয়াছে এবং ও ডিবিজনের কমিসনর সাহেব ঐ সৈন্যের সমভিব্যাহেরে আসিয়াছেন, কিন্তু সাহেবের এমত সাহস হইতেছেনা যে সৈন্য লইয়া যে স্থানে সাঁওতালেরা আছে তথায় যাইয়া প্রজাদিগের রক্ষা করেন। আমারদিগের বীরভূমের মোক্তার ৫ তারিখে যে পত্র লিখেন তদবিকল নিম্নভাগে সংক্ষেপে লিখিতেছি কমিসনর সাহেব কিরূপ ভীত হইয়াছেন তাহা ইহার দ্বারা প্রকাশ হইবেক।

"নমস্কারা নিবেদন মিদং। পূর্ব্ব পত্রে সাঁওতালদিগের হেঙ্গামার বিষয় মহাশয়দিগকে লিখিয়াছি, আমি আর এখানে তিষ্টিতে পারি না, দুই এক দিবসের মধ্যে প্রস্থান করিব, ৩ তারিখে সাঁওতালেরা সিউড়ীর উত্তর তিন ক্রোশ বিষ্ণুপুরের নিকট পল্‌সা গ্রাম লুট করিয়াছে, এবং অদ্য বৈদ্যনাথপুর নামক গ্রাম লুট করিয়া

ঐ গ্রামের ৮ জন লোককে কাটিয়াছে ঐ গ্রাম সকলের প্রজারা অদ্য, এখানে আসিয়া জজ ও কমিসনর সাহেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাতে সাহেবেরা কহিলেন যে আমাদিগের যে ৫০০ শত সিপাহী এখান আছে তাহারা বীরভূম রক্ষা করিবেক, আমরা এইক্ষণে তোমারদিগের কোন সাহায্য করিতে পারি না পুনরায় ফৌজ আসিলে তোমাদিগের জন্য পাঠাইতে পারি ইতি তাং ৫ শ্রাবন।"

(৭)

৫৩০১ সংখ্যা, বুধবার ১৭ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ১ আগষ্ট ১৮৫৫

.... মুরশিদাবাদ হইতে ২৩ জুলাই তারিখের যে পত্র আসিয়াছে তাহা আমরা নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

"সাঁওতালজাতিরা অস্ত্র ধরিয়া মুরশিদাবাদের অতি নিকটে আসিয়াছে তাহারা শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর তথা শ্রীযুত রাজা ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ বাহাদুরের জমীদারী বেলে ও মৃত্যুঞ্জয়পুর লুট করিয়াছে তাহাতে তাহারা অল্প সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। ৫০ জন প্রজা হত হইয়াছে তাহারা উক্ত রাজাদিগের লাট ঝুরি নামক তালুক আক্রমণার্থ আমগন করিতেছে এমত জনরব যে দুরাত্মারা রাজাদিগের কান্দিস্থ রাজবাটি আক্রমণ করিবেক। এই কথা যদ্যপি সত্য হয় তবেই সর্ব্বনাশ, প্রজাদিগের মহানিষ্ট হইবেক। রাজাদিগের কেবল ঠাকুর বাটিতে স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত তৈজসে হীরামুক্তাদি খচিত দেবাভরণ স্বর্ণ খাট পালঙ্গ ইত্যাদি প্রায় ৭/৮ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি আছে ....

(৮)

৫৩০৩ সংখ্যা, শুক্রবার ১৯ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ৩ আগষ্ট ১৮৫৫

(ক) সুরুই (সিউড়ী ?) হইতে কোন সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে সাঁওতালেরা ক্ষুদ্র ২ দলবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থান লুট করাতে চারিদিকেই সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, সিপাহি লোকেরা অতিশয় ক্লেশ পাইতেছে আবার রাস্তা সকল কর্দ্দমে পরিপূর্ণ খানা খন্দক ইত্যাদি সকল স্থানেই জল এ স্থান হইতে ৭ ক্রোশ অন্তরে প্রায় ১০,০০০ সাঁওতাল দলবদ্ধ হইয়া অত্যাচার করিতেছিল, কিন্তু সিপাহিদিগের আগমন সংবাদ অবগত হইয়াই তাহারা অন্যদিকে প্রস্থান করিয়াছে, সিপাহিরা তাহাদিগের প্রতি গুলি করাতে কয়েকজন হত ও আহত হইয়াছে ৩০০০ সাঁওতাল একদল সিপাহিকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহাতে অত্যাচারিদিগের ৬০ জন হত হওয়াতে তাহারা আর সংগ্রামস্থলে দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই সেনারা এইক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়াছে সুরুইয়ে

কেবল ৫০/৬০ জন সিপাহি আছে, এই সময়ে দুরাচারিরা যদ্যপি দলবদ্ধ হইয়া আগমন করে তবে আমারদিগের অত্যন্ত বিপদ বৃদ্ধি হয় সাঁওতালেদের দৃশ্য অতি ভয়ানক তাহারা কেবল কৌপীন পরে, গলায় লাল মালা আছে তাহাদের দেহ প্রকাণ্ড ও শ্যামবর্ণ সকল প্রকার পশুই আহার করে অল্প দিবস হইল একটা ব্যাঘ্র কাটিয়া রন্ধন করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে বিলক্ষণ ঐক্য আছে, তাহারা দলবদ্ধ না হইয়া কোন স্থানে যায় না, শ্রুত হইল যেখানে যত সাঁওতাল আছে সকলেই ঐক্য হইয়াছে তাহারদিগের দূত সকল পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতেছে।

(খ) আমাদিগের জঙ্গীপুরস্থ বন্ধুর লিখিত পত্র নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

জঙ্গীপুর, ২৮ জুলাই

সম্পাদক মহাশয় ৪/৫ দিবস হইল মুর্শিদাবাদের এবং মহকুমা অরঙ্গাবাদের শ্রীযুত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা ১৯ জন সাঁওতালকে ধৃত করিয়া জঙ্গীপুর প্রেরণ করিয়াছিলেন আমরা চাক্ষুষ দেখিয়াছে তাহারদিগের অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ও সর্ব্বাঙ্গ শোণিতাবৃত হইয়াছিল তাহারদিগের মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোক ও বালক ও বালিকা ছিল তাহারা মনুষ্যের সহিত বাক্যালাপ করে না তাহারদিগকে দৃষ্টি করিয়া এরূপ বোধ হইল যে তাহারদিগের দ্বারা এই ভয়ানক ঘটনা হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু তাহাদিগের এমত আশ্চর্য্য ক্ষমতা শ্রুত হইলাম যে তাহারা পদদ্বারা ধনুক ধরিয়া একেবারে দুই হস্তে ১০ তীর নিক্ষেপ করিতে পারে, দুরাত্মারা ভাগলপুর অবধি বীরভূম পর্য্যন্ত এইরূপ দৌরাত্ম্য করিতেছে।

রাজমহলের নিকট সীতা পাহাড় হইতে রেইলওয়ের একজন কেরাণি ২৬ জুলাই তারিখে আমারদিগের নিকট আইসেন তাঁহার প্রমুখাৎ দুরাত্মাদিগের নিষ্ঠুরতা অবগত হইয়া মহাশয়কে লিখিতেছি, সম্পাদক মহাশয় উপরোক্ত সীতাপাহাড়ে রেইলওয়ে সংক্রান্ত একজন ইংরাজ তাঁহার পরিবার সহিত ছিলেন, সাহেবের বিবি অন্তঃস্বত্বা ছিলেন সাঁওতালদের বিদ্রোহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে প্রাণ সংশয় দেখিয়া অনেকে সাহেবকে তথা হইতে তাঁহাকে স্থানান্তরকরণ জন্য পুনঃপুনঃ কহেন কিন্তু সাহেব এ বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া অগ্রাহ্য করিয়া কহেন যে সাঁওতালদিগের দ্বারা আমারদিগের কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই যেহেতু তাহারা অস্ত্রবিদ্যায় অশিক্ষিত, আমারদিগের কি করিতে পারিবেক, পরন্তু সে দিবস শ্রুত হইলেন যে দুরাত্মারা নিকটস্থ হইয়াছে সেই দিবস সাহেব ৪ খানা গাড়ি করিয়া বিবিকে ও বিবির ভগ্নীকে এবং নগদ ১৮০০০ টাকা ও বিবির অলঙ্কার জহরাত ও মোহর ইত্যাদি গাড়িতে এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি অপর তিন গাড়িতে বোঝাই করিয়া বিবিকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতেছিলেন, পথিমধ্যে অনুমাণ ৫০

জন সাঁওতাল আসিয়া বিবিকে হত করিতে উদ্যত হইবাতে বিবি তাহারদিগের অনেক স্তব স্তুতি করিয়া কহিলেন যে তোমারদিগের প্রত্যেক মনুষ্যকে আমি ।০ আনা করিয়া বকসিস দিব তোমরা আমাকে হত্যা করিও না তাহাতে দুরাত্মারা কহিলেক যে ১৲ করিয়া দেও তাহাও বিবি স্বীকার করিয়া সিন্দুক খুলিয়া টাকা দিতে দেখিয়া তাহারা সিন্দুক লইয়া পলায়ন করে এবং বিবি তথা হইতে গমন করিতেছিলেন ইতিমধ্যে আর একদল আসিয়া বিবিকে আক্রমণ করায় তাহারদিগকে অনেক স্তব স্তুতি করিয়া কহিলেন যে আমার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া যাও, কিন্তু আমাকে হত্যা করিও না, কারণ আমি অন্তঃস্বত্বা একটি জীব হত্যা করিলে ২ জীবের হানি হইবেক, তাহারা তাহা না শ্রবণ করিয়া বিবির গলদেশে অস্ত্রাঘাত করে এবং একপদ কাটিয়া ফেলে তাহাতে বিবির প্রাণবিয়োগ হয় পরে তাহার নিকট জহরত ইত্যাদি যাহা ছিল তাহা এবং বিবিকে উলঙ্গ করিয়া তাঁহার বস্ত্রাদি লয়, পরে মিসের মস্তকে এক অস্ত্রাঘাত করিবাতে তিনি নিকটস্থ রেইলওয়ে সংক্রান্ত এক বাঙ্গলায় পলায়ন করেন পরে দুরাত্মারা গাড়োয়ানদিগকে মারিতে উদ্যত হইলে তাহারা কহিলেক যে আমারদিগকে অর্থাৎ প্রজাকে মারিলে কাহাকে লইয়া রাজ্য করিবা, এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা কহিলেক যে তোমরা এইক্ষণে কাহার প্রজা গাড়োয়ানেরা কহিল যে এক্ষণে তোমারদিগের প্রজা, এই কথা শ্রুতিমাত্র গাড়োয়ানদিগকে পলায়ন করিতে কহিল এবং মিস যে বাঙ্গালায় গিয়াছিল সেইখানে গিয়া তাঁহাকে হত না করিয়া তাহারদিগের রাজার নিকট পাঠাইয়াছে, গাড়োয়ানেরা গাড়ী ইত্যাদি তথায় ফেলিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া এই সকল বৃত্তান্ত সাহেবকে জ্ঞাত করিলে তিনি কতকগুলীন মনুষ্য এবং বন্দুক সহিত অশ্বারোহণে তাহারদিগের নিকট আসিবায় দুরাত্মারা তাঁহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করায় তিনি তৎকালীন পলায়ন করিয়া পুনরায় অনেক লোক সমভিব্যাহারে আসিয়া দেখিলেন যে তাহারা উপরোক্ত বাঙ্গালায় মদ্য মাংসাদি আহার করিতেছে, এমত সময় সাহেব তাহারদিগের ৪০/৫০ জনকে ধৃত এবং কতকগুলিনকে হত করেন এবং কতকগুলিন পলায়ন করিয়াছে তাহারদিগকে ধৃত করিতে পারেন নাই।

(গ) অদ্য বর্দ্ধমানের কমিস্যনর শ্রীযুত এলিয়ার্ট সাহেব নদীয়া ডিবিজনের কমিস্যনর শ্রীযুত এ সি বি জে এল সাহেবকে পত্র লেখেন উক্ত পত্রবাহকের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম জঙ্গীপুরের ১০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম মলটিম সরাইয়ে অনুমান ৩ সহস্র সাঁওতাল একত্রিত হইয়া উক্ত গ্রামে অগ্নিপ্রদান করিলে উক্ত কমিস্যনর সাহেব নিকটস্থ রামপুরহাট নামক গ্রাম হইতে অগ্নির ধূম দৃষ্টি করতঃ থানা খড়বোনার ৫ জন চাপরাসিকে ঘটনা স্থানের সংবাদ জ্ঞাত জন্য প্রেরণ

করেন চাপরাসিরা তথায় গিয়া তাহারদিগের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া তলবারদ্বারা ৩০ জনকে হত করে এবং সাঁওতালেরা তিনজন বরকন্দাজকে তীর একজনকে উরুতে গুলি এবং একজনকে অস্ত্রাঘাত এইরূপ ৫ জনকে আহত করে এই সংবাদ বর্দ্ধমানের কমিস্যনর এবং বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জ্ঞাত হইয়া কতকগুলিন লোক সমভিব্যাহারে ঘটনাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে একগৃহে অনুমান ৬০/৭০ জন প্রবেশ করিয়া লুট করিতেছে সাহেবেরা উক্ত গৃহের দ্বার রুদ্ধ করতঃ প্রাচীরে এক ছিদ্র করিয়া গুলির দ্বারা ৬০ জনকে হত করেন এবং ৭ জনকে ধৃত করিয়া লইয়া যান, অপর সকলে পলায়ন করিয়াছে।

(৯)

৫৩০৪ সংখ্যা, শনিবার ২০ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ৪ আগষ্ট ১৮৫৫

আমরা অবগত হইলাম যে অত্যাচারি সাঁওতালদিগের মধ্যে প্রায় তিনচারিশত লোক ধৃত হইয়াছে অনেকে হত ও আহত হইয়াছে মেং পনেট সাহেব একদল সৈন্য সহিত পর্ব্বতে উঠিয়া অত্যাচারিদিগের ঠাকুরবাটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, ইহাতেও তাহারা ভীত হয় নাই, স্থানে স্থানে অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেছে প্রায় ৮০০০ সাঁওতাল দলবদ্ধ হইয়া ভাগলপূর আক্রমণার্থ গমন করিয়াছিল কিন্তু সন্মুখে এক নদীতে তাহারা গভীর জল দেখিয়া ভাগলপুরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, ঐ নদীতে নৌকাদি কিছুই ছিল না, একারণ তাহারা বীরভূমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

এতদ্দেশীয় কারাগার সমূহের তত্ত্বাবধায়ক মেং লচ সাহেব রাণীগঞ্জে ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য স্থানে ও পশ্চিম গমনের প্রশস্ত রাস্তায় সাঁওতালদিগের অত্যাচার নিবারণের ভার গ্রহণ করিয়া গরুর গাড়ি ও মজুর লোকদিগের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছেন শ্রীযুত গোবিন্দ প্রসাদ পণ্ডিতের জামাতা আপনার অধীনস্থ গাড়ী সকলের চাকা খুলিয়া স্থানে স্থানে রক্ষা করতঃ গো ও গাড়োয়ানদিগকে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছিলেন এই বিষয় মেং লচ সাহেব অবগত হইয়া তাঁহাকে বিধিমতে ভয় প্রদর্শন করাইবাতে তিনি সাহায্য করণে সন্মত হইয়াছেন।

(১০)

৫৩০৫ সংখ্যা, সোমবার ২২ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ৬ আগষ্ট ১৮৫৫

(ক) .... এক ব্যক্তি সাঁওতালদিগের সুবার নিকটে ছদ্মবেশে গিয়াছিল ঐ ব্যক্তি তিন দিবস আহার করে নাই, সুবার বাটির নিকট উপস্থিত হইয়া সুবার দোহাই দেয় ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ঐ ব্যক্তিকে একটি টাকা দেন

এবং কোন সাঁওতাল তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে তাহার সমভিব্যাহারে লোক দিয়াছিলেন, ঐ ব্যক্তি কমিসনর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া ব্যক্ত করিয়াছে যে সুবা খেরুয়া বস্ত্রে পাদ্রীর ন্যায় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করতঃ পরিধারণ করিয়াছেন, তিনি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করেন, তাঁহার সন্মুখে রাশিকৃত টাকা, আধুলি ও পয়সা আছে, বোধ হয় ঐ সকল টাকা লুটের টাকা

(খ) .... দুরাত্মারা দুইটা নীলকুঠীর সমুদয় দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়াছে তাহারা প্রজাদিগের প্রতি যে প্রকার অত্যাচার করিতেছে তাহা বর্ণনা হয় না, অত্যাচারিদিগের সংখ্যা ৪০/৫০ হাজার হইবেক;............চারিদিকে হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে।

(১১)

৫৩০৭ সংখ্যা, বুধবার ২৪ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ৮ আগষ্ট ১৮৫৫

বীরভূম হইতে আমারদিগের কোন সংবাদদাতা যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

এখানকার সমাচার প্রায় ৪০০০০ ধাঙ্গড় লোক অস্ত্র ধরিয়া বীরভূম বেষ্টন করিয়াছে তাহারা যদ্যপি একত্র হইয়া তীর লইয়া আক্রমণ করে, তবে এখানে যে কতিপয় সেপাই সৈন্য আছে তাহাদিগের দ্বারা বীরভূম রক্ষা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

প্রজাদিগের ভয়ের কথা দূরে থাকুক সাহেবেরাই ভীত হইয়া আপনাপন পরিবারদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতেছেন। আক্ষেপের কথা কি কহিব, অত্যাচারিরা আমারদিগের নিকটস্থ দুই গ্রাম দগ্ধ করিয়া প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কয়েকজন সেপাই ও বরকন্দাজদিগকে ঐ গ্রামদ্বয় রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহারা সাঁওতালদিগের তীরের সন্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই। দুরাচারিরা স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গ হইতে আভরণ ও পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে জননীর ক্রোড় হইতে শিশু সন্তানকে গ্রহণ করিয়া তাহার সন্মুখেই বিনষ্ট করিয়াছে, কোন দেশে এই প্রকার অত্যাচার শ্রবণ বা দর্শন করা যায় নাই।

.... প্রজারা বিষয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে কৃষকেরাও ক্ষেত্রের কার্য্য করে নাই। যে সকল শস্য জন্মিয়াছিল তত্তাবৎ নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।

সাঁওতালেরা জঙ্গলের নিকটেই থাকে সময়ে সময়ে এক এক গ্রামে

উপস্থিত হইয়া অত্যাচার করে। .... কয়েকটা রেজিমেন্ট ও তোপ না পাঠাইলে বীরভূম রক্ষা হইবার উপায় নাই। বীরভূম ৩১ জুলাই।

(১২)

৫৩০৮ সংখ্যা, গুরুবার ২৫ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ৯ আগষ্ট ১৮৫৫

মেং টুগুড সাহেবের পত্র

(ক) .... কাপ্তেন মিডেলটন মেং এবং আমি কিছু নিজামতের সৈন্য লইয়া বেলা দেড়টার সময়ে ভগ্নাডিহিতে উত্তীর্ণ হইলাম সেখানেও লোক নাই। আমি কানুর বাটিতে প্রবেশপূর্ব্বক সাঁওতালদিগের ঠাকুর পাইয়াছি, ঐ ঠাকুর একখানা মৃত্তিকা নির্ম্মিত চাকার ন্যায়, তাঁহার দুই স্থানে ছিদ্র আছে তাহাতে দুগ্ধ প্রদান করিলে ফুলিয়া উঠে। দুগ্ধ উর্দ্ধে গমন করে, ঐ ঠাকুরের আরও অনেক আশ্চর্য্য কথা নিকটস্থ গ্রামের লোকদিগের মুখে শ্রবণ করিলাম। ঐ ঠাকুরের নিকট কয়েকটা ছাগ মুণ্ড ও দুইটা ষণ্ডের মুণ্ড ছিল। কানু পূজান্তে তাহা বলিদান করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিল।

(খ) রামপুরহাট হইতে 'ইংলিসম্যান' পত্রের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে তিন স্থানে সাঁওতালদিগের সহিত যুদ্ধ হইয়াছে। জিনিপুরে যে সংগ্রাম হয় তাহাতে লেপ্টেনান্ট লার্ড সাহেব ৫ জনকে হত করেন, নালহাটির যুদ্ধে কাপ্তেন জেরিস সাহেব ৫ জনকে হত করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ চারিজন সেপাহি আহত হইয়াছে। বামনীখালের নিকটে এক ক্ষুদ্র গ্রামে অপর যে যুদ্ধ হয় তাহাতে কতিপয় সাহেব ও চাপরাসি বন্দুক এবং শূকর শিকারের বরছা ধরিয়া যুদ্ধ করতঃ দুইজনকে হত করিয়াছে ; কিন্তু বিপক্ষেরা গ্রাম লুট করিয়া অনেক দ্রব্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক পলায়ন পরায়ন হইয়াছে।

এ অঞ্চলের কোন স্থানেই লোক নাই সকলেই প্রাণভয়ে প্রস্থান করিয়াছে এবং যাহারা ছিল তাহারা হত হইয়াছে। নারায়ণপুর নামক গ্রামে ১০০০০ প্রজা ছিল তাহাদিগের অধিকাংশ ধনাঢ্য, তাহারা কেহ নাই, স্থানে স্থানে মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে গৃহাদি সকল ভস্মসাৎ হইয়াছে ....

সাঁওতালেরা প্রায় প্রতিদিবস দুই এক গ্রাম লুঠ করিতেছে। সাঁওতালেরা নির্দ্দয়রূপে প্রজাদিগকে সংহার করিতেছে ....

(১৩)

৫৩০৯ সংখ্যা, শুক্রবার ২৬ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ১০ আগষ্ট ১৮৫৫

বীরভূমের সংবাদদাতার পত্র

সম্পাদক মহাশয়। পার্ব্বতীয় দুরাত্মা সাঁওতালগণের দৌরাত্ম্যে এতদঞ্চলের অনেক গ্রাম লুট ও বহু প্রাণি বিনষ্ট হইয়াছে অবশেষ গৃহাদি ভস্মসাৎ হওয়ায় একেবারে হতজ্ঞান হইয়াছি এরূপ অত্যাচার কখন দৃষ্টি করা দূরে থাকুক শ্রবণগোচরও হয় নাই। তদ্বিস্তারিত বর্ণনে কাষ্ঠের লেখনীও অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইতেছে। কথিত ঘটনা যে যে স্থানে হইতেছে তাহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ৭/৮ ক্রোশ পর্য্যন্ত গ্রাম সকলের মনুষ্য গৃহাদির মমতা পরিত্যাগানন্তর প্রাণরক্ষার্থে সপরিবারে দিগ্বিদিক ধাবমান হইতেছে। পলায়িত ব্যক্তিদিগের ব্যাকুলতা দৃষ্টে পাষাণতুল্য হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হয় .... আমরা কথিত ঘটনার স্থান হইতে ১০/১২ ক্রোশ দূরস্থে বাস করিয়াও কখন পলাইতে হইবেক ও কোথায় বা অবস্থিতি করিব এই ভাবনায় প্রায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি..............

(১৪)

২রা আশ্বিন ১২৬২ সাল, ইং ১৮৫৫ (১৪-১৬ পৃঃ)

ভাদ্র মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ .... সাঁওতালদিগের অত্যাচার ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাহারা জননীর ক্রোড় হইতে শিশুসন্তান লইয়া তাহার সন্মুখেই তাহাকে কাটিয়া রক্ত, গর্ভধারিণীকে বল দ্বারা পান করায় এবং ঐ অভাগিনীকে অল্পাগ্নিতে দগ্ধ করতঃ বধ করে। সিপাহী সেনারা একদল সাঁওতালকে পরাজয় করে। .... কুমড়াবাদ নামক স্থানে সাঁওতালেরা রাজসেনাদিগের সহিত সাহসিকরূপে যুদ্ধ করে। .... সাঁওতালদিগের একজন অধ্যক্ষ ধৃত হয়। .... সাঁওতালেরা একজন বিবিকে অল্প অনলে দগ্ধ করতঃ নির্দ্দয়রূপে নিধন করে। .... সাঁওতালীয় অত্যাচার ক্রমে ভয়ানক হইয়া উঠে। দুই লক্ষ সাঁওতাল আপনারদিগের আবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বতীয় পথ দিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করণের উদ্যোগ করে। সাঁওতালদিগের বিদিতার্থ কমিস্যনর বিডোএল সাহেব এরূপ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন যে ১০ দিনের মধ্যে যাহারা অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন আপন দোষ স্বীকার করিবেক গভর্ণমেন্ট তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন কেবল কুচক্রকারিগণের প্রতিই বিহিত দণ্ডবিধান হইবেক। .... সাঁওতালদিগের অত্যাচার ক্রমে নিবারণ না হইয়া বৃদ্ধি হইতেছে। তাহারা বর্দ্ধমান রাজধানী আক্রমণের উদ্যোগ করিয়াছে। লেপ্টেনেন্ট গবরণর সাহেব তথাকার পুলিস প্রহরিদিগের নিমিত্ত ১০০ পুরাতন বন্দুক প্রেরণ করিয়াছেন। .... ৭ সাত হাজার সাঁওতাল অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সহকারি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পদানত হয়।

পুনরায় বিদ্রোহ প্রচেষ্টা-১৮৭১ খৃষ্টাব্দ - পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনান্তে Hon. Ashley Eden পরবর্ত্তীকালে Sir Ashley Eden - Lieutenant Governor of Bengal নবসৃষ্ট জেলা সাঁওতাল পরগণার প্রথম ডেপুটি কমিসনর নিযুক্ত হন। তিনি অতি দক্ষতা ও তৎপরতার সহিত ইহার গঠন ও শাসনকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার কিছুদিন পর মহাজন ও জমিদারগণ সাঁওতালগণের প্রতি আবার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাদের জমিজমাও উচ্ছেদ করিতে চেষ্টান্বিত হইল - তাহাদের অন্যতম প্রধান, খাদ্য মহুল বৃক্ষসকলও নির্ম্মূল করিতে লাগিল। এই সকল কারণ বশতঃ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বহু সংখ্যক সাঁওতাল দলবদ্ধ হইয়া দুমকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাদের বিদ্রোহের প্রধান স্থান বীরভূম মধ্যে মুরারই ও মহেশপুর অঞ্চল। এবার কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ অতি তৎপরতার সহিত তাহাদিগকে বুঝাইয়া বিদ্রোহাচরণ করিতে নিরস্ত করিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সহিত যে জমাজমি বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহার কর বৃদ্ধি করার বিরুদ্ধেই তাহাদের প্রধান আপত্তি। Sir George Campbell ছোট লাট হইবার পর এ সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত করিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করেন। ফলে, আর এই বিদ্রোহের বহ্নি প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। মধ্যে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে লোকগণনার জন্য সাঁওতালগণ আপত্য করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষেত্রেও সাঁওতাল পরগণার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদিগকে বুঝাইয়া নিরস্ত করেন।*

*(a) Calcutta Review, Vol XXXVI XXXV

(b) Bengal Under the Lt. Governors - C. R. Buckland I.C.S.

(c) Story of an Indian Upland - F. B. Bradley-Birt I.C.S.

বীরভূমের ইতিহাস

সম্বন্ধে সুধীবর্গের অভিমত

(১)

কল্যাণীয়েষু -

বীরভূমের ইতিহাস পড়ে তৃপ্তিলাভ করেছি। বাংলার প্রত্যেক জেলার ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন আছে। তোমার এই গ্রন্থ সেই আলোচনায় সাহায্য করবে বলে তুমি কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছ। ইতি -৭-১০-৩৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২)

আত্রাই

১১-১০-৩৬

কল্যাণবরেষু -

তোমার "বীরভূমের ইতিহাস" ওলটপালট করিয়া দেখিয়াছি। তুমি যে তোমার পিতৃদেবের —— করিতে সক্ষম হইয়াছ ইহাই আনন্দের কথা।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে যখন Hunter's "Annals of Rural Bengal" পড়ি তখন হইতে বীরভূম ও বাঁকুড়ার ইতিবৃত্তের উপর আমার নজর পড়ে। ইংরাজ আমলের কিছু পূর্ব্বে বীরভূমের "রাজা" একজন মুসলমান সামন্ত ছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়ে যে সমস্ত চিঠিপত্র ও দলীলাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তদানীন্তন কালের সামাজিক চিত্র সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়াছে।

যে কার্য্যে তুমি হস্তক্ষেপ করিয়াছ তাহা অতিশয় প্রশংসার্হ। আশা করি, দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত এই ব্রত পালনে যত্নবান হইবে।

শুভার্থী -

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

(স্যর পি, সি, রায়)

(৩)

Darjiling , 25th Oct. 1936.

আপনার "বীরভূমের ইতিহাসে" অনেক ঐতিহাসিক তথ্য রক্ষা পাইয়াছে।

বশম্বদ -

(স্যর্) শ্রীযদুনাথ সরকার

(৪)

গ্রন্থকার প্রথমখণ্ডে ইংরাজ আমলের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বীরভূমের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙলার একটি সুসংবদ্ধ ইতিহাস এখনও ভাল করিয়া রচিত হয় নাই। ইহার পথে একটি প্রধান অন্তরায় বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের নির্ভরযোগ্য তথ্যপূর্ণ ইতিহাসের অভাব। ঁসতীশ চন্দ্র মিত্র, ঁনিখিলনাথ রায়, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি অত্যন্ত পরিশ্রমে বাঙলার বিভিন্ন জেলার কয়েকখানা ইতিহাস রচনা করিয়া এই অভাব কথঞ্চিৎ পূরণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গৌরীহর মিত্র মহাশয়ের প্রচেষ্টা এই অভাব পূরণ করিতে সাহায্য করিবে। তিনি তাঁহার পুস্তকে হিন্দু ও মুসলমান যুগের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির বিবরণ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; বীরভূমের প্রাকৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির বিভিন্নধারার বর্ণনায়ও পুস্তকখানি সমৃদ্ধ। আবার মুসলমান আমলে বীরভূম সমাজে যে সংঘাত উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ফলাফলের কথাও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। বীরভূমের প্রাচীন পল্লীচিত্র, বীরভূমের প্রাচীন গ্রাম্যগীতিকা, বীরভূমে সাহিত্য-চর্চ্চা প্রভৃতি অধ্যায়গুলি পাঠে বীরভূমের পল্লীসংস্কৃতির একটি পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যাইবে। পুস্তককানিতে চারিটি মানচিত্র সন্নিবিষ্ট আছে। বীরভূমের বিখ্যাত মন্দিরাদির চিত্রও বইখানির শোভা বাড়াইয়াছে।

দেশ

১৭ই আশ্বিন ১৩৪৩

৩য় বর্ষ, ৪৬শ সংখ্যা

(৫)

শ্রীযুক্ত গৌরীহর মিত্র বি, এল্ প্রণীত "বীরভূমের ইতিহাস" খানি পড়িলাম। গল্প ও উপন্যাস প্লাবিত বঙ্গদেশে এই তরুণ লেখকের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা পত্রিকা-সম্পাদক মহোদয়গণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন এই সকল গুরুতর শ্রমসাধ্য উদ্যমের যথোচিত মূল্য দান করিয়া তাঁহাদিগকে এই পথে লক্ষ্যবদ্ধ ও অধিকতর অধ্যবসায়শীল করিতে উৎসাহিত করেন।

এইরূপ প্রাদেশিক ইতিহাসে ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেকই থাকিবে। ছিদ্রান্বেষিগণ দোষ খুঁজিলে নিজেরাতো কোনরূপেই লাভবান্ হইবেন না, অথচ যাঁহারা জাতীয় ইতিহাসের মূলধন বাড়াইতে নিষ্ঠার সহিত কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া ও নিরুৎসাহ করিয়া দেশের ক্ষতি করিবেন মাত্র। দুঃখের বিষয় দেশে এইরূপ অলস ও অকর্ম্মণ্য সমালোচকের অভাব নাই। শ্রীযুক্ত গৌরীহর মিত্র যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পথে দৃঢ়বদ্ধ হউন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। যিনি কাজ করেন, তাঁহাকে অনেক মশা-মাছির দংশন সহ্য করিতে হয়। এই অত্যাচার সহ্য করিয়া যদি লেখক একনিষ্ঠ হইয়া চলিতে পারেন, তবেই তাঁহার কৃতিত্ব এবং ভবিষ্যৎ সফলতার সম্ভাবনা। গল্প-পুস্তকের মত এই সকল বইএর প্রচুর কাট্‌তি আশা করা যায় না। কিন্তু যিনি কোন বড় লক্ষ্যের দিকে নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে দুঃখ-দারিদ্র্যরূপ কাঁটার মুকুট বরণ করিয়া লইতে হইবে এবং ধৈর্য্যের দুর্ভেদ্য বর্ম্ম পরিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য লালায়িত, কল্পনাশীল ব্যক্তিদের পক্ষে এই পথ নিষিদ্ধ।

শ্রীযুক্ত গৌরীহর মিত্র তাঁহার পুস্তকের প্রথমে বীরভূম সম্বন্ধে কতকগুলি পৌরাণিক উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন। বক্রেশ্বরে ভগবান নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেন। দুবরাজপুরের ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, অজয় নদের তীরে, ভীমগড়া, যুধিষ্ঠিরপুর প্রভৃতি স্থানে পঞ্চপাণ্ডব কিছুকাল অজ্ঞাতবাস করেন। পাহাড়েশ্বরে শিবমন্দিরের নিকটে কোন স্থান এক শিলা-নিঃসৃত জলে সীতাদেবী স্নান করিয়াছিলেন। লাভপুরের নিকট এক স্থানে দুর্ব্বাসা মুনির আশ্রম ছিল। ভাণ্ডীর বনে রামায়ণোক্ত বিভাণ্ডক মুনি তপস্যা করিয়াছিলেন। ভাণ্ডেশ্বর দেখিলেই যদি বিভাণ্ডক মুনিকে স্মরণ করিতে হয়, তবে কাশীর তৈলভাণ্ডেশ্বরেরও এই পর্য্যায়ে পড়িবেন। বোলপুরে সুরথ রাজা লক্ষবলি প্রদান করেন ও তারাপুরে বশিষ্ঠ তান্ত্রিক সিদ্ধিলাভ করেন। ইহা ছাড়া হিড়িম্ব ও বকাসুরের স্থানও বীরভূমে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সীতাপাহাড়ীতে সীতাদেবী রন্ধন করিয়াছিলেন। তিনি যে প্রস্তরে বসিয়া রামচন্দ্রের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেন, লোকে তাহার চিহ্ন দেখাইয়া থাকেন। বালা বা বারানগরে বান রাজার রাজধানী ছিল। ইত্যাদি

এই ভাবের উপাখ্যান বঙ্গদেশের বহু স্থানে প্রচলিত আছে। এই সকল উপাখ্যানের মূল্য কি ? প্রাচীন ইতিহাস বা পূর্ব্ব যুগের কোন চিহ্ন এদেশে আছে কি না, সেই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে বহু গবেষণার দরকার। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, বৌদ্ধশক্তির বিলোপ করিয়া ব্রাহ্মণগণ এদেশে তাঁহাদিগকে নিশ্চিহ্ন

করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন এবং যেখানে যেখানে বৌদ্ধকীর্ত্তি ছিল, রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বৌদ্ধরা যে এক সময়ে এদেশে ছিল, তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে ত্রুটী করেন নাই। বহুদিন পর্য্যন্ত ভীম কৈবর্ত্তের জাঙ্গাল মধ্যম পাণ্ডব ভীমকৃত বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। ঢাকা জেলার সাভার গ্রামের হরিশ্চন্দ্র রাজার রাজপ্রাসাদ পৌরাণিক যুগের হরিশ্চন্দ্রের বলিয়া এতকাল পর্য্যন্ত লোকে বিশ্বাস করিত। ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায় পালবংশীয় রাজা শিশুপালকে চেদীর রাজা বিখ্যাত শিশুপাল বলিয়া লোকের মনে ধারণা বদ্ধমূল করা হইয়াছিল। এক কথায় যেখানে কোন বৌদ্ধকীর্ত্তি দেখা গিয়াছে, সেখানেই সমাজ গুরুগণ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি কাব্য ও শাস্ত্রের সাহায্যে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গৌরীহর মিত্র পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির এই মূলসূত্র ধরিয়া যদি গল্পগুলির ব্যাখ্যা দিতেন, তবে ভাল হইত। ...... পুস্তকে তিনি অনেক নূতন তথ্য দিয়াছেন। একটি স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রে বহু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্নিবেশ করিয়া তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

তাঁহার গ্রন্থের কলেবর ক্ষুদ্র এবং ভাষা সরস ; সুতরাং বইখানির ব্যাপকভাবে প্রচার হওয়া উচিত। বহু ঐতিহাসিক চিত্র দ্বারা তিনি তাঁহার পুস্তকখানি সুশোভিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে লোহিত রাজার গড়, ভাণ্ডেশ্বর শিবমন্দির, দুবরাজপুরের পাথর, খগেশ্বর শিবমন্দির, বক্রেশ্বরের শ্বেত গঙ্গা, দুর্ল্লভপুরের ঘাটি, রাজনগরের রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ, ঢেকুরের ইছাই ঘোষের দেউল প্রভৃতি চিত্র বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বীরভূমি এক সময়ে প্রকৃতই বীরজননী ছিল, দ্বিতীয় মহীপাল যে প্রসিদ্ধ সামন্ত-চক্র লইয়া কৈবর্ত্তরাজ ভীমকে পরাভূত করেন, সেই চৌদ্দ জন সামন্ত রাজের মধ্যে ছয়জনই বীরভূমবাসী। বীরভূমিই কবি জয়দেব ও চণ্ডিদাসের জন্মভূমি ; এই দেশ বহু সিদ্ধযোগী তপস্বীর পদচারণ-পুণ্য এবং বঙ্গদেশে যে সকল তীর্থস্থান আছে, তাহাদের অনেকগুলিই এই দেশকে পবিত্র করিতেছে। প্রসিদ্ধ তারাপীঠ বামাক্ষেপার লীলাভূমি। ইহা ছাড়া কত রাজা, মহারাজা ও মহাবীরগণ এই বীরভূমে লীলা করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেক আভাস গৌরীহরবাবু আমাদিগকে দিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র ইতিহাসখানি সমগ্র বঙ্গদেশের ইতিহাসের কতকটা উপকরণ জোগাইবে, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই। ইতিহাস-লক্ষ্মীর প্রতিমা গড়িতে হইলে অনেক খড়কুটার প্রয়োজন, তাঁহার কাঠামোর জন্যও অনেক মাল-মসলার দরকার। এই সকল উপকরণের মূল্য কম নহে।

শেষ অধ্যায়ে গৌরীহরবাবু ১১৬৩ হইতে ১২৫৬ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত ২৩/২৪ খানি বাঙ্গলায় লিখিত চিঠি ও দলিলের প্রতিলিপি দিয়াছেন। গ্রন্থকারের পিতা শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ও এইরূপ বাঙ্গলা গদ্যের অনেক নমুনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গীয় গদ্যের নমুনাস্বরূপ এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এই সব দলিল-পত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। বীরভূমে প্রচলিত অনেক ছড়া ও পল্লীগীতি পুস্তকখানিতে লিপিবদ্ধ করিয়া তরুণ লেখক বঙ্গসাহিত্যে কতকটা নূতন উপকরণ জোগাইয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি, লেখক বাঙ্গালার ইতিহাসের এই যে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের দ্বার উদঘাটন করিলেন, তাহাতে তিনি গভীরভাবে প্রবেশ করিবেন এবং বাধা-বিঘ্ন, প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়া লক্ষ্যের দিকে স্থির ও নিবিষ্ট হইবেন।

বেহালা — ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন (ডি. লিট্)

১১-৪-৩৭

(৬)

শ্রীযুক্ত গৌরীহর মিত্র, বি-এল্ প্রণীত "বীরভূমের ইতিহাস" পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। গ্রন্থকার বহু আয়াস সহকারে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বীরভূমের ঐতিহাসিক বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন। বীরভূমের ভৌগোলিক বিবরণ ও হিন্দু ও মুসলমান যুগের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা এই প্রথম। গ্রন্থকারের উদ্যম সফল হইয়াছে। তিনি বহু মূল্যবান্ জিনিষ আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন. বীরভূমের প্রাচীন মন্দিরাদির বিবরণ ও চিত্র এই গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। গ্রন্থকারের অধ্যবসায় ও ঐতিহাসিক বিচার-বুদ্ধির বহু পরিচয় গ্রন্থমধ্যে আছে। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার এইরূপ ঐতিহাসিক বিবরণ সংগৃহীত হইলে বাংলার ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হইবে। "রাম চরিতে" যে সমুদয় সামন্তরাজ্যের উল্লেখ আছে তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকারের আলোচনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গ্রন্থের চিত্র নং ৮এ খগেশ্বর শিব মন্দিরের ছবি আছে। বাঙ্গলা দেশে এই Styleএর মন্দির আছে ইহা জানিতাম না। বাঙ্গালা দেশের মন্দির-শিল্পের ইতিহাস লিখিতে এই মন্দিরটি খুব কাজে লাগিবে। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

রমনা — ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ

ঢাকা — পি, আর, এস্ ; পি, এইচ, ডি,

(Vice Chancellor - Dacca University)

(৭)

বাঁকীপুর - পাটনা
৪-১-৩৭

পরম প্রীতিভাজনেষু

আপনার "বীরভূমের ইতিহাস" পাঠ করিয়া অনেক নূতন তথ্য অবগত হইলাম। আপনি অনেক অধ্যয়ন করিয়া, অনেক পরিশ্রম করিয়া যে সমস্ত মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালী আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিবেন মনে হয়। বীরভূমের ধারাবাহিক ইতিহাস বাংলার ইতিহাস রচনায় বিশেষ সাহায্য করিবে। কোন কোন সংবাদপত্রে আপনার গ্রন্থের যে বিরুদ্ধ সমালোচনা(?) প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিতেছি, সত্যানুসন্ধিৎসা প্রণোদিত নহে। আপনার গ্রন্থের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে সমস্ত কথা ও দলিল প্রকাশিত হইয়াছে তাহার আলোকে বঙ্গসাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস নূতন করিয়া লেখার প্রয়োজন হইবে। আশা করি, আপনার গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডও প্রথম খণ্ডের ন্যায় হৃদয়গ্রাহী হইবে। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনার সাধু প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

ভবদীয়
অধ্যাপক - ডাঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার
এম, এ (ডবল) ; পি, আর, এস ; পি, এইচ, ডি

(৮)

১২এ বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট
কলিকাতা
২৪এ ভাদ্র, ১৩৪৩ সাল

মঙ্গলাস্পদেষু

স্নেহের গৌরীহর, ধন্যবাদের সহিত তোমার বীরভূমের ইতিহাসের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। প্রথম খণ্ডে যে প্রণালীতে বিষয় সন্নিবেশ হইয়াছে তাহাতে আশা করি, এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে ইহা বীরভূমের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রামাণ্য ইতিবৃত্তরূপে গণ্য হইবে। এই গ্রন্থ তোমাকে বাংলা দেশে সুপ্রসিদ্ধ করিবে সন্দেহ নাই।

নিত্যশুভার্থী
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দেশগুপ্ত বি, এ

(৯)

6 Ballygung Place

প্রীতিভাজনেষু

"বীরভূমের ইতিহাস" যতদূর পড়িয়াছি, তাহাতে তোমার পরিশ্রম, বিচারশক্তি ও অনুসন্ধিৎসার প্রশংসা করি। আশাকরি, তোমার ইতিহাস পণ্ডিত সমাজে আদৃত হইবে। ইতি -

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ

(১০)

শ্রীযুক্ত গৌরীহর মিত্র মহাশয়ের "বীরভূমের ইতিহাস" খানা আমি পড়িয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমারা আত্মবিস্মৃত জাতি, তাই এখনও এরকম পুস্তকের প্রকৃত মর্য্যাদা করিতে শিখি নাই। গৌরীহর বাবু ধনীর দুলাল নন, তিনি দরিদ্র সাহিত্য সেবক। তবুও এ পুস্তক প্রণয়নে তাঁহাকে বহু অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে, পরিশ্রমের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। আমি আশা করি, অন্ততঃ বীরভূমের লোক তাঁহার এ বইখানি আদর করিতে শিখিবে। আমি যখনই গৌরীহর বাবুর সহিত আলাপ করি, তখনই বুঝিতে পারি, এ-জেলার প্রতি তাঁহার প্রীতি কত অকৃত্রিম এবং ইহার কৃষ্টির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা কত গভীর !

তাঁহার এই মূল্যবান পুস্তকখানির আমি বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীব্রজকান্ত গুহ (আই, সি, এস্)

৯-৬-৩৮ (বীরভূমের জেলা ও সেসনস্ জজ)

(১১)

Dated Suri The 26th Sept, 1936

I have seen Birbhumer Itihash Part I published by Babu Gourihar Mittra B. L and I think it eminently suitable for distribution as prizes.

Sd. H. C. Bose
District Magistrate,
Birbhum

(১২)

Dated 22nd Sept, 1936
Bengal Secretariat,
Darjeeling

My dear Gourihar Babu -

Many thanks for your presenting me with a Copy of your new book “Birbhumer Itihash” which appears to be a very useful and interesting publication.

I hope that your book will have a wide circulation.

yours sincerely
Sd. G. S. Dutt. I. C. S.

(১৩)

Ist Nov. 1936

I have been exclusively reading your work for these days. I find it extremely valuable. Yours is the first attempt at a systematic construction of the History of Birbhum and I must congratulate you on the remarkable measure of success achieved by you. The whole thing is novel to me. This shows that you did not undertake your stupendous work a day too soon. I am anxiously waiting for the next second & third parts. You will be recognised as the first writer of History of Birbhum no doubt. Your style of presentation and marshalling of facts are really admirable. You wield a facile and charming pen and the book reads like a novel. I feel you should have received bountier patronage & every patriotic inhabitant of Birbhum should fel proud of you. Had I been a rich man I would have placed enough funds at your disposal to enable you to undertake extensive tours into every part of Birbhum. But this is a mere pious wish. It is a pity that patron of learning and

research are scarce now-a-days. The people of Birbhum, or for that matter, the Government of Bengal, owe it to themselves, to assist you with funds and materials to the utmost of their capacity.

Dr. Satkari Mukherjee, M.A, P.H.D.
Lecturer - Calcutta University.

(১৪)

Director of Land Records and Surveys
Bengal
Alipore 2nd January 1937.

Dear Mitter,

I must confess that I have to keep your letter long unanswered for which I must apologise. I wanted to get the leisure to study your 'Birbhumer Itihas'- before I sent a reply. I have gone through it and I do consider it to be a very praiseworthy attempt. I consider it valuable for more than one reason. History of Bengal is yet to be written. Unfortunately there is no movement yet to collect the materials. Such of them as exist are fast passing away. It is essential that someone should place on record the traditions that yet exist and note on the outer symbols that yet have escaped the ravages of time. The history of Bengal ought to be a real great work. Bengal and the Bengalees have an old history. The culture, the social and political evolution of the country are of great interest. But such a history can only be built on clear analysis of local materials and then one must sythetise on them. Unfortunately none - nor even the University have taken up the work. All praise therefore must go to those who like you, spend so much of their time and labour on this self appointed task which is a task of

first rate importance. Much more so to a self-forgetful people like Bengalees.

2. Your task is well done. I wish your book would be in the hand of every student of history. I wish too that those so inclined in the District itself might on the basis of the materials of your book, start further investigation and discover fresh links with the ancient time. Your book might induce them to start a Museum to collect and stock the materials for a history of 'Rarh' Posterity will bless you as one of the pioneers, who had helped them to know their country.

Your very sincerely
Bejoy Behary Mukherjee
D. L. R. - Rai Bahadur

(১৫)

Government House
Calcutta
18th/19th March, 1938

Dear sir,

I am desired to say that His Excellency was much interested in the collection of objects of historical interest which you displayed at the Suri Agricultural and Industrial Exhibition 1938.

Yours faithfully
(Sd. Illegible)
Asstt. Secretary to the Governor.

বীরভূমের ইতিহাস

গ্রন্থের মানচিত্রসমূহ
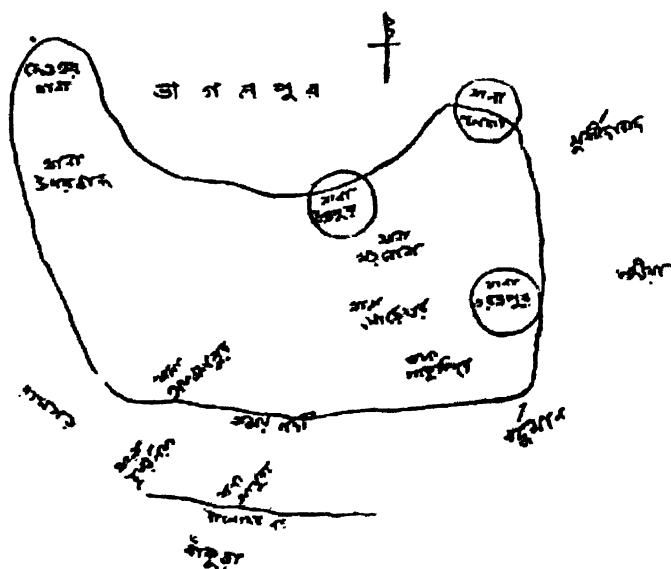
মানচিত্র-১ । বীরভূমি (১৮৩৮ খৃঃ)
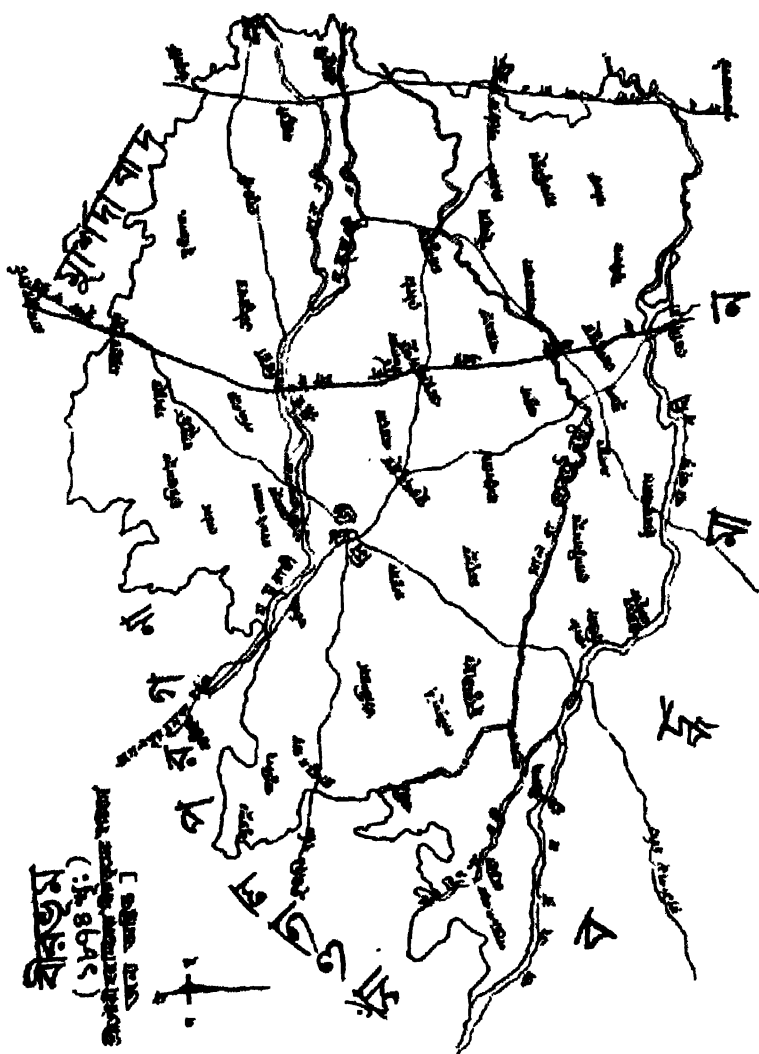
মানচিত্র-২ । বীরভূমি (১৮৭৪ খৃঃ)
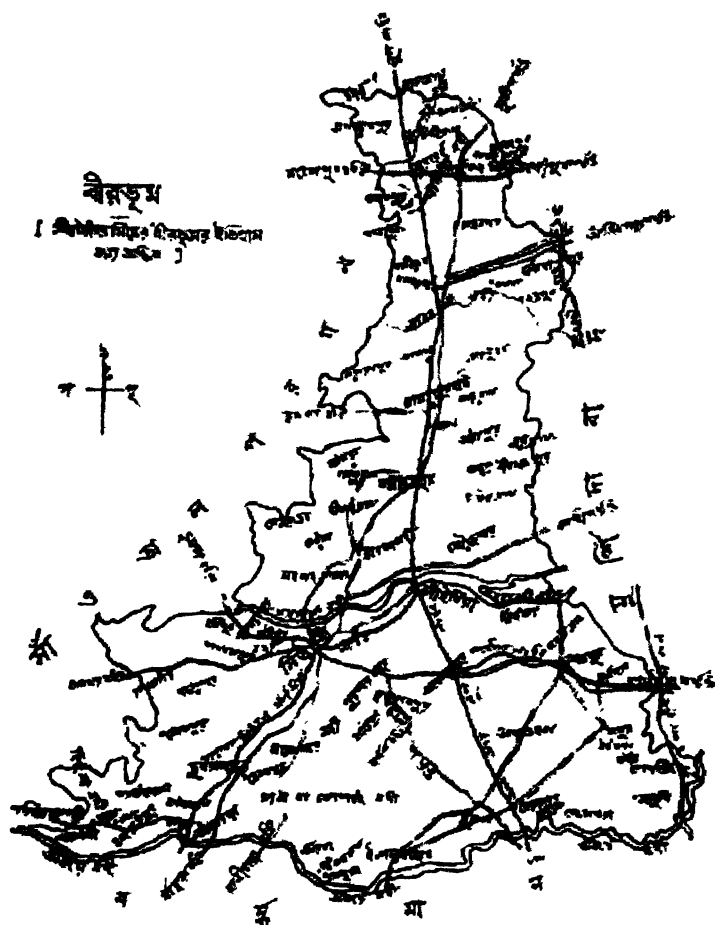
মানচিত্র-৩ । বীরভূমি (১৮৪৯-৫২ খৃঃ)
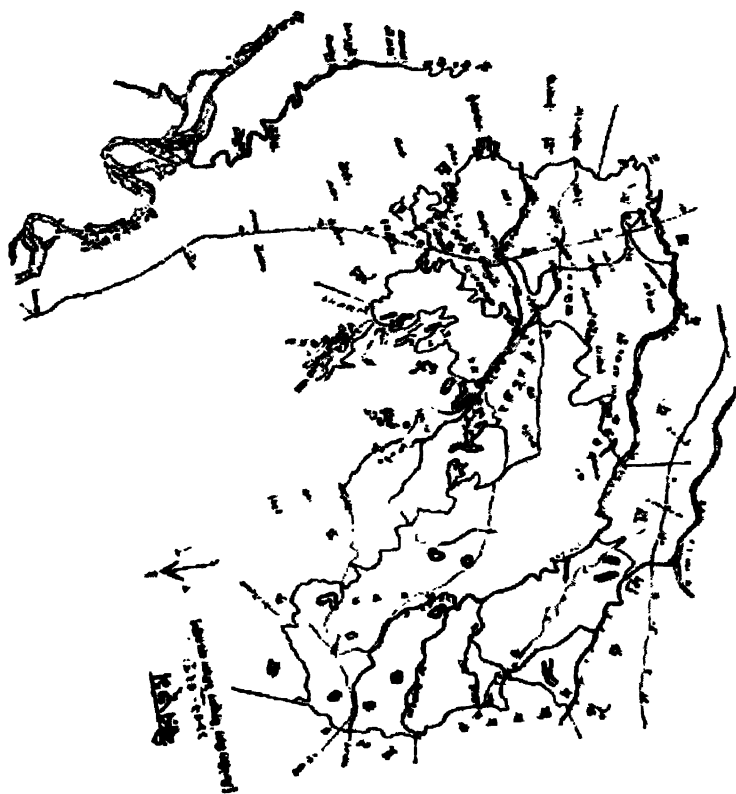
মানচিত্র-৪ । বীরভূমি (বর্তমান)

বীরভূমের ইতিহাস

গ্রন্থের চিত্রসমূহ
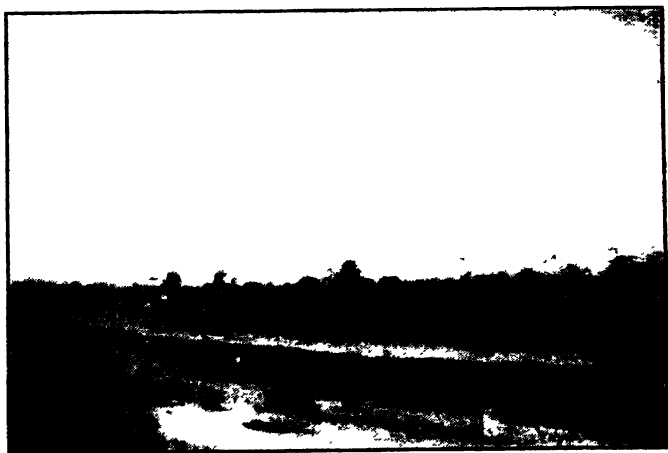
চিত্র–১ । কালীদীঘী বা রাণীর বান্দ

চিত্র–২ । বীরসিংহপুরের কালীমাতা
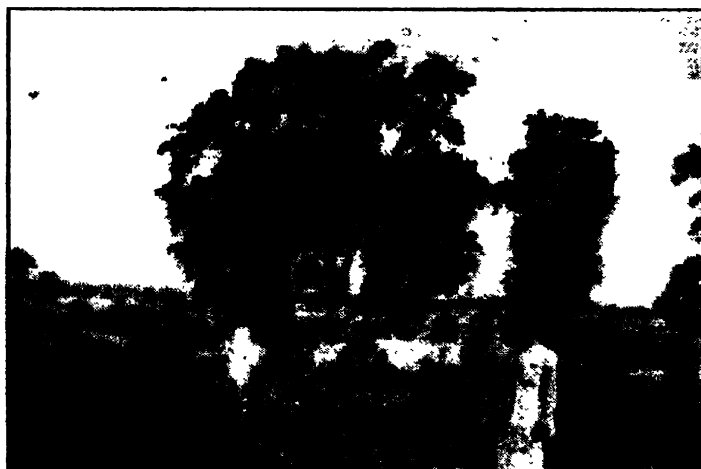
চিত্র–৩ । বীরসিংহের রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ

চিত্র–৪ । দুবরাজপুরের পাথর

চিত্র–৫ । ভান্ডেশ্বর শিব-মন্দির
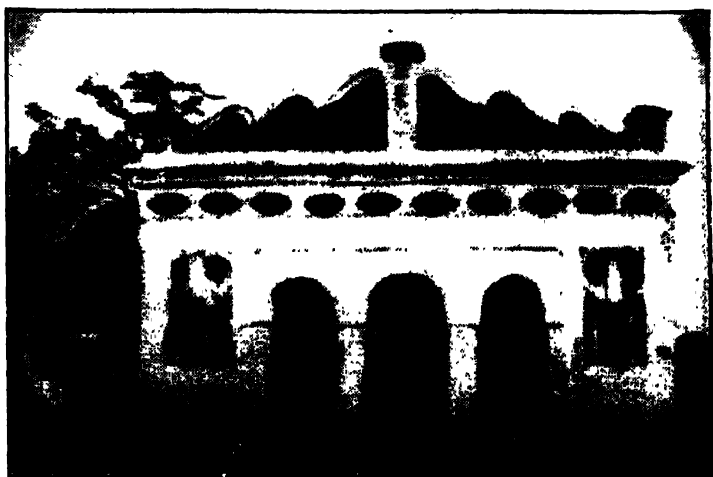
চিত্র-৬ । সুরথেশ্বর শিব-মন্দির

চিত্র-৭ । লহিত রাজার গড় (গোপডিহি)
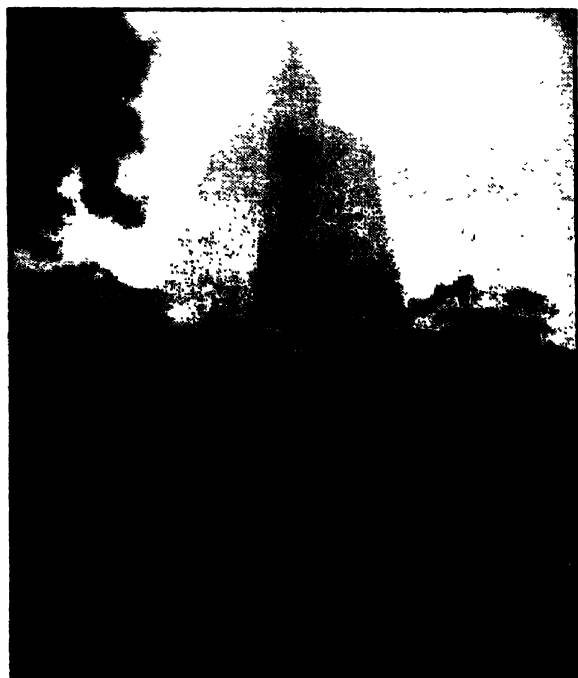
চিত্র–৮ । খগেশ্বর শিব-মন্দির

চিত্র–৯ । শ্বেতগঙ্গা (বক্রেশ্বর)

চিত্র-১০ । রাজবাড়ীর (বীরনগর) ধ্বংসাবশেষ

চিত্র-১১ । নলরাজার রাজবাড়ীর ধ্বংসস্তূপ (নানুর)
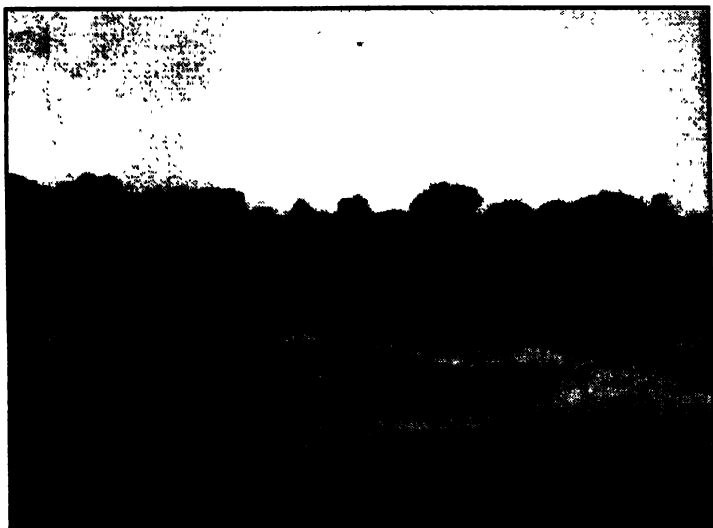
চিত্র-১২ । কালীদহের বিরামকুঞ্জ (রাজনগর)
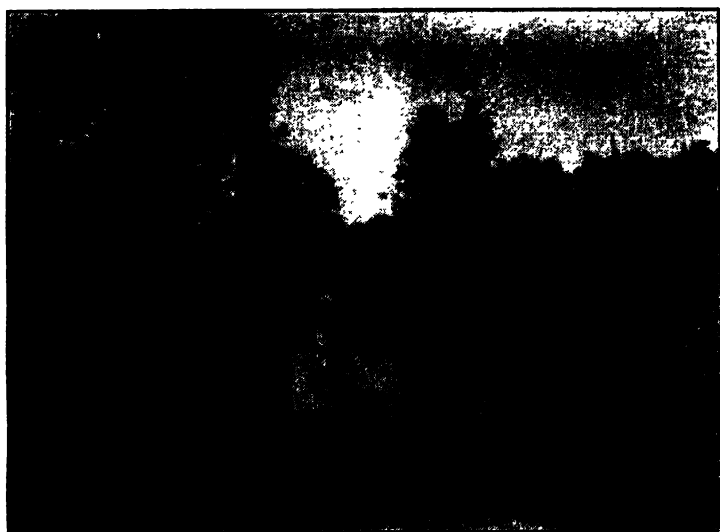
চিত্র-১৩ । ঘাটদুর্লভপুরের ঘাটি

চিত্র-১৪ । রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ (রাজনগর)
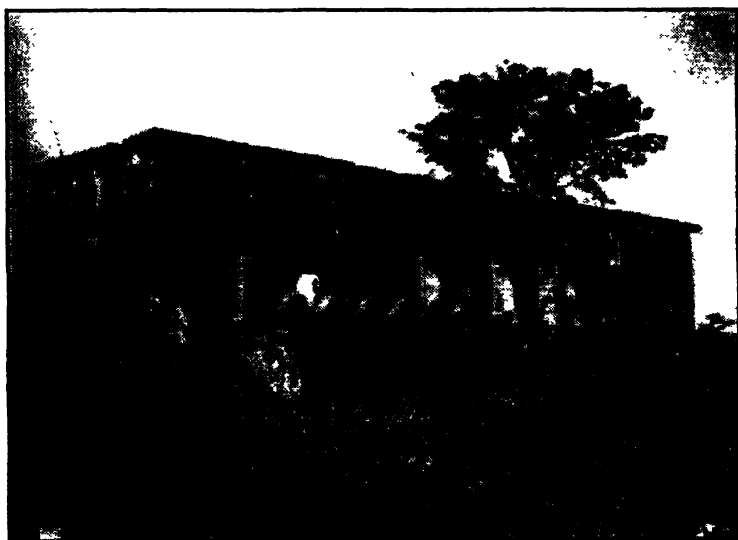
চিত্র-১৫ । ইমামবাড়ার ভগ্নাবশেষ (রাজনগর)
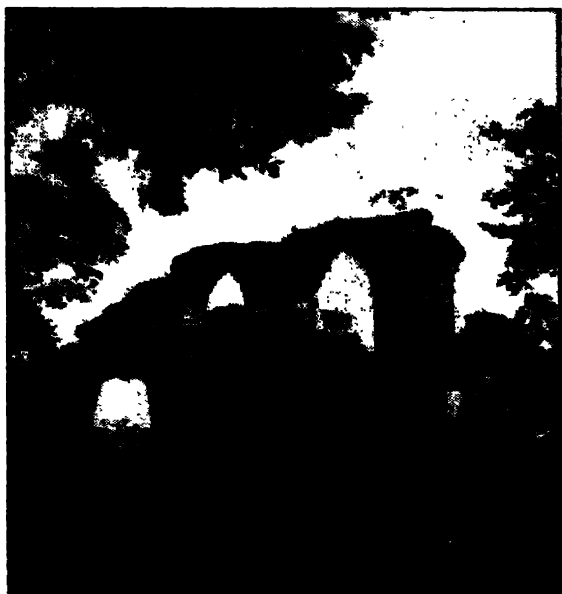
চিত্র-১৬ । তোরণের ভগ্নাবশেষ (রাজনগর)
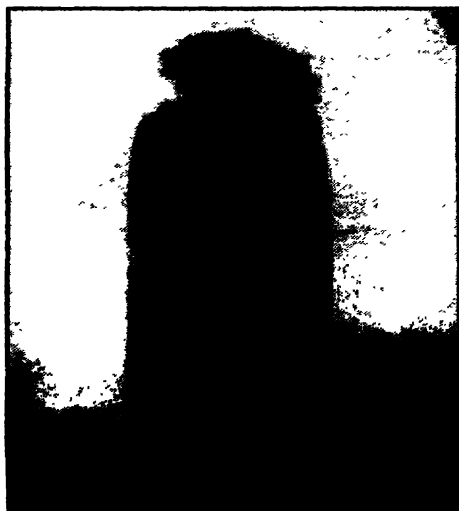
চিত্র-১৭ । ইছাই ঘোষের দেউল (ঢেকুর)
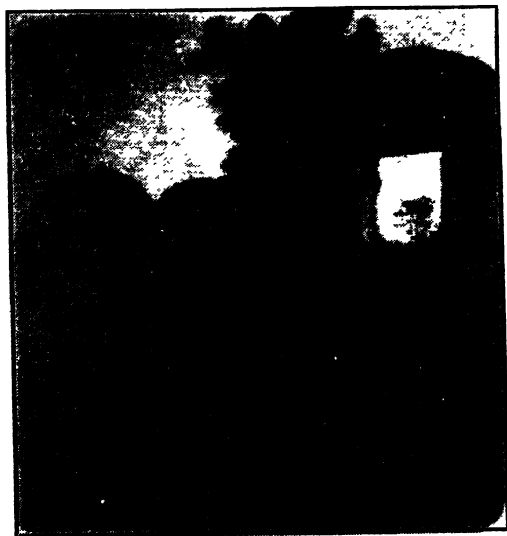
চিত্র-১৮ । চীপ্ সাহবের কারখানার ভগ্নাবশেষ – সুরুল

চিত্র-১৯ । চীপ্ সাহবের সমাধি – গনুটিয়া কুঠী

চিত্র-২০ । রেশমের কুঠী – গনুটিয়া

চিত্র-২১ । রেশম-কুঠীর ভিতরের একটি দৃশ্য – গনুটিয়া
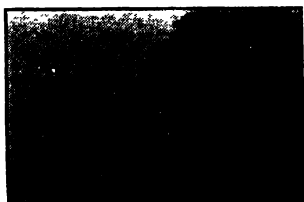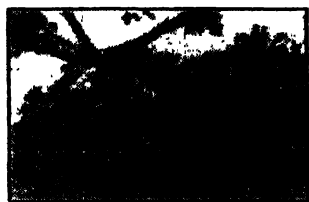
চিত্র-২২ । বাহিরের দৃশ্য – গনুটিয়ার কুঠী

চিত্র-২৩ । হেনরী আর্স্কাইন – ইলামবাজার
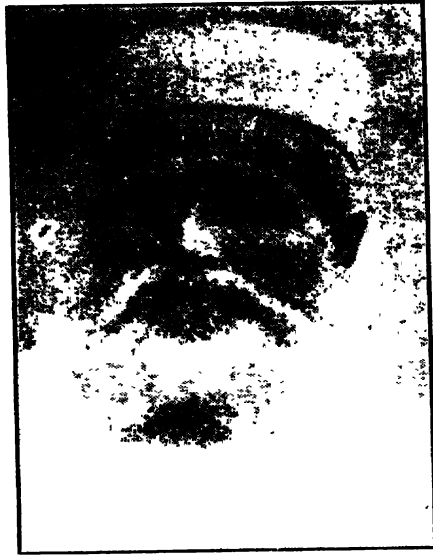
চিত্র-২৪ । রাজা সাহেব — রাজনগর

চিত্র-২৫ । মহম্মদবাজারের কতিপয় ঘাটোয়াল

পরিশিষ্ট

নতুন প্রকাশনার সংযোজন

বীরভূমের জাতি-প্রসঙ্গ

শ্রী গৌরীহর মিত্র

বীরভূমে যে সমস্ত বিভিন্ন জাতি বাস করে তন্মধ্যে কতকগুলির আচার-ব্যবহার রীতিনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

ঢেকারু - বীরভূমের লাঙ্গুলে, বেড়েলা, কানমোড়া, মহুলা, জাহানাবাদ, রামপুর, টাপডুমরো, কুইড়ে (কুণ্ডিরা), হরিপুর, কুখুটিয়া, বান্দরশুলী, মল্লিকপুর, ভাদুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে সহস্রাধিক ঢেকারু জাতির লোকের বাস। এই জাতির আদি নিবাস কিন্তু বীরভূম নহে। মহম্মদবাজার, ডেহুচা, ডামরা, গণপুর প্রভৃতি গ্রামে লৌহ-নিষ্কাশন জন্য ইহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম দেশ হইতে আনীত হয়। লৌহ-নিষ্কাশন ইহাদের জাতীয় ব্যবসায় এবং লৌহশিল্পের জন্মদাতা বলিয়া ইহাদিগকে "জন্মকার" বা "কর্ম্মকার" বলা হয়। আবার অতিরিক্ত মদ্যপান হেতু ইহারা ঢিকার (ঢক্ ঢক্ করিয়া মদ্যপান করা) জাতি বলিয়া অভিহিত হয়। তৎকালে কয়েক বৎসর এ জেলার উপরি-উক্ত বিভিন্ন স্থানসমূহে লৌহ নিষ্কাশিত হইবার পর কারখানাগুলি বন্ধ হইয়া গেলে ইহারা স্ত্রীপুরুষে দস্যুবৃত্তির দ্বারা জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় রত হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই ইহাতে তাহারা বিশেষ দক্ষ হইয়া উঠে। কিন্তু সরকার বাহাদুরের অক্লান্ত চেষ্টায় ইহারা এই নিন্দনীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহারা লোহার জিনিষ এবং মিশ্রিত পিতলের মাপা সের, পাই, পোয়া ইত্যাদি তৈরি করিয়া থাকে।

ইহারা দেখিতে বলিষ্ঠকায় এবং মাল বাগ্দীদের অপেক্ষা ইহাদের আকৃতি সুন্দর। ইহাদের গায়ের রঙ ময়লা। ইহাদের মেয়েদের দেহের গঠনও সুঠাম এবং মজবুত। ইহারা এ জেলায় আসিয়া বাংলা শিখিয়াছে, তবে ইহারা নিজেদের মধ্যে ভাঙা খোট্টাই ভাষার মত এক প্রকার ভাষায় কথা বলে।

ইহাদের টটেম বা সগোত্র মেষ। এই হেতু ইহারা মেষ ভক্ষণ করে না, তবে শূকর ও গোমাংসে ইহাদের আপত্তি নাই। চিচিঙ্গা এবং বেনে কুমড়া ইহাদের অভক্ষ্য ও অস্পৃশ্য। কারণ তাহাদের মতে প্রথমটি মেষের শৃঙ্গ এবং দ্বিতীয়টি

মেষের উদর। ইহাদের গোত্র এবং উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, এক কামার ভোজে মেষ-মাংস পরিবেশন করিবার অভিলাষ করিয়া একটি মেষ বলি দিলে ঐ দ্বিখণ্ডিত মেষ তৎক্ষণাৎ আকাশে উড়িয়া গিয়া তিন বার ঘুরপাক খাইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। সেই অবধি ইহাদের ধারণা যে মেষ তাহাদের আদি পুরুষ। আর কামার মেষ-ঘাতক বলিয়া সমাজ-পরিত্যক্ত হয় ও অপর দল স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়।

ইহাদের মেয়েরা ঘরের বাহিরে অপরের কোন কাজকর্ম্ম করে না। ঢেকারু জাতির মধ্যে "সাঙ্গা" বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও তাহা নিতান্তই বিরল। কেবলমাত্র বালিকা-বিধবাদের সাঙ্গা দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

অতি অল্প বয়সেই ইহাদের বিবাহ হয়। বিবাহে বরপক্ষকে কন্যাপক্ষের হস্তে অবস্থাবিশেষে চারি টাকা হইতে ষাট টাকা পর্য্যন্ত পণ বাবদ দিতে হয়। বরপক্ষ নিতান্ত দরিদ্র হইলে কন্যাপণের হাত হইতে রেহাই পায়। পাছে জাত্যন্তর গ্রহণ করে এই আশঙ্কায় তাহাকে উক্ত দাবি হইতে নিস্কৃতি দেওয়া হয়।

ঠাকুর, গুরু বা সমাজের প্রধান ব্যক্তির দ্বারা বিবাহের দিন স্থির করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে বরের দক্ষিণ হস্তের এবং কন্যার বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নখ ব্যতীত অপর সমস্ত অঙ্গুলির নখগুলি কাটিয়া ফেলা হয়। এই অনুষ্ঠানের পরে বর কন্যার বাড়ী বিবাহ করিতে যায়। বিবাহস্থলে পাঁচটি আম্রকলস পূর্ব্ব হইতেই বসানো থাকে। বর আসিবামাত্রই উক্ত কলসগুলির মধ্য হইতে, "ছামানি" কলসের জল তাহার মস্তকে ছিটাইয়া দিয়া বসিবার আসন দেওয়া হয় এবং কন্যাকে বরের নিকট আনা হয়। পরে বর-কন্যাকে কাপড় বা চাদর আবৃত করিয়া পরামাণিক বরের দক্ষিণ হস্তের এবং কন্যার বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগ লম্বালম্বি ভাবে কাটিয়া দুই-এক বিন্দু রক্ত বাহির করিয়া দেয় এবং দুই-চারিটি আতপ ঐ রক্ত দ্বারা সিক্ত করিয়া লয়। এই রক্তসিক্ত আতপ লইয়া কন্যার পিতা বা তাহার অনুপস্থিতিতে অন্য কোন অভিভাবক বরকন্যাকে আশির্ব্বাদ করে এবং পরে কিছু কাঁসা, পিতলের বাসন, সামান্য চাউল ও দুই-একটি টাকা বরকে দেয়। বর এইগুলি গ্রহণ করিয়া কন্যার কপোলদেশ সিন্দুররঞ্জিত করিয়া তাহার মাথায় ঘোমটা দিয়া দেয়। এই ভাবে বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিয়ের ভোজে মদ না হইলে চলে না। যেমন করিয়াই হোক মদ যোগাড় করিতে হয়।

ইহারা মৃতদেহ দাহ করে এবং দশ দিন অশৌচ পালন করিয়া থাকে। অশৌচান্তে পশ্চিম হইতে খোট্টা নাপিত আসিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া যায়। খোট্টা নরসুন্দর না হইলে ইহাদের অশৌচ দূর হয় না। অন্য সময় এরূপ কড়াকড়ি বিধান দেখা যায় না। অশৌচান্তে গুরু এবং নাপিতকে যৎসামান্য অর্থদানের ব্যবস্থা আছে।

ঢেকারুরা অনেকেই গলায় মালা ও মস্তকে শিখা ধারণ করিলেও ইহারা কিন্তু নিরামিষাশী নহে। খয়রাশোল থানার ভাদুলিয়া গ্রামের বৈষ্ণব বাবাজীরা ইহাদের গুরুগিরি করিয়া কিছু উপার্জ্জন করে।

মনসা ইহাদের উপাস্য দেবতা. মাঘ মাসে অশ্বত্থমূলে ইহারা বেদী নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার উপর আলিপনা আঁকিয়া নিরাকার মনসার পূজা করে - বেদীর উপর মনসার কোন মূর্ত্তি স্থাপন করা হয় না। পূজায় বলি দিবার প্রথা নাই। মালবাগ্দীরা কিন্তু এই পূজায় ছাগ ও মেষ বলি দিয়া থাকে।

নরী বা নুরী - হেতমপুর, ইলামবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে নুরী জাতির প্রায় তিন শতাধিক লোক বাস করে। ইহাদের আদি নিবাস পশ্চিম অঞ্চলের কোন প্রদেশ। সম্ভবতঃ গালার কারবার উপলক্ষ্যে বীরভূমে ইহাদের আগমন হয়।

পাটনা এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যাহারা গালার কাজ করে তাহাদিগকে লাহেরী বলে। অনুমান এই লাহেরী শব্দটিই প্রথমে লোরী, লারী এবং ক্রমে নরী বা নুরীরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

ইহারা গন্ধবণিক বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয়। ইহাদের ভিতর গৈঁতালী (গুঁই), ভদ্র, সেন, দাস, লাহা এবং মহলন্দ এই ছয় প্রকার উপাধি দেখা যায়।

গৈঁতালী বা গুঁইদের গোত্র বিষ্ণু, ভদ্রদের বিষ্ণু ও বশিষ্ঠ, সেনদের কুম্ভ, দাসদের বশিষ্ঠ এবং মহলন্দদের মহেন্দ্র বা মাহেন্দ্র।

তন্তুবায় জাতির ন্যায় নুরী জাতির স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই কর্ম্মবিভাগ পূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। নদীয়া কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পের প্রতিযোগিতায় গালার কারবার হটিয়া যাওয়ায় নুরীজাতির কেহ কেহ এখন চাষবাসে রত হইয়াছে।

ইহাদের আচার-ব্যবহার নবশাখ জাতির অনুরূপ। নবশাখদের ন্যায় ইহারাও অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহ দিয়া থাকে। সাঙ্গা বা বিধবাবিবাহের প্রচলন ইহাদের মধ্যে নাই। বীরভূমের লোকেরা ইহাদের ছোঁয়া জল খায় না; কিন্তু অন্যত্র ইহারা জলাচরণীয়।

ইহাদের ব্রাহ্মণ-গুরু আছে। বর্দ্ধমান জেলার ব্রাহ্মণেরা ইহাদের ক্রিয়াকাণ্ডে পৌরহিত্য করিয়া থাকেন।

বগধ, বাগতীত বা বাগ্দী - ইহারা বীরভূমের অতি প্রাচীন জাতি। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি শুনা যায়। একবার পার্ব্বতী নাকি শিবের চরিত্রবল পরীক্ষার জন্য জেলেনীর বেশ ধারণ করিয়া শিবকে দেখা দেন। শিব জেলেনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গ লাভ করেন। পরে, পার্ব্বতী আত্মপরিচয় দিলে শিব ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন যে তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান

বাগ্দীরূপে পরিচিত হইবে এবং মৎস্য ধরিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিবে।

এই জাতির তেঁতুলে, নোড়া বা দুলে বা ডুলে (যাহারা ডুলি বহন করে), কুসমেটো বা কুশাশ্রয় এবং ক্ষেত্রী বা মেটে বা মাহান্তো এই চারিটি শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে তেঁতুলিয়াই শ্রেষ্ঠ। ডুলেরা নিম্নশ্রেণীর বলিয়া গণ্য। ডুলে ব্যতীত অপর তিন শ্রেণীর ভিতর বিবাহের আদান-প্রদান আছে। ত্রয়োদশা নামক আরও একটি শ্রেণীর কথা শুনা যায়। এদের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে মজার গল্প প্রচলিত আছে ঃ- শিবের নাকি কতকগুলি উপপত্নী ছিল। পার্ব্বতী ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া এই উপপত্নীদের অনিষ্টসাধন করিতে আরম্ভ করিলে শিব তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলেন যে, তাঁহার গর্ভে অচিরেই একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করিবে। ফলে পার্ব্বতীর যমজ সন্তান জাত হয়। এই যমজ ভ্রাতা-ভগিনী পরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইহাদের মিলনের ফলে বিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বীরের জন্ম হয়। হাম্বীরের চারি কন্যার নাম শান্তু, নেতু, মান্তু ও ক্ষেতু। এই চারি জন হইতেই উপরিউক্ত চারি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ইহাদের চার শ্রেণীকেই এক হুঁকায় তামাক খাইতে দেখা যায়।

ইহারা মাছ ধরে, চৌকিদারের কর্ম্ম করে, পাল্কী বহন করে, চাষবাস করে, চূণ তৈয়ারি করে এবং মজুর খাটে। মৎস্য ধরাই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা নয়। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য নানাপ্রকার কর্ম্মে ইহারা লিপ্ত হয়। ইহাদের মেয়েরা জালি লইয়া পুকুরে ছোট ছোট মাছ ধরিয়া যৎসামান্য রোজগার করিয়া থাকে।

ইহারা অতি অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেয়। বিবাহের দিন সকালবেলা প্রথমে মহুয়া গাছের সঙ্গে বরের বিবাহের অভিনয় হয়। বর ঐ গাছকে আলিঙ্গন করে, তার পর উহার গায়ে সিন্দুর লেপিয়া দেয় এবং নিজের ডান হাতের কব্জীতে সূতা বাঁধে। বৃক্ষালিঙ্গনান্তে সূতা দিয়া মহুয়া পত্র বাঁধে। সন্ধ্যার সময় মিছিল করিয়া বর কন্যার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়। শোভাযাত্রা বাড়ীর উঠানে উপস্থিত হইলে কন্যাপক্ষীয়েরা তাহার গতিরোধ করে। তখন উভয় পক্ষে কৃত্রিম যুদ্ধ হয়' সকল ক্ষেত্রে বরপক্ষই জয়লাভ করে - ইহাই রীতি। শালপল্লবরচিত কুঞ্জের চারি দিকে তেল হলুদ প্রভৃতি রাখিয়া দেওয়া হয়। এই সময় কিছু মাছ দেখাইয়া মেয়েরা বরকে সাদরে অভ্যর্থনা করে। এইরূপ অভ্যর্থনাকে 'হেতুতি' বলে। ছাঁদনাতলায় একটি ছোট চৌকা গর্ত্ত খনন করা হয়। কনে পল্লবগুচ্ছ হস্তে বিবাহস্থলে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থান শত বার প্রদক্ষিণ করে এবং পরে গর্ত্তটিকে মধ্যস্থলে রাখিয়া বরের মুখোমুখি বসে। পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়া বরকনে উভয়ের এবং কনের কোন বয়োজ্যেষ্ঠা আত্মীয়ার ডান হাত একসঙ্গে বাঁধিয়া কন্যাসম্প্রদানপূর্ব্বক বরকনেকে আশীর্ব্বাদ করেন। বর সিন্দুরের কৌটা বাম হস্তে লইয়া কনের কপালে ও সিঁথিতে তিন বার সিন্দুর লেপিয়া দিয়া

তাহার মাথায় ঘোমটা টানিয়া দেয়। পরে পরস্পর পরস্পরকে ফুলের মালা উপহার দিয়া থাকে। পরদিন বর বধূকে লইয়া নিজ বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বিবাহের পর চার দিন পর্য্যন্ত বর-কনের গাঁটছড়া বাঁধা থাকে।

তেঁতুলে বাগ্দী ব্যতীত অপর সকল শ্রেণীর ভিতর বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাবিবাহে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। বর-কনে সামনাসামনি হইয়া মাদুরের উপর বসে এবং একে অপরের কপালে হলুদ ও জল ঠেকাইয়া দেয়। পরে চাদর দিয়া বর-কনেকে আচ্ছাদিত করা হইলে বর কনের বাম হস্তে "নোয়া" (লৌহ-বলয়) পরাইয়া দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিধবা ইচ্ছা করিলে তাহার দেবরকেও সাঙ্গা করিতে পারে।

উপযুক্ত কারণ ঘটিলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইতে পারে। সাধারণতঃ স্ত্রী বন্ধ্যা, অসতী, অবাধ্য বা সামাজিক বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে স্বামী তাহার হস্ত হইতে "নোয়া" খুলিয়া লইয়া একটি কাষ্টখণ্ড দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলে। স্ত্রী ছয় মাস পর্য্যন্ত খোরপোষের দাবি করিতে পারে এবং সে ইচ্ছা করিলে পুনরায় বিবাহও করিতে পারে।

কেহ কোনরূপ অন্যায় আচরণ করিলে সমাজের মাতব্বরগণ তাহার অপরাধের বিচার করে, তাহাদের বিধান অনুযায়ী দোষীকে জরিমানা দিতে হয়। অন্যথায় সে সমাজচ্যুত হয়।

সাধারণতঃ ইহারা শবদেহ নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দেয় বা মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলে, অনেকেই আবার শব দাহ করিয়া অস্থি বা ভষ্মাবশেষ গঙ্গায় নিক্ষেপ করে। তেঁতুলে ও কুশমেটোদের ৩১ দিনে, নোড়া বা দুলেদের ১১ দিনে অশৌচান্ত হয়।

ইহারা শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে বেলগাছের তলায় বেদী নির্ম্মাণ করিয়া উপদেবতার পূজা করে এবং তদুপলক্ষ্যে ছাগ, মেষ প্রভৃতি বলি দেয়। তাহাদের নিজ সম্প্রদায়েরই একজন পূজা করে। পূজাকালে তাহার উপর দেবতার ভর হয়। এই সময় পূজাস্থানে বহু স্ত্রী-পুরুষকে সমবেত হইতে দেখা যায়।

এতদ্ব্যতীত ইহারা দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা, ষষ্ঠী ঠাকরুণ, জগদ্ধাত্রী, কার্ত্তিক, মনসা প্রভৃতি বিভিন্ন দেবদেবীর ও ধর্ম্মরাজের পূজা করিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, মাঘ ও চৈত্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ষাট পূজা এবং ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও চৈত্র মাসে লক্ষ্মীপূজা করিয়া থাকে।

ইহাদের ভিতর শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের লোকই আছে। তবে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভূক্ত অনেকেও মদ্যপান করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাথায় শিখা রাখে এবং গলায় মালা পরে। আবার কেহ কেহ ব্যাঘ্রক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে।

মাল - মাল বাগ্দীশ্রেণীর জাতিবিশেষ। ইহাদের মধ্যে (১) রাজছত্রধারী বা ছত্রধারী, (২) রাজবংশী, (৩) মল্লিক, (৪) পাহাড়ী, (৫) কোল ও (৬) কাদর এই ছয়টি শ্রেণী আছে। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের আদানপ্রদান নিষিদ্ধ এবং এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোকের রান্না ভাত খায় না, এমন কি দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক এক হুঁকায় ধূমপান পর্য্যন্ত করে না।

ইহারা মৎস্যশিকার, চাষবাস, জনখাটা, চৌকীদারী-কার্য্য ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। রাজছত্রধারীরা মালীর কাজ করিয়া থাকে। ইহাদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীতে গরু, ছাগল, মেষ প্রভৃতি নানা গৃহপালিত জীবজন্তু থাকে।

উপরি-উক্ত শ্রেণীসমূহের মধ্যে মল্লিকরাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই বিধবাবিবাহের রেওয়াজ আছে। তবে সাধারণতঃ বিপত্নীকেরাই বিধবাকে 'সাঙ্গা' করিয়া থাকে। ইহাদেরও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত আছে। ইহারা কালী, দুর্গা, মনসা প্রভৃতি দেবীর পূজা করিয়া থাকে। উপদেবতার উপাসনাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। ইহারা প্রেত-পূজায় মুরগী বলি দেয় বটে, কিন্তু ইহারা হিন্দুধর্ম্মমতে নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্যাদি আহার করে না। ইহাদের অনেকের গলায় মালা আছে।

ইহারা শব দাহ না করিয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করে।

কেবট বা কৈবর্ত্ত - মনুসংহিতায় দেখা যায় যে, নিষাদ জাতীয় এক পুরুষ মৃত-বস্ত্র-পরিহিতা কদর্য্যান্ন-ভক্ষণকারিণী স্ত্রীর গর্ভে নৌকর্ম্মজীবী দাস বা মার্গব নামক পুত্র উৎপাদন করে। আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী মানবগণ তাহাকে কৈবর্ত্ত জাতীয় বলে। পরশুরাম সংহিতায় লিখিত আছে, স্বর্ণকার পুরুষ ও কুবেরিণী নারীর মিলনের ফলে জাত সন্তান কৈবর্ত্ত জাতীয় নামে পরিচিত। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে যে, গোপ পুরুষ এবং শূদ্র স্ত্রীলোকের মিলনে ধীবর অর্থাৎ কৈবর্ত্ত এবং শুড়ি এই দুই জাতির উৎপত্তি হয়। আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে যে, ক্ষত্রিয় পুরুষ দ্বারা বৈশ্য নারীর গর্ভে কৈবর্ত্তের জন্ম হয়।

এই জাতি বীরভূমের বহু পুরাতন অধিবাসী হইলেও ইহাদের আদি নিবাস কিন্তু উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। ইহাদের মধ্যে কেহ চাষী কৈবর্ত্ত, কেহ জেলে কৈবর্ত্ত - কেহ বা আবার চাষবাস এবং মৎস্যশিকার এই উভয় বৃত্তি দ্বারাই জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। ইহাদের প্রধান বৃত্তিই হইল খানা-ডোবা বিল পুকুর ও নদী হইতে বিভিন্ন উপায়ে মৎস্যশিকার করা।

ইহারা শুধু কৈবর্ত্ত নামেই অভিহিত হয় না। ইহাদের পরিচয়জ্ঞাপক নিম্নোক্ত আটটি নাম পাওয়া যায়। (১) ধৈবর বা ধীবর (যাহারা সরোবরের দুই দিকে জাল বাঁধিয়া মাছ ধরে), (২) দাস (বঁড়শী দিয়া যাহারা মাছ ধরে), (৩)

বৈন্দ (বৃক্ষসমূহের নিকটস্থ জলে বিন্দুজাল দিয়া যাহারা মৎস্যশিকার করে), (৪) শৌষ্কল (শুষ্কল বঁড়শী দ্বারা মাছ ধরা যাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়), (৫) কৈবর্ত্ত (বড় জালের সাহায্যে যাহারা মাছ ধরে), (৬) মার্গার (ইহারাও জাল দিয়া মাছ ধরে), (৭) আন্দ (ঘাটে 'সাঙ্কু' বাঁধিয়া যাহারা মাছ ধরে) ও (৮) পর্ণক (বিষাক্ত পাতা জলের উপর ফেলিয়া যাহারা মাছ ধরে)। কিন্তু আমাদের এখানে মাত্র কৈবর্ত্ত, দাস, মার্গার প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়।

এই জাতির স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই মৎস্য বিক্রয় করিতে দেখা যায়। বড় বড় কাতলা মাছ পাইলে ইহারা তাহার মুখের ভিতর হাত পুরিয়া তালুর তৈলযুক্ত অংশ বাহির করিয়া লইয়া কাঁচাই গিলিয়া ফেলে।

এই জাতির ছেলেমেয়েদের অতি শৈশবেই বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সাঙ্গার প্রচলন নাই।

ইহারা প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে পচুই মদ খায়। এই জাতির প্রায় সকলেই নিরক্ষর, তবে আজকাল কেহ কেহ মাত্র নিজের নাম সহি করিতে পারে।

সদ্গোপ - এই জাতির প্রাচীন নাম গোপ। ইহারা সৎশূদ্র বলিয়া পরিচিত। পরাশরসূত্রে লিখিত আছে যে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্র-কন্যার গর্ভে জাত পুত্রকে সদ্গোপ বলিয়া জানিবে। ইহাদের আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলার গোপভূম পরগণা।

অতি প্রাচীনকালে ইহারা বীরভূমে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। এই জাতি নবশাখ বা নবশায়ক নামে গণ্য। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ইহাদের হাতে জল খায় এবং ইহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণরক্ষা করে। কৃষিকার্য্যই ইহাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। ইহাদের মধ্যে বিত্তশালী ব্যক্তি ও জমিদারের অভাব নাই। এই জাতির উপাধি মণ্ডল, ঘোষ, রায়, রায়চৌধুরী প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে অনেকেই লেখাপড়া শিখিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। ঘোষ উপাধিধারী সদ্গোপগণ নীলপুরের ঘোষ বলিয়া খ্যাত। এ সম্বন্ধে একটি ছড়াও প্রচলিত আছে। তাহা এই :-

ধন্য ধন্য বর্দ্ধমান,
চার চণ্ডী বিরাজমান,
উত্তরে কনকা নদী,
মধ্যে গঙ্গা ভাগরথী,
দেখ প্রভু সনাতন
অনেকে করিয়া রণ
রণ করি নীলপুরে যায়,
নীলপুরে গিয়া দেখি চামারের স্থান,
এক দিকে বসিলেন যত মুনিগণ
অপর দিকে বসিলেন গোপের নন্দন।

মৃত্তিকা খুঁটিয়া দেখ নাহি কোন দোষ,
সেইজন্য বলি মোরা নীলপুরের ঘোষ।

ইহাদের ভিতর সাঙ্গা বা বিধবাবিবাহের প্রচলন নাই।

ভল্ল - লাভপুর ও মৌড়েশ্বর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রধানতঃ এই জাতির বাস। পূর্ব্বে এদেশে সেন প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিধারী যে সমস্ত সামন্ত রাজা রাজত্ব করিতেন, ইহারা তাঁহাদের অধীনে সৈনিকের কর্ম্ম করিত। ইহারা ভল্ল লইয়া যুদ্ধ করিত বলিয়া ভল্ল বা ভল্লা জাতি নামে পরিচিত হয়। ইহাদের বর্ত্তমান আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়াও ইহাদিগকে বীর ও সাহসী বলিয়াই মনে হয়। বাগ্দী-জাতির সহিত নানা দিক দিয়া ইহাদের সাদৃশ্য আছে। বাগ্দীদের সহিত এক হুঁকায় তামাক খাইলেও ইহারা নিজেদের বাগ্দী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া মনে করে।

বাগ্দী-জাতির মত ইহারা মৎস্যশিকার বা পাল্কীবাহকের কার্য্য করে না। ইহারা জন খাটিয়া, চাষবাস করিয়া জীবিকার সংস্থান করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই চৌকীদারী ও সূত্রধরের কর্ম্ম করিয়া থাকে। ইহাদের জীবিকা অর্জ্জনের অন্যতম উপায় হইতেছে দস্যুবৃত্তি। ইহাদের মধ্যে অনেক ওস্তাদ লাঠিয়াল আছে।

বাগ্দী-জাতির ন্যায় ইহারাও মদ্যপানে বিশেষ আসক্ত।

লেট - তীবর পুরুষ ও তৈলকার স্ত্রীর মিলনে দস্যু লেটজাতির উৎপত্তি। ইহারা মালবাগ্দীর সমস্তরের জাতি। রামপুরহাট মহকুমা অঞ্চলে প্রধানতঃ ইহাদের বাস। ইহাদের মধ্যে লিতু বা নেতু, ক্ষেতু, শান্ত এবং মস্ত - এই চারিটি শ্রেণী বা থাক্ আছে। তবে এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর বিবাহ সম্বন্ধীয় সম্পর্কের আদান-প্রদান হয় না। এমন কি সমশ্রেণী ব্যতীত অপর শ্রেণীর রান্না পর্য্যন্ত ইহারা খায় না। ইহারা ডাকাতি, দিনমজুরি, জালবোনা, মাছ ধরা প্রভৃতির দ্বারা জীবিকার সংস্থান করে। মালবাগ্দীর সমজাতি হইলেও ইহারা তাহাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া আহার করে না। বাগ্দীরা বলে যে, তাহাদেরই একশ্রেণী হইতে লেট জাতির উৎপত্তি; কিন্তু লেট জাতির লোকেরা এ কথা স্বীকার করে না।

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে বা তাহার খোরপোষের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে। মনসা এবং ধর্ম্মরাজের প্রতি ইহাদের বিশেষ ভক্তি। ইহারা সমারোহের সহিত উক্ত দেবতাদ্বয়ের পূজা করিয়া থাকে।

সাঁওতাল জাতি - এই জাতির সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ বাংলা মাসিক পত্রিকাদিতে বাহির হইয়াছে।

ধাঙ্গড় - এই জাতির লোকদের বীরভূমের বহু স্থানেই দেখা যায়। ইহাদের আদি নিবাস পশ্চিম অঞ্চল। ধাঙ্গড় জাতির মুদি কোড়া, কুন্নি কোড়া, ধাঙ্গড় ও

সাঁওতাল - এই চারিটি শ্রেণী বা থাক্ আছে। এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর বিবাহ হয় না। কথিত আছে যে, ইহারা পূর্ব্বে দীঘি, জলাশয় প্রভৃতি খনন করিত। এইজন্য ইহাদের কোড়া (খোঁড়া বা খনন হইতে) পদবী হইয়াছে। সাঁওতাল জাতির ন্যায় ইহারা সহজে কাহারও উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে না। তবে বিবাহাদি উপলক্ষে ইহারা যে পক্ষের পাল্কী বহন করে সেই পক্ষের বাড়ীতে ভোজন করে।

ইঁদুর ধাঙ্গড় জাতির প্রিয় খাদ্য। ইহারা মদ্যপানে বিশেষ আসক্ত, সারাদিন মজুর খাটিয়া দিনান্তে ইহারা প্রচুর পরিমাণে মদ খায় এবং পরদিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখে। সকালে উঠিয়াই উহা গরম করিয়া গলাধঃকরণ করে। ভাতের সঙ্গে ইহারা ব্যাঙ বা ইঁদুরপোড়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত খাইয়া থাকে। ইহারা দুর্গা, কালী, শিব, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করে। ইহাদের বিবাহে বরপণের রেওয়াজ আছে। কনের বয়স কমপক্ষে ১০/১২ বৎসর এবং বরের বয়স ২০/২২ বৎসর হওয়া উচিত। বিবাহে কন্যাপক্ষের তরফ হইতে ছেলের বাপকে পণস্বরূপ ৭৷৷০ টাকা দিতে হয়। ঐ পণ দিতে না পারিলে বিবাহ হয় না। বিবাহে বরপক্ষকে রূপার ও পিতলের গহনা দিতে হয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বরযাত্রী যায়। বিবাহে কর্ত্তা নিজেই পুরোহিতের কর্ম্ম করে। ইহাদের স্বতন্ত্র পুরোহিত নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহের সময় বর গাছের উপর চড়িয়া বসিয়া থাকে ; আর কনে নীচে হইতে বরকে ডাকিয়া বলে-

গাছে থেকে নাম তুমি
মাটি কেটে খাওয়াব আমি।

বিবাহের সময় মাদলের বাজনা ও গীত হয়। মেয়েরা গীতচ্ছলে বরপক্ষকে উপলক্ষ্য করিয়া ঠাট্টা-তামাশা করিয়া থাকে। কোন পরিবারে সন্তানের জন্ম হইলে ইহারা অশৌচ পালন করে। সাধারণতঃ বার কিম্বা মাসের নামে ইহাদের ছেলেমেয়েদের নামকরণ হয়। ইহাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা নাই। তবে বিধবাবিবাহ বা সাঙ্গা আছে। পুরুষ যত বার ইচ্ছা তত বার বিবাহ করিতে পারে।

ইহারা শবদাহ করে, ক্ষেত্রবিশেষে গোরও দেয়। ইহারা দশ দিন অশৌচ পালন করিয়া শ্রাদ্ধক্রিয়াদি সম্পন্ন করে। এই সময় জ্ঞাতি-কুটুম্বদিগকে ভাত আর মদ খাওয়াইতে হয়।

ইহারা স্ত্রীপুরুষ উভয়ে প্রধানতঃ মাটি কাটিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। চাষবাসের কাজও ইহারা করিয়া থাকে। ধাঙ্গড় মেয়েরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। ইহারা এক মুহূর্ত্তও আলস্যে অতিবাহিত করে না। অবসর সময়ে ইহারা খেজুর পাতার মাদুর বুনিয়া বাড়তি বেশ দু'পয়সা উপায় করিয়া থাকে। মাঠে ধান তুলিবার

সময় উঞ্ছবৃত্তি দ্বারাও ইহারা ধান্যসংগ্রহ করে। সাঁওতাল জাতির মেয়েদের ন্যায় এই জাতির মেয়েরাও গাছে চড়িতে অভ্যস্ত। ইহারা সূর্পের সাহায্যে ধান-চাউলের ধূলাবালি পৃথক করিতে ওস্তাদ। ধাঙ্গড় স্ত্রীলোকেরা শিশুসন্তানগুলিকে কাপড় দিয়া পিঠে বাঁধিয়া লইয়া কাজকর্ম্ম করিতে বাহির হয়। ইহারা খুব কর্ম্মঠ। সাঁওতাল জাতির ন্যায় ইহারা কখন কখন গো-মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে।

ইহাদের নিজস্ব ভাষা থাকিলেও বাঙালীর সান্নিধ্যে বাস করায় ইহারা বাংলা বুঝিতে ও বলিতে পারে। সাঁওতালদের ন্যায় ইহারা ২০-র বেশী গুনিতে পারে না। ২০-র বেশী গুনিতে হইলে 'এক কুড়ি এক' 'এক কুড়ি দুই' এই ভাবে গণিয়া থাকে।

ডোম - লেট জাতীয় পুরুষের ঔরসে চণ্ডাল-কন্যার গর্ভে হাড়ি ও ডোম এই দুই সন্তানের জন্ম হয়।

সদ্যশ্চাণ্ডালকন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ শৌনক।
বভুবতুস্তৌ দ্বৌ পুত্রৌ দুষ্টৌ হড্ডি ডোমৌ তথা॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ

ইহারা নিজেদের উৎপত্তি ও আদি বাসস্থানের বিষয় কিছুই বলিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে 'বিশ ডেলে' 'আকুড়ে' 'শাজুনে' ও 'বাজুনে' এই চারিটি থাক্ দেখা যায়। শাজুনেরা ঝুড়ি, টোকা, পেছি, ডালি, পাখা, খাঁচা, লাটাই, চিক, জাফরি প্রভৃতি বুনিয়া থাকে। বাজুনেরা নহবৎ, ঢোল, কাঁসর, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাদন করে। ইহাদের সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ইচ্ছা করিলে ইহারা শালীকে বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পুরোহিত আছে। পুরোহিত-ঠাকুরকে ইহারা "ধরম পণ্ডিত" বলে। বিবাহে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে।

ডোমজাতির মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের লোকই আছে। ইহারা কালী, সরস্বতী, মনসা এবং বিশ্বকর্ম্মার পূজা করে। বিশ্বকর্ম্মাকে ইহারা "বিশ্যকম্‌কর" বলে। ইহারা যে ছোট কাটারি দিয়া বাঁশ কাটে এবং বাঁশের শিল্পদ্রব্যাদি তৈয়ারি করে সেটি ভাদ্র মাসের শেষ দিনে বিশ্বকর্ম্মার পূজায় নিবেদন করে। ইহাদের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন লোকেরা মৃতদেহ দাহ করিয়া তাহার ভস্ম বা অস্থি লইয়া গঙ্গায় দিয়া আসে। সাধারণ গরীব লোকেরা শব নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দেয়। ইহারা গাভীকে "মা লক্ষ্মী" বলে এবং গোজাতিকে বিশেষ সম্মান করে।

ঢোল, কাঁসর, সানাই, রসুনচৌকী, নহবৎ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদন এবং বাঁশের নানাবিধ শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ ইহাদের জাতীয় ব্যবসায়।

হাড়ি - ময়লা পরিস্কার করা হাড়িদের জাত-ব্যবসা, কিন্তু বীরভূমের হাড়িরা সকলেই মেথরের কর্ম্ম করে না। এখানে (১) ভুঁইমালী, (২) দাই বা ফুল

হাড়ি, (৩) কাহার এবং (৪) মেথর এই চারি শ্রেণীর হাড়ি আছে। শেষোক্ত শ্রেণীর হাড়িরাই মেথরের কর্ম্ম করিয়া থাকে। মেথর-হাড়িরা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা - বাঙালী, মঘয়া ও বাঁশওয়ারী। কাহার-হাড়িরা সূত্রধরের কর্ম্ম করে। কাহার ও দাই-হাড়ির ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে। ইহাদের মধ্যে কালীভক্তের সংখ্যাই বেশী। ইহারা স্ত্রীপুরুষ সকলেই একসঙ্গে বসিয়া সন্ধ্যার সময় হাঁড়ি হাঁড়ি পচুই মদ খায়। ইহারা সময় বিশেষে গো-মাংস ও ইঁদুরপোড়া খাইয়া থাকে।

শৈশবেই ইহারা ছেলেমেয়ের বিবাহব্যাপার সম্পন্ন করিয়া ফেলে। বিবাহ উপলক্ষ্যে স্ত্রী-পুরুষে মদ খাইয়া মাদল বাদ্যের সহিত একসঙ্গে নৃত্য-গীত করে। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে এই জাতির অনেকেই মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

বাউরি - বীরভূমে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার বাউরির বাস। ইহাদের মোলো, ধোলে, গোবরে ও কাহারে - এই চারিটি "থাক্" বা শ্রেণী আছে। প্রবাদ আছে যে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মুনিঋষিদের জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহের কর্ম্ম করিত। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ইহারা অনেকেই ব্যাঙ, শূকর ও গো-মাংস ভক্ষণ করে। ইহারা মুসলমানদের রান্না খায়। ইহাদের মধ্যেও অনেকেই মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

বিবাহের সময় কন্যার কোন পিতৃবন্ধু বরকে কোলে করিয়া ছাদ্‌নাতলায় লইয়া আসে এবং এইরূপভাবে কন্যাকেও তথায় আনা হয়। তৎপরে মালা বদল হইলে বর-কন্যা ঘরের ভিতর যায়। পরদিন কন্যার সিঁথিতে সিন্দুর ও হাতে 'নোয়া' পরানো হয়। ইহাদের সমাজে ছোট মেয়েও কোলে চাপিয়া শ্বশুরবাড়ীতে স্বামীর ঘর করিতে যায়।

ইহাদের সমাজে শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। পিতা-মাতার মৃত্যুর ৩৬ ঘন্টা পরে পুত্র নিমপাতা মুখে দিয়া জ্ঞাতির সহিত ভোজন করে এবং পরে আবার নিমপাতা মুখে দেয়। ইহার পর স্নান করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানে এক গুচ্ছ বেনামূল প্রোথিত করে এবং দশ দিন প্রত্যহ স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই বেনামূলে চাউল, ভিজা ছোলার দানা ও জল নিবেদন করিয়া পুনরায় স্নানান্তে বাড়ী ফিরে।

ইহারা চৈত্র-সংক্রান্তি এবং মহালয়ার দিন পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে।

মুচী - তিবর-পিতার ঔরসে এবং চণ্ডাল-মাতার গর্ভে এই মুচী বা চর্ম্মকার জাতির উৎপত্তি। "তিবরৈপৈঃ চণ্ডালাং চর্ম্মকারো বভূব" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)। ইহারা রুইদাস এবং মুচীরাম দাস নামক দুই সাধু ব্যক্তির বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়।

ইহাদের মধ্যে (১) রুইদাস, (২) গুড়ে, (৩) খোলটা, (৪) শিখুরে, (৫) আদি বা রাঢ়ী ও (৬) কোনাই - এই ছয়টি শ্রেণী আছে।

ইহারা কালী এবং দুর্গার পূজা করে, কিন্তু গো-মাংস খায়।

রুইদাস মুচীদের গলায় মালা আছে। তাহারা সাধারণতঃ তাঁতের কাজ করে। অন্যান্য শ্রেণীর মুচীরা জুতা তৈয়ারি, ঢাক বাদন প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে।

তন্তুবায় - ইহারা তন্ত্রবাপ, তন্ত্রবায়, তন্ত্রী বা তাঁতী নামে আখ্যাত। এই জাতির স্ত্রী-পুরুষ রেশম, তসর ও সূতার থান, শাড়ী, ধূতি, চাদর, গামছা প্রভৃতি বয়ন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে।

ইহারা উত্তর, মধ্যম, বারেন্দ্র ও পূর্ব্বকূল - এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং এই সকল থাকের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। ইহাদের উপাধি দাস, দত্ত, চন্দ্র, কুনার, কুনদাই, পুরো প্রভৃতি। পূর্ব্বোক্ত চারিটি থাক্ ব্যতীত ইহাদের শোনা, ভক্তে, বরবটে, মুসুরে, হাত-বেড়ে প্রভৃতি আরও বাইশটি থাক্ বা শ্রেণী আছে। ইহাদের সমাজে সগোত্র বিবাহের প্রচলন নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ঘৃতাচী বিশ্বকর্ম্মার কোনও আদেশ অমান্য করিলে তিনি তাঁহাকে এই অভিশাপ দেন যে, তাহাকে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ঘৃতাচীও বিশ্বকর্ম্মাকে অনুরূপ অভিশাপ দেন। ফলে, বিশ্বকর্ম্মা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঘৃতাচী ঈশ্বরভক্তিপরায়ণা ছিলেন। একদিন যখন তিনি গঙ্গাতীরে ধ্যানস্থা তখন ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলেন এবং অবশেষে তাঁহারা পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হইয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। ফলে তাঁহাদের মালাকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, কংসকার, শঙ্খকার, তন্তুবায়, সূত্রধর, স্বর্ণকার ও চিত্রকর - এই নয় পুত্রের জন্মলাভ হয়।

ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে এবং গোপমাতার গর্ভে তন্তুবায়দের জন্ম বলিয়া ইহারা বিশ্বকর্ম্মাকে কুলদেবতা বলিয়া পূজা করে। ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীর দিন এই পূজা হয়।

এই জাতি নবশায়ক সম্প্রদায় মধ্যে গণ্য —

"গোপোমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী –

কুনাল কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ।" (পরাশর সংহিতা)

এই জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ-প্রথা নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অধিকাংশই বৈষ্ণব।

তাম্বুলী - তামূলীদের জাতীয় ব্যবসায় পান বিক্রয়। ইহারা তামূলী,

তাম্বুলিক, তাম্বুলী বা তাম্লি নামে পরিচিত।

ইহাদের 'পাড়া গেঁয়ে', 'বিয়াল্লিশ গেঁয়ে', 'চৌদ্দ গেঁয়ে' ও 'গয়লা পেড়ে' – এই চারিটি থাক্ বা শ্রেণী আছে। এই সকল থাকের মধ্যে বিবাহাদির আদান-প্রদান হয়। তামুলীদের কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, মৌদগল্য প্রভৃতি গোত্র আছে। ইহাদের সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে (৩৯, ৯ম অধ্যায় উত্তরখণ্ড) লিখিত আছে যে, বৈশ্য পিতার ঔরসে এবং শূদ্রা মাতার গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি।

"বৈশ্যাত্তু শূদ্রকন্যায়াং জাতস্তাম্বুলিকস্তথা।"

কথিত আছে যে, ইহাদের আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলা। তেলেঙ্গা মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে তথায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিলে ইহারা প্রাণভয়ে দেশত্যাগী হয়। ইহারা বহু দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। ইহারা বিশেষ ঘটা করিয়া বৈশাখী পূর্ণিমায় গন্ধেশ্বরী দেবীর পূজা অর্চ্চনা করে। এই পূজার সময় ইহারা নিজেদের ব্যবহৃত জাঁতিগুলোকে দেবীর মূর্ত্তির নিকটে রাখে। ইহাদের ব্রাহ্মণ-পুরোহিত আছে।

কর্ম্মকার - এই জাতির লোকেদের মধ্যে অধিকাংশই কামারের কাজ করে এবং কেহ কেহ স্বর্ণকারের কর্ম্ম করে। ইহাদের মধ্যে 'মামুদ পুরে', 'উশ তুলে', 'বন পেশে' এবং 'কামালে' – এই চারিটি থাক্ বা শ্রেণী আছে। ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং শূদ্রকন্যার গর্ভে ইহাদের আদিপুরুষের জন্ম।

কথিত আছে, এই জাতির আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলা। এই সময় বর্দ্ধমানাধিপতির সুবর্ণ-তরবারি হঠাৎ ভাঙিয়া গেলে উহা কিরূপে মেরামত হইবে এই চিন্তায় রাজা উদ্বিগ্ন হন। এই সময় এক কর্ম্মকারের এক চণ্ডাল-ভৃত্য ছিল। সে কর্ম্মকারের কাজ বেশ ভালরূপেই জানিত। চণ্ডাল-ভৃত্য ভগ্ন তরবারিখানি এরূপ নিপুণ ভাবে মেরামত করিয়া দেয় যে, তাহা দেখিয়া রাজা পরম সন্তোষ লাভ করেন। কর্ম্মকার তাহার চণ্ডাল-ভৃত্যের কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিলে রাজা তাহাকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিতে আদেশ দেন। চণ্ডাল-ভৃত্য রাজার নিকট আনীত হইলে রাজা তাহাকে পুরস্কার দিতে চাহিলেন। সে পুরস্কারের পরিবর্ত্তে কর্ম্মকার শ্রেণীভুক্ত হইতে চায়। ইহাতে রাজা সম্মতি দিলে কর্ম্মকারগণ অবিলম্বে বর্দ্ধমান পরিত্যাগপূর্ব্বক বিভিন্ন স্থানে গিয়া বসতি স্থাপন করে।

ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ নাই। স্ত্রী গুরুতর অন্যায় করিলে বা ব্যভিচারে লিপ্ত হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। পরিত্যক্তা স্ত্রী অপর স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। স্ত্রী কোন অবস্থায়ই স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে না। ইহাদের কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, আবার কেহ শৈব।

যাদুপতিয়া - ইহা একটি সঙ্করজাতি। মুসলমান ফকিরের ঔরসে ও হিন্দু নারীর গর্ভে এই সঙ্করজাতির উৎপত্তি। ইহাদের আকৃতি হিন্দুর মত। ইহারা অনেকেই হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহারা হিন্দুদের ন্যায় নাম রাখে – কালী, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করে এবং ইহাদের ব্রাহ্মণ-পুরোহিতও আছে। ইহাদের মেয়েরা হিন্দু ললনাগণের মত সিঁথিতে সিন্দুর পরে।

কিন্তু ইহাদের মধ্যে আবার কাহারও আল্লা বা খোদের উপর বিশ্বাস। তাহারা দাড়ি রাখে, মসজিদে যায়, পশু জবাই করে, রোজা রাখে, মৃতদেহ গোর দেয় এবং গোমাংস ভক্ষণ করে।

বিবাহের সময় ইহারা কাজীকে ডাকিয়া আনে। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহারা মুসলমানের রান্না খায়; কিন্তু মুসলমানেরা ইহাদের রান্না খায় না বা ইহাদের ছোঁয়া জল স্পর্শ করে না। মুসলমান এবং যাদুপতিয়াদের মধ্যে বিবাহ হয় না।

রামপুরহাট মহকুমার কোন কোন অঞ্চলে ইহাদের বাস। ইহারা কাঁসার ঘটি, বাটি, অলঙ্কার, কাঁসর, ঘন্টা, লোহার বাটখারা প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ারি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে।

উপরি-উক্ত জাতিগুলি ব্যতীত বীরভূমে নুনিয়া (জনসংখ্যা প্রায় হাজার), সুনরি (সাড়ে চৌদ্দ হাজার), মেহনা, মাড়ব বা ঝালোমালো, ধানুকি, পুস্প বা মধু নাপিত (প্রবাদ আছে যে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মস্তক মুণ্ডন করিবার পর হইতে ইহারা অপর কাহারও ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া হস্ত অশুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই), রাজবংশী, কুড়োল, খয়রা, বেড়ো, বাইতি, কোনাই, দোষাদ, গাবেরি, কালোয়ার, খাতিক, লোহার, মুণ্ডা, ওরাঁও, তুরি প্রভৃতি আরও প্রায় সত্তর প্রকারের জাতি আছে।

* ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী' ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত।

NOTES ON THE

EARLY ADMINISTRATION OF THE DISTRICT OF BIRBHUM.

বীরভূমে ব্রিটিশ শাসনের পদসঞ্চার ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো

সংকলন : ই. জি. ড্রেক-ব্রকম্যান, আই.সি.এস.

[সংকলন : ই জি. ড্রেক-ব্রকম্যান, আইসি.এস., ১৮৯৫-১৮৯৬ এই দুই বছর বীরভূমের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ছিলেন। তাঁর সংকলিত এই অধ্যায়ে ১৮৩০ পর্যন্ত বীরভূমে ব্রিটিশ শাসনের পদসঞ্চার সম্পর্কিত তথ্য। বর্তমানে দুষ্পাপ্য। এই দুষ্পাপ্য নথি রক্ষিত আছে মুর্শিদাবাদ কালেকটরেট গ্রন্থাগারে। তা সংগ্রহ করে দিয়ে ধন্যবাদার্থ হয়েছেন শ্রীমান সৌমিত্র সেনগুপ্ত। বর্তমানে এস. ডি. ও বাঁকুড়া সদর মহকুমা। পুরানো দিনের ইংরাজী। তাই ইংরাজীতেই এই দুষ্প্রাপ্য নথি প্রকাশ করা হল। – সম্পাদক।]

PREFACE

These notes were compiled from the volumes of correspondence in the offices of the Magistrate and Collector of Birbhum during the short period I occupied that post in 1895 and 1896. Of thc numerous volumes which had to be examined, some only contained matters of routine and others nothing of importance or interest. Perhaps another officer may be inclined to carry on the notes from the year 1830, which is the latest period to which these refer.

Gaya, 1898. E. G. DRAKE-BROCKMAN,
I.C.S.

I.– INTRODUCTORY.

The affairs of the district of Birbhum were administered from Murshidabad for a period of twenty years after the grant of the Diwani to the East India Company by the Mughal Emperor in 1765. In the year 1785 the collector of Murshidabad complained to the Government of the unsettled state of affairs in Birbhum, and applied for additional troops to enable him to maintain order, and in consequence Birbhum and Bishenpur were formed into a separate district. In 1786 Mr. Foley was collector and Magistrate, and in the following year Mr. Sherburne. Afterwards for a time the posts of Collector and Magistrate were distinct and held by different officers.

The head-quarters were at Suri; an Assistant, Mr. Hesilrige, was posted to Bishenpur. Many alterations in the area were made from time to time. Bishenpur was severed from Birbhum in 1793, the year of the permanent settlement, and annexed to Burdwan. A few years later the Zamindaries of Patkum, Jelda and Pachete were added to Birbhum. The area of Birbhum, according to the Quinquennial register of 1799, comprised 669 square miles. This was exclusive of Parganas Sarhat and Deoghar which as appears from a later account, extended over 1,114 square miles. The area of the Bishenpur is given at page 461, Vol I, of the "Fifth Report of the Select Committee" as 1,256 square miles.

In 1809 the Collectorship of Birbhum was abolished, and the district again administered from Murshidabad, an Assistant Collector remaining in charge at Suri. This continued till 1820, when Birbhum was reinstated as a separate district and restored to its former area, with the exception of a few estates which were transferred to the Jungle mahals. Since then it has remained a separate district, though considerably diminished in extend after the Sonthal rebellion in 1855, when the portion now known as the Sonthal Parganas was separated and formed into a separate jurisdiction.

The period embraced by these notes extends only till the year 1829. In that year a regulation was passed appointing Commissioners of Revenue and Circuit to superintend the Magistrates and Collectors of district. The post of Superintendent of Police was abolished, and powers vested in the courts of Circuit were confided to the Commissioners, who were to be under the control of the Sadar

Nizamat Adalat and the Board of Revenue. Birbhum, along with Murshidabad and Nadia, was placed in the 14th division, and the head-quarters of the Commissioner were at Murshidabad.

GENERAL CONDITION

Before entering on a history of the earlier administration of the revenue and criminal affairs, some idea may be given of the general state of the district in its earliest days under the Company.

In 1789 the population of Birbhum was estimated at 800,000 and of Bishenpur at 570,000. The figures were "merely conjectural", but believed to be "not very erroneous", though the Collector complained that false returns had been submitted, as reports had been made that a "tax was to be levied and a draft to be made of a number".

In 1802 the population of Birbhum was estimated at 700,000 only. The Hindus outnumbered the Muhammadans as 30 to 1. The uncultivated land in extend was double the cultivated. The country was "an immense jungle", stretching from a short distance from Suri as far as Bihar. Wild elephants roamed about at will, and in 1790 a herd of 30 was loose, causing destruction to the villages and cultivations. An application had been made previously to Dacca for help to erect a khedda to capture them. Tigers also were numerous, and rewards for their destruction given. The heads brought in for the sake of the rewards were one year found to be "manufactured of dogs and jackals' heads covered with tigers' skin sewn on with black thread in a most ingenious manner", and it is added, "the deception was extremely good".

There seem to have been no market towns, and even in 1816 Nagar, the resident of Rajas of Birbhum, though reported to be one of the largest towns, could be boast of 930 dwelling-houses. Suri, the head-quarters, was even smaller. We read of a great fire having occurred, in which three-fourths of the town was burnt, and which was prevented from spreading through the exertions of the police. This proportion was estimated at only 75 dwelling-houses, exclusive of out-houses.

Of roads there were few. Those in existence at the beginning of the century had been made by the Commercial Resident, Mr. Cheap, for communicating with his factory at Surul, where he resided for

many years. The only road "passable throughout the year for carts" was the road from Suri to Burdwan through Surul. A road to Murshidabad had been completed in 1796, but this was "without bridges and drains". A road to Catwa and one also to Deoghar were repaired at times by the convicts, but the number of the latter was insufficient to keep them in good condition. The zamindars were bound by their engagements at the time of settlement to pay attention to the roads in their estates, and they are said to have kept them "in a passable state of repair" when order to do so by the Magistrate. "Some even planted roadside trees", wrote the Magistrate in 1818. Ten years later, however, they were reported to be unwilling to subscribe for repairs to the roads. Most of these latter owners had purchased their estates at auctions held for arrears of revenue. The offices at Suri were not located in proper buildings. They were small, and continually in want of repairs. "Except the verandah there was no place for vakils or public". "The treasury and malkhana were in old godowns". Education did not then receive attention, and there were no schools for children even in 1823.

The first regular post mentioned in one from Suri to Burdwan in 1791, in which year "cross dâks" were established by the order of the Governor-General in Council. The runners, who received three annas a day, went by a path way to Surul in two stages. The arrangements were as far as Surul under the Collector of Birbhum at a total cost of Rs.43 a month. Some years later a service to Murshidabad was started, and the postal arrangements were put under the Magistrate. A zamindari dâk was established in 1807, and six routes, which included all the thanas, were maintained.

II – REVENUE ADMINISTRATION.

Land Settlement

As soon as he was appointed Collector, Mr. Sherburne was engaged in making a settlement of the district. The chief zamindar was a Muhammadan, styled the Raja of Birbhum. He had in 1786 agreed to pay a yearly revenue of $6^{1}/_{2}$ Lakhs of rupees for his zamindari, which extended over the greater part of Birbhum. The first punya ceremony was held by the Collector on 25th July 1787,

when Rs. 51,000 were collected. This ceremony was soon after abolished by order of Government.

In 1787 the Collector started making a detailed estimate of the assets of Birbhum zamindari. An establishment of about 300 persons for measuring the lands and preparing a rental of the different parganas was employed. Hitherto the settlement had been yearly, but it was intended to make them henceforth for a term of years. Mr. Sherburne recommended a yearly revenue of $6^{1}/_{2}$ Lakhs, to commence at Rs. 6,11,000 for the first year. He considered this assessment "very moderate when compared with that of the neighbouring zamindaris." The total rental of the zamindari he estimated would not be short of $7^{1}/_{2}$ lakhs. The Governor-General fixed the revenue for the year 1788 only at a sum of Rs. 6,11,321, and took an engagement from the Raja of Birbhum on condition of his paying up his arrears and granting pattas to his raiyats. Mr. Sherburne had recommended the latter to be distributed in order to guard the raiyats "from oppression and the zamindar or farmer from being defrauded by his raiyats."

The difficulties Mr. Sherburne found in making a correct assessment he attributed to various circumstances. There were no regular records. The average annual receipts from 1765 to 1776 were ascertained to be Rs. 6,74,000 and for the years 1775 to 1785 to be Rs. 5,37,065. The decline of revenue subsequent to 1769 was attributed by the collector in some measure to the great famine, of which Sir William Hunter has written in his "Annals of Rural Bengal." But there were also other reasons: "the liberality of the zamindars in alienating their lands" and their "inattention to, if not connivance in, the frauds of their servants, farmers and raiyats," and, lastly, in a large measure to the influence of the village mandals. When the settlement had been a yearly one, the farmers had to treat with the mandal or enter into a compromise with him for a reduction of his rent " in consideration of his assistance in procuring him the amount of the *jama* of his village from the other raiyats." This was effected by the levy of various impositions which fell "on the class of people least able to support them." The raiyats also "for a trifling consideration paid to the gomashta or farmer in possession, obtained fraudulent returns in the account of their assessments, so that the succeeding farmer having no authentic documents, followed in the

steps of his predecessor." The exactions by farmers, under-renters and mandals amounted at one time to over Rs. 37,500. This sum was partly recovered and repaid by Mr. Sherburne. Revenue-paying lands were secretly appropriated by the zamindar for his private emolument, and land was granted as *bazi zamin* so as to have it excluded from assessment. Out of 217,907 bighas of *bazi zamin* in Birbhum, only 22,919 bighas had been registered in the *bazi zamin dufter* in 1789. The mandals seized lands belonging to raiyats whom they had themselves included to desert. A complaint is made that "the accounts of every village exhibit proof of the most flagrant frauds and impositions." The surveyors appointed to measure the land had been bribed to enter lands of the first quality under the second, and so on. Every attempt on the part of the authorities to recover the proper rental by detecting the frauds met with violent opposition, so that "it became an almost annual custom for the raiyats, headed and excited by the mandals, to assemble in arms and put a stop to the collections till they brought the to farmer terms." And Mr. Sherburne added : "The revenue can never be realised without the presence of a military force to check these disturbances."

Such was the state of things in Birbhum prior to the permanent settlement. In Bishenpur similar chaos, reigned. The tenure of this district under the Subahs was a feudal one. The zamindar paid a quit-rent of about Rs. 1,60,000 a year only. In 1782 the revenue was settled by Government at a little over four lakhs, but it never reached that amount except in one year. "This was," writes the Collector, "partly on account of the necessities of the zamindar, and his resources and profits being swallowed up by a very numerous family and kindred, " who formed the greater part of the tenure -holders. Lands to a very great extent had "been alienated from the rental of Government and granted as debottar, brahmottar, etc., of which no notice is taken in the public accounts." In one case there was an account showing fees levied on matters concerning caste, marriage, and religion directly contradictory to the regulations. The enforcement of the jamabandi had "caused great clamour, incredible desertions," and had with other causes affected the district "in such a manner that a series of years will be required to bring it into its former flourishing state." A dispute existed between the two brothers, Chyton and Damadar Sing, over the ownership of the zamindari and the

settlement was made with them jointly. Damadar Sing soon after died. His brother, Chyton, fell in arrears, and was put in confinement and the estate attached. A manager was appointed in 1792, as Chyton Sing refused to execute the agreement for a final settlement. As stated above, this district was in the following year transferred to Burdwan.

The regulations for the decennial settlement were passed in 1790. Amongst other conditions it was laid down that pattas should be granted to raiyats and patwaris appointed by the zamindars. Pattas granted to Khudkasht raiyats could not be cancelled. No abwab, mathut, or other cess was to be levied, and to afford provision for the zamindars, talukdars, and their families, ten per cent., excluding the nanker and other free lands, was to be allowed them over and above the contribution to Government.

The rents of lands and lakes alone were to be left to land holders, and Government reserved to itself the sole light to impose, collect, or modify all duties, customs, and taxes of every description. Great importance was attached to then due regulation for the general prosperity of the country. These duties under the name of sair were eventually abolished by Government. Thy had been excluded from the assets on which the land settlement was based, and compensation was allowed to those zamindars who had suffered loss by their abolition.

As regards the granting of pattas, the Collector in 1792 wrote that not a single patta had been issued in Bishenpur and not many in Birbhum. The raiyats said it was "not the custom, and their lands were over rated," while the landlords said there "was no just record, and enquiries were opposed by the raiyats." Ceases continued to be levied by zamindars in spite of their prohibition, and in 1821 the Collector writing on their subject enumerated no less than fourteen different kinds paid on occasions such as marriage or death, or digging of a new tank, etc.

The assessment of each pargana had been made in 1789 by taking the average rental of each kind of land in two or three of the principal villages only. This was but a rough and ready method. Even when the settlement was to be made permanent, any measurement of the lands was forbidden, and the assessment was made on the rental stuted in the zamindars' papers. Wee read that "many of the zamindars gave in false papers". One mode was "to withhold papers belonging

to certain mauzas and shares of villages and mauzas, so that many were unassessed," and were found to be so even in 1816, when the Collector, reporting on the matter, wrote that "the district abounds in productive and extensive alienations of the public dues."

The rates of rent for different descriptions of land were fixed for each pargana by Mr. Keating in 1790. The rates for one pargana differed from those for another, but the difference was not great, The rates for pargana Khatanga are below:---

1		Assl. 2			Abwab 3			Other items at 1 anna per rupee 4			Total 5		
		Rs	A.	P.	Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.
1 Rice land (sab jol)	(1st class)	0	12	5	1	8	10	0	2	6.00	2	7	1 00
2 Ditto	(2nd ")	0	10	5	1	4	10	0	1	18.50	2	1	13.50
3 Ditto	(3rd ")	0	9	5	1	2	10	0	1	14.00	1	13	9.00
4 High land (sah match)	(1st ")	0	10	5	1	4	10	0	1	18 50	2	0	13.50
5 Ditto	(2nd ")	0	8	5	1	0	10	0	1	11.00	1	10	6.00
6 Ditto	(3rd ")	0	6	5	0	12	10	0	1	3 50	1	3	18.50
7 Marsh (sah bil)	(1st ")	0	8	5	1	0	10	0	1	11.00	1	10	6.00
8 Ditto	(2nd ")	0	7	5	0	14	10	0	1	7.25	1	7	2 25
9 Ditto	(3rd ")	0	6	5	0	12	10	0	1	3.50	1	8	18.50
10 Suzarcane(sona ikshu)	(1st ")	0	7	5	0	14	10	0	1	7.25	1	7	2.25
11 Ditto	(2nd ")	0	6	5	0	12	10	0	1	3.5	1	8	18.50
12 Ditto	(3rd ")	0	6	5	0	10	10	0	0	19 75	1	0	14.75
13 Waste		0	5	5	0	10	10	0	0	19.75	1	0	14.75
14 Homestead		2	8	5	5	10	0	0	7	11.00	8	0	6.00
15 Vegetable		1	4	5	2	10	8	0	3	16.00	4	0	11.00
16 Grass		0	1	15	0	3	10	0	0	6.50	0	5	11.50
17 Reed		0	4	5	0	8	10	0	0	16.00	0	13	11.00
18 Betel		10	5	5	20	10	10	1	15	0	32	14	15.00
19 Tari (vegetable and spring crops)		0	12	5	1	8	10	0	2	6.00	2	7	1.00

There were besides the above other sorts of land, viz, kuri (land near village sites), Shuli (drain) melatt (clay), bali chapa (overlaid with sand), etc. The rates of these differ very little from one another. Paiksht raiyats were allowed a remission of 50 per cent. on the established rate, while Khudkasht raiyats had to pay according to the jama bandi.

PATWARIS AND KANUNGOS

To give a full account of the difficulties in controlling the patwaris would require a separate chapter. The appointment of this officer was considered by Government as "no less essential to afford a correct knowledge of the assets of estates than to protect the poorer classes of cultivators". He was to be considered the joint servant of the people and the state, "receiving a liberal income partly from the contributions of the cultivators and partly by a grant from Government." Three years after the order for the appointment of patwaris, the Collector reported there was no patwari in the district, and the Raja of Birbhum objected to their appointment on the score of expense.

The Mughal Government had established the post of kanungo as a check on its officers, zamindars, and other; but since the acquisition of the Company to the Diwani, the office had declined. In 1790 the Collector reported there were no kanungos in Birbhum, and only two naib kanungos in Bishenpur, and he added that "in the present state of the district the office may now be considered no longer necessary." The post was accordingly abolished in 1799, but re-established in 1820, after experience had shown the difficulty of establishing the system of patwaris without it. Each kanungo was placed in charge of a huda, which comprised certain parganas and other local division, and in 1823 there were 14 kanungos in charge of 22 parganas and 18 other local divisions. But these complained they could not get any papers from the patwaris, who constantly absented themselves from their villages. Copies of pattas given by the zamindars to the raiyats were not obtainable, and Collector added "there are not many instances in which the raiyat possesses such a document."

In 1824 stern measures where taken to compel the patwaris to comply with the regulations. Many of them were placed in jail for not giving in their accounts to the kanungos, but even "after frequent injunctions made by Collector after Collector," little or no success was attained in establishing the system. The zamindars "refused to allow of any measurement of their lands," and did all they could to "obstruct the preparation of the patwaris' accounts," and four years after their appointment the kanungos had "effected comparatively nothing." "The zamindars," wrote the Collector in 1824, "were suspicious," and thought "it would tend to their detriment in the

delivery of the accounts of the villages," while the "internal economy of the management of their estates would not perhaps do them any great honour if brought to light."

AS regards the accounts, we read that "it has been established in every court of this zilla by the patwaris' depositions on oath that they had delivered to the kanungos such accounts as they had received from their respective zamindars for that purpose. These have been proved in many instances to be false and manufactured by the zamindars, so as to promote their own interest in the best possible manner and keep the kanungos in the dark;" and, finally, in 1825 the Collector reported that the system of kanungos and patwaris was so imperfectly established in the district "that a revision of the whole is absolutely necessary before any real benefit can be gained from their offices."

In the estates of the ghatwal in parganas Sarhat and Deoghar, regarding whom we shall hear later, an exemption from maintaining patwaris was granted, and later on the attempt to maintain them in the rest of the district seems to have been abandoned.

HISTORY OF ZAMINDARS OF BIRBHUM, PACHETE, AND PATKUM.

Many estates were sold by auction for arrears of revenue soon after the permanent settlement in 1793. We may give there a brief account of the principal estates in Birbhum. Chief among them was that of the Muhammadan Raja of Birbhum, whole head-quarters were at Nagar. This zamindari extended over nearly the whole district of Birbhum and was "the largest Mussulman zamindari in Bengal, and the growth in magnitude of all the single zamindaries of Bengal being next at Burdwan in superficial measure the most extensive and comprehending in all its actual dimensions 3858 British square miles" (Page 407 and 294 Vol I of the Fifth Report of the Select Committee). From the earliest years of the Company's rule it fell in arrears of revenue. The zamindar Bahadur Zaman Khan, who succeeded his father, Asad-uz-zaman Khan, in 1787, was dispossessed of the management and sent to Calcutta for confinement. Many of the raiyats had deserted their lands and settled in other districts in consequence of his exaction. "In one year he imposed no less than seven new taxes." In 1787 the Raja petitioned to be allowed to return to his estate and

this was assented to by the Collector, "provided he did not interfere with the renters and raiyats," but considered "himself merely a private gentlemen."

At the decennial settlement Mr. Keating, who in 1788 had succeeded Mr. Sherburne as Collector, proposed that the revenue should be fixed at 6½ lakhs, which was the amount accepted by Government, subject to a deduction only for the sair duties which had been abolished. This settlement became permanent in 1793.

The zamindar, Muhammad Zaman Khan, who had obtained the sanad on succession from Government of the death of his father, Bahadur Zaman Kahan, did not long enjoy his estate. He became so heavily involved that the Collector reported there was little chance of recovering the arrears except by sale of his lands. The estate was constantly under attachment, and the Raja himself put in confinement more than once to compel payment of the arrears, but without success.

In 1795 Mr. Ernst was deputed to attach the zamindari, and submit a statement of lands to be sold for recovery of the arrears. He found that many resources had been "improperly alienated or collusively withheld," and that the zamindari yielded "with the utmost facility upwards of a lakh of rupees more than the revenue assessed puon it." The gross resources amounted to Rs. 8,11,520, exclusive of noabad lands, which alone brought in Rs. 60,854. These noabad lands Mr. Sherburne had previously reported were lands secretly appropriated out of the malguzari lands by thezamindar for his private emolument. The Raja and his family were given a fixed monthly allowance after his estate was attached. Quarrels arose between Mr. Ernst and the Collector, Mr. Fitzroy, and the former experienced great difficulty in performing his duties. Mr. Fitzroy finally preferred charges of bribery and embezzlement of money against Mr. Ernst so that an enquiry was made with the result that Mr. Fitzroy was dismissed, Mr. Ernst removed and Mr. Fryer appointed in place of both.

A charge of disqualification was made by the Collector under Regulation X of 1793 and instituted before the judge against the Raja, whose "want of means had resulted from his own neglect and profligacy." Both he and the Rani were declared to have collected their rents, "but, instead of fulfilling their engagements to Government, spent them in idleness, folly, and extravagance."

This large estate was split up and sold in[1] "lots," and in 1801 it was stated that the parganas of Sarhat and Deoghar and the Gonatia estate were the only portions that remained. Sarhat and Deoghar were held by the Collector on behalf of the Raja, as he was unable to collect the rents from the ghatwals, who held their lands at a light rental on condition of their performing certain police services. The Gonatia estate was let on lease to a Mr. Frushard, the Commercial Agent of the East India Company,. for his silk factory.

In many cases the purchase-money paid for the lands sold was less than the amount of revenue payable on them, and the chief purchasers were persons who had formerly held situations under the Raja.

In 1818 the Magistrate wrote that "the rich zamindars in the district were Hindus and Mussalmans of low caste or new creation." The behaviour of these new proprietors was the cause of frequent complaints on the part of the authorities. In reporting on the rent free lands in 1820, the collector wrote that the original donees and their representatives "with a few trifling exceptions have been stripped of every portion by the hundred purchasers of the ancient Raja's zamindaries." As an example he quoted the 'gosain taki'. This was a fee established by an ancient usage of the district, and paid to gosains by the sadar malguzars. It was reckoned at one pice in every rupee per annum of revenue paid. An adequate abatement was allowed from the assessment by the Government relinquishing over Rs. 10,000 per annum on the aggregate of the assessed land, yet the custom was in 1821 "becoming obsolete and the zamindars withheld payment." The chakran lands for the support of the village police and other public servants, and which had been excluded from assessment "prior to or at the time of the decennial settlement and duly notified in the chittas of 1193," were the Magistrate complained, resumed wholesale by the auction -purchasers of the estates. These circumstances eventually led to the resumption regulations being enforced, and in 1835 and the following years operations under them were carried out all over the district.

But to return to the subsequent history of the Birbhum Raja. Soon after the sale of his estates, we find the Collector advising Government to put him under restraint, "as he was in a constant state of intoxication." He was " son ignorant as not to be able to sign his

own name," and had "no means of subsistence except begging." His debts amounted to between Rs. 50,000 and Rs. 60,000.

In the year 1802 he died, and Government allowed his family a pension of Rs. 500 a month. Little is heard after of his descendants, except when they petition for increased pensions. A nephew, who was in receipt of a pittarce of Rs. 5 a month, applied for an increased pension, as he had married, and was "obliged to retain two or three females in his service." The claim was supported by the Collector, who added that, being a descendant of the Raja, "he cannot stoop to any menial employment for his support."

Another petition was received from the widow of one of the Rajas, complaining that the government Vakil had got charge as mukhtear of certain lands given her by the former zamindar, and that he never gave her any account. Two years after the estate was attached for arrears of Government revenue amounting to Rs. 4,500, and was purchased for that amount by her mukhtear and three others in his own name. Though reduced to beggary, the family appears to have kept up the title of Raja for many years after.

In 1821 we read of Raja Damu zaman Khan being fined RS. 400 for illicit purchase of opium. He was also charged with bribing the police. He afterwards appealed to be let off, as he could not pay the fine. A few years later, when reporting on the use of opium in the district, the Collector attributes the decay of the family of the Raja of Birbhum to the use of this drug.

The Pachete estate, " a jungly territory of 2,779 square miles and most westerly zamindari of Bengal" (see pages 264 and 464 of the Fifth Report), was transferred from Ramghar to Birbhum in 1799, and settled with Raja Guru Narain Deo. He was soon reported to be distressed circumstances, "owing to a total disregard of his own affairs, and having left his estate to the management of his servants, who are neither men of ability or integrity." This Raja was "a notorious defaulter," and his estate was attached for arrears. In 1804 he was reported to be "in balance more than the amount of his annual jama," and to be "the sole instigator of those very disturbances which he pleads in mitigation of his balance." "His notoriety as a protector of dacoits," the Collector added, "is to well established to admit of doubt and for the last few years he has been organising a body of Chuars, which now amounts to upwards of 3,000 men. These obey his

orders to commit crimes, and it is his intention to try and deter Government from selling his estate." The Raja petitioned for his estate to be attached to the district of Midnapur, but this was reported to be "only a device, so that by change to another zilla a veil of oblivion may be passed over his former conduct." Later we find the Raja arrested on a charge of murder and tried before the Court of Circuit. His zamindari was eventually sold for arrears of revenue.

Patkum, owing to its retired position, was declared to be always a difficult pargana of which to preserve the peace. The revenue, which was small, was never released regularly. The estate was "surrounded by deep woods and mountains, and joined the Mahratta borders. The woods were thinly inhabited by wild tribes of Chuars and Bhuyas." The estate was taken under the management of the Court of War in 1797 on behalf of the Raja, Bikramdit Sing, who was a minor. The Raja's uncle, Mokundutt Sing was appointed manager, but dismissed two years later for misconduct. In retaliation he instigated the Chuars to attack the young Raja. Many people were killed and the Raja's residence plundered. Mokunduttt himself fled. In 1804 Bikramdit was put in charge of his estate. and entered into an engagement for payment of the revenue. Two years later the pargana was again reported in a disturbed state and the zamindar in distress owing to the depredations of Mokumdutt Sing.

DROUGHTS AND ISUDATIONS.

Calamities in the shape of droughts and inundations occurred at different periods. There is little mention in the records now at Suri regarding the great famine of 1772 dealt with by Sir William Hunter in his "Annals of Rural Bengal." The earliest calamity we read of in volumes of correspondence occurred in 1787, and was due to floods in both Birbhum and Bishenpur. The torrent is said in some places to have "swept off villages, inhabitants, and cattle, the crops on the ground with everything that was movable." Mr. Frushered, who owned a silk factory at Gonatia and acted as Commercial Agent of the Company, complained that six months after the purchase of his lease and buildings the "flood in one day swept away as much of the huts as cost Rs. 15,000 in erecting, and put him to a further expense of Rs. 6,000 in erecting embankments."

In 1791 there occurred a great drought. The crops suffered

severely, and the loss was so considerable that the Collector suggested to Government a suspension of revenue to the extent of nearly Rs. 60,000. The Magistrate also attributed to the scarcity the increase in the number of robberies and dacoities which had taken place "in spite of the vigilance of the guards."

About this time granaries of rice, to be used in periods of distress, were established in Birbhum. The buildings were erected near Suri and guarded by an establishment under the Collector. There were 18 golas- 11 with raised floors and the rest with merely mud walls and touched roofs. These contained at one time over 27,000 maunds of grain, but 1,500 to 2,000 maunds were stated to have become rotten. The scheme did not meet with success, and had finally to be abandoned. Rice amouncing to 26,000 maunds and paddy over 600 maunds were sold by auction in 1796 for under RS. 9,000, the buildings going for under RS. 200. From the returns submitted at the time the average price of rice was nearly 2 maunds the rupee. Attempts were also made in 1792 to introduce the cassava plant, and extend the cultivation of maize and potatoes for use in times of distress and failure of the rice crop. These attempts were unsuccessful. The necessity of erecting and repairing the embankments and other works for the protection of the country was recognised, and these were henceforth to be put under control. Enquiries into the water supply were made. On this latter subject the Collector wrote in 1800 that there "were tanks in every town and village, " and he had "never heard of the want of water, and the inclination the netives have for digging reservoirs in the vicinity of towns would seem to supersede the necessity of any work of this description." He adds that "the clearing of the jungle is most desirable," but would be opposed by the proprietors. It was the custom for zamindars to sell lands rent-free for digging tanks; many sold the land "at a price equal to 10 years" purchase." Numerous tanks are still to be found in all of the older and settled villages of Birbhum, but the inclination as regards the upkeep and repairs of these old reservoirs does not appear to be so strong now.

Another drought occurred in 1800. Owing to the dearth of rain since the previous September, the aman crop was damaged, and land holders asked for their balances of revenue to be recovered by instalments and without sale of their lands. Only three years after there

followed another "extra ordinary drought." The zamindars and talukdars petitioned "that, owing to the uncommon dearth that prevailed during two seasons, our crops have generally failed," and ,"excepting some small crops of sugarcane and cotton. We have nothing but rice to depend upon." The Collector, Mr. R. Thackeray (father of the novelist), in consequence of the high prices asked, permission "to take an account of the grain in the district, so that after computing the consumption the quantity which the district will admit may be exported and the remainder sold at fixed prices," his object being to "hinder many iniquitous-practices being committed to raise the price" and to "prevent a scarcity existing amidst plenty." How he would compute the consumption and at what price the remainder should be fixed are questions he does not enter upon. The proposal, however, was not accepted by the Board.

In 1806 was again read of a "sudden and extraordinary rise of waters of the More and Adjai rivers." The floods swept away whole villages, "destroying many cattle and much property of the inhabitants, several of whom lost their lives." The rivers rose on the 28th September, and inundated the country, so that on their banks there was "not a hut to be seen." The people climbed trees and remained during the night of the 28th and the whole of the 29th and 30th." Large tracts of land were laid waste and covered with sand several feet deep. A great portion of this land was afterwards found to be recoverable, but in consequence of the loss sustained, the Collector asked for the revenue to be suspended, provided the zamindars suspended their demands from their raiyats. From this inundation the factory of Gonatia also suffered. The number of lives lost was put down at 651 and of cattle over 6,000; the value of property destroyed over 1½ lakhs of rupees, while nearly 24,000 bighas of land were thrown out of cultivation.

In the year 1828 little rain fell, and in the following year the Collector wrote that "in addition to the tanks being totally drained of the little water they received last year, we have not had a single shower of rain in the district during the whole of the present season. In fact the price of rice has risen from 1 maund 10 seers to 36 seers per rupee, and I see no prospect of its falling."

In 1837 distress was again felt on account of the excessive drough, and a postponements of a month was requested in the

payment of half the land revenue, of which there were arrears amounting to Rs. 24,000.

MISCELLANEOUS REVENUE- EXCISE AND STAMPS

The abkari or excise system was started in 1790. The Government General in Council in that year issued a proclamation prohibiting all persons from making or vending spirituous liquors without a license from the Collector. No tax was to be levied except by Government, but persons aggrieved were permitted to claim compensation. In the preamble to the proclamation it was stated that the quantity of liquor consumed was considerable, while its price was low, and in consequence the vice of drunkenness had been long prevalent among the lower classes; the houses of vendors also were the resort of robbers and disorderly person, and the vendors themselves were frequently privy to their crimes.

A compensation or Rs. 2,970 was paid to the Raja of Birbhum in consequence of the resumption of the abkari mahal of his zamindari.

The settlement of shops was held every year by the Collector who received a commission on the total amount of revenue collected. The shops were dealt with by of revenue collected. The shops were dealt with by parganas. Pachwai shops paid 3 annas a day and stills for country spirit paid 6 annas a day in the mufassal and 12 annas a day in Suri. In 1792 the annual revenue amounted to Rs. 6,215 in Birbhum, and two years later this had increased to over Rs. 14,500. This increase continued till in 1822 the revenue exceeded Rs. 21,500, and in 1825 was over Rs. 35,500. There were then 49 liquor shops, 277 pachwai, 8 ganja and 2 opium, settled in 32 parganas of the district.

Cases of illicit dealing were dealt with by the Collector, who referred his decisions to the Board for confirmation. The country gave every facility for smuggling, especially in opium, which was chiefly used in Nagar owing to the Mussulman population there. The Raja himself was given to its use, and in one case he was fined Rs. 400 for illicit purchase of opium, but he was unable to pay the amount. Opium was reported by the Magistrate in 1828 to be taken by natives for cholera "as a perfect cure of hastening of dissolution."

Stamps formed another source of revenue. These were sold by nominees of the Collector, who received a commission in addition to

his salary on the total amount sold. The revenue from stamps in 1814 exceeded Rs. 13,200, and increased till in 1822 it was more than Rs. 27,200.

III -- CRIMINAL ADMINISTRATION

Previous to 1790 criminal justice was administered by the Naib Nazim at Murshidabad through a daroga as his representaive at Suri. In the year 1790 the East India Company took over the Nizamat affairs and passed regulation appointing Courts of Circuit and laid down rules of procedure. The criminal courts henceforward were subject to a Sadar Nizamat Adalat or Chief Criminal Court at Calcutta.

On the 1st January 1791 the jail at Suri was made over to the Magistrate. The office of daroga was abolished, and he returned to Murshidabad. The Sadar Nizamat Adalat ordered the Magistrate to carry out the sentences already passed by the Naid Nazim except those for mutilation. Persons confined during pleasure were also sentenced to fixed terms and others released. Prisoners were no longer to be subjected to corporal punishment to "compel them to answer questions truly." In 1793 the zilla kazis were abolished.

CRIME

The state of the district as regards crime both previous to 1790 and after is shown clearly in the corrospondence. Military were employed to keep the peace. In 1788 the daroga of the Nizamat Court had to ask the Collector for the help of military to carry out a sentence of execution on the spot "in case of an attempt at rescue."

The depredations by dacoits were serious, and the Magistrate complained to Lord Cornwallis that the district was overrun with them. They came from the jungles across the river Adjai, and military were asked for to guard the four ghats or passes, as the local police, consisting of the thanadars and ghatwals, were useless. The Commander in Chief was at once asked to depute a company for the purpose. Dacoity "had got to such a head as to demand the utmost efforts to put a stop to it." "searcely a night passes," wrote the Magistrate in 1789, "without some daring robbery being committed, and but a few days ago two villages were nearly burnt down by a set of dacoits."

The nieghbouring district of Burdwan was also in a disturbed state, and combined parties were issued against the dacoits there and in Birbhum, A military guard had to be sent to Ilambazar on the river Adjai to protect the Company's weavers from the Burdwan dacoits. Another gurad was sent to protect the widow of the Raja of Birbhum and her children from thieves in the jungles around Nagar. On one occasion the thieves had entered this town and plundered the houses and wounded severeal of the inhabitants. Attempts made at time to reduce the number of military employed in the district were always strongly objected to by the Magistrate, who complained that the police guard was quite insufficient "even if three times the number of barkandazes be kept." He estimated at one time that there were 2,000 dacoits in Birbhum, Burdwan, and Rajshahi. There were in 1793 two companies of native infantry employed, and ten years later an officer and 12 sepoys extra were asked for, as the jungles of Birbhum "abounded with numerous banditti." In order to apprehend Bishan Manker, a leader of Chuars, the officer in charge of the Ramghar Battalion, asked for a ballalion of sepoys and a howitzer! He stated it would require two battalions with two guns and two howitzers to dislodge the people from the tops of the rocks. In another expedition in 1799 against the Chuars and Bhuyas in Patkum, sarrounded as it was by woods and hills, "the air was so fatal to the troops that 100 fell sick in a day."

CONDUCT OF ZAMINDARS.

We have seen in Pachete how the Raja was himself an instigator of crime in his district. In Patkum also there were disturbances caused by the land-holders. "The estates of the jungle zamindars," wrote the Magistrate, "afford shelter to outlaws, and the monthly reports from them are blank sheets."

In 1791 a regulation was passed in consequence of the land holders being suspected of conniving at robberies and murders. Magistrates were authorised to apprehend them and commit them for trial to the Courts of Circuit, and if guilty , none of the family was to succeed to the zamindari without tyhe express permission of the Governer General in Council. some years later the Magistrate of Birbhum wrote that the zamindars, who "throughout Brengal, particularly in this district, held their estates upon a light, easy, and

most favourble tenure, failed in the performance of their duty, and will do nothing untill actually compelled to it by legal threats or lawful compulsion." It had been the custom of the country to hold the zamindars answerable for property stolen in their estates, and they were obliged to "recompense the plaintiff in conformity to that custom," but, added the Magistrate in1819, "zamindars, in general with their servants and dependants, will continue to be gainers by these outrages (e.g., dacoity, robbery, burglary, and heavy thefts) until it is made their interest that they should not be so." He suggests Government should determine the aid to be given by zamindars to prevent these abuses and the penalty for enforcement of it.

Maharaja Partab Chand Bahadur, "a powerful and contumacious individual," acted no better than the rest. Of the dacoities committed in 1819, one half occurrred in his estates, and in all cases he refused aid to the police. "In none of his estates was a single dacoit tried or apprehended." In the next year the pargana of Burdwan was attached by the orders of the Magistrate of Birbhum, as the zamindar would not appear in answer to a charge of declining to aid the police in a case of dacoity within his zamindari and for neglecting to appoint chaukidars. After being repeatedly fined he was committed for trial before the Court of Circuit, but was eventually acquittted.

On the other hand, the zamindar of pargana Bagmundi, Raja Anand Sing, was rewarded for arresting Gopal Manjhi and other disturbers of the peace by remission of one year's revenue and arrears.

Dacoity had become so prevalent in 1810 that Sir, C. R. Blunt, the Magistrate of Birbhum. Was deputed to tour in the distirct and suppress it. He reported to Government that he had apprehended "between 300 and 400 robbers and receivers of stolen property," and that the dacoits had been generally protected by the land holders and their agents, "Many wealthy proprietors of estates now occupy large pucka houses who a few years ago were engaged as paikars and gumashtas on a salary of Rs. 5 or 6 a month. Every gang has a receiver with whom the property is lodged, and remains secreted for a time. The receiver retails the plunders article by article to the land holders at a fifth or less of its value; these resell or barter to a description of paikars, who prowl about the country, and convey it

out the district. Almost every individual, whatever his rank in life, is at present a pawnbroker," and the Magistrate suggests these should be licensed and made to give security in order that the trade may be restricted.

POLICE

The zamindars had always been held responsible for preserving the peace within their estates, and this responsibility was laid down in the regulations when the Company took over the Nizamat affairs. Certain lands styled thanadari and unassessed with revenue were devoted to the maintenance and the establishment of thanas. The chief officer or thanadar was chosen by the zamindar, and under him were a number of barkandazes. There were eight thanas in Birbhum in 1793. These were increased to eleven ten years later. Some parganas had been transferred to Birbhum from Murshidabad in 1794, when another thana at Labpur was established. In 1808 there were sixteen thanas in the district and one kotwali for the town of Suri. The force for the latter was maintained by a tax assessed by the Magistrate on merchants and traders. The collections were made by the cheif merchants. The direct control of the police had to be taken over by the Government owing to their unsatisfactory condition. The thanadari lands were resumed. assessed with revenue and settled with the proprietors of the estates in which they were situated or on their refusal leased out to farmers. The apoointment of the darogas in charge of thanas and the subordinate police henceforth lay with the Magistrate, acting at first under the direction of the Courts of Circuit and the Sadar Nizamat Adalat, and later under a Superintendent of Police for the Lower Provinces when that office was established.

The old class of thanadar was unsatisfactory. In Bishenpur we read of their general supineness, and "the wellgrounded suspicion of their being themselves concerned with the dacoits." Nor were their successors, the darogas, any better. Numerous were the cases of their removal and punishment. "The great negligence and indolence of the officers of the thana forcibly struck me," wrote the Magistrate, in the numerous cases which have been berore the Court. In one case I suspended daroga and amla for not taking notice of a reported dacoity for seven days, though the house attacked was only three miles from the thana."

The people themselves gave no help in the prevention of crime. Information was often not given "to avoid inconvenience," and the "structure of the huts offers great facility to burglars." Violence, however, in cases of burglary does not appear to have been oftern used, and the value of the property taken was often trifling. Instances in support of these remarks can be obtained from the reports of serious crime submitted by the Magistrates regularly to the Court of Circuit, and later to the Superintendent of Police. In one case of dacoity occurring in thana Naihati we read of three persons being killed and 13 wounded, and property valued at Rs. 9,240 stolen. No persons were detected, though 50 to 60 were concerned in te attack. The zmindar's cutcherry was looted, "and not a single man offered the least resistance." The Raja would "not offer a rupee" as reward, though the Magistrate offered Rs. 200. It was also found that at least five chaukidars were privy to the crime. In the report of another dacoity in Keoganj thana we read of two persons killed and six or eight wounded. The dacoits were armed with bamboo sticks. The two who died and those wounded were the only persons who offered resistance. Though the owner of the house had been 30 years a police daroga, and was surrounded by "a whole host of bearers and coolies and numerous servants armed with swaords and spears, matchlocks, and other weapons," they did not make the slightest attemp to seize any of the dacoits, "who were only armed with bamboo bludgeons." The women in the zanana were stripped of their ornaments, valued at Rs. 500. None of the property was recovered, and the complainant "refused for some time to give any deposition on the subject. He had the face to send a petition, setting forth that the daroga was doing nothing, and requested to be allowed to conduct the investigation if he had "a clever muharrir placed under him and half-a-dozen stout barkaundazes and a few sepoys." The Magistrate added that he declined to do so, and in consequence "the complainant has given himself little or no trouble to assist in the enquiry."

Another officer writing later complains that the "salaries of the police were too small to restrain them from levying contributions from the inhabitants, which the most vigilant surveillance of the Magistrate in unequal to check effectually, solely from his being unable to obtain proof from the backwardness of the natives and the unaccountable submission with which they comply with the exrotionate

demands of the police officers and the unwillingness to assist in the eonciction of the extortioners.

VILLAGE WATCHMEN.

The village watchmen were "the active agents in every dacoity," and "were either the perpetrators of every outrage, or when not personally engaged connived at the commission of those acts in others." Yet in spite of this Sir C. Blunt, the Magistrate, writes in 1811 that this branch of the police "is the most effective in the district, for I am not aware of one instance wherein an offender in a serious charge has been traced on the information and enquiries of the daroga and amla of the thana unaided by the intelligence and assistance of the village watchman." And another Magistrate in 1816, while styling the watchmen as "notoriously robbers," admitted that they required more adequate remuneration. "The more immediate duty of a large proportion was to collect revenues and serve as guides and coolies."

They usually held lands rent free in return for their services. These chakran lands had been unassessed with revenue when the estates had been settled. The chaukidars originally numbered about 8,000 for the district of Birbhum, but they gradually decreased, and their lands were seized by those who had purchased their estates at auctions held for arears of revenue. In 1808 the Magistrate complained that both the thanadari and chakran lands were being "resumed by the land-holders whenever they could do so."

GHATWALS.

The ghatwals formed part of the police of the district. These men who were over 50 in number held large grants of land in parganas Sarhat and Deoghar, for which a "nominal revenue" or "tributary fee" was paid to the Raja of Birbhum, in whose estate their lands were situated. They "possessed all the influence of independent proprietors." Their duty was to protect the passes in the hills and forests in the west of the district, and for this purpose maintained a number of subordiantes as picquets at certain posts selected by the Magistrate.

From the first the Raja of Birbhum was unable to collect his

rents from them. In consequence the Collector was obliged to collect them, and after taking the Government revenue and costs of collection paid the balance to the Raja. The ghatwals were constantly in arrears and at times their movable porperties had to be attached and sold. On the death of a ghatwals the appointment of a successor rested with the Collector subject to the concurrence of the Magistrate, whose opinion was necessary regarding the competence of the nominee to perform the necessary police duties.

There were frequent disputes amont them regardıng their succession, which acording to custom was hereditary. The posts could be held by females and minors, a nominee being chosen to perform the police duties.

The distrurbance at one time grew so serious that in 1803 the collector recommended a sale of the parganas Sarhat and Deoghur. Two of the ghatwals were found guilty of murder and robbery, and attacked the peons sent to arrest them. A special enquiry was made into their tenures by Mr. Scott, and a setelement made with them direct. A regulation was passed in 1814, laying down the conditions under which they held their grants. They became thus practically independent proprietors in spite of the protests of the Raja. The rent payable by the ghatwals was over Rs. 20,000 of which over Rs. 15,000 was due to Government as revenue, the balance after paying for costs of collection being handed over to the Raja as zamindar. The latter's descendants were in receipt of this from the Birbhum treasury till the transfer of the parganas to the Sonthal Parganas. the ghatwals were reported "as careless and worthless in the performance of their duties." Their grants, however, could not be resumed, though police duties might no longer be required of them.

Mention may be made here of another class of chaukidars, whose duty it was to gurad the roads or passes within the estates of the Raja of Birbhum near his residence at Nagar. These ghat chaukidars, also sometimes erroneously called ghatwals, held land in return for their services. Their origin has been given by Mr. McNeil in his "Report on "The Village Watch of Bengal". They formed part of the "Baishazari mahal," which included the various servants employed by the Rajas of Birbhum, most of whom have since disappeared and their lands resumed by the purchasers of the estate. These few ghat

jamadars and chaukidars, and the chakran duftaries still employed in the Birbhum Collector and Magistrate's offices are the only survivals of that once large body of men.

From an enquiry made into the records at Birbhum it would appear the lands held by these servants were not assessed with revenue at the time of the settlement of the Birbhum zamindari.

JAIL

When the jail at Suri was taken over by the Magistrate in 1791, it, "consisted of two long very narrow thatched buildings with mud walls, in which the prisoners were promiscuously confined." The old jail was surrounded with huts, which were liable to take fire, and in 1797 the jail was burnt down. New buildings were ordered to be erected in accordance with the Fouzdari Regulations. A pucka jail was sanctioned in 1814, but it was not completed till six years after. Then it was reported to be "one of the very best in the country, securing at once the safe custody, comfort and health of its inmates." Prisoners sentenced to perpetual imprisonment commenced in 1791 to be transported to the Andamans for clearing the islands.

Under the Muhammadan rulers prisoners were kept in chains, one of which "hung from the neck." They were not allowed "to shave their beards, cut their hair or change their clothes." This practice was abolished when the jail was taken over by English, by whom also labour as a punishment was introduced. Mr. Cheap, Commercial Resident at Surul, suggested that roads from Surul to the Adjai river should be made by convicts, "as labour is the greatest punishment the natives fear." The Governor-General suggested the employment of prisoners in the iron and coal mines in the district, remarking that "such labour would be felt as a real punishment, which imprisonment in this country does not appear to be among this description of persons." This later idea seems, however, to have been abandoned on account of expense, but prisoners were regularly employed on the repair of the roads and building of bridges, and some even in clearing the town of Suri They also worked in the public gardens in the station. The Doms were employed in making baskets and handles for the pickaxes. Later clothmaking was introduced for the prisoners' clothes, and this we read effected a saving to Government "even on the limited scale done." Tasks were performed on Sundays, and only

at the Dassera festival was an exception made, "owing to the crowds passing on the roads." We read of a sentence of "tashir' being passed in 1819. This was carried out by the accused "being mounted on an ass or pony, and thus ignominiously exhibited to public view."

The jail guard consisted of a jamadar, 2 havildars, 3 naiks, and 76 sepoys, besides a daroga and 3 and 4 burkandazes. The military portion was from the provincial battalion at Burdwan. The Provincial Battalions had succeeded the Sebandy corps, which had been employed in guarding the offices of Magistrates and Collertors and Commercial Residents till 1803. The discipline does not seem to have been good, for there were numerous escapes from jail, and the guards were constantly punished for negligence. There were at times outbreaks among the prisoners. One occurred soon after the jail was taken over by the Magistrate in 1791. In this case the prisoners overpowered the guard, being led by a notorious dacoit. All except twenty six were, however, subsequently recaptured. Another outbreak occurred in 1814, when the prisoners "seized the muskets of the guard, but were eventually orverpowered after one prisoner had been killed by a bayonet wound."

As regards the health of the prisoners, the retruns of the sick and of death were submitted regularly. Sickness among the prisoners was far greater in those days than now. Some years were distinctly unhealthy. In 1814 the number of deaths in the half-year amounted to 30, while the average monthly number of sick was 38. The daily average number of prisoners was 300. The returns for 1825 and 1826 show the annual number of death in jail to be 40 and 31 respectively. An assistant Surgeon was in charge of the jail, and also of the district. The first we hear of was a Mr. Kegan, who was in charge in 1788, and who built the original Collector's cutcherry afterwards bought by Government. At times, however, there was no doctor. for in 1821 the Magistrate had to obtain leave to go to Murshidabad for treatment. A few years later Mr. James Williamson acted as Assistant Surgeon. He had come to Birbhum as a missionary sent by the Baptist Society at Serampore, and brought references from Drs. Carey and Marshman. He arrived in India in 1821 as a surgeon on board the sailing vessel Heroinc. We know little of the general health of the district. An epidemic of cholera is reported to have occurred in Suri in 1818. It raged "with great violence," the deaths numbering 13 to 15 a day.

Two native doctors were apoointed, but, the Magistrate added, one soon "withdrew himself of his own accord with the true spirit fo a Bengali philanthropist."

IV -- COMMERCIAL

The East India Company as a trading concern had a monopoly of the silk industry in Birbhum. Its affairs were managed by a Commercial Resident at Surul, about 20 miles from Suri. Besides the Commercial Resident, who was paid servant, there was also a Commercial Agent. The latter worked with his own capital, and the Company paid only for the produce received, thereby incurring no risk.

The silk industry in Birbhum in the early years was on a large scale, as may be gathered from the heavy drafts made by the Resident, Mr. Cheap, on the Treasury at Suri. At times the Collector was unable to meet them on demand. The interests of the Company's weavers were zealously guarded hy the Resident, who brought any matter he considered damaging to the Company's interests immediately to the notice of the Magistrate and Collector or ɩo the Government. In 1789 a military guard was sent to Ilambazar to protect the weavers from dacoits who came from the borders of Burdwan, and shortly after we find the Governor General in Council, on the representation of the Resident, Mr. Cheap, made through the Board of Trade, ordering a zamindar in whose estate a robbery of goods belonging to the company had occurred to produce the robbery or the goods, or in default a portion of his lands would be sold to make good the value plundered; for, wrote Mr. Cheap, "since the appointment of the thanadars rested with the zamindar redress is justly due from him."

Military were posted at Surul for guarding the factory. Mr. Cheap was for 41 years to Commercial Resident of Birbhum, having come to India as a member of the Bengal Civil Service in 1782. He lived chiefly at Surul. On the death of Mr. Frushard, the Commercial Agent at Gonatia his factory was sold, and the lease of it was taken by Mr. Cheap, who died there in 1828 at the age of 62, and was buried in the factory grounds. The lands measuring 203 bighas and factory at Surul were sold after Mr. Cheap's death, but the ruins of the latter

remain, and the extent of the original buildings can still be seen. We have already seen how at one time the only roads in the district had been made by Mr. Cheap. He also made the roads from Surul to Gonatia, and from Surul to Katwa in Burdwan.

The commercial Agent, Mr. Frushard, whose nationality is entered in the returns as French, had been sent by the Court of Directors in 1782 to be Superintendent of the Company's silk works, but in consequence of a reduction in the ijnvestment his services were dispensed with, and he was permitted to erect a silk filature on his own account at Gonatia. He purchased the buildings there in 1785 from a Mr. Edward Hay for a sum of Rs. 20,000, and was allowed by Government as an indulgence to hold his lands "as a paikasht raiyat." After working thus for two years he was taken into the company's employ as Commercial Agent, and obtained in 1791 a lease of 2,500 bighas of land round his works. This lease was granted him at a rent of Rs. 1,500 a year for 12 years by the Raja of Birbhum at the request of Government. We find Mr. Frushard constantly receiving from the treasury at Suri large sums of money for silk supplied to the Company. His position was not equal to that of the Resident. The correspondence between him and the authorities at Suri clearly disclose that less attention was paid to him and his complaints. We have seen how his factory suffered from inundations in 1789 and again in 1806.

In 1800 Mr. Frushard's lease was increased to Rs. 3,411 a year, inspite of his objections that the rent received by him after many years only amounted to Rs. 2.163, while the works had cost Rs. 60,000 and had been in the Company's use without rent ever being paid by it. His commission amounted to Rs. 12,000 a year, which, after paying the interest on his capital, only left him Rs. 3,000 or Rs. 4,000. He fell often in arrears with his rent to the Raja, and the latter put this forward to the Collector as an excuse for himself being in arears of revenue. Mr. Frushard died in 1807, and the factory was taken over by Mr. Cheap at a rent of Rs. 3,415 from Government, who had purchased the estate at Calcutta for Rs. 15,800 at a sale held for arrears of revenue. On the death Mr. Chep in 1823 the estate was put in charge of Mr. Shakespear, who acted as Commercial Resident till 1835, when the manufacture of silk by Government in Birbhum ceased. The estate was afterwards taken over by the Collector and managed as a khas mahal, and has since been bought by the Bengal Silk

Company, which still carries on the manufacture of silk in the original buildings.

Beside those in the employ of the Company, some other Europeans were engaged in trade in the district. The right to work the iron in the district was leased out by former zamindars, and as early as 1787 we read of a Mr. Farquhar holding the "loha mahal" at a lease of Rs. 765 a year. He seems to have abandoned the working not long after. The manufacture of iron was, however, carried on in some villages till recent times. In 1800 it was reported there were 100 iron mines in the district.

At Supur near Surul there was a French factory in charge of Messrs. Chaubon and Arrear. These gentlemen had in 1787 been ordered by Mr. Sherburne not to hoist the French flag, and Mr. Arbuthnot, the Assistant Collector, was deputed to Supur to enforce the taking down of the flag. Later in 1793 when notice of war between England and France had been received the Magistrate took "paroles of honour" from these two gentlement "not to serve against Britain or undertake any fresh speculation." The Magistrate also took possession of "one mutilated house in Supur, which was French property." This "French factory" was afterwards put under Mr. Cheap's care on behalf of the authorities.

There were also four Europeans engaged in the maunfacture of indigo and one of sugar. Mr. Erskine had come to Birbhum in 1787 with "a free merchant's covenant, " and started the manufacture of indigo at Ilambazar. Mr. Paterson had been sent from England in 1792 to extend the cultivation of sugar. He had found suitable lands in Birbhum. Disputes concerning the growing of indigo are first reported in 1827 on the border of Murshidabad.

CURRENCY

There were many different kinds of coin current during the earlier years of the Company's administration. The sicca and sonat rupees were, however, in general use. The revenues were mostly paid in gold. This was convenient for zamindars, who thereby effected a saving in the cost of carriage. The difficulty of obtaining silver was great. In 1794 the Judge complained that he found difficulty in procuring even the smallest quantity of silver in exchange for gold. It

was found impossible "to pay even one tenth of the establishment in silver." The Collector asked Government "to take measures to prevent the traffic which keeps gold coin not current at its estimated valuc and keeps up a high rate of batta in exchange for silver to the great distress of the middling rank of people" To counteract the combination of poddars, who fixed arbitrarily the amount of exchange, he requested a distribution of small gold coin. Batta was exacted by the land holders from the tenants at the rate of one pice in every rupee of rent. This was seldom brought to the notice of the courts, though we find it stated "the hardshi;p experienced by the raiyats is very considerable." In 1795 the Governor General ordered the Salt and Commercial Departments to make no distinction between payments in silver and in gold. All payments under Rs. 4 and fractional parts of larger sums too small to be made in gold were to be issued in silver. All other payments were to be made in silver or gold indifferently except in April, may and June. when impediments existed to the free circulation of gold on account of little or no revenue being collected then. Still the difficulty of obtaining silver continued, and in 1802 the Collector wrote from Suri that "no silver beyond a few hundred rupees can be procured in this town, and that probably at an exorbitant rate of batta." He estimated there were four lakhs of gold mohurs in the district which passed at their full value. There was no alloy in the old established rupees, and batta was allowed on any dificiency. It was forbidden to deface or mark coin, and shroffs were informed of the penalties for such. The Magistrate in 1794 even recommended the Sadar Nizamat Adalat to advise Government to make base coining a capital offence. In spite of regulations it was reported in 1808 that the greater part of the currency of the district was of deficient weight. This, however, is stated not to have given "rise to any extensive shroffage," as all rupees "were taken at their nominal value in common intercourse." The land lords went to the shroffs who took "the full or perhaps more amount of batta." It may be noted here that in 1795 a proclamation was issued converting the interest payable by the Company of their bonds and promissory notes from 8 per cent. to 6 per cent.

PRICES.

A table is given below of the prices of grain and other articles

in certains years:-

1789 .... Cotton (uncleaned), 16 seers the rupee.

Dhutties, 3 anna to 8 annas a piece; size 7 feet x 4 feet.

1791.... Rice from 1 maund 8 seers to 1 maund 12 seers and 8 chittacks per rupee (1seer = 60 sicca rupees).

1792 .... Coarse rice from seers 32 per rupee in August to maund 1-32 1/2 per rupee in November.

Fine rice August, 30 seers; November, 1 maund 27 1/2 seers.

Arhar, August, 30 seers; November, 1 maund 10 seers.

Mashkolai August 32 1/2 seers; November, 1 maund 10 seers

Grain August 30 seers; November 1 maund 10 seers.

		Mds. sts	
1796....	Rice (average)	1 33	per rupee
1798	Do (November).......	2 20	Per rupee
1814	Do (April)	1 17 1/2	per rupee
1817	Do (do)	1 0	per rupee

1828 Salt, Rs. 2-11 to Rs. 3-12 a maund for the Madras or karkatch.

The pay of peons was Rs. 3 a month in 1803, and increased to Rs. 4 a month in 1829

To diet of witnesses was reduced to one anna a day in 1809 as being "equal to a labourer's hire."

MISCELLANEOUS

EDUCATION

We have seen that there were no schools, either public or private, in the district. The chief religious endowment was the temple at Deoghar. This was controlled by a Committee of Local Agents, among whom were the Magistrate and the Collector. The chief priest or Ojha of the temple had been induced to give Rs. 500 to start a

school at Suri, but this sum was subsequently refunded to him. In 1823 the Magistrate, Mr. Garrett, proposed that schools should be established, where the pupils could be kept "as much and for as long a period as possible from the contaminating society of their ignorant and superstitious relatives." He complained of the "lamentable deficiency in morality of the native character." One officer in 1816 reported that the "sect of Gosains and Boistnubs has multiplied vey rapidly in the district of late years. The highest castes we are told had "gradually dropped from calling a panchayat," and the other castes had "in some measure follwed suit," and the Magistrate suggested that the panchayats should be allowed to deal with petty offences if the offender desired to remain in the caste, while the Court would deal with him "if he desired to become a Boistnub." The natives of Bengal, it was observed, did "not entertain that reverence for their religion they formerly did."

SATIS

In 1818, when asked to report regarding the practice of sati, Mr. Morrision, the Magistrate, considered it to be on the decline, owing to the degeneracy of Hinduism and the rich zamindars being "Mussulmans or Hindus of low caste or new creation," as well as "to the certainty of the heirs of the deceased husband being maintained in possession and enjoyment of life, honour and property by the existing laws and justice of Government." He was not in favour of any penal enactment, being content to leave matters alone, "to follow a more slow but ultimately sure course." "The Raja of the place," he states, "is a Mussulman, and the Hindus seem generally willing to embrace the excuse of the will of the reigning power to avoid" the performance of sati. Since 1816 reports regarding the number of satis performed in the district had been regularly forwarded to the Superintendent of Police. No women were deterred from burning themselves by the efforts of the Magistrate or police. The average yearly number of cases of sati reported from 1816 to 1827 is only five, and these embraced various castes. In 1818 two women, who had determined to burn themselves, relented, but nevertheless "appear to have enjoyed their relative ranks in society amongst their former friends." In two other cases the women actually ascended the pyre, but lost courage on being singed and left the flames. These two were sup-

ported by their relations, though "considered as having lost their caste." One died two days after from the effects of the burns; the other lived a month.

DEOGHAR TEMPLE

A short account may here be given of the Deoghar temple, which was about 80 miles distant from Suri. A portion of the income of the temple was, under the Muhammadan rule, paid to the zamindar. In 1787 Mr. Sherburne proposed to make the collections, which he estimated at 3,000 or 4,000 rupees a year, an article in the assessment, but he omitted entering them. "as the amount received by the zamindar was insignificant and an assessment might depreciate the sanctity of the shrine and damp the zeal of the pilgirms, making them more parsimonious in their contributions to it." In 1791 Government relinquished its claim, which amounted to a three-fourths share of the offerings, and entrusted the sole care and management to the Ojha. or head priest, on his executing an agreement to keep the temples in repair and to perform all the usual ecremonies. He was also bound to keep order and not exact offerings from the pilgirms on pain of dismissal. The appointment of Ojha remained with Government. It was, however, held to be hereditary, but the priest was to be over 40 years of age. The income of the temple in 1791 according to MR. Keating consisted of the offerings and the proceeds of 32 villages and 108 bighas of land. This he estimated at Rs. 2,000 a year., Some years later we find the total income estimated at Rs. 25,000 a year. This included ornaments, elephants and cattle given as gifts by wealthy pilgrims. The Collector in 1820 estimated the income at Rs. 50,000 but the exact amont could not be ascertained, as there was a difficulty in getting proper accounts from the Ojhas. The number of pilgrims attending the great festival of the year was put down at 50,000 to 60,000,

The mismanagement of the temple was a suorce of constant complaint. The temple and ghats were frequently left in disrepair. The Ojha was charged with alienating villages from the temple and claiming them as his own. We are told he considered "his situation as a means of enriching himself and his family." On his death in 1820 a dispute over the succession arose between an uncle and his nephew. Mr. Floyer, the Collector, as a local agent to superintend the affairs,

went to Deoghar to enquire, and received false certificates of birth. He denounced the place "as a vile asylum of Hindu fanaticism," and those connected as a "set of base minded wretches." The nephew, Nittanand, was eventually appointed. He, however neglected to carry out the terms of appointment, for it was soon after reported that the "whole place and environs were a scene of dirt and stench," and only a quarter of the income was spent on the temple. The resources were estimated at Rs. 1,50,000 annually. Finally, the nephew was charged with malversation of the funds, and the uncle, Sarbanand, was in 1823 appointed Ojha in his stead, a yearly provision being made for the nephew. The Magistrate, commenting on the state of the temple, observed "it was not the spot to which one would turn for a specimen of what the Hindu religion of this country is," and in 1826 the complained that "the funds were misappropriated by the Ojha for the benefit of his relations and friends." On the death of this priest in 1837 the property was attached till a successor could be appointed by Government after taking the opinion of Brahmins. The subsequent history of this temple belongs to a period beyond that included in these notes. It is now within the Sonthal Parganas.

(1) The term 'lot' (spelt and pronounced 'lat') is still the ordinary term for an estate in the Birbhum district.

SONTHALIA AND THE SONTHALS – CHAPTER XIV

ব্রিটিশ আমলার চোখে ১৮৫৫-এর সাঁওতাল বিদ্রোহ

[নবগঠিত সাঁওতাল পরগণা (১৮৫৬) নন্ রেগুলেটেড জেলার দ্বিতীয় ডেপুটি কমিশনার ই. জি. ম্যান, আই. সি. এস. তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১৮৬৭ সালে লেখেন 'সান্তালিয়া এন্ড দি সান্তাল' নামক গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায় এখানে পুর্নমুদ্রিত হল। আমরা এ লেখার বঙ্গানুবাদ না করে ইংরাজী ভাষাতেই প্রকাশ করলাম – সম্পাদক।]

It is now some twelve years since the Sonthals, goaded to resistance by the wrongs they were suffering, rose up and attempted to release themselves from the oppression and misery inflicted upon them at the hands of the unwitting British Government, and savages as the tribe were, they appear, while endeavouring to obtain redress, to have raised a panic even amongst the residents of Calcutta.

The primary causes which led to the rebellion of 1856 may be traced as far back as the year 1832, and may be shortly summed under the following heads, 1st - The grasping and rapacious spirit influencing the Mahajuns or money lenders in their transactions with the tribe. 2nd. - The inequasing misery caused by the iniquitous system of allowing personal and hereditary bondage for debt. 3rd - The unparalleled corruption and extortion of the police in aiding the mahajuns. 4th. - The impossibility of the Sonthals obtaining redress from the Courts. And last, but not least, the improvidence and "happy-go-lucky" style of living of the Sonthals themselves. These all combined were, in my opinion, the primary causes of the rebellion.

It has been argued, as before remarked, that the Sonthals were always slaves and that the institution of slavery amongst them was of ancient date. But it seems rather to have been introduced by the

mahajuns, who derived the Institution from the inhabitants in the vicinity.

It appears, however, that from 1832 the Moonsifts had been in the habit of decreeing civil suits in the mahajun's favor, upon bonds the terms of which were thus:-"In consideration of having received - Rs., I undertake to work out (at any time I may be called to do so) this debt with interest (often) @ 40 and 75 per cent." Time was never made the essence of the agreement, and an arrow-head or some such mark was carelessly scrawled upon the bond to represent the signature of the recipient of the dole, who in nine cases out of ten never read or understood what he was signing, and was ignorant of the misery and ruin he entailed upon his children. This bond was of such value, that whenever the mahajun wanted his own fields prepared, or crops cut, he would immediately pounce down upon the unfortunate donor of it, and drag him to compulsory and doubly unprofitable work ; for while the Sonthal's time was taken up in looking after the mahajun' field without payment or fair remuneration, his own land would lie fallow or his crop rot from not being reaped at the right time. To such a climax had this evil attained, that it was a common thing for a Moonsiff to decree that a grandson should give personal service in liquidation of a debt due by a grandfather, and of which debt the grandson was ignorant, or which had never been incurred. In too many instances I fear, si vera est fama, the lower Courts were guilty of gross negligence and fraud.

To Mr. Le F. Robinson, of the Bengal Civil Service, is due the honor of having called the attention of Government to this crying evil, and of never abating in his exertions until this great engine of oppression was abolished. His name, with a few others, is now mentioned with affection and gratitude by the people he benefited. I herewith append his remarks on the subject of slavery: he states that -

"It was called Kamiotee, but it is not peculiar to Sonthalia or the Sonthals. You will "find it nearly all over the country, I believe, in "one form or another. But in Sonthalia it was "very bad. A man borrowed money and gave "a bond to work it out, binding himself to work "for the lender, whenever he was required, with-"out pay. The lender of course required his "services at harvest and the other busy seasons "of the year, when the debtor could have got "work and pay elsewhere, and when work was "slack the lender of course did not

require his "slave' services. He could make nothing else-"where; all he got when working was food, and "sometimes a bit of cloth once a year. As "interest was taken in advance, the debtor "could never work out the debt; the interest "was never less than 25 per cent, often much "more; the son, daughter, or other nearest relation of the debtor used in case of his death "to be considered liable, and if suits were "brought on these bonds in the old Moonsiffs' " Courts, they used to give decrees for their due" execution, no matter how old the debt or "who was working it out at the time! I have "had a bond brought to me in which 25 Rs. was "originally borrowed by a man who worked his " life time, his son did ditto, and I released his " grandson from any further necessity; it had "been running on for over thirty years, if I "remember rightly! Whenever I got a complaint, I made the creditor produce the bond "and impounded or tore it up, and sent the "debtor to work on the railway. It was in "1858 that the whole matter was reported to the "Bengal Government."

The rapacity of the mahajuns (curtailed as their power for evil has been, since the period about which I am now writing) is still patent to any who may come in contact with them . They may be necessary evils, but the evil of doing without them would be far preferable to any supposed good to be derived from them. They are not so grasping with men of their own caste or nation, but the bargaining of the Bengali mahajun with the Sonthal is the contest between a knave and a reckless fool- about as equal as a battle with a wolf on the one side, and a lamb on the other.

When it is considered that under the old regulation system an ill-paid Darogah or Native Inspector of Police, with about twenty Burkundauzes or Constables, was placed in the country with no European or respectable Native supervision, or with just sufficient to give such supervision a name and to make it a farce; when the only English Officer performed at the most one hasty dash through the middle of the district but once a year ; when these Inspectors were notoriously corrupt, and played into the hands of the money lenders, besides practising a little extortion on their own account- it ought not to be a matter of surprise that this confiding, impulsive, and unthinking Sonthal race should rise to strike a blow for their freedom. It was the custom of the mahajun to lend out small sums at exorbitant compound interest, and upon presenting fee to get the aid of the

police to plunder and give him the debtor's property. To obtain redress for a wrong such as this, the sufferers were obliged to wend their weary way on foot through swamp and jungle to a distance of from 80 to 150 miles ere they could lay their complaint before the Hakim at Bhaugulpore or Deoghur. Upon filing their petition and paying through the nose in bribes to the Amlah and fees to the Mooktears (Native Court Agents), the first order obtained was generally an order by an overworked Collector to the Inspector to report on the plaint, and the same to be produced some fortnight or three weeks hence. It may be fancied that the bribe of the mahajun, with the knowledge that in the report he was reporting on himself, would hardly enable the Inspectors to give an impartial return. The necessity for the Sonthal to go constantly to and fro, with his ignorance of the dates appointed for hearing the cause , and the expenses, would tire him out long ere the case was in train for redress. Sick at heart he would return to his cottage, emptied by the money lender, to find his wife and children starving, his homestead in ruins, and his cattle and ploughs sold up for some paltry debt which , in many cases , had been allowed to accumulate at compound interest for years for the mahajun, watching the industry of his victim, would, at the time when his garners were full and the sponge ready to be squeezed , pounce down on him and take hundreds for a debt of a unit, and but too often on some false claim. When for oppression such as this no remedy was to be found; when they saw the proceeds of their labor annihilated, and the destroyers assisted by men wearing Government badges; when many a dreary mile had been trudged, and their last piece spent to enable them to seek a remedy at the foot of the Hakim, and when their claims were either ignored or dismissed, it is not to be wondered at that they should seek a remedy for their misery in arms. When the Sal branch, their signal for war, like the old fiery cross of the Scots, was passed by willing hands from village to village, the whole of this peaceful, industrious race rose as one man, to contend not only for their rights, -for they had long since given up all hope of getting those,-but for bare existence, as they had no faith in a Government which seen only through the Police, and in their quarrels with the mahajuns they had every reason to consider tyrannical, unjust, and extortionate. Thus the torch was lighted which flamed over all the Sonthalian country, caused the death of some Europeans, both

male and female, and thousands of Sonthals, and was only extinguished when our troops had burnt and destroyed many Sonthal villages, all the crops accessible, and had starved the people into a surrender.

The causes that gave rise to this rebellion, with the prior inactivity to give the Sonthals redress, and the stringent measures afterwards taken, form a dark blot on the pages of British History in India.

Long before the rebellion itself broke out ominous signs of discontent had appeared, and appeals for redress had been presented to the authorities; but in the former instances, where any tumultuous gatherings had taken place, they seem to have been treated merely as unlawful assemblies, and no further action taken on them at all, while in the latter the necessary enquiry seems never to have been instituted, or notice sent to the Government of the discontent amongst the people or the oppression practised on them.

This culpable negligence on the part of the responsible authorities can only be accounted for on the plea, that they were so far off from, and so ignorant of the people and their language, that they had formed no conception of the volcano then ready for eruption. At any rate, no action was taken, no troops collected, and no enquiry made into their grievances, until after the Sal branch had been passed and held up in ominous silence at the Manjhee Stan, while the place of rendezvous was declared. The insurgent forces were collected, and the work of plunder and death commenced ere measures were taken to resist them.

It was on or about the 25th June, 1856, when some servants of an indigo planter residing at Aurungabad, and who had gone into the Sonthal country to collect coolies for the Indigo manufactory, returned, terror-stricken, to their master with the intelligence that they had been seized by a large body of armed Sonthals on the war trail, who warned them to retire at once, for vengeance was to be taken on their enemies for injuries received, and upon mahajuns and Government Officials in particular. They had already commenced by decapitating every policeman, Inspector, or mahajun who was unlucky enough to meet them.

The indigo planter referred to at once sent notice of this to the Hon'ble Ashley Eden , who was then in charge of the Aurungabad Magistracy. It was well for the interests of Government, and for the

protection of life and property, that this intelligence came to one who had ability to conceive, and energy to carry out, a plan which probably saved the towns of Jungipore, Moorshedabad, and the surrounding country from being looted. Having sent express to Berhampore for all available troops, he issued perwannahs to the neighboring zemindars to collect as many lattials or fighting men as they could, with whom to meet the insurgents. These assembling presented such a bold front that the Sonthals, apparently doubtful of their own strength, turned back and never attempted to ravage this portion of the boundary, but confined their depredations more towards the Rajmehal, Bhaugulpore, and Deoghur divisions, and to the regions about Nonee.

A curious instance of the animus shown by the Sonthals against Government is depicted in the following story which was told me by the planter before referred to. It is said that the Sonthals had made a Bengali gomashta write perwannahs for the planters, informing them "that as they were 'chassas' or cultivators like themselves, if they stayed in their factories, and gave the Sonthal army 'russud' or Commissariat supplies, they should remain unmolested." If this story can be relied on, - and it was narrated by a good authority, - it proves that the hostile feeling of the tribe arose, not from an animus against Europeans in general, but merely against Government and the police. I will not attempt to describe the murders committed and heavy reprisals taken by our troops, since all my knowledge is derived from hearsay evidence, which is seldom trustworthy. Suffice it to mention that after a guerilla warfare, in which many lives were sacrificed, the war was brought to a close, and the rebellion crushed by the end of 1858.

This period found the Sonthals houseless and wretched, with a great portion of their tribe annihilated, and their accessible villages and crops destroyed ; but they had cut to pieces every mahajun they could get hold of, and had frightened the remainder away with a wholesome fear sufficient to keep them from again appearing to dun their miserable debtors for some time to come ; so to a certain extent the Sonthals had temporarily gained their end, but at a fearful cost to themselves.

There was a rude kind of chivalry shown by the tribes in this war which deserves to be recorded. Although, as a race, they are wonderfully well imbued with a knowledge of all the kinds of

vegetable poisons with which their jungles abound, and although for hunting and shooting they dip their arrow-heads into a compound so poisonous that a full-grown tiger, even if scratched with the prepared barb, surely dies in half an hour ; yet, despite all this, they disdained or neglected to take such an advantage when at war with our troops. I have never been able to find an instance of a case in which any of our men or officers were wounded by poisoned arrows, although many received arrow wounds. While in converse with Sonthals, I have often thought of asking them the question , why they omitted to use the arrows poisoned, but have abstained , as I feared to suggest a practice which they might try upon the questioner, should he ever offend them.

The only race that seems to have derived benefit and no evil from the rebellion is that of the Paharees, who live on the summits of the hills, at the base of which the Sonthals cultivate. These people followed the Sonthal bands at a respectful distance, and waited until the latter had driven away the peaceful inhabitants of the villages enroute, when they rushed in and, taking advantage of their absence and of the Sonthals pursuing, took everything they could lay hands on, and when gorged with booty speedily retired to their fastnesses, leaving to the Sonthals the fighting part and but little of the plunder.

I could scarcely refrain from laughter on hearing the account from a Bengali of his experiences of the rebellion. He lived on the margin of the Sonthalian boundary and the Bhaugulpore district proper, and had built a comfortable homestead, with his cattle, grain, and produce all around him, but the Sonthals marching through his village caused him to free, and with his family hide himself in the woods. The Paharees following looted all his property, and when, after the expiration of a few days, he returned, congratulating himself that all was over, the British force arrived , whose array, to use his graphic language , " stretched from one end of the horizon to the other," and added to his stock of misfortune by burning down the whole village, and all his property also.

A melancholy incident occurred near Tela Gurrie, which resulted in the death of a Mr. H —— and his three sons. It appears that these gentlemen having received news that a body of Sonthals were approaching a village in the vicinity, marched out with some hired fighting men to meet them. But on the two parties coming in sight, the

Natives on the Europeans' side fled, leaving old Mr. H. with his younger son on an elephant and the others on horses.

The elephant, slow and cumbersome, ran into a jheel or large swamp, and while in that position and without a mahout or elephant driver- for he had also fled- some of the enemy scaled the brute's side and with their battle - axes split poor Mr. H.'s and his son's skulls. The others disdaining to leave their father, had already fallen pierced by many arrows.

Isolated incidents such as this occurred, but I refrain from harrowing the feelings of the surviving relations of the sufferers by recounting them in detail.

STATISTICAL REPORT -- THANA LABPORE

লাভপুর থানার ১৮৭৩সনের একটি বিবরণ

[আর. ডি. হাইম. ১৮৭৩সনের তৎকালিক বীরভূম জেলার তিনটি থানার বিভিন্ন বিষয়ক বিবরণ সংগ্রহ ও সংকলিত করেন। থানাগুলি লাভপুর, সাকুলিপুর (বর্তমান নানুর) এবং বড়োঞা (বর্তমানে ঐ থানাটি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। তখন বীরভূম জেলায় ছিল। এ নথিটি দুঃস্পাপ্য। লাভপুর থানার তথ্যাদি সম্বলিত অংশ সংগ্রহ করতে পেরেছি। বাকী দুটি পাইনি। জেলার একটি মূল্যবান দলিল হিসাবে প্রকাশ করা হল।- সম্পাদক।]

1. Owing to contiguity in situation, this tract bears a very close resemblance in many respects to the thanas already reported upon. This report therefore describes only what has newly been found worth noticing in it, and does not enter into detail in regard to what has been spoken of in the report on those thanas.

2. This thana is bounded on the north by thanas Maureswar and Burdwan ; on the east by Burdwan and Sakoolipore ; on the south by Sakoolipore and Kosba ; and on the West by Kosba and Mayureswar. Its area is about 109$^3/_5$ square miles, as ascertained by adding together the areas of the villages comprised in it. It is drained by the rivers More, Kopaie, and Buklessur; the latter two, joining towards the east of the thana, flow by the name of Kooya river. It cannot boast of a single village which may, properly speaking, be said to approach the rank of town. The villages containing the largest number of households in it are Darka, Hirapore, Chahata, and Kooromba. The chief occupation of the people of this tract is agriculture, and they almost entirely depend on the produce of

cultivation. The principal crops cultivated are rice, sugarcane, and the rubbee crops, of which the first is grown beyond the needs of home consumption, and is therefore the chief article of export. Cotton and some pulses are also cultivated, but not in sufficient quantities to meet the requirements of the whole tract. For them and other necessaries the people have to look to distant marts. They are imported from Calcutta, Agra, Cawnpore, and Dhulian. The articles of export and import are conveyed by railway; they are loaded and unloaded at Ahmedpore station, which is the only market in the tract, whence the conveyance to the interior is conducted by means of pack-bullocks and carts.

3. The zemindars of this quarter keep no records of the areas of the mouzahs pertaining to their zemindaries : the papers they have only shew the net rental assessed on each ryot, and consequently were of no service in the prosecution of this inquiry. Therefore, in accordance with paragraph 5 of the Board's letter No. 43A, of 21st January 1873, the whole tract was actually measured, mouzah by mouzah, and the result has been embodied in the following table, which will show the distribution of the area in regard to produce :-

Land under Crop.

	Bgs.	K.	G.	A.	R.	P.
Rice-land	1,31,965	1	8	43,624	3	11
Sugarcane	2,637	8	5	871	3	19
Rubbee sema	16,022	15	18.25	5296	3	6
Dehi mulberry	41	2	15	13	2	16
Matal	1,818	0	18.50	601	0	1
Olan*	345	12	16.25	114	1	2
Jedanga* (arahur, &C)	556	16	17.25	184	0	12
Total	153,386	18	18.25	50,706	1	27
Orchard land	1,021	7	9.25	337	2	23
Total	154,408	6	7.50	51,044	0	10

Uncultivated Land.

	Bgs.	K.	G.	A.	R.	
Culturable waste land, but not under cultivation last three years	921	4	19	304	2	7
Land cultivated within the last three years but now fallow	1,054	11	9.25	348	2	19
Unculturable land	6,493	7	18.25	2,146	2	12
Grazing land	19,535	18	14.50	6,458	0	26
Total	28,005	3	1	9,257	3	24

Village Site

	Bgs.	K.	G.	A.	B.	P.
Bastu	6,305	9	12	2,084	1	33
Udbastu	585	11	19	193	2	14
Total	6,891	1	1	2,278	0	7

Land under Water

	Bgs.	K.	G.	A.	R.	P.
Tanks	18,121	7	5.25	5,990	2	5
Khals and kanders	2,201	6	12	727	2	34
Rivers	1,775	14	6	587	0	2
Total	22,098	8	3.25	7,305	1	1
Grand Total	2,11,402	19	2.75	69,885	1	2

In the foregoing table only the lands on which amun rice is grown have been classified as rice land ; those producing aush and rubbee crops are classed as rubbee sema. The distinctive characteristics of these lands having been given in the report on thana Burdwan, are not again noticed here.

4. Classification of land according to the nature of soil :-

(1) Matthyal (2) Dorah (3) Bali

These three kinds of soil were found in this tract. Some waste dangas full of kunkur were also met with here and there, but their soil

belongs to one or other of these three classes.

Classification of land according to cultivation :-

(1) Sali	(4) Olan
(2) „	(5) Dehi mulberry
(3) Jedanga	(6) Matal mulberry

These three classes of culturable lands exist in this thana. Their soil falls under one or other of the three descriptions enumerated in the proceeding classification, and each of them is here appropriated to the cultivation of the same kinds of crop as in the thanas already reported upon. The first two classes, viz. Sali and Do, are, according to their productive power and advantages of cultivation, again divided, as in those thanas, into three sub-classes, which are given below:-

Sali	*Do*
Sali, Awal (1st class)	Do, Awal (1st class)
Do, Doem (2nd class)	Do, Doem (2nd class)
Do, Siem (3rd class)	Do, Siem (3rd class)

5. The following are the crops generally cultivated in this quarter :-

Rice	Musuri (Errum larsutum)
Sugarcane	Khesari (Lathurus saticus)
Beet (Cicerarietinum)	Rai, mustard (Sinapis glauce)
Matar (peas)	Til, kashta (Sesaemum orientale)
Shurshi, mustard (Sinapes dichatoma)	Cotton
Mushna, flax (Sinum usitatissimum)	Dehi mulberry
Job (barley)	Matal mulberry
Gow (wheat)	

6. The mode of growing these crops in this thana is similar to that adopted in the thanas already reported upon; the cost and profit of cultivation are also alike. The large-grained rices are, as in those thanas, cultivated to a greater extent than the smaller grained ones.

7. Indigo and potato are not cultivated in Labpore. Tobacco is planted in some of the villages bordering the Kooya and More rivers, and on homestead lands in small quantities for home use.

8. Formerly cotton was cultivated in this quarter to an extent sufficient to meet the cultivator's wants, but at present its cultivation has almost been given up : it exists in few villages. The area under its cultivation in this thana during the current year, along with other

rubbee non-creeping crops, such as mustard, linseed, & c., is about 56 acres. Land is not set apart exclusively for it. The decline of its cultivation may be attributed to the gradual spread of machine made clothes, which being now cheap, are used by the people of almost all ranks : very few wear home-made clothing. Only country cotton is grown here ; cultivation of kher cotton was not found. The method of cultivation in this thana is the same as that described in the former report.

9. The two kinds of Ramkapass (Devil's cotton), viz. Ramkapass (wild cotton) and Ramkapass (red cotton), were also found in some villages of this thana.

10. The crops named in the following list are especially cultivated in this thana by some people. The lands on which they are grown, the process of their cultivation, and their use, are the same as described in the report on Burdwan, Maureswar, and Sakoolipore. Nothing peculiar to be noticed with respect to them, in addition to what has been said in that report, was found.

List of Special Crops

Kachu (Arum colocusia)
Mula, radish (Rashanus sativus)
Vadni kalai
Kuri kalai
Arahur kalai
Sheen (Crotolaria juncia)
Red potato (Convulvolus battatus)
Halood (turmeric)
Ada (ginger)
Shusha (cucumber)
Jhinga (Luffa acutangula)
Purul (Luffa pentandra)
Lanka, chillies (Capsicum frutiscius)
Safflower
Law (pumpkin)
Kela (plaintain)

Koomra (Gourd cucurbita pipa)
Dingle (Amaranthus gangeticus)
Shim (kidney bean)
Palang sak (Beta Bengalensis)
Pai sak (Basella albu and rubra)
Begun (brinjal)
Panka sak
Notor sak
Piring sak (Trigonella corniculata)
Kaunta (Diocorea pentaphylla)
Kankoor
Khero
Tarmooj
Oochiya (Momordica muricata)
Karla

11. Among fibrous and other useful plants, those that grow in thana Burdwan are also met with in this quarter ; but as a full description of them has been given in the report on that thana, it is scarcely necessary to enumerate them here again. All of them grow

here to the same extent, and are used for the same purposes, as in that thana.

12. Betel plantation, called Boruj, was noticed only in one village, named Nawaparah. The mode of its cultivation has been described in the report on thanas Burdwan, Maureswar, and Sakoolipore. The three sorts of betel which are cultivated in them are also planted here, but do not flourish.

13. The cultivation of almost all the aforesaid crops, especially of the rubbee crops, sugarcane, cotton, and most of the vegetables, require frequent irrigation ; but there being no perennial river in the whole tract*, it is carried on mainly from tanks. The rivers and kanders that exist in this thana hold water only in the rainy season, when irrigation is least needed, and begin to get dry towards the first part of winter; consequently crops are liable to failure if there be a cessation of rainfall for a short time. Water is raised here by sini and deeni, which have been described in the report on thana Burdwan.

**The river Kopai and More are exceptions to this, but run very low in the dry water -- Editor.*

14. Regarding the industries, other than agriculture, which are followed by the people of this quarter, the first and most profitable is the rearing of silkworms. Formerly the people of the north-eastern half of the thana lived chiefly by it ; but the industry has now much declined, owing, it is said, to the successive failures of the outturn from the prevalence of various diseases of the worms.

15. Three varieties of silkworms reared here are the bara palu, the nistiri palu, and the chhaia palu. The process of rearing these worms has been fully described in the former report, and the same modes are followed in this quarter.

16. Besides the above-named worms, the generation of a mixed species of worms has recently been noticed, which are called khcki palu. They are produced by the union of nistiri and chhata palu, and are, according to circumstances, divided into two other varieties.

17. The first is produced by worms bred by males of the nistiri with females of the chhata palu ; it more nearly resembles the nistiri in its characteristics, and may therefore be named nistiri-khcki.

18. The second is produced by worms generated by males of the chhata palu and females of the nistiri. This also resembles more

nearly the male parent, and may accordingly be named chhata-kheki.

19. Both varieties are, however, known by the name of kheki. The fiber of the silk produced by them is somewhat fine, and as they have been only lately introduced, their cocoons are reeled along with those of other worms. They have not yet been generated largely enough for silk to be manufactured separately from their cocoons, but it is expected that in time, as their numbers gradually increase, silk will be reeled from their cocoons separately.

20. There is no difference in the mode of rearing these worms ; it is like that of the nistiri and chhata palu.

21. In this thana there is one large silk manufactory, at Gonotia, which is managed by a European superintendent. This factory formerly belonged to Government, and was sold to Messrs Watson & Co. in 1244 B.S.* This Company sold it in 1265 B.S.** for Rs. 20,000 to Messrs, Lyal & Co. During the time of this Company its condition has been much improved ; they have provided it with steam and two bomas (water-raising machines), at a cost of Rs. 18,000 and Rs. 10,000 respectively. But when it belonged to the Government the number of its basins was greater, and the work was carried on more extensively than at present. It now contains 428 basins, all worked by steam, and three tandurs (ovens) for heating cocoons, besides 100 basins which are worked in the native method when the steam basins are not sufficient to work the whole quantity of cocoons brought in. An establishment consisting of 21 officers, including the superintendent, is entertained for its management, whose monthly salary amounts to about Rs. 1,250. Under it there are three other factories in this district,—Kotasur, Sumargunge, and Manipore, but they are not within Labpore thana.

* *A.D. 1837*

** *A.D. 1858*

22. The cocoons used in this factory are purchased by direct contract both with the silkworm breeders and with paikans*, and the silk manufactured in it is exported to Calcutta and London. A statement is given below showing the number of labourers employed the amount of their annual wages, advance for cocoons, and the annual outturn during the last year, i.e. 1875 :-

* *Travelling Dealer.*

Gonotia Factory.

		No.
Number of working basins		428
Number of laborers employed in reeling silk	Men	247
	Women	113
	Boys and girls	73
	Total	433
Number of laborers employed in turning wheel.	Men	115
	Women	129
	Boys and girls	189
	Total	433

	Rs.	A.	P.
Amount of annual wages of laborers	7,835	3	0
Ditto advanced for cocoons	4,279	8	6

	Md.	S.	C
Ditto of outturn in pucca maunds	112	15	10.75

** This sum represents only $2^1/_2$ month's wages during which the factory worked in 1875. The year being a bad one, no labour was employed during the remainder. Labourers consists of katanus and pakdors; the former reel the silk and receive Rs. 5 per mensem, latter turn the wheels and receive Rs. 5 per mensem.*

23. There are also 90 small filatures in this tract, with 129 basins ; they are kept, as in the thanas already reported upon, by the well-to-do mulberry planters and silkworm breeders, and are worked in the old native method. The silk manufactured in them is partly consumed locally and partly exported to Calcutta and Moorshedabad and to the markets of the North-Western Provinces.

Looms.

24. The marginally noted kinds of looms are found in this tract. Besides the Tantees, Jugis, Korahs, Kuniyas, & C., who are weavers by caste looms have been found in the houses of some Boistabs, Bagdis, and Moochies of this quarter.

Silk Looms	206
Blanket ditto	10
Cotton thread looms	424
Total	640

Blacksmithy.

25. There are 33 blacksmithies in this thana. The profession is followed by Kamars only, whose work chiefly consists in making implements of husbandry.

Brass-smithy.

26. No brass-smithy was found here. The metal utensils used by the people are imported from other parts of this district and from Moorshedabad.

Goldsmithy.

27. These number 73. The goldsmiths prepare silver and gold ornaments, but their manufactures are not exported. The rate of their wages here is the same as in the thanas already reported upon.

Carpentry.

28. There are 150 carpentries in this thana. Besides the Chhutar, who are carpenters by caste, some persons of Bagdi, Dome, and Bouri castes follow this industry, but they are not very expert. The most skilled carpenter cannot earn more than Rs. 7.8 a month.

Oil Mills.

29. There are 222 of these mills, called ghani. Particulars regarding them have been given in the report on Burwan.

Spinning Wheels.

30. As in the thanas already reported upon, this wheel is a portion of the household furniture, to be found in the house of almost every ryot except those of the higher classes ; but the practice of spinning twist is being gradually abandoned with that of wearing home-made clothing. At present it is found mostly among the cultivating classes, who make use of the cotton of their own production or of that they buy at markets. There are 6,543 of these wheels in this tract.

Potters' Wheels.

31. These number 109 ; their description has been given in the former report.

Ghooting Lime.

32. The practice of manufacturing lime from ghooting, a kind of gravel, also prevails in this quarter. The process has been described in the report on Burwan, Sakoolipore, and Maureswar. It is also manufactured here from muscles and snails. This lime is used with betel. No lime is exported from this thana.

Trades and Commerce.

33. The only commerce, in the true acceptation of the word, carried on in this tract is in rice. There is only one ganja (market), viz. at Ahmedpore, where rice purchasers (arotdars) open their shops, buy rice directly from the riots, who take their rice thither by pack-bullocks and carts, and export it to Calcutta. Since Augrahan last 1,21,538 pucca maunds of rice have been exported from this market.

34. Besides the arotdars there is another class of dealers in rice, who purchase it at the doors of the ryots and carry it to markets, where it sells dearer. They have carts and bullocks of their own. Some of these dealers come from the districts of Burdwan and Nuddea, and are called bepari. The construction of several roads during the last relief operations has contributed much to the convenience of these traders.

35. In the course of counting stock an attempt was made to estimate the quantity of paddy in store in the whole tract, and it was found to amount to 3,664 pantis*. The same systems and rules for the advance and sale of paddy and rice which obtain in the thanas already reported upon obtain in this.

* *1 panti = 3,200 seers.*

36. Cotton, tobacco, mustard, flour, clarified butter of buffaloes' milk, cloth, salt, pulses, and spices, are also sold at the market of Ahmedpore, but the traffic in them is not very extensive. They are also supplied to this tract from Kandi, Cynthia, Purundarpore, Katwa, and Krinahar.

37. There are six hats (weekly markets),- at Moheegram, Gonotia, Darka, Chahata, Valkuti, and Ahmedpore, where only

vegetables, small fish, and earthen pots, are sold. No daily bazar was found in the whole tract.

38. There is only one hide godown, situated at Moheegram, where only uncured hides of cattle, goats, and sheep are purchased. Buffalo hides are not found here.

39. Trade in cattle has been introduced in this quarter. Some persons, Mahomedan by caste, of the villages of Mirband and Ulkunda and their neighborhood, buy bullocks in villages bordering the river More and take them to Pachundi, in the Burdwan district, where there is a large cattle hat. Young calves are kept by some people of this quarter and fed till they are able to draw the plough, when they sell them at their own houses to the aforesaid paikars (dealers) or to other ryots, keeping only as many as are required for tilling their own lands.

40. No trade in firewood exists in this quarter. Ghoshi (cowdung cakes) , khoa (refuse of sugarcane), and shurpate (leaves of shur), are chiefly used for fuel.

Principal Articles of Export.

Rice and silk.

Principal Articles of Import.

41. Tobacco, cotton, machine-made cloth, salt, clarified butter of buffaloes' milk, flour, coconut-oil, spices, sugar, jute, betelnut potato, paper , mustard, oilcake, pulses, tar, iron, metal utensils, molasses for preparing tobacco, machine-made thread, khair, catechu*.

* *Produce of the Micerasa catechu, used in this district as a condiment with betel, and in medicine as an external application -- Editor.*

Fairs (Melas).

42. At Vastore the mela commences on the full moon day of Bysack, on which the Pooja of the Dharmaraj Thakoor of the village takes place; it continues for about two months. Shopkeepers come from different parts of the country to sell various articles, and some 200 persons daily come and go.

At Rakhorresur this mela commences on the day of "Shiboratree," in Falgoon, and lasts for about a fortnight. Several shopkeepers bring their shops. The daily attendance does not exceed 100.

43. There are three other fairs,—at Shetholgram, Chohata, and Mohespore, but they are of short duration and little consequence.

44. No charitable or religious institution exists in the whole tract.

45. Two tolls, two middle class English schools, four aided vernacular schools, one girls' school, thirteen subsidized village pathsalas, one night pathsala, and nine village pathsalas, are found. To the first and last named institutions Government gives no aid.

46. The chief villages of this thana are Ahmedpore, Labpore, Gonotia, Darka, Ramnugger, Kooromba, Thiba, Hirapore, and Chahata.

A list of places of worship is given below:—

Hindu.

Temples of Shiva	Pucca	142
	Kucha	83
Village deities	Pucca	55
	Kucha	150
Deities daily worshipped	Pucca	30
	Kucha	111
Total	Pucca	227
	Kucha	341

47. The worship of these deities is conducted in the same manner as in the thanas already reported upon .There are no almshouses or establishments for public good attached to any of them. The deities daily worshipped include "salgram," "shreedar gopal," "Radhakanto," Lakshinarain, & c. There is a goddess named "Fullora" in village Labpore, whose worship is conducted by a "Gosain" with the proceeds of "devtor" properties :-

Akhra	Pucca	21
	Kucha	24
	Total	45

These are established by the "Bauls" "and Boistubs," whose description has been given in the former report. In some only of the " Akhras" of this thana "Mahutshubs" are held annually.

Mohomedan.

Musjid	Pucca	9
	Kucha	23
Astara		125
	Total	157

48. The ceremonies celebrated at these places have been described in the report on thanas Burwan, Sakoolipore, and Mouressur.

49. The following tenures and rights in land are found to exist in this quarter :-

Zemindaries and independent taluks.	Zemindari and resumed lakraj.
Intermediate tenures	Patni, durpatni, and sepatni talooks ; ijara and dorijara, ayma, bhati ayma, nankar, madadmash.
Cultivating tenures	Mukurraree jumma, mouroshe jumma, kheraj kharjda, bahar kharida, jote jumma, miadi jote, korfa jote, bhag jote, krishanee jote, gatepaka rent.
Rent-free tenures	Confirmed lakraj, brahmator, debotter pirattor, chiraki mahatran, khoshbash.
Government service lands	Chowkeedaree chakran lands.
Zemindars' ditto	Halshabara's land, shimandar's land, atpaharias land, barber's land.

50. There are chowkeedars in every village, all of whom with the exception of those of ten mouzahs pertaining to Lat Gonotia, whose chakran lands were resumed by Government in 1856, paid by Government at the rate of Rs. 3 per mensem, have lands called chakran lands. Their number in each village ranges from one to twenty-two, and their holdings have been ascertained from their verbal statements to comprise land from 3 to 46 beeghas. As these holdings have since the time of their creation passed through several hands, they have been reduced very much in some cases, as in the thanas already reported upon, by fraud and collusion on the part of the chowkeedars. Under orders of the Collector, conveyed in his letter No. 735, of 4th December 1875, measurement and demarcation of chakran lands of this thana was taken up on the 15th January 1876 along with the prosecution of this enquiry in it ; and up to the date of its completion 382 acres 1 rood and 7 poles of land of 95 holdings in 26 mouzahs were surveyed with compass, the plans and other papers of which have been submitted with report No. 30, dated 29th April 1876.

51. In this thana also, as in those above alluded to, some villages have too many chowkeedars, and their number may be reduced without any prejudice to the public safety.

52. The practice of katlapara also existed in this quarter when the chowkeedars were under the control of zemindars.

53. No kind of illegal cess was found to be levied by the zemindars of this thana.

Mines.

54. At present no mine of any kind exists in this quarter.

55. To the east of village Labpore there lies a waste danga on either side of the river Laghata, near Sarparajpore, on which here and there heaps of iron slag (Louhakilta or Mandur) are found, both above and under the ground, and remains of houses and wells are traceable, indicating that at some bygone time a ganj, or town, stood there. Heaps of iron slag are also met with in the village of Lodda, which stands on the east bank of the above river, as well as buried on its banks after floods. These circumstances lead to the inference that a kotshal (iron factory) existed at this spot, in which iron was long manufactured, and that the village Lodda, which is still in existence, was first inhabited on that account, as may be presumed from the fact that, owing to the existence of an iron factory, the village may have been named first Lohardaha, subsequently contracted into Lohorda, and pronounced in the Persian language Lodda, during the time of the Mussulmans. No residence of the upper classes i.e. Brahmin, Kaystas, and Baidya, was found in this village. It contains 85 households of the marginally cited castes, and the inhabitants, though not new settlers, live by manual labour. From this it appears probable that its present inhabitants are lineal or collateral descendants of the artisans and labourers formerly employed in the factory.

Kalu	4	Koybutta	11
Baistab	6	Bagdi	9
Sodgope	26	Hari	9
Chhutar	1	Dome	1
Kamar	7	Moochi	8
Moira	1		----
Rajput	2		8!

56. This danga naturally abounds in kunkur and stones of various colors, some of which bear marks of being bitch pathor (iron producing stones), a fact which shews that a quarry of these stones most probably lies under it, and that the factory was worked as long as the stones were abundant, and closed with their gradual exhaustion. There are no means of ascertaining the time of erection, duration, and closing of the factory ; only this much is known, that neither iron factory nor town stood on the spot at the time of the decennial settlement, for had it then existed it would have been recorded in the mouzahwary and quinquennial registers as an iron mehal (lohar mehal), but no mention of it is found in either.

57. Enquiry was made of the oldest inhabitants, but they could say nothing more than that they have heard from their ancestors that there was a town named Syamlabad with a kotshal of iron on the spot.

58. On a survey of the danga it evidently appears that formerly a sal wood stood on it. Some khair trees (Mimosa catechu) are still met with in one part of it, about two miles to the west of village Labpore. They were not planted by anybody, but have grown from seeds falling from the trees of the old forest, and are used for fuel. The preparation of khair (catechu) does not exist in this quarter.

59. The lower parts of the danga are culturable, and large portions of them are supposed to have been rendered so by the removal of the iron-stone.

Salt.

60. To the west of Labpore and south of Gogah there lies another danga, called Sekampore danga, in the lower parts of some of which there are deposits of salt-producing earth. The women of some of the poor people of the surrounding villages scrape this earth and prepare salt therefrom from winter till the rains set in for household consumption. To prepare salt from this earth it is diluted with water, which is then filtered and boiled. A little of this earth and the salt prepared from it were sent with report dated the 25th November 1875.

61. By enquiry it has been found that the danga is extensive, but salt-producing earth is obtained at very few places, and the quantity of salt the earth is capable of yielding is not sufficient to repay the cost of manufacture. Only one-sixteenth part of this earth is salt. The

practice of using salt prepared by the above process has long existed among the poor of the neighborhood.

62. The earth is scraped every morning from the aforesaid places, and is re-impregnated every night on the very same spots by dewfall. Only so much of it is scraped off as becomes damped by the dew, the earth below it yielding no salt. During the rainy season these places are inundated, and the brackish matter being washed away, no salt is obtainable.

Springs.

63. A spring was found to the east of the village Labpore, and close to the north of the Government road running from Ahmedpore to the river Laghatta. It has existed from a long time, and is perennial. A small space round the spring is under water, and is daldale, or shaking bog, and dangerous. It has been ascertained from the people of the quarter that the daldale round the spring extended over a large area, which has gradually become solid and culturable. On observing the site of the daldale it appears to have formerly comprised about 25 beghas, the greater portion of which has become culturable ; the area at present covered by it is about 10 cotahs only.

Ghooting (Limestone).

64. Is produced in this thana also, but no particulars regarding it not entered in the former report have been noted.

Wax.

65. Wax prepared from bees' combs is in general use, but is also prepared from matter yielded by a kind of worm. It has not been ascertained that they are called by any other appellation than that of wax-producing worms.

66. These worms grow on small branches of trees. As they gradually increase in bulk, they emit matter from their bodies, with which they construct their cells ; these are closely attached to the branch, and have no aperture, but a few marks resembling small holes are perceptible. Like the lacdye worms, they are enclosed in their cells, from which wax is prepared as lacdye from those of the former. The cells are white in colour, and are called khayamome, from the fact of their bearing a resemblance to khai (parched rice grain).

67. It appears to be the case that these worms, on attaining maturity, lay eggs, expire within their cells, and are thrown down by rain or wind, together with house and offspring. If any remain on the branches, they construct new habitations. If the cells be thrown down on the ground before maturity, the worms fail to reproduce and perish ; but if they fall on bushes, reproduction takes place there, and the young make their cells on the spot. Amount large trees this worm has been seen on mango and arjune* trees, and on bushes of mayna and bunchi trees underneath them.

* *Terminalia Arjune -- Editor.*

68. First, to ascertain if they possess any power of locomotion, some of these worms were taken alive with their cells, but no such power appeared. Secondly, an attempt was made to ascertain their size and form ; but as the worm melted away in the process of separating it from the cell, the attempt failed.

69. It is inferred that these worms are naturally devoid of the power of locomotion. They grow and make their cells on the very spot on which they are produced. In considering the mode of their generation, it appears that when the natural sap of a tree becomes corrupted, it generated them ; for they are not found in all the trees of a grove, but only on certain branches of some. Their generation in this way is effected spontaneously. Worms thus generated gradually procreate others, by the general laws of propagation, and the offspring dwells on the same branches with the parents. In consequence of the absence of the power of locomotion they cannot migrate to other trees, but go on propagating their species on the tree on which they are produced. They live upon the sap of trees. On detaching their abodes from trees, the lower part of their body is observable through the side which was in contact with the wood, marks resembling legs are seen all round it, and the presence of blood is perceptible. When the worms are dead the blood-vessel becomes black, but it was not possible to ascertain if any dye could be prepared from it.

70. The young of these worms are found on the same branches with the mature, showing that they are generated at all times, and gradually construct their waxy cells, which become ripe for the preparation of good wax during the trees months from Bysack to Ashar. All the wax they are capable of yielding is obtained during that time.

71. To prepare wax from the cells of these worms, put some in a basin, pour a little mustard oil on it, and melt by heat of fire. Then, before the matter gets cool, strain it through a piece of cloth placed over another vessel containing water ; the wax will float on the water, and the dead worms and other refuse will remain on the cloth.

72. Some cells of these worms, together with wax prepared therefrom, have been forwarded to the Collector for inspection with report No. 33, of 11th May 1876.

-- *Sent to Economic Museum, Calcutta - Editor.*

Description of Caste.

73. This thana is inhabited only by people professing Hinduism and Mahomedanism.

Mussalmans.

Caste		Number of households.
Mussalmans		1,522
Bedia		40
Patua		22
Nikaris		3
	Total	1,587

74. Except the Nikaris, full descriptions of these castes have been given in reports already submitted ; nothing more has been noticed than what was said of them there. The Nikaris do not drink pachai, like the Bedias. They are uneducated, and deal in fish.

Hindus.

75. Among the Hindus there are people of many castes ; those inhabiting this thana have been divided into the following classes :-

First Class.

Caste		Number of households
Brahmins		1,023
Kayasthas		134
Bedias		7
	Total	1,164

76. Accounts of the people of this class have been given in the report on the thanas already completed. The figures for the Brahmins include the Conoje and Mithili Brahmins, who number 1 and 85, and immigrated formerly from Conoje and Mithila respectively for the purpose of transacting business in this quarter, and settled here like the Bangas Brahmins, but have no social connection with the latter.

Second Class

Caste	Number of households.
Agardani	19
Barua Brahmin	44
Chitakar	2
Vat	9
Daibajanas	17
Sanyasee	21
Total	112

77. Except the Chitakar Brahmins and the Sanyasees, all the people of this class have been treated of in the previous reports. Particulars regarding these two castes are given below:-

78. Chitakar Brahmins - These are Brahmins degraded for serving as priests to all castes in the performance of funeral rites, which is a profession followed by no other Brahmins. They do not cultivate land with their own hands.

79. They are handsome, industrious, tolerably intelligent, and frugal, but not persevering. Their women are handsome and industrious.

80. Sanyasee - These did not formerly belong to any caste. They are descendants of any Sanyasee (religious mendicant) or his disciples, and their families have gradually increased and formed the caste called Sanyasee. They are Shaiva, that is devotees of Shiva ; their corpses are not burned, but interred, and figures of Shivalinga are placed on their tombs. Those that are in indigent circumstances construct these figures with earth. The office of their priest is performed by the Brahmins. The males wear girua-bastra (cloth coloured red with giri, a kind of earth). They generally reside near the temple of a Shiva, and become his sebait. There is an idol of an Anadilingashiva, called Rakhoressur, in a village of the same name

in this thana, and all zemindars have assigned devattars for his worship. The village has fifteen households of the Sanyasees, who conduct his worship and enjoy all the devattar properties of the Shiva. They declare that formerly the site of the village was a dense uninhabited jungle, and that the Shiva lay in it under ground that in time immemorial a Sanyasee named Jajom Gossain Varati had communication in a dream with the Shiva, and accordingly dwelt there and founded the idol ; and that thenceforward the village has been gradually populated, and is called after the name of the Shiva Rakhoressur. The present Sanyasees are descendants of the said Gossain. They are of dark complexion, handsome, cheerful, and hospitable, and their women are handsome and industrious.

Third Class

Caste	Number of households.
Chutri	42
Sodgope	3,154
Kamar	66
Kumar	123
Tili	27
Gandhobanik	480
Mali	15
Mayra	216
Tanti	291
Barui	15
Napit	154
Rajpur	30
Aguri	26
Goala	134
Kaibatta	93
Boistab	601
Total	5,467

81. Accounts of these people have been given in previous reports.

Fourth Class

Caste	Number of households.
Subarnabanik	74
Sarnakai	83
Chhutar	174

Kalu	290
Suvri	341
Doba	40
Chasha Dhoba	8
Pura	9
Jugi	67
Cheluti Sunri	28
Total	1,114

82. Particulars regarding the people of the above castes have been given in previous reports. The Cheluti Sunris resemble the Sunris in almost every respect, differing only in not manufacturing liquor. They deal in rice.

Fifth Class

Caste	Number of households.
Bagdi	1,171
Hari	379
Dome	337
Kotal	4
Bollo	310
Koura	108
Jela Kaibatta	204
Baitee	7
Byadh	3
Kurmi	5
Bauri	272
Moochi	711
Lohar	44
Kole	7
Dangar	30
Bajikur	26
Total	3,618

83. The people of this class have been all described in a former report, with the exception of Bajikurs, an account of whom is given below.

84. Bajikurs - The aforementioned 26 households of this caste were found in village Sithalgram, about four miles to the east of Labpore police-station. They pay no rent for their homestead lands,

which have been given to them by the zemindar of the village rent-free.

85. They are strong, intelligent, and cheerful, drink pachai liquor, men and women, and live by begging and playing legerdemain tricks. They do not follow any profession, such as agriculture, commerce, & c., and stay in their houses for very short periods twice during the whole year.

86. In the beginning of Agrahyan they all set out to beg, in different directions, on one and the same date, with their wives and children and all their property, putting thorns at the doors of their houses, and return on the morning of 15th Chaitra. They would rather submit to stay with their families in the neighbouring villages that enter their own before the said day, on which they are all bound to come back to their respective homes. Should any one of them return before or after it, he is fined Rs. 7 for breaking the rule, and in default is interdicted by their social law.

87. From the 15th to the last day of Chaitra they celebrate observances (brata) in honour of the Shiva of the village, and both men and women devote the interval to drinking, dancing, and singing.

88. The idol of the above-mentioned Shiva is immersed in water throughout the whole year, being raised from it only when his jogan* takes place, and again immersed after it is over, by the headman of the Bajikurs, for which the zemindar of the village has given them five beeghas of land free of rent. They do not cultivate the land themselves, nor do they appropriate its proceeds to their own use, but expend them entirely in the worship of the Shiva, together with the amount of fines and subscriptions collected among themselves.

* *worship -- Editor*

89. After the jogan (worship) of the Shiva is finished, they again go away on a certain day in the beginning of Bysack with their families, as in Agrahan, putting thorns at their doors, and return on an appointed day before the Doorga Pooja in Ashin, and worship the idols of Doorga and Syama by subscription at their homes, where they stay this time till the end of Kartik, devoting themselves to pleasure and amusements.

90. Ancther social rule strictly observed by the people of this caste is that the father and son must not live in commensality after

the latter is married, but are both bound to separate, and, in case of its violation, the rule is enforced by imposition of fines.

91. The Bajikurs are not like the Haghras, who are mostly thieves and have no fixed residence. They detest theft, have fixed habitations, and are content with what they earn by begging, which is their caste profession.

92. Parts of the Board's Statistical Return No. 41B, namely Part I E 2 (Fiscal), Part III D I (Agriculture), Part III D 2 (Stock), Part III D 3 (Rates of rent and produce), Part III, F 1 (Prices of produce), Part III F 2 (Labour), Part III K (Charitable Institutions), Part IV A (Statistics of Instruction), and Part G (Manufacture), are herewith annexed duly filled up for the tract surveyed.

R. D. HIME,
Collector, Editor.

ARCHAEOLOGY OF BIRBHUM
THE PAST INFORMS THE PRESENT

SUBRATA CHAKRABARTI

INTRODUCTION

The district of Birbhum at 23^0 32′ 30″ N and 24^0 35′ 00″ N : 88^0 02′ 40″ E and 81^0 05′ 25″ E covers an area of about 4514 km^2 with an average elevations of about 80 m above mean sea level, and could be viewed as an upside down funnel. At its southern border with Burdwan, the funnel mouth reaches a width of about 100 km in east-west direction, which is traversed by the Ajay and forms the natural boundary between the districts of Birbhum and Burdwan. The tapering narrow end at the northern tip of the district, the width of the funnel has decreased to less than 10 km east-west and is appended to the body of the hills of the Santal Parganas in the west and to the Gangetic plains in the east. The western part of the district is more rugged as it shares geomorphology of the Bihar Plateau and is marked by a few inselbergs or isolated hillocks tc the Rajmahal Highlands. The monotonous level plain of the deltaic Bengal is broken in the district by the rolling undulating upland, which exerts an influence on the climate and thus affect the distribution of plants, animals, soils, water-courses and, above all, people.

Much of the area of the district is taken up by undulating lateritic outcrop. Aside from this topographical unit, the large and small rivers – the Ajay, Mayurakshi, Hingla, Bakreswar, Sal-Kopai, Singra, Dwarka, Brahmani etc. – structure the surface of the narrow valley corridors and narrow valley segments of Birbhum. The plateau character governs the drainage pattern of Birbhum and most of the rivers have west to east flow, the cross-section of the valley floor(s)

being broader in the west, that is the upstream region. Most of the rivers of the district originate from the Santal Parganas highlands and fall into the 'dead delta' zone below the higher land along the Ganga-Bhagirathi bank. It does not have in stricto senso the lowland plains but does have several subunits of large enough stretches of level land for human habitation.

Birbhum is relatively small itself; it is part of a greater landmass of the Peninsular India. Even though the district is a fringe to the Eastern Plateau of India, there are no geographic obstacles with its east-west and north-south axes. These characteristics of Birbhum are relevant to its history of culture change and cultural evolution.

GEOLOGY

Birbhum is an area of great geological complexity. At its geological base is the Precambrian landmass. The Gondwana sediments of continental origin are found in parts of the district. In sequential development of rock systems of the district, as that of the Eastern Plateau of India, there are unconformities, but the evidence of the Precambrian rocks followed by basalt flows of Upper Jurassic / Lower Cretaceous and subsequent developments from Eocene through Miocene-Oligocene to Mio-Pliocene speaks volume about the geological antiquity of Birbhum, which has considerable bearing upon the Pleistocene and Holocene geomorphology of the country in question.

Uncertainty exists between the Pliocene and Pleistocene boundary in Birbhum Nevertheless, the Quaternary stratigraphy of Bengal can be seen to have developed in a sequence beginning from, what has been designated by Ghosh and Majumder (1991) as, the Lalgarh Formation with its Lower and Upper Member units to Older Alluvium and Younger Alluvium series.

The Lower Lalgarh Formation consists of rounded pebbles, cobbles and boulders of quartzite, amphibolite, schist, granite, laterite, fossil wood and pellets of white shale and represents the primary laterite. The Upper Lalgarh Formation is re-worked and re-deposited sediments of the Lower Lalgarh Formation. Nowhere in the district of Birbhum, the Lower Lalgarh Formation could be associated with the Paleolithic archaeology but the Upper Lalgarh Formation

incorporates the lithic industries from the Lower Palaeolithic to the Upper Palaeolithic not only in Birbhum but also in Bengal, Bihar, Jharkhand and Orissa (Bose and Sen 1948; Bose, Sen and Ray 1958; Ghosh 1962, 1966; Chakrabarti 1999, 2000, 2001, 2002).

The alluvial and fluviatile fan sediments overlie the Lalgarh Formations and make up the post-Pleistocene geomorphology of the Upland Bengal including Birbhum, which have great bearing upon the growth and development of the Mesolithic cultures of the region. A composite stratigraphy of Birbhum that can be worked out from exposures and erosions, either natural or geo-archaeological section cuttings, is as follows:

A thin veneer of humus

Yellowish brown to reddish brown silt and fine grained sand with grits of quartz and chert

(Slope wash material)

Yellowish red silt and medium grained sand with iron-oxide granules and grits of rock fragments constituting mainly of vein quartz and chert

(Slope wash material)

Holocene

Old surface built up by alluvial and fluviatile fan Pleistocene sediments

Unconformity

Lateritic Bed comprising of nodules, quartz pebbles, fossil-woods in a clayey matrix

? Pio-Pleistocene Boundary

Unconformity

Yellowish fedspathic mottled clayey Bed

↕

Conglomerate Bed with pebbles of different rock types, fossil-woods, agate in a clayey matrix

Yellowish-grayish mottled horizontally bedded sand and mud

Unconformity

Jurassic Volcanic rocks of the Rajmahal Traps

Subsurface basement ridge of Gondwana rocks

Basement granitoid Precambrian rocks, at places intruded by dolerite dykes

PREHISTORIC HUNTER-GATHERER SOCITIES

The prehistoric hunter-gatherer societies evolved during the geological period called Quaternary. This geological period is subdivided into the Pleistocene and Holocene or Recent Epoch. The Pleistocene began approximately 3 million years ago and ended around 10,000 years before present. The Holocene began about 10,000 years ago and continues at present. The boundary between the Pleistocene and Holocene, like the boundaries between the various preceding glacials and interglacial, is not very well defined. Some authorities would not consider the Holocene as a separate series but just regard it as the most recent stage of the Pleistocene (Goudie 1983).

The cultural remains of the Pleistocene humans have not survived in its entirety. It is only the most durable objects that were preserved that give us glimpses of the cultural activities of the past hunting-gathering societies. Since tools made of bone or wood rarely were preserved, most of the evidence about human activities during the Pleistocene comes from stone artefacts. Therefore, this culture is designated as Paleolithic or Old Stone Age Culture. The Palaeolithic is again subdivided into Lower, Middle, and Upper periods. These subdivisions are mainly based on the technology of stone tool manufacture.

LOWER PALAEOLITHIC

In Birbhum, the evidence for the presence of the Lower Palaeolithic cultural remains is associated with the Acheulian. The Acheulian has been subdivided into early, middle, and late periods, but our advanced knowledge on the Acheulian culture suggests that it had only two subdivisions viz. early or lower and late or upper stages. In the Old World, the Acheulian first appeared approximately 1.5 million years ago. In India the oldest dated Acheulian is around 1.2 million years. There is a lack of well-dated Acheulian sites in Bengal. The *in situ* occurrence of Acheulian implements in the Upper Lalgarh Formation in Midnapur district (Ghosh 1966; Chakrabarti 2001) and on the Pleistocene beds from the area around the Susania hills in Bankura district (Sastry 1966) probably indicates their origin in Upper Pleistocene. At the Susunia hill complex about thirty-five sites from which more than two thousand Acheulian tools were recovered (Dasgupta *et al* 1973) but it is unfortunate that there is whatsoever no study on them that make scientific assessment difficult to define and designate this otherwise important assemblage or assemblages. It stems from Dasgupta *et al*'s (1973) report that the Acheulian industry, as in other parts of Bankura and Midnapur districts, represents Lower Acheulian tradition. But the Acheulian appeared later in Birbhum and, as it stands today, has a very limited distribution, mainly in northwest Birbhum at Maluti Sadar Ghat on Chila, the rivulet that flows in Birbhum – Jharkhand borderland. It should be borne in mind that the report (Dasgupta *et al* 1969) of 'Early Stone Age tools', comprising of stray finds described as hand axes, from Jibdharpur in Suri P.S. Birbhum has not been published either with documentation or description of the tools and, furthermore, subsequent explorations carried out there yielded negative results.

At Maluti Sadar Ghat site at 24^0 $7'$ N and 87^0 $40'$ E, the Acheulian finds, discovered from three localities, one of them fossiliferous, include handaxes, cleavers, choppers, scrapers and unmodified wastes – flakes, cores and chips and are made of raw materials – traps, basalts, quartzite, chart, jasper (Chakrabarti 1993, 1999, 2001, 2003). The assemblages at Maluti Sadar Ghat Acheulian sites show preponderance of various other tools, such as retouched flakes, side scrapers, end scrapers, points, borers and sundry light-

duty tools over the diagnostic Acheulian artifacts – hand axes, cleavers and knives.

It should be noted that such assemblage character is common with the Late or Upper Acheulian world over. However, the typo-technological traits of the assemblages at Maluti Sadar Ghat represent the Upper Acheulian tradition, the fossilised mammalian teeth and bones, belonging to *Bos* sp. And *Cervus* sp., associated with the assemblage at the fossil-bearing locality, and the geological horizon in which these are found indicate that the Acheulian here belonged to Late Upper Pleistocene.

MIDDLE PALAEOLITHIC

Traditionally the Middle Palaeolithic is characterised by artifacts mostly made on flakes. However, there are many Middle Paleolithic assemblages that contain a great frequency of blades, which were produced from specially prepared cores. There is no sharp boundary between the beginning of the Middle Palaeolithic and the end of the Late or Upper Acheulian. And almost all Middle Palaeolithic tool had its antecedent in the Late Acheulian. Several Thermoluminescence and Uranium / Thorium decay series and radiocarbon dates are available for the Middle Palaeolithic in India. These range in age between 150,000 and 10,000 B.P. The culture of the Middle Palaeolithic period thereby continued to exist for a long duration, covering the Terminal Middle Palaeolithic to the end phase of the Upper Pleistocene. In Bengal, however, there is no radiocarbon dated Middle Palaeolithic site.

The first good evidence for the Middle Palaeolithic in Birbhum has come from the Chila Valley (Chakrabarti 1993, 1998, 1999, 2001). The Middle Palaeolithic sites, seven in number, lie in the Mid-reaches of the Chila river, extending over 4.4 km stretch of the Valley. Perhaps such a spread is by itself can be regarded as a remarkable feature of the industry. The shaped tools include scrapers, points, borers, notches etc. The preponderance of unmodified waste over shaped tools characterised the Middle Palaeolithic industry from the Chila Valley, and it shows exclusive reliance on silicious rocks. These occur as surface finds as well as in the second fluvial gravel bed having, at places, sharp contact to the channel gravel (Lower Palaeolithic) but usually separated by a thin layer of alluvium. Further south from the

Chila Valley, about 17 km to the east of the Maluti Sadar Ghat Acheulian site and 12 km north from Suri, the district headquarters, in the vicinity of the basalt quarry, E / 1 – 14 A (2), at Hatgacha Mouza, in the Mahammadbazar area, a Paleolithic site has been recently discovered (Chakrabarti i.p. 1998-1999, 2001). The site is an open-air station and the artefacts found on the Tertiary rock surface, which, by no means, could be their geological context. Nevertheless, the occurrence of Palaeolithic artifacts in this region is important from the viewpoint of the past hunter-gatherers movement in Birbhum. The artefacts from this site, even though the collection is random and from a small portion of the site, incorporate scrapers, borers, notches, burins, flake-blades, blades and unmodified waste. Chert as raw material dominates over jasper and agate in this collection.

The Hatgacha Palaeolithic artefacts do not represent either morphologically or technologically the typical Middle Palaeolithic. It also does not qualify as belonging to an Upper Palaeolithic industry. But as it does share a similar trait from two of the assemblages from among the seven Middle Palaeolithic assemblages in the Chila valley, it may be placed as a Transitional Middle Palaeolithic-Upper Paleolithic industry.

UPPER PALAEOLITHIC

The Upper Palaeolithic is that stage of Stone Age culture when humanity earned the denotation of *Homo sapiens sapiens* or wise human. Not only the Upper Palaeolithic industry is characterised as having more tools made on blades than the Middle Palaeolithic but also new types of stone tools, such as strangulated blades, Gravette points, truncated pieces, pressure-flake leaf-shaped points appeared during this period. Art in various forms became important component of diurnal existence of humankind. As modern humans, *Homo sapiens sapiens* had appeared on earth approximately 100,000 years ago, their culture may have beginning since the species arrived but the evidence for the Upper Paleolithic cultural remains over the world is better known between the dates ranging from 40,000 to 10,000 years B.P. There is widespread evidence of the Upper Palaeolithic cultural remains in India but not of the makers of this culture. However, well-dated geomorphic data and rich fossil record of fauna and ostrich egg shells from several Upper Palaeolithic sites in India

suggest that the culture may be placed in the time-range 20,000 – 10,000 B.P.

In Bengal the Upper Palaeolithic industry is neither geographically very widespread nor culturally as varied as sites known from Central, Western and Southern India. The stone artifacts that have been designated as Flake-Blade industry represents the first appearance of the Upper Paleolithic in Bengal. It should be noted that the Upper Paleolithic stone industry reported from the north Midnapur region is dominated by Flake elements than Blade tools (Datta 1991). However, a blade-based leptolithick industry discovered in 1999 from the Paruldanga area at $23^0 42' 15''$ N: $87^0 43' 20''$ E represents the Upper Palaeolithic in Birbhum and reflects the gradual development of flake industry into blade industry (Chakrabarti 1999, 2001).

The Upper Palaeolithic artefacts at Paruldanga, which were found sealed in on an earlier geomorphic surface at a depth of 1.5 m at the southeast corner of the site by covered up slope wash material of yellowish red to yellowish brown silt of the recent geologic period suggest their primary context. Over 300 artefacts have been recovered from the old surface, which conformably overlie the upper part of the zone of nodular laterite making up the Upper Lalgarh Formation (Fig. – 1).

The Upper Palaeolithic industry at Paruldanga includes a bone tool, possibly a hide-burnisher, and a varied stone artefacts: curved-backed knives/points, straight-backed blades/knives or points, tianged points, gravers or burins, beck-like boring tools, microlithic backed blades and debitage-cores, anvils etc. Variously colored cryptocrystalline rocks, chert, quartz, carnelian, quartzite and fossil-wood were employed to fashion the artefacts. The assemblages of this type have not been found elsewhere in the region till now. The geologic context in which the Upper Palaeolithic artefacts lie suggests that these have unquestionable great antiquity, definitely greater than 12,000 years B. P.

MESOLITHIC

The Mesolithic hunter-gatherers were the most successful colonisers from among the past hunter-gatherers who preceded them.

On the one hand, theirs is a cultural survival from the Palaeolithic, on the other hand technological changes are reflected in the Mesolithic. The Mesolithic stone industry is characterised by microlithic tools, that is, very small artefacts made on siliceous rocks. The culture began around 10,000 years ago in postglacial environment and survived well into the Neolithic-Chalcolithic and even much later when iron had been introduced.

The Mesolithic sites in Bengal are well distributed in space and time. We find the number of sites has increased during the Mesolithic period in Bankura, Purulia, Midnapur, Burdwan and Birbhum. The Mesolithic hunter-gatherers in Birbhum have shown greater mobility along the banks of the Ajay, the Bakreswar, the Kopai and, better adaptability, by occupying the lateritic uplands. In the lateritic uplands in and around Santiniketan, there are al least five Mesolithic camps – Paruldanga, Syambati, Cheap-Kuthi, Deer Park, Ballabhpur – all located within a 15 km radius of the Ajay-Mayurakshi water divide in the Kopai-Bakreswar valley of the five camps or open-air station of the Mesolithic hunter-gatherers, the camp site at Paruldanga represents activities of longer duration and indicates probably larger groups were occupying the site. Trial excavations at this open-air settlement have helped establish three phases of occupation (Fig. – 1). The Mesolithic – 1 tool occur here at a depth between 0.26 m and 1.5 m in yellowish red silt and, above it, in the yellowish brown to reddish brown silt at a depth between 5 cm – 7 cm are found the Mesolithic – II tools (Chakrabarti 1993, 1998-1999, 1999-2000, 2001). In the assemblage composition, there is indication of lithic reduction sequence in the manufacture of artifacts consisting of flake-blade to blade and blade-let tools. In the Paruldanga collection the finished tools are outnumbered by debitage, possibly an indication of tool knapping at the site. The finished tools consist on blades, lunettes, points, borers, burins, scrapers, notches and retouched flakes. A few pieces of triangles were found from the surface but none found in excavation. The debitage includes primary flakes, cores, unclassified lumps, and core-rejuvenated flakes. The chert is the dominant raw material followed by agate, quartz and fossilwoods employed for tool manufacture at Paruldanga. No radiometric dates are available for ascertaining the chronology of the Mesolithic assemblages at Paruldanga, nevertheless the

occurrence of microlithic tools in a stratigraphical sequence over an old land surface sealed in by two sets of slope wash material suggests continuity ranging from Early Holocene to Late Holocene period.

Microlithic artifacts purportedly belonging to Mesolithic Period are reported from Sukhbazar, Tatarpur, Kondaipur, Dubrajpur, Hetampur, Nalhati, Suri, Bakreswar and many other places from the district of Birbhum. However, non-geometric types and, mostly, waste products represent the microlithic artefacts from these sites. The raw material used for manufacturing these tools is predominantly chert but quartz, agate and fossilwoods are not uncommon. The stratigraphical horizons of artefacts from most of the sites are not known but it is been reported that the artefacts at Sukhbazar and Tatarpur lay over an old surface scattered with fossilwoods whereas at Kodaipur the upper layer of a bed of pisolithic laterite, which has a thickness of about 1.50 m incorporated the microlithic tools (Dasgupta *et at* 1965: 43). It does seem that some of the sites may represent the Mesolithic – 1 and some the Mesolithic – II stages of culture as reflected in the Paruldanga assemblages.

EARLY FARMING COMMUNITIES

Transition to Neolithic in Bengal is more speculative than contextual. This is true in the case of archaeology of Birbhum also. The Neolithic is that time segment when band level societies first evolved into tribal societies with nomadic pastoral existence coupled with food production and lasting until the appearance of copper metallurgy, which marks the beginnings of Copper Age. Although archaeology has attested that even some of the early Neolithic societies knew cold hammering of native copper. However the genesis of the Neolithic in the district of Birbhum is not only uncertain but even doubts exist as to whether the sites with polished and ground stone axes could be assigned the status of the Neolithic. On the contrary, our picture of the early settled farming communities of the Chalcolithic is far more comprehensive than the Neolithic in the district of Birbhum. The Chalcolithic cultures of the region are divisible into two or, more probably, three phases of development: Early Chalcolithic, Late Chalcolithic and Iron-using Later Chalcolithic. The Radiocarbon dates, now calibrated, place the Early Chalcolithic at 1690-1035 B.C.

Late Chalcolithic at 920-795 BC whereas in the last phases of the Late Chalcolithic, first farmers became iron user and may have evolved into iron Age at 820-595 BC (Possehl 1988; Agrawal and Yadava 1995).

The Chalcolithic villages are numerous in the district of Birbhum. These villages are located below 50-meter contour and stood on proximal reaches of the river valley built up by alluviums. On imagery the villages present picture of 'chaotic agglomeration'. But their spatial distribution locates each other at a distance of 5 km (Nag 1987). The radius drawn around each village gives an idea of the catchments of the settlement, which usually spreads over an area not more than 4 to 6 acres. The general arrangement of settlements is Linear.

Excavations in half a dozen sites e.g.Nanur (23^0 42′ N: 87^0 51′ E), Mahisadal (23^0 42′ 49″ N: 87^0 41′ 42″ E), Haraipur (23^0 52′ N: 87^0 45′ E), Bahari (23^0 38′ 30″ N: 87^0 46′ E), Hatikra (23^0 49′ N: 87^0 35′ E) and Kotasur (23^0 52′ N: 87^0 45′ E) have provided with settlement and cultural data based upon which life and time of the early farming communities of Birbhum can be reasonably reconstructed (Das 1967; Kar *et al* 1969' Chakrabarti and Hasan 1982; Ghosh et al 1988 ; Chakrabarti 1986; Ghosh and Chakrabarti 1990). The salient features of the Chalcolithic settlements and cultural remains in Birbhum are examined and presented below.

The earliest Chalcolithic villages in Birbhum are found in the southeastern part of the district. The settlement sites in Birbhum and adjacent parts of South Bengal, with the exception of Mangalkot (23^0 32′ N: 87^0 54′ E) on the Ajay and to some extent Mahisdal on the Kopai, do not take the form of tells or mounds made up of the debris of long occupation. Such tells or mound sites occur in other parts of India/ The accumulation of debris layer upon layer suggests longer duration of occupation of such settlements, which could have been possible due to easy access to water and availability of rich fertile soils thereby giving settlement stability. On the other hand, the Chalcolithic villages in general in Bengal and in Birbhum in particular reveal two or three sequential stages of development. The Chalcolithic habitation sites in Birbhum incorporate cultural deposit of 2 m at its maximum showing two stages of development.

The first stage is distinctively Copper Age during which at the early farmers of Birbhum variously used the softer metal whereas in the second stage in its late phases iron was adopted by the peoples who had been settled in this region for many centuries previously. Some authorities have applied the term 'Early Iron Age', despite notable absence of an appropriate high-temperature technology that would make iron smelting techniques seem plausible, but it would be premature to regard the case as proven and, therefore, until archaeology provides us with a better answer it would not be inappropriate to designate this cultural interlude as Iron-using Late Chalcolithic phase.

The origin of the early farming communities who settled on the terraces in river valleys in the uplands of South Bengal is decidedly unclear. They appeared on the scene with copper metallurgy but did not discontinue their stone technology. This certainly would not imply a generic relationship between the antecedent and continuing cultures. The point is that knowledge of copper-working is evident from the presence of copper celts, fish- hooks, bangles, rings etc., and that native copper was available not far distance away from the Chalcolithic settlements of the region but, despite this, none of the sites indicate prolific use of the soft metal. This may imply the Chalcolithic villages though maintained inter-village trading network, the inter-regional exchanges may have involved only high-value objects, which probably occurred vertically among the high –ranking individuals of different early farming communities.

It does seem from the location of Chalcolithic settlements that each settlement had its own farming territory. By setting up their villages along rivers, especially on low-lying terraces and floodplains, the Chalcolithic farmers were able to exploit the fertile soils. Perhaps the selection of the most productive territories along rivers for permanent settlements also suggest that these villagers ensured that continuous growing of crops and cereals on the same plot of land would lead to soil exhaustion if the farming territories were not rejuvenated and made rich annually through floods. It is not known whether these farmers rotated cereals and legumes to prevent soil exhausting but certainly they did cultivate rice, which is evident from the fully exposed barn, measuring 1.28 m in diameter with a depth of 1.25 m, from Mahisdal. Two such barns have been located in an

excavated area of 40 m x 20 m = 800 m^2 at Mahisdal. Each barn could contain 900 kilogram of paddy and assuming that there existed twenty such barns at one time in this settlement, Ghosh (1986) noted that to produce 180 quintals of paddy at one time in a year these farmers would need at least 72 acres of land to cultivate, which could hold a population size of about 250-300 people in a settlement of about 8000 m^2. It is highly unlikely that all the settlements of the Chalcolithic period were large settlements and existed in one time period. Nevertheless considering the variations of sizes of settlements and farming territories, if the average population size is estimated to 200 souls per village, then the total population of Bengal in the Early Farming stages of history should not exceed 10,000. In comparison to other parts of Bengal, if more number of sites indicates more population, the district of Birbhum could have hold substantial population of 6000- 7000 souls.

Data from Mahisdal suggest that the main occupation of the Chalcolithic farmers was agriculture, which is evident from the presence of a large quantity of charred rice over the second floor-level of period – I occupation at this site (Das 1967: 60). The cultivated species was *Oryza sativa* but these farmers also exploited its wild progenitors. Furthermore, it is also evident from archeological data that the agriculture based economy had to be supplemented by animal husbandry. This is testified by the presence of charred remains of wild and domesticated animals (Banerjee 1982). Humped cattle (Bos Indicus), buffalo, sheep, goat, pig, domestic fowl and pariah dog were reared but the recovery of bones of swamp deer, spotted deer, barking deer, nilgai, sambar, chital, falconer, and even jungle cat and wolf, from excavations at several Chalcolithic sites clearly demonstrate that how hunting remained a substantial mode of economy in these village societies. Fish, turtle and snails had rooms in their larder, but fishing as an economy could have been relatively unimportant at this stage of cultural existence.

These villages contained mud houses, the traces of which are completely obliterated but in excavations floors of beaten earth with soiling of rammed terracotta nodules, reed-impressed clay daubs, burnt husk-impressed clay plasters and post-holes have been identified. These give an idea about the houses the Chalcolithic villagers built albeit without any idea of house plans. The houses no

doubt were simple and built of perishable material and presence of large quantities of ash in floors (Das 1967) suggests their vulnerability to fire. Probably the houses the early farmers constructed were small and occupied by single family units, and if the average population as estimated on the site size and availability of cultivable land is correct, the single units of family could have consisted of not less than 10 persons per house.

As craftsmen, these villagers could not have succeeded much in introducing sophisticated techniques of metalworking. Conditions essential for casting copper, such as a temperature of about 1100^{0}C (Renfrew 1969), and a reducing atmosphere, the evidence of which have not been attested from any of the excavated sites. But as potter their inventory is much more impressive. Various pottery types included bowls, basins, dishes, vases, lids and jars, urns etc., which were used for storage, drinking, serving, cooking and ritualistic purposes. The shapes and sizes of pottery differed considerably. Both monochrome and polychrome pottery appeared that included different shades in black-and-red, red, black slipped and grey. Pottery ornamentation in white pigment on black surface, simple bands, dots, dashes, sigma's, solid triangles, swastikas and some other designs focuses upon characteristic attributes and levels of complexity of material culture of the Chalcolithic farmers. Likewise, terracotta discs with pin-holed petal motif in double-rows and cubes with enigmatic figures, such as the ones probably of human, recognised from Hatikra, and black ware depicting incise designs and pin-hole decoration may stand for attributes that could have association with these villagers socio-cultural or ritualistic status system or even social ties with people beyond their immediate vicinity. For instance, Sankalia (1974: 312) has reminded us of the existence of a similar black ware with incised and pin-holed decoration from close at Chrind and distant Tekkalakota. However, the evidence of items like beads, bangles, decorated combs, hairpins is not wanting in the archaeological record in this phase of culture. But the distribution of these materials is not uniform in all the Chalcolithic sites of Birbhum. For example, the preserved evidence of 1993 excavation at Mahisdal – I shows that, in addition to terracotta beads, agate, banded agate, jasper, chalcedony, carnelian, coral and steatite were in circulation probably as prestige goods. The shapes of the beads are varied: disc, bi-cone,

circular, crescent, spherical button, barrel, conical, tubular, pentagonal and hexagonal. In length, breadth and thickness a considerably variation is noticed, the maximum is 3.5 cm, 1.4 cm and 0.7 cm whereas the minimum is 0.2 cm (in the case of micro beads 0.1 cm only), 0.1 cm & 0.1 cm respectively. It is interesting that some of the materials used in bead manufacture are not available in the vicinity of Mahisdal. Perhaps these came from further northerly sites as exchanged prestige goods between high-status individuals on a basis of balanced reciprocity and passed on to other members of the community. It is not clear what products were exchanged between the Chalcolithic communities in return for these prestige goods but it is not necessary to assume that huge quantities of goods moved across the Ajay valley at this stage of culture.

The first firming settlers of this region did not discontinue the use and making of stone tools. This implies they did not neglect the non-domestic food resources available in the vicinity of their settlement. But all the same, it should not be overlooked that the stone inventory of these villagers comprised of scrapers, points, luntes and short blades that would indeed go well with the need for composite tools in reaping cereals and paddy from the field in a more efficient way. There is as yet, however, no evidence that would suggest freeing of a part of population from subsistence for full time craft specialisation that is copper smiths, potters, bead-makers, stone tool fabricators *et al* in the early farming communities of this region.

Even though limitation exits in our knowledge of the total material culture inventory of the Chalcolithic communities of Birbhum, we do have records of mortuary practices of the communities. Three types of disposal of the dead can be archaeologically recorded. These are a) Extended Burial, b) Fractional or Secondary Burial and c) Urn-Burial. It is however not known whether the variations in burials are signs of status differences or related to the differences of burial treatment of the dead between the communities or within the groups in the community. The graves contain no goods, thereby making it impossible to locate the individual significance of the deceased thus buried. In the Ajay-Mayurakshi divide, there are only two sites that have yielded evidence of burials and these sites even though are situated at a distance of about 30 km from each other, it is significant that within such a short distance the

deceased subjected to extended burial at Pandurajar Dhibi show east-west orientation (Dasgupta 1965:43) whereas the orientation of the dead is north-south at the Haraipur burial (Kar, Pandy and Singh 1969:46). Therefore, we may assume that in their extra-corporal ideas and beliefs, the structure of the societies of the early farming communities is far from being monolithic.

The mortuary practices apart, there is evidence of a terracotta phallus as part of cultural inventory of the first farmers at Mahisdal. It is most likely in these village societies, food and fecundity, the sustenance and reproduction in good numbers, writ larger than ceremonial propensities of life. We do not know what this realistic value in rough terracotta stood for. Nevertheless, human interest in generative organs, both male and female, is much deep rooted than a peevish children's covert obsession with libido. Analogous evidence of fertility symbols is not wanting in archaeological records of the contemporary societies. The pudenda and the penis, sometimes in enlarged form or in erect position respectively; loom large in village ritual in the 3rd millennium B.C. India. But the appearance of dual contrast in a two-sex model in human affairs has a much longer history dating back to the beginnings of art with exaggerated breasts and genitals in the painting, engraving and portable sculpture of the Upper Paleolithic. The social function and meaning of this art is far from being a case of the looser winning. Its chief motive could not have been a flight from the reality but another means of conquering the world: the art of projection of the contemplated reality that would serve as a means of social integration for mutual advantage. The sex symbol as an insignia of individual and social identity establishes a pattern of continuity in behavioural model that is basic to sharing and encountering with the others. But it is highly inconceivable that the gender equality could be achieved only through phallicism, even though the level of society was Chalcolithic. Though evidence for organised religion is wanting in Chalcolithic archaeology in Birbhum, the dualisms of spirit and matter in Indian way of coming into Philosophy has its roots much deeper than formal canonisation of Purusa and Prakiti.

The early settlers six or seven levels of continuous occupation in type-sites in southeast Birbhum do not show any appreciable break in material culture tradition. The society did evolve initially but at

the end it was an evolution in retrograde material culture in Period – II of the Chalcolithic phase in Birbhum vis-à-vis Bengal. Despite the knowledge of iron, as it has been recorded from the top of the lower level i.e. Layer – 5 of the Period – II at Hatikra, Mahisdal and other Chalcolithic sites, and proliferation of variety of shapes in different wares, notably the finesse in black- slipped ware, the overall craftsmanship shows sign of Chalcolithic genius deteriorating. The coming into contact of people with comparatively advanced iron technology was disadvantageous for the Chalcolithic village societies in this region. The apparent initial material boost up but lack of capacity to cope with challenges the black metal posed resulted in derailment in rank and file of the Copper Age specialists. The appearance of iron artefacts in the last phases of the Chalcolithic sites in Birbhum and contiguous regions did not have as great an ecological impact as did the diffusion of agricultural techniques in Early Chalcolithic. The introduction of iron technology affected the culture of the Chalcolithic population of the region more drastically. In their attempt to adapt to new technology, the iron-using Chalcolithic population presents apicture of a culture as if it was the flicker before final examination. From a dozen of radiocarbon dates now available for the lowest, middle and top levels of occupations at three of these farming settlements, as seen earlier, that the fluorescence in material culture lasted for about seven hundred years, whereas despite addition of a supposedly new pottery type the material culture of these settlers began to go downhill from about 900 – 800 B.C., and they wore a deserted look much before 700 – 600 B.C. None of the type site of the Chalcolithic in Birbhum could attract the population with real knowledge of iron metallurgy when they colonised the region in the second half of the third century B.C.

EARLY HISTORIC SETTLERS

There is a hiatus of about two to three hundred years in the culture history of Birbhum prior to ushering of urban dimensions in settlements in the region. As compare to Chalcolithic villages, the early historical settlements are a negligible few. The only noteworthy settlement is Kotasur (23^0 58′ N: 87^0 45′E), located on the northern bank of the Mayurakshi River, which now flows about 8 km down south from the settlement.

Excavations were carried out at this settlement site in 1985 and continued in 1986 – 1987 by N.C. Ghosh *et al* (Ghosh 1993; Chakrabarti 1995). Two trenches, measuring respectively 3m x 5m and 3m x 3m, were dug to ascertain the cultural sequence at Kotasur. Five broad periods of cultural deposit have been identified at the site. Period – I is distinguised by NBP and other associated wares; indeterminate iron objects and beads of terracotta. The NBP appeared in excavation when the thickness of the initial deposit reached 30 cm above the natural soil. The quality of the NBP is inferior when compared with the ware found in the middle Ganga plains and their presence is limited in quantity as well. The evidence of structures is absent, except the occurrence of a couple of rammed floor levels of mud. In period – II, there appears mainly the typical bowls and other types in plain red ware but more importantly fragments of molded terracotta figurines, ascribable to Sunga craftsmanship, are located at this level. Mainly a few floor levels with post-holes represent the structural remains in this horizon. The diagnostic pottery in Period – III is red ware but often a thick bright red slip that characterise this red ware. The types include bowls, basins, pans vases and jars. The pottery with ring-handle has also been recorded from this stratum. The noteworthy structural remain is a two backed brick walls of one and a half course in width even in a limited area of digging in this period.

The succeeding two archaeological horizons at Kotasur are in disturbed context. The deposits in Period – IV contain appreciable amount of sand and silt resulted from long lasting water logging, which might have been due to the vagaries of the Mayurakshi. Nevertheless, the pottery and antiquities recorded from this level, Ghosh (1993) suggested may be placed between fourth and eight century A.D. Period – IV has been badly vandalised by brick robbing that has totally disturbed this archaeological horizon. Thereby, it is a serious impediment in understanding the full circle of cultural development at the early historic Kotasur.

The site has also yielded a few punch-marked coins in disturbed horizon 30 cm below the surface in the trench dug on the northern face of the habitation mound atop which now lies the *Madanesvar* Siva temple. Two, if not more, of these coins bear representation of boat or ship and sun and six-armed symbols.

But more importantly the Kotasur site is a fortified settlement (Fig. –3). It is evident that an impressive mud fortification wall, 1 km in circuit and about 10 m wide, with a canal-like ditch protecting the wall, encircled the settlement (Chakrabarti *et al* 1981; Chattopadhyaya 1993-94). It is possible that the fortification of the settlement served the entire population, including domestic animals and arable lands. Perhaps it served a dual purpose: it could resist inroads of floods and the accumulated water in the canal-like ditch could have been conveniently used in irrigating fields. For Kotasur does, not seem to be a hierarchical settlement nor does it reflect an increasingly complex socio-political organisation and an intensification of warfare. Unfortunately, the emphasis on excavating the early historic sites in Bengal, in general, and Kotasur, in particular, by the archaeologists does not help much in reconstructing how or whether the scheme of social ranking had crystallised into a class system, as it could occur in state societies.

It should be noted that fortification wall alone would not suffice to designate an urban character to a settlement. The nature of settlement organisation, population distribution and status differences, free space within the settlement, reflection of relative wealth of the homes of some members of different profession or between the homes of some members as compared to others practicing the same occupation, patron-client relationship, political levels of authority etc., are some of the issues, which are basic to understanding urban dimensions of the settlement of Kotasur and its like in the Ajay-Bhagirathi delta, that not only remain inconclusive, these issues even cannot be raised in early historic archaeology of Bengal. Even diagnostic artefacts fair poorly as culture markers at several early historic sites, including Kotasur, in this region and to assign them a time bracket is not free from problems. For example, India entered into the historical age with the Northern Black Polished Ware culture but one cannot say with certainty when this ware entered into the Ajay-Bhagirathi delta. Furthermore, there is properly speaking no NBPW culture sites in Bengal as we have in the Middle Ganga region. Could it be an early historic diaspora from time to time from the neighboring *mahajanapadas*, notably Anga and Magadha, to this region in the 6th –5th century B.C. acted as an important agent in introducing new material inventory, the reflection of which is

manifested in the artefactual remains found in archaeological horizons in some sites and as surface scatters in many other. We should not lose sight of the observation of the iterant Jain monk, Vardhamana Mahavira, as recorded in the *Acharanga-sutta*, that the land of the Ladhas (i.e. the Radhas) was pathless and rugged country, habitations were few and far between, people cavalier but did not refer to settlements of any consequence that could be regarded as urban centers. Undoubtedly, this_suggests absence of urban centres in Birbhum and neighbouring areas in the 6th-5th centuries B.C.

The Jain monks and preaches and waves of diaspora, may be numerically insignificant, could have brought with them artefacts needed for their diurnal use. These certainly would have included utensils and vessels of the Northern Black Polished Ware, which remained and important material culture inventory during the reigns of the Sisunagas, Nandas and the Mauryas of the Ganga plain. However, the quality control for standardisation in making and crafting of artefacts noticed in the Ganga plain in the time range between c. 700 B.C.- 100 B.C. is in contrast with the physical standard of the artefacts that have been found in archaeological horizons and as surface scatters in the Birbhum and contagious areas in the Ajay-Bhagirathi delta region. It does not augur well even for a Big Brother's control over material production and least of state level authority in quality production. The point that has to be kept in mind that the occurrence of the NBP ware, the terracotta objects with appliqué design, moulds to produce artefacts or art objects in specific style, terracotta art objects reflecting dynastic types and other sundry items would not establish urban dimensions to a settlement or a region. And the presence of dynastic artefacts no doubt can give an index of time span of the objects' continuity but this would hardly suggest equivalent dynastic authority over the region. The flowering of urban life is a complex issue. Huge size of a settlement alone does not signify its urban character. The archaeological evidence so far known is insufficient to demonstrate the appearance of state societies in Early Historic periods in Birbhum and contiguous region, despite the presence of a fortified settlement like Kotasur and the huge Mangalkot site. However, overgrown villages do not necessarily can assume urban dimension. But villages that overgrow could bring about systems of labour co-operation in their social organisations to help

devise protective measures that would sustain the people and their surroundings is evident in the building up of the massive fortification wall encircled by a ditch at Kotasur. Nevertheless, the prevalence of non-standardised artefacts in material culture argues well against the emergence of core groups in the Early Historic Kotasur society that could effectively control quality of material products. The emergence of such core groups in a society would certainly require establishment of definite authority, either economic or political, the evidence of which is lacking in the archaeology of early historic Kotasur. It looks; therefore, as if the potent forces behind urban organisation have never developed fully in the region even though it has had occasional onslaughts of political hurricanes, the inhabitants of the Early Historic Period in Birbhum remained a people who had never known a city.

REFERENCES CITED

Agrawal, D.P. and M. G. Yadava. 1995. Dating the Past. Pune: Indian Society for Prehistoric and Quaternary Studies.

Banerjee, S. 1982. The Archaeological Material from West Bengal in the Zoological Survey of India, Puratattva 11:162-164.

Bose, N. K., and D. Sen. 1948. Excavations in Mayurbhanj. Calcutta: University of Calcutta.

Bose, N. K., D. Sen and G. S. Ray, 1958. Geological and Cultural Evidence of the Stone Age in Mayurbhanj. Man in India 38 (1): 49-55.

Chakrabarti, D., A. Nag and Subrata Chakrabarti. 1981. An Archaeological Reconnaissance in Birbhum. Puratattva 10 (1978-79): 25-32.

Chakrabarti, D. and S. Jamal Hasan. 1982. The Sequence at Bahiri (Chandra Hazrar Danga), District Birbhum, West Bengal, Man and Environment 6:111-149.

Chakrabarti, S. 1986. Kopai Valley, Post-Palaeolithic Settlers, Birbhum, in The Pleistocene Perspective. Vol. 2, Section D, pp. 1-9. Southampton: The World Archaeology Congress.

Chakrabarti, S. 1993. Mesolithic Typology in Upland West Bengal. In Proceedings of the XXI Conference of the Indian Society for Prehistoric and Quaternary Studies. Pp. 1-7. Chakrabarti, S. 1995. Consolidated Report 1985 – 1995 on archaeological explorations and excavations carried out by the Department of Ancient Indian History Culture and Archaeology, Visva-Bharati, Submitted to the Archaeological Survey of India.

Chakrabarti, S. i.p. Exploration in Birbhum. Indian Archaeology 1998-99: A Review.

Chakrabarti, S. i.p. Exploration in Birbhum, Indian Archaeology 1999-2000: A Review.

Chakrabarti, S. 1999. The Context, Character and Chronology of Microliths from Paruldanga. Bulletin of the Deccan College Post-Graduate and Research Institute 58-59 (1998-1999) : 3-10.

Chakrabarti, S. 2000. Recent Advances in Prehistory of Mayurbhanj, in Archaeology of Orissa (K. K. Basa and P. Mohanty Eds.), pp. 77-101. Delhi: Prativa Prakashan.

Chakrabarti, S. 2001. Prehistory in Bengal: Progress and Regress at the Close of the Twentieth Century (Professor Dharani Sen Memorial Lecture, 2001). Kolkata: The Anthropological Society of India.

Chakrabarti, S. 2002. Mesolithic Cultures in West Bengal, in Mesolithic India (V.D. Misra and J. N. Pal Eds.), pp. 332-346. Allahabad: Department of Ancient History, Culture and Archaeology, University of Allahabad.

Chakrabarti, S. 2003. Mesolithic Hunter-Gatherers: Bengal in Perspective, in Anthropology in Eastern India (Silver Jubilee Volume 1979-2001), Kolkata: Eastern Regional Centre, Anthropological Survey of India.

Chattopadhyaya, B.D. 1994. Urban Centres in Early Bengal: Archaeological Perspectives. Pratna Samiksha 2-3 (1993-94) : 169 – 192.

Das, R. 1967. Indian Archaeology 1963-64: A Review. Pp. 59-60 and p., 61

Dasgupta P.C. 1965. Indian Archaeology 1962-63: A Review. pp. 43-46

Dasgupta, P. C., D.K. Chakravarty and S. Mukherji. 1969. Indian Archaeology 1964-65: A Review. pp, 46-48.

Dastupta P.C. D. K. Chakravarty And S. Mukherji, 1973. Indian Archaeology 1965-66: A Review. pp, 55-57.

Datta, A. 1991. Upper Palaeolithic Culture in West Bengal – A Distinct Regional Development, in Studies in Archaeology (A. Datta Ed.), pp. 67-76. New Delhi: Books and Books.

Ghosh, A. K. 1962 Discovery of Prehistoric Stone Implements from North West Midnapore, West Bengal. Science and Culture 28: 338-339.

Ghosh, A. K. 1966. Implementiferous Laterite in Eastern India, in Studies in Prehistory, Robert Bruce Foote Memorial Volume (D. Sen and A. K. Ghosh Eds.), pp. 149-162.

Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay.

Chosh, N. C. 1986. The Chalcolithic Background of West Bengal, in Indian Studies

(Amita Ray, Hitesh Sanyal and Sunil Ray Eds.), pp. 15-19. New Delhi: Books and Books.

Ghosh, N. C. 1993. Indian Archaeology 1987-88: A Review. pp, 110-111.

Ghosh, N. C. and Subrata Chakrabarti. 1990. Protohistoric Investigations in the Western Fringe of the Bengal Delta, in Adaptations and Other Essays (N. C. Ghosh and Subrata Chakrabarti Eds.), pp. 207-213 Santiniketan: Research Publications, Visva-Bharati.

Ghosh, N. C., A. Nag and P. K. Chattopadhyay. 1988. The Archaeological Background and Archaeological Sample from Hatigra. Puratattva 18 (1987-88):21 -- 27.

Ghosh, R. N. and S. Majumder. 1991. Geological and Morphostratigraphy of West Bengal: A Database for Archaeological Exploration, in Studies in Archaeology: A. Datta Ed.), pp. 7-37. New Delhi: Books and Books.

Goudie, A 1983. Environmental Change. Oxford: Clarendon Press

Kar, R. C., R. G. Pandeya and A. Singh. 1969. Indian Archaeology 1964-65: A Review. p.,46.

Nag, A. 1987. Spatial Analysis of Pre-and-Proto-Historic Sites in Ajay-Damodar Valley, in Archaeology and History: Essays in Memory of A. Ghosh (B. M. Pande and B. D. Chattopadhyaya Eds.), pp. 265-280. Delhi Agam Kala Prakashan.

Possehl, G. L. 1988. Radiocarbon Dates from south Asia. Man and Environment 12:169-196.

Renfrew, C. 1969. The Autonomy of Southeast European Copper Age. Proceeding of the Prehistoric Society 35: 12-47.

Sankalia, H. D. 1974. The Prehistory and Protohistory of India and Pakistan. Poona: Deccan College.

Sastry, M. V. A. 1966. Pleistocene Vertebrates from Susunia, Bankura District, West Bengal. Indian Minerals 20 (2): 195-197.

বীরভূমের ভূমি-ব্যবস্থার বিবর্তন ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে অপারেশন বর্গা

শুচিব্রত সেন

শ্রী গৌরীহর মিত্র তাঁর 'বীরভূমের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বীরভূমের ভূমি রাজস্বের একটি প্রামান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তৎকালীন সময়ে যেসব তথ্য আহরণ করা সম্ভব ছিল শ্রী মিত্র মহাশয় তার যথাযোগ্য ব্যবহারে কার্পণ্য করেন নি। তাঁর পুস্তকের প্রকাশকাল ১৩৪৩ অর্থাৎ ইংরাজীর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ। এরপর থেকে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণায় বীরভূমের ভূমি রাজস্বের ইতিহাস সমৃদ্ধতর হয়েছে। শ্রী মিত্র মহাশয়ের রচনার পরিপূরক হিসাবে এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের অবতারণা।

বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক মহলে দুটি বিতর্ক অদ্যপি বর্তমান। প্রথমটি হল পুরাতন জমিদারীর অবলুপ্তির জন্য ইংরেজ প্রবর্তিত অতি উচ্চহারে রাজস্ব আদায় অথবা জমিদারী পরিচালনায় অপদার্থতা কোনটি বেশী দায়ী ? আর দ্বিতীয়টি নব্য জমিদার শ্রেণীর সামাজিক ভিত্তির বিতর্ক।

শ্রী মিত্র তৎকালীন কালেক্টর সাহেবের মন্তব্য উদ্ধৃত করে প্রথমে বলেছেন যে অযোগ্যতার জন্যই বীরভূমের পুরান জমিদারী (মহম্মদ জমা খাঁ) "কিস্তিতে কিস্তিতে লাটে লাটে" বিক্রী হয়ে যায়। পরে আবার রায় বাহাদুর বিজয় বিহারী মুখার্জীর সার্ভে রিপোর্ট উল্লেখ করে বলেছেন যে অত্যধিক হারে রাজস্ব নির্ধারণ জমিদারী অবলুপ্তির অন্যতম কারণ। সাধারণভাবে চিত্তব্রত পালিত বা সিরাজুল ইসলামের মত ঐতিহাসিকরা বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারী অবলুপ্তির জন্য রাজস্ব আদায়ের mismanagement কেই দায়ী করেছেন[১]। কিন্তু বীরভূমের ক্ষেত্রে অধ্যাপক মানস-সাঁতরার ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে অত্যধিক হারে রাজস্ব নির্ধারণ, কৃষির অনুর্বরতা, দুর্ভিক্ষ জনিত

কারণে লোক সংখ্যার হ্রাস ইত্যাদি। জমিদারী ব্যবস্থার পতন ডেকে আনে। mismanagement এর তত্ত্ব অন্ততঃপক্ষে বীরভূমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়[২]। সাধারণভাবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও অধ্যাপক বিনয় চৌধুরী এই অভিমতই পোষণ করেন[৩]।

নব্য জমিদার শ্রেণীর সামাজিক ভিত্তি

বীরভূমের নব্য জমিদার শ্রেণীর সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে শ্রী গৌরীহর মিত্র কোন আলোচনা করেন নি। জেমস মিল এবং পরবর্তীকালে রজনীপাম দত্তের মত মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা মনে করতেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নব্য জমিদার শ্রেণীর উত্থান ঘটেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত জমি ক্রয়ের জন্য নিয়োজিত হওয়ায় অর্থাৎ শহরের ধনী সম্প্রদায়ই নূতন জমিদারশ্রেণীতে পরিণত হন, আর এর ফলেই স্বাধীন (?) ব্যবসায়ীক উদ্যোগ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। অধ্যাপক বিনয় চৌধুরী অবশ্য এই মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে ১৮৩০ এর আগে বাণিজ্যিক পুঁজি জমিদারী ক্রয়ে খুব বেশি বিনিয়োগ হয় নি, তার পরে অবশ্য এজেন্সি হাউসগুলির পতনের ফলে দালালি ও ফাটকা পুঁজি জমি ক্রয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। বীরভূমের ক্ষেত্রে ১৮০২ খৃষ্টাব্দের জেলা কালেক্টরের এক মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন অধ্যাপক চৌধুরী। "In Birbhum, as the district eollector reported in 1802, the greatest part of the purchasers....are persons who have held situation under the Raja ; the rest are the merchants and persons that have been in the service of different zamindars[৪]" অনেক নায়েব গোমস্তা সে জমিদারী ক্রয় করেছিলেন এ কথা যেমন ঠিক, তেমনি বীরভূমের জমিদারী ক্রয়ে বাণিজ্যিক পুঁজিও কার্যকরী ছিল। হেতমপুর জমিদার যে একদা রাজনগর রাজের কর্মচারী ছিলেন এ কথা সুবিদিত। তেমনি লাভপুর, সুলতানপুর (অবিনাশপুর), রায়পুর ও সুরুলের জমিদারী ক্রীত হয় ব্যবসা, বাণিজ্যের পুঁজি থেকে[৫]।

ফিস্‌ক্যাল বিভাজন

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী প্রসঙ্গে শ্রী মিত্র মন্তব্য করেছেন যে, ১৮০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বীরভূমের রাজস্বের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। এই প্রসঙ্গেই তিনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Mr. Sherwill এর জমি জরিপকে প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্মত রেভিনিউ সার্ভে হিসাবে উল্লেখ করেছেন। যথার্থই এই সার্ভে রিপোর্টে তৎকালীন বীরভূমের বিভিন্ন পরগণার আয়তন ও প্রদেয় রাজস্বের একটি বিবরণ পাওয়া যায়। তবে হান্টার এর যে বিবরণ তৈরী করেছেন সেটি কিছু ভিন্ন। সেরউইলের রেভিনিউ সার্ভের সঙ্গে তিনি রেভিনিউ

বোর্ডের পরগণার পরিসংখ্যান এবং কালেক্টরের রিপোর্টকে মিলিয়ে একটি Fiscal Division এর বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন ; কিন্তু এ সব স্বত্বেও তাঁর মন্তব্য ছিল "The figures should be looked upon with caution, and as only approximating to correctness."[৬] উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে আকবরশাহী পরগণার আয়তন যেখানে শ্রী মিত্র ২৬ বর্গ-মাইল বলে উল্লেখ করেছেন হান্টার সেখানে তার আয়তন বলেছেন ২৭.৫৫ বর্গমাইল কিংবা আমরোল বা ভাতশালার উল্লেখ সার্ভে রিপোর্টে নেই, কিন্তু কালেক্টরের বিবরণে এ জায়গা দুটি অন্তর্ভুক্ত। আলিনগর পরগণার বর্ণনায় হান্টার বলছেন, আয়তন ৩৮,০১৯ একর বা ৫৯.৪০ বর্গমাইল। ২৭টি তালুক। সরকারি খাজনা ৪০১৪ পাউন্ড, ১৪ সিলিং। জজকোর্ট দুবরাজপুর এবং আমডহড়া। ১৮৫২র রাজস্ব জরিপ অনুযায়ী এই পরগণার প্রায় এক পঞ্চমাংশ জমি অকর্ষিত। বক্রেশ্বর নদী এই অঞ্চলের উত্তরভাগে প্রবাহিত এবং এর পার্শ্ববর্তী অধিকাংশ স্থানই ঘাস ও ছোট জঙ্গলা গাছে পরিপূর্ণ। এর পশ্চিমভাগ উঁচু নীচু, কিন্তু পূর্বভাগ সমতল এবং ভাল চাষ হয়। ধান, নীল এবং তুঁত চাষ ও অন্যান্য ফসল উৎপাদিত হয়। বর্ধমান থেকে সিউড়ি পর্যন্ত একটি ভাল রাস্তা এই পরগণার দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে গিয়েছে।[৭]

জমিদারী, তালুক ও পত্তনি

পাঠক, এর সঙ্গে শ্রী গৌরীহর মিত্রের বিবরণটি তুলনা করলে পার্থক্য অনুধাবন করবেন। এইভাবে এই রিপোর্টে (হান্টারের পুস্তক) বীরভূমের প্রত্যেকটি পরগণার যে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে বীরভূম সংক্রান্ত যে কোন গবেষণায় সেটি একটি মহামূল্যবান আকর। এই তথ্য অনুসারে বীরভূম তখন মোট ৭৭টি আর্থিক ভাগে বিভক্ত ছিল। ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের রাজস্ব বিভাগের হিসাব অনুযায়ী ৫১০টি অঞ্চল (estate) থেকে মোট রাজস্ব আদায় হত ৭৩,৩৫৮ পাউন্ড ১০ সিলিং। ১৮৭২ এর সেন্সাস অনুসারে বীরভূমের জনসংখ্যা তখন ৬,৯৬,৯৪৫ জন। মনে রাখা দরকার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে পরেই অর্থাৎ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মোট রাজস্ব প্রদায়ী মহলের সংখ্যা ছিল ২২২টি যেখান থেকে মোট রাজস্ব আদায় হোত ৬,৯১,৮২৪ টাকা। ১৮৪০ এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করণের মাধ্যমে তৈরী হয় আরও ১৫৩ টি ছোট রাজস্ব প্রদায়ী মহল যেখান থেকে আরও রাজস্ব আসত ১৩,১৪৯ টাকা,[৮] তাহলে ১৮৪৮ থেকে ১৮৭২ এর মধ্যে তৈরী হয় আরও ২২২+১৫৩ = ৩৭৫; ৫১০-৩৭৫ = ১৩৫ টি রাজস্ব প্রদায়ী মহল। মালিকানা হস্তান্তর এবং জমি খন্ডিতকরণের প্রমাণ এর থেকে পাওয়া যায়। ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে যে এর পরবর্তীকালে মহালের যে সংখ্যার পরিবর্তন ঘটেছিল তার মূল কারণ বিভিন্ন

জেলার সীমানার পরিবর্তন। কিন্তু এর ফলে বীরভূমের সামগ্রিক আয়তন হ্রাস পেয়েছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের পর এই জেলার একটা বড় অংশ নিয়ে গঠিত হয় সাঁওতাল পরগণা। ৩,৮৫৮ বর্গমাইল আয়তন থেকে তা কমে দাঁড়ায় ১,৩৪৪ বর্গমাইলে।[৯] ১৮৫৯ এ কেতুগ্রাম থানা বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭২ এ রামপুরহাট, নলহাটি ও পলসাকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করা হয়। ১৮৭৯ তে ১০৮ বর্গমাইল আয়তন সমৃদ্ধ বড়োঁয়া মুর্শিদাবাদে চলে যায় এবং রামপুরহাট, নলহাটি (মুরারই থানা সহ) পুনরায় বীরভূমের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দেই বীরভূম ১,৭৫৬ বর্গমাইল আয়তনে পরিণত হয়।[১০] তদবধি বীরভূমের এই আয়তনই বজায় আছে। কিন্তু ঘটনা হল আয়তন হ্রাস পাওয়া স্বত্বেও এই জেলায় রাজস্ব প্রদায়ী তালুকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই থাকে। নিম্নবর্ণিত তালিকা তার প্রমাণ।

বৎসর	রাজস্ব প্রদায়ী জমিদারী বা তালুকের (estate) সংখ্যা	মোট রাজস্বের চাহিদা
১৮৬৫-৬৬	৫৩৪	৭,৩৬,০৭৪
১৮৭০ - ৭১	৫৩৬	৭,৩৮,০৬৭
১৮৭৬ - ৭৭	৫১৭	৭,৩৭,৯৫৫
১৮৮০ - ৮১	৮৭০	৮,০০,১৮৯
১৮৮৭ - ৮৮	১,০০৩	১০,০১,৫৯১
১৮৯৭ - ৯৮	১,০২৫	১০,০৫,৭১৪
১৯০২ - ০৩	১,০৬০	১০,০৯,৪৯৬
১৯৩০ - ৩১	১,১১৫	১০,৩৪,৮৪১

Maximisation of Revenue বা যত বেশি সম্ভব খাজনা বৃদ্ধির নীতি অনুসারে বীরভূমেও বিভিন্ন নিষ্কর ও পতিত জমি করের আওতাভুক্ত হতে থাকে, আর এর ফলেই বাড়তে থাকে তালুকের সংখ্যা। এর সঙ্গে অবশ্যই জন সংখ্যা বৃদ্ধির একটা সম্পর্কও আছে। সাঁওতাল অভিবাসন প্রথম থেকেই বীরভূমের ভূমি সম্পর্কের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৭৭০ এর দুর্ভিক্ষের পর থেকেই সাঁওতাল কৃষিজীবীদের বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার মত এখানেও কৃষির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। জঙ্গল জমি হাসিল করে তাকে আবাদ জমিতে রূপান্তরিত করার পিছনে এঁদের অবদান সর্বাধিক, কেননা জঙ্গল হাসিল করার বিষয়ে নিম্নবর্গীয় হিন্দুচাষীদের ক্ষেত্রে একটা জাতিগত নিষেধ ছিল।[১১] আবার এ কথাও ঠিক প্রায়শই আবাদযোগ্য জমি থেকে উৎখাত বা

পলায়ন করার ফলে সেই জমি বন্দোবস্ত করার জন্য কৃষকের সমস্যা দেখা দিত। দরপত্তনী এবং সেপত্তনি ইজারার সময় ক্রমাগত কর বৃদ্ধি অনেক সময়েই কৃষকের পলায়নের জন্য দায়ী ছিল। এই প্রসঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী ভূমি বন্দোবস্তের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাসঙ্গিক হবে। হান্টার তাঁর Statistical Account of Bengal (১৮৭৭) এ উল্লেখ করেছেন যে বীরভূমে বিভিন্ন ধরণের ভূমি স্বত্বের মধ্যে প্রধান ছিল জমিদারী ও তালুকদারী। প্রথমটি আবার ৫ ভাগে উপবিভক্ত ছিল, যথা, ইজারা, জোতজমা, চাকরান ও লাখেরাজ। তালুকদারের যে উপভাগ ছিল তা হল ইসতিমারী যেগুলি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্ব থেকেই বিদ্যমান, মৌরসী, মোকারারী ছিল স্থায়ী তালুক, আইমা, ভাতীআইমা, নানকর প্রভৃতি তালুকগুলি জমিদার বা ভূমধ্যকারীরা দিয়েছিলেন তাদের আত্মীয়, শিক্ষিত ব্যক্তি বা কর্মচারীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য। মোকারারি চক জম তালুক স্থায়ী ভাবে নির্দিষ্ট (বৃদ্ধি যোগ্য নয়) খাজনার বিনিময়ে দেওয়া হোত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী যে নূতন তালুক সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে অবশ্যই প্রধান ছিল পত্তনি তালুক। বলা বাহুল্য এটির উৎপত্তি বর্ধমান জমিদারী রক্ষার্থে। এগুলির যে বিভিন্ন উপবিভাগ ছিল তা হল দরপত্তনী, সেপত্তনী ইত্যাদি। প্রথম দিকে পত্তনী বন্দোবস্তের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পতিত জমি পুনরুদ্ধার, যার ফলে গড়ে উঠেছিল অনেক জনবহুল গ্রাম। দরপত্তনি ও সেপত্তনি প্রবর্তনের ফলে খাজনার হার এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে অনেক সময় কৃষকরা গ্রাম পরিত্যাগ করে অন্য গ্রামে নূতন পাট্টা নিয়ে (রোসাদ পতিত) বসবাস করতে থাকে। সুরুলের সরকার পরিবার এইভাবে বহু দরপত্তনীর সৃষ্টি করেছিলেন।[১২] এই রকম বহু মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হওয়ায় ভূমি ব্যবস্থা এক জটিল চরিত্রে রূপ নেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৮১৯) পত্তনী অধিকারের স্থায়িত্বে স্বীকৃতির সাথে সাথে বহু জমিদার ও তালুকদাররা পত্তনি ক্রয় করতে থাকেন। বর্ধমানের মহারাজ, নসিপুর মহারাজ এবং নাটোরের মহারাজার বীরভূমের জমিদারী পত্তনী বিলির মাধ্যমে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৯৭ এর জরিপ অধিকর্তা মুন্সী-নন্দজীর এক বিবরণ থেকে জানা যায় যে বাবু কৃষ্ণরাম বোস (কোলকাতা) মল্লারপুরের দ্বারী ময়ূরেশ্বরের জমিদারী বর্ধমানের মহারাজার নিকট থেকে ক্রয় করেন। কিন্তু শীঘ্রই মহারাজা এই জমি আবার নিজেই ক্রয় করেন, পরে আবার তিনি মথুরানাথ মল্লিককে এর পত্তনি দান করেন। মথুরানাথ তাঁর কর প্রদানে অক্ষম হলে পত্তনি পুনরায় অধিগ্রহণ করে দেওয়া হয় বর্ধমানের নন্দলাল বাবুকে। ইজারার সময় অতিক্রান্ত হলে জঙ্গলমহল বাদ দিয়ে বাকী জমিদারী পত্তনী দেওয়া হয় উমাসুন্দরী দাস্যা ও ক্ষেত্র কুমারী বিবিকে। ক্ষেত্র কুমারী তাঁর অংশের দরপত্তনী দেন উমাসুন্দরীকে। ক্ষেত্র কুমারীর অংশের পত্তনীর রাজস্ব ছাড়াও তিনি ১,৫০০

টাকা অতিরিক্ত রাজস্বের অঙ্গীকার করেন। ব্যবস্থা লাভজনক না হওয়ায় তিনি যখন এটি পুনরায় বিক্রী করতে চান তখন কোন ক্রেতা খুঁজে পাওয়া যায় না। উমা সুন্দরী তখন কৃষকের রাজস্ব টাকায় ২ আনা থেকে ৪ আনা বৃদ্ধি করেন। কৃষকদের তীব্র প্রতিবাদে উমাসুন্দরী শেষ পর্যন্ত জনৈক মদন গোপাল দাসের কাছে তাঁর পত্তনি ৭৪,০০০ টাকায় বিক্রী করতে সক্ষম হন।[১৩] মল্লারপুর জমিদারীর এই উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে বীরভূমে পত্তনি বন্দোবস্তের ফলে ঘন ঘন মালিকানা পরিবর্তন ও কর বৃদ্ধি কৃষিক্ষেত্রে ও কৃষকদের মধ্যে কি ধরণের বিপর্যয় নিয়ে এসেছিল রবার্টসন তাঁর সেটেলমেন্ট রিপোর্টে (১৯০৯-১৪) মন্তব্য করেছেন "Practically all the villages are held by tenure holders under zamindars, who proved to be more rapacious than the zamindar."

ইজারা

ইজারা বন্দোবস্ত বলতে বোঝাত যে একটা চুক্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমির রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার। এগুলির মধ্যে কিছু কিছু স্থায়ী ও হস্তান্তর যোগ্য ছিল। এর প্রধান প্রধান বিভাজনগুলি হল ইসতিমারি ইজারা, মৌরসী ইজারা, মকরারি ইজারা, কাৎকিনা ইজারা এবং মেয়াদী ইজারা।

জোতজমা

জোতজমা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী ব্যবস্থার পূর্ব থেকেই বীরভূমে বিদ্যমান ছিল। এগুলি ছিল বংশপরম্পরা অধিকার যোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য এবং কর বৃদ্ধি রহিত। মৌরসী জোত ছিল স্থায়ী। মোকারারি জোত বিধিবদ্ধ না থাকলে জমিদারী বা তালুকের ক্রয় বিক্রয়ের সাথে সাথে তার অবলুপ্তি ঘটত। বীরভূমের পরিপ্রেক্ষিতে মাঝি জোত ও কৃষাণী জোতের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বের অবকাশ রাখে।

সাঁওতাল জমি বা মাঝি জোত

'মাঝি জোত' এর আদিরূপ খুঁজতে গেলে ফিরে যেতে হবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরও আগে, তবে এই বন্দোবস্ত একে সঠিক রূপ দেয়। ১৭৭০ এর দুর্ভিক্ষের পরে কৃষকের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় ও এবং বহু জমি জঙ্গলে রূপায়িত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে এই জমিকে আবাদযোগ্য করার চেষ্টা শুরু হলেও এটি গতি পায় জমিতে স্থায়ী স্বত্ব লাভের পর। তখন ভূস্বামীরা জমি পুনরুদ্ধারের জন্য সাঁওতালদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। জাত যাবার ভয়ে যেমন তথাকথিত নিম্নবর্গীয় চাষীরা জঙ্গল হাসিল করতে রাজী ছিল না,[১৫] তেমনি সাঁওতালরাও জঙ্গলের মধ্যেকার জমি ছাড়া অন্যত্র বসতে ইচ্ছুক ছিল না।[১৬] মৌখিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদাররা সাঁওতাল কৃষকদের জঙ্গল কেটে

চাষ আবাদে নিযুক্ত করে। সাঁওতাল প্রথা অনুযায়ী সমস্ত বন্দোবস্তই হোত মাঝি বা সাঁওতাল গ্রাম প্রধানের সঙ্গে। এটি Headman বা মন্ডলী প্রথা নামেও পরিচিত ছিল। মাঝি প্রাপ্ত জমি অন্যান্য সাঁওতালদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট করের মাধ্যমে বিলি করত, কিন্তু জমিদার বা পত্তনিদারের কাছে সমগ্র অঞ্চলের করের জন্য মাঝি এককভাবে দায়ী থাকত। এই কাজের বিনিময়ে মাঝি কয়েক রেখ (যা এক জোড়া বলদে ১ দিনে চাষ করতে পারে) জমি বিনা রাজস্বে ভোগ করার অধিকারী ছিল।[১৭]

১৮৫৫র সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে বীরভূমের একটা অংশ সাঁওতাল পরগণার অন্তর্ভুক্ত হলেও এই জেলায় সাঁওতাল চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই থাকে। ১৮৭২ এর প্রথম সেন্‌সাসে এদের সংখ্যা ছিল ৬,৯৫৪, ১৯০১ এর জনগণনায় সেটি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৭,২২১ এ, এবং ১৯৩১ এ এদের সংখ্যা ছিল ৬৪,০৭৯,[১৮] ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বীরভূমের ডেপুটি কালেক্টর জেলার কালেক্টরকে জানাচ্ছেন যে অধিকাংশ সাঁওতাল মাঝি বা গ্রাম প্রধান "no doubt acquired right of occupancy." কিন্তু তারা জানে না Occupancy right বা স্বত্বাধীকার বলতে কি বোঝায়, শ্রী রাহা প্রস্তাব রাখেন যে সাঁওতাল পরগণার মত বীরভূমেও সাঁওতাল অধিকৃত জমি সরকার কর্তৃক জরিপ করে রাজস্ব স্থায়ী ভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত।[১৯] সেই অনুযায়ী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সাঁওতাল পরগণার ভিত্তিতে বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলের 'মাঝি জোত' এর রাজস্ব স্বীরিকৃত হয় এবং জঙ্গল কেটে নূতন আবাদী জমি প্রচলিত রাজস্বের অর্ধেক করা হয়। ১৯০১ এ ম্যাকআলপিন পুনরায় সাঁওতাল জমির জরিপের ব্যবস্থা করে হস্তচ্যুত সাঁওতালজমির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভূমি স্বত্ব বিষয়ে একটি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন। ১৯২৪-৩২ এর সেটেলমেন্টের সময় এই জমিগুলি (সাঁওতাল অধিকৃত) জরিপের বাইরে রাখা হয়। এই ব্যবস্থায় সাঁওতাল চাষীদের যে কিছুটা উপকার হয়েছিল এ কথা স্বীকৃত, তবে এই ব্যবস্থা গ্রহণের পশ্চাতে ১৮৫৫র সাঁওতাল বিদ্রোহের বিষয়টি সম্ভবতঃ ইংরেজ সরকারের মাথায় ছিল। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের Rent Act চালু হওয়ার সময়ে তৎকালীন বীরভূমের কালেক্টর Sir Rivers Thomson (১৮৫২-৫৫) এবং পরবর্তীকালে সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কমিশনার হিসাবে একটা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় রচিত Bengal Ryots এর ভূমিকায় অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন। "From his statement in the Imperial Legislative Council it would appear that the Government's experience during the Santal Insurrection was an important factor behind the liberal policy under lying the Act of 1859[২০] অধ্যাপক বিনয় চৌধুরী অবশ্য একটি প্রবন্ধে এই

মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, বাংলাদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর হিসাবে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে Rivers Thomson এর মন্তব্য ছিল "It was only when....the oppressions of the landlords threatened an agrasian revolution that the Government stepped by the Legislative enactment to arrest the natural increase of rent in Bengal, and the result was the land Law of 1859". এর পরেই অধ্যাপক চৌধুরী বলছেন, "There is no evidence that the Rent Act of 1859 was designed to avert an "agrarian revolution."[২১] অথচ ১৮৫৯ এর আগে পর পর দুটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। একটি সাঁওতাল বিদ্রোহ, অন্যটি সিপাহী বিদ্রোহ। কাজেই ১৮৫৯ এর Rent Act এর পিছনে ইংরেজদের এই দুটি বিদ্রোহের কথা যে মাথায় ছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

যাইহোক, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ম্যাকআলপিন রিপোর্ট প্রকাশের পরে ১৯১০ এ O'Malley বলছেন যে 'মাঝি জোত' হচ্ছে ".....a class of cease in vogue in Santal villages, where the Manjhi or headman takes a settlement of the whole village from the zaminder for the specified term at a lump rental and makes his own arrangement for rent with other cultivators, to whom he lets out land."[২২] এই ব্যবস্থাকে একটা স্থায়ীত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ম্যাক্আলপিন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে P. M. Robertson রামপুরহাট ও সিউড়ি সাবডিভিসনের কয়েকটি গ্রামে জরিপ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন ঃ

"The average Santhal Jot is fairly big . Many Sonthals hold Jots of 20 to 50 bighas, with a few have holdings of 100 bighas or more."[২৩]

উপরোক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাঁওতাল জমির ব্যাপক হস্তচ্যুতি একদিকে সরকারি উদাসিনতা ও অন্যদিকে ভূস্বামীদের অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের অনিবার্য পরিণতি। সাঁওতালদের ভূমিস্বত্ব বজায় রাখবার কোন সরকারি আইনই বাস্তবে কার্যকরী হোত না। এ সম্পর্কে সাঁওতালদের অনধাবনতা এবং আইনী জটিলতার ভীতিও অবশ্য দায়ী। Robertson একই সাথে মন্তব্য করেছেন যে বে-আইনী কর আরোপ এবং সাঁওতালদের জমি থেকে উচ্ছেদ অব্যাহত ছিল Bengal Tenancy Act এর প্রবর্তন স্বত্বেও। উপরন্তু ঐতিহ্যগত কারণেও তারা কর বৃদ্ধি হলেও গ্রাম প্রধান বা মাঝিকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র যেতে চাইত না। প্রসঙ্গতঃ Robertson এর পর্যবেক্ষণ প্রণিধানযোগ্য।

"....such is the sentimental tenacity with which the Sonthals cling to their headman, that rather than lose him, they will submit to almost any exaction."[২৪] বহু বৎসর পরে আরেকটি সমীক্ষায় William Van Scherdel এবং Aminul Haque Faraizi সাঁওতালদের সম্পর্কে বলেছেন "The inability of those (the Santals) who reclaimed the Barind area of northern Bengal to maintain a permanent foothold seems to be related less to their habits than to their lack of formal rights to the land that they reclaimed and cultivated."[২৫] কাজেই বৃটিশ অফিসার ও নৃতত্ববিদ কর্ণেল ডালটন যখন বলেন, "The Santals as a rule care little for permanently located themselves. A country denuded of the primeval forest, which affords them the hunting grounds they delight in and the virgin soil they prefer, does not attract thems and when through their own labour the spread of cultivation was effected this denudation, they select a new site, however prosperous they may have been and retire into the back woods where their harmonious flutes sounds sweeter, their drums find deeper echoes, and their bows and arrows once more be utilised."[২৬] বাস্তবকে অস্বীকার করে ইতিহাসকে অহেতুক রোম্যান্টিসাইজ করার এ এক সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টা মাত্র।

McAlpin তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে, সাঁওতালরা বহুবার তাদের অন্যায়ভাবে বাজেয়াপ্ত জমি ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। যখনই কোন সরকারি জরিপের কথা শোনা যেত তখনই জমির মালিকরা রাজস্ব প্রায় দ্বিগুন করে দিতেন। উদাহরণসরূপ বলা যায় ১৮৯০ এর শেষের দিকে বোলপুর থানার সেহালা, বিদ্যাধরপুর এবং খন্জরপুরে সাঁওতালরা অনেক আবাদী জমি তৈরী করে, কিন্তু জরিপের আগে জমিদাররা আকষ্মিকভাবে তাদের প্রদেয় রাজস্ব দ্বিগুন করে দেয়। জমিদারদের যুক্তি ছিল সাঁওতালরা দেয় কর অপেক্ষা অনেক বেশি জমি চাষ করছে। কিন্তু বি. বি. মুখার্জী তাঁর রিপোর্টে বলছেন, "The Santhals old rent receipts showed no area nor the zamindars could prove any previous measurement of Jamabandi." মুখার্জী অসহায় ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন যে রাজনগর, মহম্মদবাজার, খয়রাশোল এলাকার এরকম ৫৬টি ক্ষেত্রে সাঁওতাল জমি বে-আইনীভাবে জমিদাররা হস্তগত করেছে। এর সঙ্গে রামপুরহাট, বোলপুর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রচুর উর্বর সাঁওতালি জমি জমিদার-মহাজনের গর্ভে চলে যায়। অতিরিক্ত রাজস্বের দাবী মেটাতে না পেরে তারা

মহাজনের দ্বারস্থ হোত, আর কিভাবে মহাজন এই সরল মানুষগুলোকে ঠকিয়ে সাঁওতালদের নিজস্ব জমিতেই তাদের ভাগচাষীতে পরিণত করেছিল সে কথা সবার জানা।

১৯২৪-৩২ এর Settlement Report- এ বি. বি. মুখার্জী এত দেখিয়েছেন যে কিভাবে মাঝির অধিকৃত নিষ্কর জমি বিক্রী হয়ে গিয়ে মাঝি সেই জমি হারাচ্ছে। মুখার্জী প্রদত্ত দু একটি উদাহরণের উল্লেখ করা যেতে পারে। আদিতে মাঝি অধিকৃত 'রেখ' জমি ছিল নিষ্কর। কিন্তু কুড়ালমাটিয়া গ্রামে জনৈক হোসেন আলি 'রেখ' জমি কিনে নেয়। ফলে মাঝি হারায় তার নিজস্ব 'রেখ' জমি। উপরন্তু এটি আঘাত হানে সাঁওতালদের চিরাচরিত মন্ডলী প্রথা বা মাঝি জোতে।

অপর একটি উদাহরণে দেখা যাবে যে রাজনগর থানার মাদারপুর মৌজার মাতলামাঝি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে একটি দলিল রেজিষ্ট্রি করে বনমালি দাসের কাছ থেকে ২০০ টাকা ঋণ নেয়। কিন্তু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে Aboriginal Land Alienation Act পাশ হওয়ার কয়েকমাস আগে আদালতের একটি ডিক্রীর মাধ্যমে ১,৩০০ টাকা এই বন্ধকীর জন্য মাতলা মাঝিকে দিতে বলা হয়, এবং মাতলার সমস্ত জমি নিলাম করা হয়। বনমালিই নিলামে সেই জমি কিনে নেয়। যদি মাতলা ব্যক্তিগত ভাবে তার কিছু জমি বিক্রী করতে পারত তাহলে হিসাব অনুযায়ী সে পেত ২,৫০০ টাকা। এর থেকে ১,৩০০ টাকা (দু বছরে ২০০ টাকার সুদ + আসল) তাহলে সে অন্ততঃ তার অর্ধেক সম্পত্তি বাঁচাতে পারত। কিন্তু বন্ধক ছিল সমস্ত জমি। বনমালির এই ধরণের আরও ১২ জন সাঁওতালের বিরুদ্ধে জমি বন্ধকী মামলা দায়ের করেছিল। এই উদাহরণ দেওয়ার পর শ্রী মুখার্জীর মন্তব্য হল, " This will bring ruin to all these families who will have to leave their comfortable hearths and homes and migrate to the south to work as coolies." এ্যাবরজিনাল ল্যান্ড এলিয়েনশন অ্যাক্ট পাশ হলেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। রবার্টসন একদিন যেখানে ২০ থেকে ৫০ বিঘা পর্যন্ত সাঁওতাল জমি মালিকের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাঁরা কিভাবে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে ভূমিহীন চাষী বা কয়লাখনির মজুরে পরিণত হল উপরোক্ত উদাহরণেই খুঁজে পাওয়া যাবে তার প্রধান উত্তর। পরবর্তীকালে এর সাথে যুক্ত হয়েছিল ৩০ এর দশকের মহামন্দা ও ৪৩ এর দুর্ভিক্ষ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাত।

বীরভূমের বহু স্তরায়িত ভূমি ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ভাগজোতে জমি চাষ। হান্টারের বিবরণে যে বিভিন্ন ভাগজোতের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে প্রধান ছিল 'আধা ভাগ জোত' যেখানে মধ্যস্বত্বভোগী চাষীকে নির্দিষ্ট সময়ের

জন্য জমি দিত, চাষী চাষের সমস্ত খরচ বহন করে ফসলের অর্ধেক দিত মালিককে, বাকী অর্ধেক তার নিজের থাকত। 'আঠার বাইশ ভাগ' এই ক্ষেত্রে কৃষক বলদ, লাঙ্গল সহ চাষের অন্যান্য খরচ বহন করে উৎপাদিত ফসলের ১১ ভাগের ৯ ভাগ পেত। জমিতে সারের খরচ যে বহন করত তার অধিকার ছিল খড়ের ওপর। এই জেলায় সর্বাধিক প্রচলিত ব্যবস্থাটি ছিল কৃষাণী প্রথা। এক্ষেত্রে কৃষক শুধুই চাষের অধিকারী ছিল এবং ধানবীজ সরবরাহ ও অন্যান্য কাজের বিনিময়ে সে পেত ফসলের ৩ ভাগের এক ভাগ। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কিন্তু ধান মালিকের গোলায় উঠত, এবং সেখানেই তা ঝড়িয়ে কৃষক তার ভাগ নিয়ে যেত। বি. বি. মুখার্জী তাঁর settlement Report এ বলেছেন, "Cultivation on the system of share of produce is fairly large in vogue" কিন্তু সেটেলমেন্টের নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে যে, মোট জমির ১.৯৮% জমি বর্গা প্রথায় চাষ হোত। অধ্যাপক বিনয় চৌধুরী এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন ১৯১৩-১৪ সালে সাঁওতাল অধ্যুষিত বীরভূমের যে বিশাল এলাকার অধিকারের দলিল ম্যাক আলপিন তৈরী করেছিলেন তা বীরভূমের সেটেলমেন্ট কাজের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল, এবং স্পষ্টতঃই এখানে বর্গাচাষের আয়তন নথিপত্রে যা পাওয়া যায় তার থেকে অনেক বেশি ছিল। ১৯৩৯ সালে বীরভূমের ১৫টি গ্রামে যে বিশদ অনুসন্ধান চালানো হয় তাতে দেখা গেছে চাষের জমির ৩৭.১ শতাংশ বর্গা প্রথায় চাষ করা হত। নমুনা হিসাবে নেওয়া গ্রামগুলিতে অনুসন্ধানের পর ফ্লাউড কমিশন (১৯৪০) স্থির করে শতকরা ২৩ ভাগ জমিতে বর্গা চাষ ছিল।[২৭] সন্দেহ নেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল্যবৃদ্ধি ও ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষে এই বর্গাচাষের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এই আলোচনায় প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার যে কৃষানী ব্যবস্থা ভাগচাষের অন্তর্ভূক্ত নয়। এই পার্থক্য সম্পর্কে Van Schendel এর অভিমত হলঃ The essential difference between Krishanas and share croppers, there is that the former do not control the labour process while the latter do Krishans cultivate their employer's land under his supervision, but share croppers cultivate other peoples land at their own risk.[২৮]

বীরভূমে কৃষানী বন্দোবস্ত যে অতি পুরাতন এক প্রথা একথা O' Malley তাঁর জেলা গেজেটিয়ারে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করেছেন। এব্যবস্থায় জমির মালিক বীজ, সার, বলদ এবং লাঙল সমস্তই সরবরাহ করে। কৃষাণ শুধু তার সমস্ত পরিশ্রম দিয়ে জমি চাষ করে। বিনিময়ে সে পায় উৎপাদিত শস্যের তিনভাগের একভাগ। কিন্তু খড়ের অধিকারী সে ছিল না। বি. বি. মুখার্জী তাঁর সেটেলমেন্ট

রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে কৃষাণরা জমির সত্ব পেতে আগ্রহী ছিল না। এর কারণ হিসাবে জনৈক কৃষাণের উদ্ধৃতি খুবই কৌতূহল উদ্দীপক, "বীজ, সার, হাল, বলদ সম্বন্ধে আমাকে কোনো দুশ্চিন্তা করতে হয় না। এর সমস্ত দায়িত্বই থাকে মালিকের এবং আমি একটা ফসলের ভালো অংশ পেয়ে থাকি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি শক্ত হাতে পাঁচন কড়ি ধরতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কোনো চিন্তা নাই"।

দেখা গেছে যে কৃষাণরা তার প্রাপ্ত ফসলের অংশ থেকে কিছু সঞ্চয় করে নিজস্ব অল্প কিছু জমিও ক্রয় করতে পেরেছিল। জমির মালিকের পক্ষেও কৃষাণী ব্যবস্থা সুবিধাজনক ছিল। চাষী শ্রমিকের অভাবের সময় কৃষানী ব্যবস্থা তার পক্ষেও লাভজনক ছিল। ধান বপন এবং কাটার সময় যে অতিরিক্ত শ্রমিকের দরকার পড়তো তা মেটানো হত মুনিশ বা দৈনিক মজুর গ্রহন করে।

১৯৪১ সালে শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন বিভাগের পক্ষ থেকে শ্রী সুধীর সেন বীরভূমের ১৫টি গ্রামে একটি সমীক্ষা করেন। সেখানে দেখা যায় যে ভূমধ্যকারীরা 'মাহিন্দার' অপেক্ষা কৃষানী চাষে বেশি উৎসাহী। এই গ্রামগুলিতে মাহিন্দার অপেক্ষা কৃষাণের সংখ্যা ৪ থেকে ৪.৫ ভাগ অধিক ছিল। সমগ্র চাষের শতকরা ৭.১ ভাগ জমি যেখানে মাহিন্দার দিয়ে করান হোত, সেখানে কৃষান চাষ করতেন শতকরা ৩৭.১ ভাগ জমিতে। বীরভূমে এই কৃষাণী ব্যবস্থা স্বাধীনতার পরেও অনেককাল টিকে ছিল, কিন্তু বর্গা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকলে মালিকরা আস্তে আস্তে এই ব্যবস্থা থেকে সরে আসে এই ভয়ে যে পাছে কৃষাণরা বর্গার অধিকার দাবী করে।

বীরভূমের ভূমি বন্দোবস্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 'লাখেরাজ' জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিবাদ বিসংবাদ। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রেও অবশ্য এই 'লাখেরাজ' জমি সংক্রান্ত বিবাদ বিদ্যমান ছিল। এই জমি মূলত ছিল নিষ্কর।

লাখেরাজ দেবোত্তর

এগুলি হোল হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের ধর্মস্থান পরিচালনার জন্য যথাক্রমে দেবোত্তর, শিবোত্তর এবং পিরোত্তর জমি। এমনকি নবাবি আমলে যারা মসজিদ আলোকিত করতেন তারা পেতেন 'নিষ্কর চিরাগী' জমি। এই ব্যবস্থা বহুপ্রাচীন হলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এনিয়ে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়। অনেকসময় জমিদাররা সরকারী কর এরাবার উদ্দেশ্যে 'ট্রাষ্ট' গঠন করে কিছু জমিকে করমুক্ত রাখার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি তৈরী করতেন। সেবায়িতদের নামে এই জমিগুলি নির্দিষ্ট করা হত। Bengal Tenancy Act এর (১৯২৮) ২২

ধারায় ফাঁকি দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য, যেখানে নূতন কোনো দেবোত্তর সম্পত্তি গঠনে বিধিনিষেধ রাখা হয়েছিল।

চাকরাণ জমি

চাকরাণ জমি সামন্ততান্ত্রিক ভূমির ব্যবস্থার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গ্রাম পাহারার জন্য চৌকিদারী, শেরেস্তায়ী কাজ করবার জন্য দপ্তরী, দেবার্চনার জন্য পুরোহিত এবং কামার, কুমোর, কাহার ও নাপিতের কাজের বিনিময়ে বরাদ্দ থাকতো নিষ্কর জমি। এই বরাদ্দ জমিগুলি ছিল বংশপরম্পরায় ভোগ দখলের অধিকার স্বীকৃত। গ্রাম পাহারার জন্য নিযুক্ত চৌকিদারী চাকরাণ জমি, জমিদারের সঙ্গে সরকারের ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চৌকিদারী চাকরাণ জমিগুলি সরকার অধিগ্রহণ করে। অধিগ্রহণের পূর্বে এই জেলায় প্রায় ৫ হাজার ৮১৫ টি চৌকিদারী চাকরাণ জমি ছিল। পরে সেটি দাঁড়ায় ২৭১৬ টিতে। চৌকিদারদের জমিদারের সঙ্গে নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে এটি বন্দোবস্ত করতে বলা হয়। জমিদারদেরও এই অনুরোধ করা হলে কয়েকজন তা মেনে নিলেও অনেকে সমস্যার সৃষ্টি করে। এই জমি চৌকিদারের পরিবর্তে বাইরের কাউকে দিলে তারা অনেকবেশী সেলামী এবং কর পেতে পারতেন। এই জমি সংক্রান্ত বিষয়ে তৎকালীন বীরভূম জেলা কালেক্টর মন্তব্য করেছিলেন "What is transferred to the zemindars is the ownership of the chakr.ıı. lands and that the chowkidars though having no occupancy rights are atleast entitled (if enable to came to terms with the zemindars) to retain possession till ejected through the civil court.[২৮]

এই জেলায় এক ধরণের বিশেষ ভূমি বন্দোবস্ত ছিল। যেটি তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই তৈরী হয়েছিল। এর নাম ছিল 'ঘাটোয়াল মহাল'। এ বিষয়ে অধ্যাপক রঞ্জন গুপ্ত বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[২৯] একসময় রাজনগরের রাজারা পার্বত্য উপজাতিদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বীরভূমের অরণ্যবৃত অঞ্চলে (সারহদ, দেউঘর প্রভৃতি) পাহারা দেওয়ার জন্য যাদের নিযুক্ত করেছিলেন তারাই ঘাটোয়াল নামে চিহ্নিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এই ঘাটোয়াল জমিও নব্য জমিদার শ্রেণী নিলামে কিনে নেন। এরপর থেকেই তারা ঘাটোয়ালদের খাজনা বৃদ্ধি করতে থাকেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৮০১ থেকে ১৮১৪ পর্যন্ত কম বেশী তীব্রতায়[৩০] ঘাটোয়াল বিদ্রোহ চলতে থাকে। ১৮৫৫-র সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে ঘাটোয়াল অঞ্চলে অধিকাংশই নব্যসৃষ্ট সাঁওতাল পরগণা জেলার মধ্যে চলে যায়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূম জেলার মোট ঘাটোয়াল জমির পরিমাণ দেখানো হয়েছিল ৪৮৯ বিঘা ৫ কাঠা, বি. বি. মুখার্জী তাঁর

সেটেলমেন্ট রিপোর্টে (১৯২৪-৩২) এর পরিমাণ উল্লেখ করেছেন ১৮২.৫৪ একর। এই জমির মালিকরা একটা নির্দিষ্ট রাজস্বের বিনিময়ে (যেটি এই অঞ্চলের পাহাড়ার জন্য) ঘাটোয়াল জমি অধিকারে রেখেছিলেন। ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দের এই জমি সংক্রান্ত একটি নির্দেশনামায় বলা হয়েছিল যে, ঘাটোয়ালী, চৌকিদারী, জায়গীর বংশ পরম্পরাগত। এটি শুধু একজনের অধিকারী থাকতে পারে এবং এর পরিবর্তে তাকে সরকারের অধীনে পাহাড়ার দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু নতুন পুলিশি ব্যবস্থায় ঘাট চৌকিদারীর কোনো প্রাসঙ্গিকতা ছিল না, যদিও সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কমিশনার এটি বারবার বজায় রাখার পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন। শেষপর্যন্ত বিস্তৃত অনুসন্ধানের পর ঘাট চৌকিদাররা বিঘাপ্রতি এক টাকা খাজনার বিনিময়ে ১৯৩০ সালে এই বন্দোবস্ত স্বীকার করে নেয়।[৩১]

বৃত্তির বিনিময়ে যে সমস্ত জমি একসময় নিষ্কর ছিল ব্রিটিশ আমলে তার সবগুলি করের আওতাভুক্ত হয়। দেবোত্তর বা এইজাতীয় কিছু জমি অবশ্য ব্যতিক্রম ছিল। বিভিন্ন বৃত্তিধারী সম্প্রদায় যথা–কামার, কুমোর, নাপিত প্রভৃতি তাদের জমি হারালেও কাজের বিনিময়ে তারা নগদ অর্থের বদলে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান এবং আলু ইত্যাদি পেতেন। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের প্রথম পর্যন্ত এই প্রথা বিদ্যমান ছিল। নাপিত তার নিয়মিত চুল-দাড়ি কাটা ইত্যাদির বিনিময়ে মাসান্তে অথবা বৎসরান্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ শষ্য রোজগার হিসাবে আদায় করতেন। সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার প্রবহমানতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই জেলার গ্রামান্তরে Money Economy বা মুদ্রা অর্থনীতির সার্বিক প্রচলন সত্তরের দশকের প্রথম থেকে লক্ষ করা যায়। কিছু কিছু গ্রামাঞ্চলে এই একবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেও ‘কাজের বিনিময়ে শষ্য’ চালু আছে।

জমির খাজনা

বি. বি. মুখার্জী তাঁর সেটেলমেন্ট রিপোর্টে পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বীরভূমে রাজস্বের হার অনেক বেশী ছিল। বিঘা প্রতি ২ টাকা ১২ আনা থেকে ৩ টাকা ৮ আনা রাজস্ব ছিল খুবই স্বাভাবিক। এর প্রধান কারণ হল যে, অধিকাংশ জমিদার ছিলেন অনুপস্থিত এবং মধ্যসত্ব ভোগীরাই ছিল জমির আসল পরিচালক। Bengal Tenancy Act এর সঙ্গে পরিচিতি থাকায় তারা কৃষকদের সঙ্গে অত্যন্ত উচ্চ খাজনায় জমির বন্দোবস্ত করতেন। এই খাজনা বৃদ্ধি অনেক সময় ২০ থেকে ৪০ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২০০ ভাগও বৃদ্ধি পেত। সাধারণ কৃষক আইন সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। এবং এই আইনের বেড়াজালে জমিদাররা কৃষকদের মিথ্যা করে অতিরিক্ত জায়গা দেখিয়ে সেই হারে তাদের কাছ থেকে ‘কবুলিয়ৎ’ লিখিয়ে নিতেন। এরকম

একটি উদাহরণ বি. বি. মুখার্জী দেখিয়েছেন হেতমপুরের মহারাজা বিশ্বনিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পর্কে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ স্বত্বাধীকারী প্রজারাও যে কৃষি জমি বাড়িয়ে নিত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই সরকারি জরিপ এলেই জমির মালিক মাত্রেই ভীত হয়ে পড়তেন। এ বিষয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতায়' একটি সুন্দর বিবরণ আছে।

বাংলাদেশে ইংরেজী ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কোন জরিপবন্দী হয় নাই। তখনকার দিনে সীমানা সহরজ লইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মামলা মকদ্দমার আর অন্ত ছিল না। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া জরিপ করিয়া মাত্র গ্রামগুলির সীমানা নির্ধারিত হইয়াছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জরিপ আইন পাস হইবার পর বংলাদেশে নতুন জরিপের এক পরিকল্পনা হয়। প্রতিটি টুকরো জমি, তাহার বিবরণ এবং স্বত্ব স্থায়ীত্ব নির্ধারণ করবার জন্যই এ জরিপের আয়োজন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তাহার জের এই গ্রামাঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রাম্য লোকগুলি বিভীষিকার একেবারে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

১৯৪৭ এবং তারপর

স্বাধীনতার সময়কাল পর্যন্ত এই ভূমি ব্যবস্থাই বীরভূমে বিদ্যমান ছিল। ১৯৫১ সালে সেন্সাস রিপোর্টে অশোক মিত্র উল্লেখ করেছেন যে জমির মালিক হিসাবে বড় জমিদার ছাড়াও পত্তনিদার এবং দরপত্তনিদাররাই গুরুত্বপূর্ণ ভূস্বামী হিসাবে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর প্রদত্ত হিসাব অনুসারে স্থায়ী স্বত্বাধীকারীর সংখ্যা ছিল ২৬,৭০৭ জন। অন্যদিকে স্থায়ী খাজনা প্রদানকারী রায়তের সংখ্যা ছিল ৭১,৪২৬ জন। একই সাথে তিনি দেখিয়েছেন যে বীরভূম জেলায় ১৯৩১ সালে গ্রামের সংখ্যা ছিল ২,৪০২ টি, ১৯৪১ সালে সেটি কমে দাঁড়ায় ২,২১১তে। এবং ১৯৫১ সালে সেটি আরো কমে ২,২০৭টিতে পরিণত হয়। এর কারণ হিসাবে শ্রী মিত্র রাজস্ব প্রদানকারী মৌজার পরিবর্তনকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেই সাথে মনে হয় যে বিশ্বযুদ্ধ এবং মন্বন্তরও দায়ী ছিল। উপরন্তু ১৯৪৬ এবং ১৯৪৯ সালে এই জেলায় ব্যাপক বন্যা দেখা দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মনে বীরভূমেও একদল অতি স্বচ্ছল চাষী বা জোতদারের আবির্ভাব ঘটে। আন্দ্রে বেতেই উল্লেখ করেছেন যে জমিদার ও জোতদারের মধ্যে পার্থক্য শুধু কাজের ব্যাপারে আলাদা ছিল তাই নয় জীবন যাত্রার দিক থেকেও এই দুই শ্রেণীর পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। জোতদারদের জীবনযাত্রা জমিদারদের মতো পরিশীলিত ছিল না।[৩২] সাহিত্যিক উপাদান থেকেও একথার সমর্থন মেলে। তারাশংকরের গণদেবতায় কঙ্কনার জমিদার এবং শ্রীহরি

ঘোষের চারিত্রিক পার্থক্য একথা প্রমাণ করে। বীরভূমে জমিদার শ্রেণীর অধিকাংশ যেখানে ব্রাহ্মণ ছিলেন সেখানে সম্পন্ন চাষী বা জোতদাররা অধিকাংশই এসেছেন সদ্গোপ, সুবর্ণ বণিক এবং তেলী সম্প্রদায় থেকে। রায়ত হিসাবে যারা বীরভূমে সংখ্যা গরিষ্ঠ তারা একেবারেই তথাকথিত নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত। হাসিম আমীর আলির বীরভূমের উপর একটি সমীক্ষাতেও এর প্রমাণ মেলে।[৩৩]

এই জেলায় ভাগচাষীদের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ১৯২৮ সালের Bengal Tenancy Act (সংশোধনি) অনুসারে জমিতে বর্গাদারদের স্থায়ী স্বত্ব পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করা হয়। সেই সুযোগ নিয়েই বস্তুত এই জেলায় জোতদারদের আধিপত্য আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪০ সালের Floud Commission শস্যের বাণিজ্যিকিকরণের সাথে জমির স্বত্বের প্রশ্নটিকেও বর্গা প্রথার বৃদ্ধির জন্য দায়ী করেছিল।

জমিদারী অবলুপ্তি

স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ আইন (যা ১৯৫৪ সালে পাশ হয়), এবং ১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন (যা ১৯৫৬ সালে পাশ হয়)। এই দুই আইনই পরবর্তীকালে কয়েকবার সংশোধিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। স্বভাবতঃই বীরভূম এর ব্যতিক্রম নয়। এই আইন অনুযায়ী জমিদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের সমস্ত বাড়তি জমি সরকার অধিগ্রহণ করেন। জমির ঊর্দ্ধসীমা ঠিক হয় কৃষিজমির ক্ষেত্রে ২৫ একর, অকৃষি জমির বেলায় ১৫ একর (কিন্তু অকৃষি ও বাস্তু জমি মিলিয়ে ২০ একর)। জমিদারী অধিগ্রহণ হলেও জোতদার বা সম্পন্ন চাষীদের আধিপত্য আদৌ ক্ষুন্ন হয় নি। এরা অনেকেই বেনামে বহু জমি নিজেদের অধিকারে রেখেছিলেন। ১৯৫৬ সালে সংবিধান সংশোধন করে রায়ত বা আনডার রায়তদের মধ্যস্বত্বভোগী হিসাবে ঘোষণা করেও খুব একটা সুফল হয় নি।

অপারেশন বর্গা

গত শতাব্দীর ৭০এর দশক থেকে পঞ্চায়েত ও কৃষক সংগঠনের সহযোগিতায় এই সব বেনামী জমি উদ্ধার করে বিলি করা শুরু হয়। ইতিমধ্যে ১৯৭২ এর সংশোধনী ১৫A ধারা অনুসারে জমিতে বর্গাদারদের বংশানুক্রমিকভাবে চাষের অধিকার স্বীকৃত হয় ; অর্থাৎ জোতদারদের ইচ্ছামত বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ হয়। প্রথমদিকে নানা কারণে অবশ্য বর্গাদারদের নাম স্বত্বলিপিতে লিপিবদ্ধ করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে ঠিকমত অগ্রসর হওয়া যায় নি। ১৯৭৮ সাল

থেকে রি-ওরিয়েন্টেশন শিবিরের মাধ্যমে এই শ্রেণীর মানুষের ভিতর গ্রামে সান্ধ্যসভা করে সচেতনতা আনার ব্যবস্থা করা হয়। বর্গাদার হিসাবে নাম নথিভুক্ত করার জন্য দরখাস্ত আহ্বান করে সরেজমিনে তার ফয়সালা করা হয়। এই পদ্ধতিই অপারেশন বর্গা নামে পরিচিত। বীরভূমে কিষাণদের বর্গাদার হিসাবে নাম নথিভুক্ত করার দাবী ওঠে। শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. সি. এস ১৯৭০ সালে এই জেলায় কৃষাণী প্রথার তৎকালীন রূপ সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে ১৯৬৯ সালে ডিসেম্বর মাসেই বীরভূমের Additional Collector কৃষাণদের বর্গাদার হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাৎক্ষণিক ভাবে এটি করা না গেলেও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষাণরা অগ্রিম শষ্য দাদনের সুদ 'দেড়াবারি' (৫০% ভাগ) থেকে কমিয়ে 'সোওয়াবারি' (২৫% ভাগ) তে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। 'অপারেশন বর্গার' ফলে শেষ পর্যন্ত অবশ্য কিষাণদের বর্গাদারী অধিকার সুনিশ্চিত হয়েছিল।

বীরভূমের কৃষি অধিকর্তা 'কৃষির বাৎসরিক পরিকল্পনা. ১৯৮৩-৮৪' নামে (ইংরাজীতে) একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন যেখান থেকে ৮০র দশকের বীরভূমের ভূমি চরিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ পাওয়া যায়।[৩৪] সেই হিসাবে কৃষকের সংখ্যা ছিল ১,২৭,৯৪৭ জন এবং কৃষি মজুরের সংখ্যা ২,২৫,৯৩৭ জন। চাষোপযোগী জমি ৩,৩০,৬১৬ হেক্টর। এর মধ্যে ১ হেক্টর পর্যন্ত জমির মালিকের সংখ্যা ৬৬.১ শতাংশ, ২ হেক্টর পর্যন্ত ২২.৮ শতাংশ, বাকীরা ৪ হেক্টর বা তার উর্দ্ধে। ১৯৮৭ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত সরকারে ন্যস্ত জমির পরিমাণ ৪০,০১৮.১৬ একর। এর মধ্যে ২৪,৪৮৫.৯৯ একর জমি ৫২,৮০৬ জন ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বন্টিত হয়েছিল। নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা ছিল ৮৮,৬৫১ জন এবং তাঁরা চাষ করতেন ৯২,২৩৪.৭৯ একর জমি।

স্বাভাবিকভাবেই ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের এই সাফল্য নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। বীরভূমের ভূমি সংস্কারের ফলে গ্রামীণ ক্ষমতায়নেও যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে সে বিষয়েও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। স্বাধীনতার পরে পরেই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় আধিপত্য ছিল জোতদার বা সম্পন্ন চাষীর। বর্তমানের ক্ষমতা বৃত্তে অধিষ্ঠিত প্রান্তিক চাষী ও বর্গাদার শ্রেণী। নির্বাচনী রাজনীতির অনিবার্যতাও অবশ্য এর জন্য দায়ী। সম্পন্ন চাষী আজ তার ভবিষ্যৎ খুঁজে নেয় শহরের আলোকবৃত্তে। চাষ অপেক্ষা ব্যবসা ও চাকুরি বৃত্তি তার অনেক বেশি কাম্য। ক্ষমতার স্থানান্তরণে তার কোন আপশোষ নেই। কিন্তু কৃষিপণ্যমূল্যের ক্রমাবনতি প্রান্তিক চাষী, বর্গাদার ও কৃষি মজুরকে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিহ্নিত করছে। বিশ্বায়ণের দাপটে সার, বীজ, ডিজেল, বিদ্যুৎ সবেরই দামের উর্দ্ধগতি

আজ অপ্রতিরোধ্য। 'অপারেশন বর্গার' প্রতিরোধের বর্শামুখ তাই অনেকটাই ধারহীন। একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় তাই প্রয়োজন আছে কোন বিকল্প ভাবনার। যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই বিকল্পকে হতে হবে প্রযুক্তি নির্ভর যেখানে বাজারী অর্থনীতির দাবী মেনে উৎপাদিত হবে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় ফসল। নতুবা ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক নিয়মেই অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে দেখা দেবে কোন নবতর ভূমি সংস্কার।

তথ্যসূচী

১। চিত্তব্রত পালিত : Tensions in Bengal Rural Society. কোলকাতা, ১৯৭৫, পৃ-১২ সিরাজুল ইসলাম : The permanent settlement in Bengal: A Study of its operation 1790-1819, ঢাকা, ১০৭৯ পৃ-২৫২

২। মানস সাঁতরা : Land Revenue Administration in Bengal under Early British Rule: A case study of Birbhum District, 1765-1820, দিল্লী, ১৯৯৪

৩। বিনয় চৌধুরী : The Cambridge Economic History of India, Vol-2, দিল্লী, ১৯৮৪, পৃ-৯৪

৪। বিনয় চৌধুরী : প্রাগুক্ত, পৃ-১১৫

৫। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : বীরভূম বিবরণ : ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ-২১৭, এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য সুরুল নথি সংকলন।

৬। উইলিয়াম হান্টার : Statistical Account of Birbhum, Reprint 1973, Delhis P-419 পূর্বোক্ত পৃ-৪২১

৭। পূর্বোক্ত পৃ-৪২১

৮। দুর্গাদাস মজুমদার : W.B. District Gazetteer Birbhum - 1975, পৃ-৩৭৭

৯। পূর্বোক্ত, পৃ-৬

১০। পূর্বোক্ত পৃ-৭

১১। পার্লামেন্টারী পেপারস : (H of C) ; Vol - IX, Part - III.

১২। সুরুল নথি সংকলন, বিশ্বভারতী, পৃ-৫৩৭

১৩। পি, এম. বরার্টসন : Final Report on the Survey and steelement of Sonthal villages of Rampurhat and Suri Sub. Division of the District of Birbhum, 1909-1914, Calcutta - 1915, P-23.

১৪। পূর্বোক্ত, পৃ-২৩,

M. C. Alpin ও তাঁর Report on the condition of the Sonthals in the Districts of Birbhum, Bankura, Midnapur and North balosore (১৯০৯) পুস্তকে দেখিয়েছেন যে বীরভূমের অধিকাংশ ভূ-স্বামীরাই ছিলেন পত্তনীদার, দরপত্তনীদার এবং সেপত্তনীদার। এরা একই সাথে মহাজনের ভূমিকাও পালন করতেন এবং জমিতে কৃষকের স্বত্বের পুরোপুরি বিরোধী ছিলেন।

১৫। পার্লামেন্টারি পেপারস - পূর্বোক্ত

১৬। স্বভাবগত দিক থেকে সাঁওতালরা পাহাড় ও জঙ্গল বেশি পছন্দ করত। জঙ্গল থাকার ফলে তাদের জমি জরিপ করা অনেক সময় অসুবিধা হত।

১৭। শুচিব্রত সেন :

১৮। বিজয় বিহারী মুখার্জী : Final Report on the Survey and settlement operations in the District of Birbhum 1924-1932, Calcutta, 1932 (এখন থেকে শুধু) setelement Report

১৯। বি. এম. রাহা : "Condition of the Sonthal Ryots in Beerbhoom" proceedings of the Lt. Governor of Bengal ; Revenue Dept. Land and Land Revenue Misc, File No. 8, Nos. 68-80 ; August, 1881.

উধৃত : Edward Duyiker: Bengal past and present ; Vol - Cl, 1982

২০। সঞ্জীব চন্দ্র চ্যাটার্জী : Bengal Ryots ; There Rights and Liabilities ; Calcutta 1977 (Re Print), P-XXXXIV

২১। বিনয় ভূষণ চৌধুরী : The Calcutta Historical Journals,Vol.-1, No.-1, July, 1976, P.- 53.

২২। L. S. S, O'Malley : Bengal District Gazetteer, Birbhum, Calcutta, 1910, P.-90.

২৩। Robertson, P.M : পূর্বোক্ত, পৃ-১৩

২৪। পূর্বোক্ত

২৫। W. V. Sehendel এবং A. H. Faraizi : Casp 12 S Rural Labourers in Bengal, 1880 - 1980, Rotterdam, 1984 ; P - 50.

২৬। E. H. Dalton : The Descriptive Ethnology of Bengal ; quoted in Nundji Munshi Settlement Report, 1896, P -4.

২৭। বিনয় ভূষণ চৌধুরী ঃ বাংলা ও বিহারে কৃষক উৎখাতের ইতিহাস ১৮৮৫-১৯৪৭

বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন ঃ ১ম ভাগ, ১৯৯৫, কোলকাতা, পৃ-৯১

২৭। W. V. Schendel : পূর্বোক্ত, পৃ-৮৮

২৮। Settlement Reports; p-21

২৯। রঞ্জন গুপ্ত ঃ

৩০। রঞ্জন গুপ্ত ঃ প্রাগুক্ত

৩১। Settlement Report ; পৃ-১১৯

৩২। আন্দ্রে বেতেই, কৃষি ব্যবস্থায় শ্রেণীর স্বরূপ, জোতদারদের কথা, বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন, প্রথম ভাগ, কোলকাতা ১৯৯৫ পৃ-৩৭

৩৩। হাসিম আমীর আলি

৩৪। রঞ্জিত দত্ত ঃ ধূসরমাটি ঃ ১৯৮৭, পৃ-১২০

('ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তন' বিষয়টি অত্যন্ত গভীর ও জটিল। শুধু একটি প্রবন্ধে এর সার্বিক আলোচনা সম্ভব নয়। এটি নিজেই হতে পারে একাধিক গবেষণার প্রসঙ্গ। পাঠক শুধু এক সংক্ষিপ্ত রূপরেখাই এই রচনায় পাবেন।

তথ্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য আমি শ্রী অরুণ চৌধুরী ও অধ্যাপক দীক্ষিত সিনহার কাছে কৃতজ্ঞ।)

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

দী ক্ষি ত সিং হ

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বোলপুর শহরের অনতিদূরে শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালের ৭ই পৌষ ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কালে এই বিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথের অনুসৃত শিক্ষাদর্শকে কেন্দ্র করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমন এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা অন্য সবার থেকে আলাদা, আলাদা কারণ এর লক্ষ্য জীবিকার সন্ধানে ব্যবহারিক সুযোগ লাভ নয়, মানব জীবনের পূর্ণতা-সাধনই লক্ষ্য। যে শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে মূল আশ্রয় করে অন্য সকল শিক্ষার পত্তন করবে। উপলব্ধি করেছিলেন, সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে (র র, খণ্ড ২৭, পৃ ৩৪৫)।

রবীন্দ্রনাথ এই জীবনের পূর্ণতা সাধন লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার তিনটি প্রধান লক্ষ্য চিহ্নিত করেছিলেন ঃ ১) প্রাচ্য ও প্রতীচীর সমস্ত "চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্ত সম্পদকে সংগৃহীত করার মাধ্যমে আপনাকে বিস্তীর্ণ ও সংশ্লিষ্ট করিয়া জানা"। ২) বিদ্যার উদ্ভাবন করা- "বিশ্ববিদ্যালয়ের মূখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, গৌণ কাজ বিদ্যাকে দান করা"। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি সাধনা-দ্বারা অনুসন্ধান ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। ৩) সমস্ত জ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিককবর্ত্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবন যাত্রার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিবে (ঐ পৃ-৩৪৫-৩৪৬)। যে শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে, সেটা ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষা বিস্তার করে সেও এর সঙ্গে মিলিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন হয়ে উঠবে সমস্ত

চিত্তের সম্মেলন। বাহ্যিক বৈভব বর্জিত পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সাহচর্য্যের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজের এক উদ্ভাসিত রূপ। এক কথায়-যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম।

এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয় বিশ্বভারতীর প্রাতিষ্ঠানিক রূপটির ক্রমবিকাশের চর্চা করা বা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা। বিশ্বভারতীর প্রদর্শিত শিক্ষা ব্যবস্থা কতটা সমাজ জীবনে প্রভাব ফেলেছিল তার মূল্যায়ণ করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমরা প্রধানতঃ চেষ্টা করবো রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় যে লক্ষ্য বিশ্বভারতীর জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন তা কতটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশে পাশের "পল্লীর জীবন যাত্রার কেন্দ্রস্থল অধিকার" করতে পেরেছিল তা আলোচনা করতে। রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ণের ভাবনা ও তার রূপায়ণের যে কর্মকাণ্ড বীরভূম জেলায় করা হয়েছিল তার পরিপূরক বহুদিক ছিল। অথচ সবগুলি দিক ও সব কার্য্যাবলী আলোচনা এই অল্প পরিসরে করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র এখনকার সমাজজীবনের প্রেক্ষাপটে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা ও প্রভাব তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের সুনির্দ্দিষ্ট দিক আছে। একটি শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যার উৎপাদন করা। আর একটি শান্তিনিকেতন থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে, শ্রীনিকেতন যেখানে রবীন্দ্রনাথ অবহেলিত পল্লী সমাজ পূর্ণগঠনের কাজে নেমেছিলেন। রেখেছিলেন পল্লী সমাজকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্‌বোধিত করে তুলতে। অনুভব করেছিলেন আত্মহিতের জন্যই আত্মশক্তির উদ্‌বোধন করা প্রয়োজন। আশা করেছিলেন পল্লীবাসী যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। রবীন্দ্রনাথ গ্রামের সমাজ জীবনের মধ্যে চিরপুরাতন একাত্মকতা, স্থায়িত্ব ও ঐক্যের রূপ দেখেছিলেন। লিখেছিলেন, "আমার এই ক্ষুদ্র গ্রামের চাষাদের প্রকৃতির মধ্যে যে একটি ঐক্য দেখা যায় তাহার মধ্যে বৃহৎ জটিলতা নাই। এই ধরাপ্রান্তে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে সামান্য গুটিকতক অভাব মোচন করিয়া জীবনধারণ করিতে সঠিক দর্শন বিজ্ঞান সমাজতত্বের প্রয়োজন হয়না। যে গুটিকয়েক আদিম পরিবারনীতি গ্রামনীতি ও প্রজানীতি আবশ্যক, সে-কয়েকটি অতিসহজেই মানুষের জীবনের সহিত মিশিয়া অখণ্ড জীবন্তভাব ধারণ করিতে পারে। কিন্ত এই "অখণ্ড জীবন্তভাব" গ্রামের মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন তা নানাকারণে তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং তারই আশু প্রতিকারের জন্য শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা। এখানে একথা বলা প্রয়োজন যে, শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠার বহুপূর্বেই তাঁর পৈত্রিক জমিদারি পতিসরে (বর্তমানে বাংলাদেশে) গ্রামন্নোয়নের লক্ষ্যে নানা কাজ হাতে নেন। এই কাজে কালিমোহন ঘোষ তাঁকে

সাহায্য করেছিলেন। যিনি পরে শ্রীনিকেতনের পল্লী পূর্ণগঠনের অন্যতম কাণ্ডারী ছিলেন।

১৯২২ সালে শ্রীনিকেতনের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। ১৯১২ সালে রায়পুরের কর্ণেল নরেন্দ্র প্রসন্ন সিংহর কাছ থেকে সুরুল গ্রামের কুঠিবাড়িটি রবীন্দ্রনাথ দশ হাজার টাকায় ক্রয় করেন। এই বাড়িতেই শুরু হয় গ্রামের কাজ। কিন্তু ১৯২২ সালের আগেই বিক্ষিপ্তভাবে পরীক্ষামূলকভাবে নানা কাজ এখানে আরম্ভ করা হয়। ১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছার শান্তিনিকেতনের শিশু বিভাগের ড্রইংশিক্ষক সন্তোষ মজুমদার সুরুল কুঠিবাড়িতে গিয়ে চাষবাসের কাজ শুরু করেন। চিনে বাদাম, লঙ্কা ও ধানের চাষ করতেন। খরচ হতো দেড়শ টাকা, লাভ হতো অনেক বেশী। শান্তিনিকেতন থেকে গো-পালন কেন্দ্রও এখানে স্থানান্তরিত হয়। তাঁকে সাহায্য করার জন্য দুজন মালি ও দুজন গোয়ালা নিযুক্ত হয়।

১৯২১ সালে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তখন এই দলের কয়েকজন অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে সুরুলকুঠিবাড়িতে গিয়ে ওঠেন দীনবন্ধু এনডরুজের সহায়তায়। এই দলে ছিলেন কুমিল্লার অভয় আশ্রমের নীরেন দত্ত, শান্তিনিকেতনের কুলপ্রসাদ সেন, বজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অনাথনাথ বসু, ত্রিগুনানন্দ রায় প্রভৃতি। তাঁরা চরকা কাটতেন, তাঁত বুনতেন আর গ্রামে গ্রামে এসব প্রচার করতেন। এঁদের মধ্যে অনাথ বসু নিকটবর্তী বাগ্রিরি গ্রামে অনেকদিন ছিলেন এবং গ্রামোন্নয়নের প্রচুর কাজ করেছিলেন।

১৯২১ সালের ২৮শে নভেম্বর শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছলেন লেওনার্ড এলমহার্ষ্ট। আরম্ভকালে শ্রীনিকেতনের নাম ছিল ডিপার্টমেন্ট অফ এগরিকালচার, শান্তিনিকেতন। এই বিভাগের চ্যান্সেলার হলেন রবীন্দ্রনাথ, ডিরেক্টর বা অধিকর্তা হলেন এলমহার্ষ্ট, সেক্রেটারি ও কোষাধ্যক্ষ হলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দশজন ছাত্র ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, কালিমোহন ঘোষ, গৌর গোপাল ঘোষ, সন্তোষ মিত্র, সচ্চিদানন্দ রায়, যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কর্মীদের নিয়ে কর্মী দল গঠিত হল। কাজ শুরু করা হলো ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী।

অরম্ভকালে যে প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'শান্তিনিকেতন কৃষি বিভাগ' ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে তার নাম হলো শ্রীনিকেতন। একে একে এখানে নানান নতুন বিভাগ যুক্ত হলো, যেমন পল্লী সংগঠন বিভাগ, সমাজ-শিক্ষা সংগঠক শিক্ষা-কেন্দ্র, গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সম্প্রসারণ কেন্দ্র, কুষ্ঠ নিবারণ কেন্দ্র, শিক্ষাসত্র বিদ্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র-শিক্ষা চর্চা ইত্যাদি। এসে যোগদান করেন দেশ বিদেশ থেকে নানান্ কর্মী। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

জাপান থেকে কাঠের কাজের শিক্ষক কিংতারো কাসাহারা, মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট মিস গ্রীণ, পি, সি লাল, ধীরানন্দ রায়, ভি ওয়াভনারকার, হ্যারি টিমার প্রভৃতিরা। প্রথমে শ্রীনিকেতনের কাজ তিনটি গ্রামে শুরু হয়। পরে তা ৭৫টি গ্রামে বিস্তার লাভ করে। এই গ্রামগুলিকে আবার ১৬ গ্রামসেবা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এলাকা ছিল ২০০ বর্গ মাইল জুড়ে। শ্রীনিকেতনের কাজের জন্য শ্রীমতী ডি. ডবলু ষ্ট্রেটের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল একলক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা ও রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে জমি জমা, কুঠিবাড়ি ও সত্তর হাজার টাকা মূল্যের পশুপাখি ও যন্ত্রপাতি।

শ্রীনিকেতনের কাজের পরিধি যেমন বিশাল ছিল তেমনি ছিল তার ব্যাপ্তি। প্রথমদিকে যেসব কাজের কথা ছাত্র ও কর্মীদের বলা হয়েছিল তা ছিলো ১) পক্ষী পালন, ২) মৌমাছির চাষ, ৩) গোপালন, ৪) বাগান, ৫) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, ৬) সমবায় ও ৭) কাঠের ও ধাতুর কাজ। কিন্তু যতদিন গেছে তত এর পরিধি বেড়েছে। ১৯২৩ সালে গ্রামের কাজের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছিল তাতে দেখা যাচ্ছে ব্রতীদল গঠন কৃষি বিষয়ক নানা কাজ যার মধ্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বীজ ও সার তৈরী, মুরগী পালন, শাক সবজির চাষ, মাছ চাষ, তাঁতের ও কাঠের কাজ, বাঁশ বেতের কাজ, চামড়ার কাজ, মহিলাদের সেলাই শেখানো, স্বাস্থ্য সমিতি গঠন ও ম্যালেরিয়া নিবারণ সংক্রান্ত ইত্যাদি নানা কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৯৩০ সালে আর একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে কাজের ও গ্রামের সংখ্যা বাড়তে থাকায় শ্রী হেমন্ত সরকারকে বল্লভপুরসহ আরও ছয়টি গ্রামের ভার দেওয়া হয় এবং শ্রী উষারঞ্জন দত্তকে কাছাকাছি তিনটি গ্রামের উন্নয়ণের ভার দেওয়া হয়। একে একে আরও গ্রাম কর্মী যেমন বাগাদৌর গ্রামের ফণিভূষণ ঘোষ ও লালদহ গ্রামের জ্ঞান ঘোষ, শক্তিপদ সরকার, অধীর রঞ্জন মজুমদার, বৈদ্যনাথ ঘোষ প্রভৃতিরা যোগ দেন। এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আংশিক সময়ের কর্মীদেরও দেওয়া হয়েছিল। এঁরা প্রত্যেকেই গ্রামে থেকে গ্রামের লোকেদেরকে নিয়ে উন্নয়ণ ও সংস্কারের কাজ করতেন।

১৯৪৬ সালে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকায় শ্রীনিকেতনের কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে ফসলের উৎকর্ষ সাধন ও হার বাড়ানো ও নতুন বীজ ও নতন ধরণের ফসলের চাষ শুরু করা এবং সর্বোপরি নতুন কৃষি পদ্ধতির দ্রুত প্রসার ঘটানো। শ্রীনিকেতনের চেষ্টায় নতুন ধরণের আখ CO ৪২১ গ্রামে দেওয়া হয় ও নতুন ধরণের গুড় তৈরী করার পদ্ধতি (হাঁড়ি পদ্ধতি) শেখানো হয়। শ্রীনিকেতন এই অঞ্চলে ফসল চক্র (Crop

rotation) আলু ও শাক সবজি চাষ যেমন টমাটো, ফুলকপি, বীট, গাজর, বাঁধাকপি ইত্যাদির চাষের প্রবর্তন করে। পশুপালনের ক্ষেত্রে শ্রীনিকেতনের উল্লেখযোগ্য অবদান হলো শংকরজাতীয় গরু (মুলতানি, হরিয়ানা, লাল সিন্ধি) এনে গ্রামের পশুচাষকে এক নতুন মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা করা। তাছাড়া ছাগল চাষ, মৌমাছি চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে চাষীদের আয় বাড়ানোর চেষ্টাও উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন ১৯২৩ সাল থেকে বিভিন্ন গ্রামে প্রায় ৩১টি নৈশ বিদ্যালয় খোলার মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা শুরু করা হয় তেমনি ১৯৩৬ সালে লোক শিক্ষা সংসদের মাধ্যমে যাঁরা স্কুলে যেতে পারেন না বা কাছাকাছি সেই ব্যবস্থা নেই তাঁদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। লোক শিক্ষা সংসদ প্রথমে শান্তিনিকেতন থেকে তার কাজ শুরু করে পরে (১৯৪৩) তার শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত করা হয়। এই লোকশিক্ষা সংসদের কেন্দ্র বোম্বাই থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত লাভ করে। একসময় এই সংসদের কেন্দ্রের সংখ্যা ৪০০ পর্যন্ত পৌঁছয়। এই সংসদের শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ছিল—প্রথম স্তরকে বলা হতো আক্ষরিক (শুধু সাক্ষর হতে পারলে), প্রাথমিক প্রবেশিকা আদ্য (তখকার ম্যাট্রিক) মধ্য (I.A.) ও অন্ত (B.A.)। এছাড়াও আশেপাশের ১৭টি বিভিন্ন ধরণের স্কুলের তত্ত্বাবধানও করা হতো।

শ্রীনিকেতনের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রামোন্নয়নের দিক ছিল মৃতপ্রায় গ্রামীণ হস্তশিল্পের মান উন্নয়ণ এবং এর মাধ্যমে গ্রামের হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলির আয় বৃদ্ধি করা। শ্রীনিকেতনে এরজন্য শিল্পভবন স্থাপন করা হয়। শিল্পভবনের পরে নামকরণ হয় শিল্প সদন। শিল্প সদন পল্লী সম্প্রসারণ কেন্দ্রের সঙ্গে গ্রামের শিল্প বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। শিল্প সদন তাঁত, গালার কাজ, কাগজ তৈরী, কাঠের কাজ, বই বাঁধানো, বাটিক, চামড়া তৈরী ও তার থেকে নানারকম জিনিস তৈরী, মাটির কাজ ইত্যাদি শিল্পের ওপর নানারকম পরীক্ষা নিরিক্ষা ও সেগুলির পুনর্জীবনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ খুলে দেয়। একসময় শিল্প সদনের কাজে ২০০ এর ওপর লোক সরাসরি যুক্ত ছিলেন এবং আরও ৩০০র মতন পরিবার তাঁদের বাড়িতে কাজ করে বেশ ভালো রোজগার করতেন। একটা হিসেবে দেখা যাচ্ছে (১৯৪৪ সালে) শিল্প সদনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের মাসিক আয় ৩০ টাকারও বেশী ছিল।

সমবায় ও সমবায় নীতি রবীন্দ্রনাথের পল্লী পুর্নগঠনের মূল মন্ত্র। তিনি বিশ্বাস করতেন সমবায় মানুষের শক্তি ও মানুষের সভ্যতা ও উন্নতির মূলে। "পরস্পর মিলিয়া যে মানুষ সেই মানুষই পূরা, একলা মানুষ টুকরা মাত্র"।

একথা রবীন্দ্রনাথের লেখায় বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। শ্রীনিকেতনেও তার প্রকাশ ঘটেছে! বিভিন্ন ধরণের সমবায় সমিতি বিশেষতঃ ঋণদানের জন্য সমবায় সমিতি ও স্বাস্থ্য সমবায় সমিতিগুলি বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে তার আর্থিক দুরাবস্থা দূর করতে ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৯২৭ সালের ২২শে নভেম্বর বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এর কর্ণধার বা চেয়ারম্যান। ১৯২৮ সালের ১লা জানুয়ারী ব্যাঙ্ক কাজ শুরু করে। কাজের পরিধি বিস্তৃত ছিল বোলপুর, নানুর ও ইলামবাজার থানা পর্য্যন্ত। এই অঞ্চলের ১১১ সমবায় সমিতি এর সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯২৮ সালের ৩০শে জুন দেখা যাচ্ছে ২৯৯টি বিভিন্ন ধরণের সমবায় সমিতি এর সঙ্গে যুক্ত আছে। এর মধ্যে ৬৬টি সেচ সমবায় সমিতি বা Irrigation Societies যুক্ত ছিল। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সেচ সমবায় সমিতিগুলিকে টাকা ধার দেওয়া হতো যা বীরভূমের মতো খরা প্রবণ এলাকায় একটি অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এছাড়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি, স্বাস্থ্য সমিতি, মৎস চাষ সমবায় সমিতি, ধর্ম্মগোলা, ক্রয়-বিক্রয় সমিতি ইত্যাদি গুলি বিশ্বভারতী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কৃষি সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে চাষীদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কিনে, বিশেষতঃ গরীব চাষীদের কাছ থেকে যাঁরা মহাজনী প্রথার স্বীকার হতেন সমবায় ব্যাঙ্ক এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। শুধু আর্থিক ক্ষেত্রেই নয় গ্রামের লোকেরা যাতে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারে তার জন্য গ্রাম্য বিচার ব্যবস্থা করা, কয়েকটি গ্রামকে নিয়ে যৌথ মেলা ও যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করাতে উৎসাহ দেওয়া হতো। ১৯৩০ সালের একটি প্রতিবেদন থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বল্লভপুর গ্রামের নিকটবর্তী তিনটি গ্রামকে নিয়ে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, স্কুল ও ব্রতীবালকদের দল সংগঠিত হয়েছে। জন্মাষ্টমী পালনের ক্ষেত্রে বল্লভপুর, সাদিপুর, খেজুরডাঙ্গা এবং সাঁওতালপাড়াকে এক করে উদ্‌যাপিত হয়েছে। বগদৌড় গ্রামে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি ১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে স্থাপন করা হয়েছে যাতে বছরের শেষে ১৯৬৪ টাকা ১৪ আ. ৬ পঃ জমা পড়েছে। ১৯৩০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৫৯৫৫ টাকা ১২ আ. ৪ পঃ। এই টাকা ঐ অঞ্চলের সম্মিলিত ফসল ছিল।

সমবায় সমিতিগুলির কাজের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সমিতিগুলি বীরভূমে এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৮৭১ সাল থেকেই বীরভূমে তথাকথিত বর্দ্ধমান জ্বরে (যা ম্যালেরিয়া বলে বিশেষজ্ঞরা চিহ্নিত করেছিলেন), লোকসংখ্যা কমতে থাকে। ১৯২২ সালে যখন শ্রীনিকেতনে ডাক্তারখানা খোলা হয় তখন

আশেপাশের গ্রামের থেকে রোগাক্রান্ত মানুষরা দলে দলে চিকিৎসার আশায় আসতে থাকেন। ১৯২৬-২৭ সালে শ্রীনিকেতনের ডাক্তারখানায় আশেপাশের ৫৮ টি গ্রামের ৪৮৭৩ জন রোগীর (প্রধানতঃ ম্যালেরিয়া আক্রান্ত) চিকিৎসা হয়। ১৯৩০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০১৮৭ তে (Visva Bharati, Annual Report 1930) এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি খোলার আগে ১৯২৪-১৯৩০ সালের মধ্যে ১৩টি স্বাস্থ্য সমিতি (Helth Society) খোলা হয়। কিন্তু স্বাস্থ্য সমিতি খোলা সত্ত্বেও ম্যালেরিয়া কমার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। দেখা গেল চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তবে এর আশু সমাধান করা সম্ভব নয়। গ্রামগুলির জরাজীর্ণ অবস্থা দেখে গ্রামের ছেলেদের নিয়ে ব্রতীদল গঠন করা হয়। এরা গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করা নিকাশী ব্যবস্থা ঠিক করা, জলা জায়গায় যেখানে মশা জন্মায় সেখানে কেরোসিন ছড়ানো ইত্যাদি গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করতে থাকে। এইসময়কার গ্রামের অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হেমন্ত কুমার সরকার লিখেছেন,

ম্যালেরিয়া ছিল অধিকাংশ লোকের সর্বক্ষণের সাথী। বসন্তের হওয়ার পরে কতকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়া বর্ষার চাষ কোনও প্রকারে সারিয়া লোকে আবার শয্যায় আশ্রয় লইত।...নিবারণের কোন উপায় ছিল না, এদিকে এক একটা পরিবার ধ্বংস হইয়া যাইত এবং পতিত বাড়ী ঘরের মাটির দেয়াল পড়িয়া গিয়া নূতন নূতন ছোট বড় ডোবার সৃষ্টি হইয়া মশক বৃদ্ধির সহায়তা করিত। মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়—ডোবা ও পুকুরের জলে সেই মশা জন্মায় একথা তাঁহারা জানিতেন না, সুতরাং বাড়ীর নিকটেই গর্ত খুঁড়িয়া নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দেয়াল তুলিতেন, কিন্তু তাঁহারা বুঝিতেন না যে তাঁহারা নিজ হাতেই নিজেদের পুত্রকন্যাগণের ও প্রতিবেশীদের জন্য যম-ডোবা খুঁড়িয়া রাখিতেছেন। (উদীচী, পৌষ ১৩৮৬ পৃ-৮৮)।

অতএব ব্রতীবালকদের নিয়ে গ্রাম পরিষ্কার করা অন্যদিকে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে মশা ও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে সজাগ করে দেবার চেষ্টা চলতে থাকে। বাড়ি বাড়ি কুইনাইন বিতরণের কাজও পাশাপাশি পালন করা হয়। প্রায় ২৬টি স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি বীরভূমের বিভিন্ন জায়গায় খোলা হয়। এগুলি ১৯৩২ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত খোলা হয়। প্রথম স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি বোলপুর সংলগ্ন বাঁধগড়া ও শান্তিনিকেতনের কাছে অবস্থিত গোয়ালপাড়া গ্রামে খোলা হয়। স্বাস্থ্য সমিতিই একমাত্র শ্রীনিকেতন অনুপ্রাণিত প্রতিষ্ঠান যা শান্তিনিকেতনের চিরাচরিত চৌহদ্দি ছাড়িয়ে বীরভূমের অনেক জায়গায় প্রসারিত

হয়। এর সঙ্গে বীরভূমের প্রশাসনও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। (দ্রঃ দীক্ষিত সিংহ ২০০৪)। এগুলি গ্রামের লোকদ্বারা পরিচালিত গ্রামের থেকে সংগৃহিত অর্থের সাহায্যে চলত। যেহেতু একটি গ্রামের পক্ষে স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি চালানোর জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না সেইহেতু আশে পাশের গ্রামগুলিকে নিয়ে এগুলি সংগঠিত করা হতো। ফলে সমবায়ের ব্যাপকতা প্রসারিত হতো। বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের এই প্রয়াসের ফলে ম্যালেরিয়া আস্তে আস্তে প্রশমিত হয় ও লোকবৃদ্ধি স্বাভাবিক হারে বাড়তে থাকে।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি হস্তশিল্পের পুর্ণজীবন ইত্যাদি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সমান দৃষ্টি ছিল নারীদের সমস্যার ব্যাপারে। ১৯২৮ সালে সুরুল ও বল্লভপুর গ্রামে মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়। তাঁদের তাঁত বস্ত্র তৈরী, উলবোনা, এ্যামব্রয়ডারী ইত্যাদি কাজ শেখানোর মাধ্যমে সংসারের আয় বাড়াতে সাহায্য করা হয়। বল্লভপুর গ্রামেরই চারজন দাইকে উন্নততর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে শিশু মৃত্যু বা প্রসবের সময় মা-দের মৃত্যুর হার কমে। তাঁরা আটটি গ্রামে তাঁদের কাজের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমাতে সফল হন। বেশ কয়েকটি গ্রামে মাতৃ ও শিশু মঙ্গল কেন্দ্র খোলা হয়।

রবীন্দ্রনাথের গ্রাম পুর্ণগঠনের ভাবনা ও তার সফল রূপায়ণ কতটা সম্ভব হয়েছিল তা নিয়ে তর্ক হতে পারে। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার কথা ভাবেননি। চেয়েছিলেন এক সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ। তখনকার সময়ের প্রেক্ষাপটে তার পূর্নগঠনের কাজ যে যুগান্তকারী ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পল্লী পূর্নগঠনের বিভিন্ন কার্য্যাবলী যে তখনকার "জীবন যাত্রার কেন্দ্রস্থল অধিকার" করেছিল তা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি প্রত্যেকটি কাজ যার বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা গ্রামীণ জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থলে সমূলে আঘাত করেছিল। আঘাত করেছিল বলেই কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা পদে পদে বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি করেছিল। তখনও স্থায়ী উন্নয়ণের (sustainable development) কথা চিন্তার জগতে স্থান করে নেয়নি। সমাজ ব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রবাহও (process) যে উন্নয়ণের ধারাকে প্রবহিত করে তার কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। ব্যাধি জরাজীর্ণ ও আর্থিক অবস্থার ক্রমনিম্নগামী লেখচিত্র তখনকার গ্রাম বাংলার সমাজ জীবনে যে দুর্বিসহ মেঘে ঢেকে দিয়েছিল তা গ্রাম পুর্নগঠনের কাজ অনেকটা দূর করতে পেরেছিল। স্বাস্থ্যের, শিক্ষার, হস্তশিল্পের, কৃষি ও সমবায়ের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত এনে দিয়েছিল।

গ্রন্থসূচীঃ

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী খণ্ড ২৭।
২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমবায়নীতি, রবীন্দ্ররচনা সংগ্রহ, বিশ্বভারতী খণ্ড ২৭।
৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্ররচনা সংগ্রহ, বিশ্বভারতী খণ্ড ২৭।
৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পল্লীগ্রামে, রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী খণ্ড ২৭।
৫) চিত্তরঞ্জন দেব, শ্রীনিকেতন পরিচয় সংবাদ বিচিত্রা গ্রন্থমালা, কোলকাতা - ১৩৬৮।

Tagoris Experiment in Health care : Health and medicine as an aid to rural reconstruction in Suchibrata Sen and S. Sarbadhikary (ed.) Understanding Health and ecology in Rural Bengal During colonial Rule, Visva-Bharati Annals, NS, 2004.

বল্লভপুর ঃ কালের প্রেক্ষাপটে বীরভূমের গ্রাম

দী ক্ষি ত সিং হ

একটি গ্রাম ও তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লেখচিত্রের মাধ্যমে অঞ্চলের বা জেলার সমাজজীবনের গতিপ্রকৃতি কতটা বোঝা যায় তা নিয়ে যথেষ্ট তর্কের অবতারণা করা যায়। তথাপি গ্রাম সমীক্ষা সমাজতত্ত্বে বা নৃতত্ত্বে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সমাজবদ্ধ মানুষের বহুধা রূপ এবং বিবিধ কর্মকাণ্ডের সবগুলি দিক এই সমস্ত সমীক্ষায় সবসময় সার্বিককভাবে প্রতিফলিত হয় না বা আলোচিত হয় না। যেমন, অর্থনীতিবিদরা জমির মালিকানা, উৎপাদন, বন্টন, উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত সামাজিক ব্যবস্থার ওপর বেশী গুরুত্ব দেন অপরদিকে সমাজতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদরা সামাজিক কাঠামোর বিন্যাস, কৃষ্টি, আচার ব্যবহার ইত্যাদির ওপর বেশী গুরুত্ব দেন। স্বভাবঃতই এই দুই শ্রেণীর লেখার মধ্যে মিল থাকলেও সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক রূপটি ফুটে ওঠেনা।

বল্লভপুর গ্রামের যে চিত্রটি ১৯২৫ সালের কালীমোহন ঘোষের সমীক্ষার মধ্যে বিধৃত আছে তা গ্রামের আর্থিক অবস্থার দিকটি যতটা, সামাজিক বিন্যাস প্রসৃত অবস্থার চিত্রটা ততটা নেই। এর কারণ বল্লভপুর সহ অন্যান্য গ্রাম সমীক্ষাগুলি শ্রীনিকেতনের পল্লী পুর্নগঠনের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল 'তথ্যভিত্তিক অতিরঞ্জন অবরঞ্জনহীন সংক্ষিপ্ত সঠিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ' (হেমন্ত কুমার সরকার রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংস্কারের আদর্শ Visva-Bharati News 1979) করা যাতে গ্রামোন্নয়নের দিকগুলি চিহ্নিত করা যায়। বল্লভপুর ও তার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি তখন ক্রমান্বয়ে বর্গী, খরা ও ব্যাধিতে জীর্ণ হয়ে কালাতিপাত করছিল। হেমন্ত কুমার সরকার, যিনি প্রত্যক্ষভাবে গ্রাম সমীক্ষায় জড়িত ছিলেন লিখেছিলেন, 'দেশের প্রতিকূল রাষ্ট্রশক্তি পল্লীবাসীদিগকে বহুবিধ উপায়ে বিচ্ছিন্ন করিতেই চেষ্টা করিয়াছে, শিক্ষিত সমাজের কোন প্রতিষ্ঠানও এই ক্ষীয়মান পল্লীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, পল্লীবাসীগণ নিজেদের উদ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য

চেষ্টা করে নাই। এই অবস্থায় আরম্ভ হয় ম্যালেরিয়া, একদিকে আর্থিক দৈন্য ও জড়ত্ব, অন্যদিকে ব্যাধি, এই সবগুলি মিলিয়া গ্রামকে ধ্বংস করিতে থাকে এবং ১০০ বৎসরের মধ্যে ৫০০ ঘর লোক ২৪ ঘরে আসিয়া দাঁড়ায়।.....ইহা হইল ১৩৩২ (১৯২৫) সালের কথা (শ্রীনিকেতনে আমার গ্রামসেবা ঃ বল্লভপুর, উদীচী, পৌষ ১৩৮৫)।

১৯২৫ সালের পর ১৯৭৫ সালে পুনরায় ভারতীয় সংখ্যাতত্ব বিভাগের শ্রী কুলদা রঞ্জন বিশ্বাস ও শৈলেশ সেনগুপ্তের নেতৃত্বে বল্লভপুর গ্রামের সমীক্ষা করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল এই পাঁচ দশক পরে গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কতটা পরিবর্তন হয়েছে তা দেখা। শ্রীনিকেতনের বিভাগগুলিও পরবর্তীকালে বল্লভপুর গ্রামের সমীক্ষা করেছেন কিন্তু তার বিস্তারিত তথ্য লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গেছে। ফলে গ্রামীণ জীবনের এক নিরবিচ্ছিন্ন লেখচিত্র থেকে আমরা বঞ্চিত হই। এ সত্বেও বল্লভপুর গ্রাম সমীক্ষা ইতিহাসের পাতায় স্থান পাওয়ার যোগ্য এই কারণে যে বীরভূম জেলার একটি অংশের আর্থিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ জীবনের ওপর কি তার প্রতিফলন হয়েছিল তার একটা ক্ষণিক চিত্র এর থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

১৯২৫ সালে সমীক্ষা কি কি বিষয়ে করা হয় ? হেমন্ত সরকার লিখছেন, গ্রামের অবস্থান, আয়তন, মাটির বিবরণ, লোকসংখ্যা, জাতি অনুসারে লোকের শ্রেণী বিভাগ, কৃষি-ধান, আলু ও গুড়ে বিঘা প্রতি ফলন, শস্য হানিকর কীটপতঙ্গ, ধান ও আঁখের চাষ, ৭০/৭৫ বৎসর পূর্বের তূলা চাষের কথা, সেচের ব্যবস্থা, ধান, আলু ও আঁখ চাষের আয় ব্যয়, গৃহপালিত পশু, গরুর খাদ্য, পশুর ব্যাধি, ক্রয় বিক্রয়, পথ ঘাট, ঋণ, মাছ, পরিচ্ছদ, দুইটি পরিবারের বার্ষিক আয় ব্যয়, তাঁত শিল্প, অন্যান্য শিল্প, শ্রমজীবি, সামাজিক ব্যবস্থা, মদ্যপান, বিবাহ পদ্ধতি, ধর্ম, উৎসব, খেলাধূলা, কারুশিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, গ্রাম্য বিচার, জমিদার, মদের দোকান, চুরি ডাকাতি, রাস্তা, হস্তলিখিত পুঁথি, স্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়া, পল্লীসমিতি ও ইহার কাজ, সমিতির আয়ব্যয়, গৃহস্থের চাষের জমির পরিমাণ, কৃষি কার্যের জন্য ব্যবহৃত হাল লাঙ্গল প্রভৃতি যন্ত্রপাতির বিবরণ ও তৎসমূহের কয়েকখানা ছবি ; ছবিগুলি শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু এবং তাঁহার দুইজন ছাত্র মাসোজি ও হরিহরণ বাবু অঙ্কিত। (উদীচী, ১৩৮৫)। সমীক্ষার এই বিষয়বস্তুর দিকে চোখ বোলালে বোঝা যায় যে যতটা অর্থনৈতিক দিকের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ততটা সমাজ জীবনের বা জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা কেমন ছিল তার ওপর নয়। তবুও হেমন্তকুমার সরকার যাকে ক্ষীয়মান গ্রামীণ জীবন বলেছেন তার একটা ছবি আমরা পাচ্ছি।

বল্লভপুর গ্রাম শ্রীনিকেতনের উত্তরে, কোপাই নদীর ধারে বোলপুর-সিউড়ি রাজপথের ধারে অবস্থিত। গ্রামের পত্তন শুরু হয় এই অঞ্চলের আর্থিক বিকাশের মধ্যে দিয়ে। ঐতিহাসিক শ্রী তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় রবীবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর, 'জন চীপ : বীরভূমের কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট' (ফেব্রুয়ারী ১৫, ১৯৫৩) লেখায় এই অঞ্চলের উত্থানের কথা এইরকমভাবে বর্ণনা করে গেছেন :

কোম্পানীর আমলেই এই সমৃদ্ধির উদয়। আবার কোম্পানীর আমলেই তার অবসান। এইটুকু সময়ের মধ্যেই এই সুরুল গ্রামকে কেন্দ্র করে বীরভূম জেলার সারা দক্ষিণ অঞ্চলটা ধনে জনে সরগরম হয়ে উঠেছিল।......সে সময় অজয় এক প্রকাণ্ড স্রোতস্বতী নদী।........তখন বীরভূমে গড়ার কাপড়, সিল্কের কাপড়, চিনি আর গালা প্রচুর পরিমাণে, আর লোহার জিনিষ অল্প পরিমাণে তৈরী হতো। হামেহাল সেসব জিনিষ সেখান থেকে অন্যত্র চালান যেতো। তার কিছু পরে এসে গেলো নীলের চাষ। সেও বড় কম চলল না। আর চলেও ছিল অনেকদিন ধরে। বীরভূমে নীলের চাষ যে সাহেব প্রথম আমদানি করেন, তাঁর নাম জন চীপ। চীপ সাহেব খুব সম্ভবতঃ ১৭৮৭ সালের আশে পাশে বনবল্লপুর (তখন এই নামেই পরিচিত ছিল) গ্রামের দক্ষিণে একটা উঁচু টিলার ওপর তাঁর কারবার শুরু করেন। নীল ছাড়াও, চিনি ও গালার ব্যবসা ছিল তাঁর। চিনি যে এখানে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হতো এই অঞ্চলে তার উদাহরণ এখনও পাওয়া যায়। চীপ সাহেব তাঁর নীল কুঠি ছাড়া সুরুল গ্রামের কাছে আর একটা কুঠি বাড়ি বানিয়েছিলেন এবং তার সংলগ্ন এলাকায় চিনি তৈরীর কারখানাও করেন। এই কুঠি বাড়িই, যাকে তখন লোকে ছোট কুঠি বাড়ি বলত, পরে ১৯২২ সালে শ্রীনিকেতনের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়।

জন চীপের ব্যবসার পত্তনের আগে এই বনবল্লপুরে গুটি কয়েক ব্যবসায়ীর সাময়িক আস্তানা ছাড়া কিছু ছিল না। কিন্তু ব্যবসা আর নৌকোর পাল মেরামতের কারবারে জায়গা জনপদের চেহারা নেয়। চীপ সাহেব শুধু ব্যবসার পত্তন নয় যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতির জন্য চার চারটি রাস্তা বানিয়েছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সুরুল থেকে সিউড়ি যাবার রাস্তা যা বল্লপুরের গা ঘেঁষে চলে গেছে। কাছেই সুপুর গ্রামে ছিল বন্দর, যার মাধ্যমে রপ্তানী হতো এই অঞ্চলের উৎপাদিত দ্রব্য। অনতিদূরে ইলামবাজারের (যার নাম তখন ছিল গোরাবাজার) জঙ্গলকে ঘিরে গালা উৎপন্ন হতো। পাল সারাবার ও কাপড়ের ব্যবসার জন্য একে একে ৬০টি বর্ধিষ্ণু তাঁতি পরিবার বাস করতে শুরু করেন। এর সঙ্গে এই অঞ্চলে তুলোর চাষও শুরু হয়। বল্লভপুরের লোকেরাও তুলো আর আখ চাষ

করতেন, ধান তো ছিলই। সব মিলিয়ে কৃষি নির্ভর এক আর্থিক কাঠামো তৈরী হয়।

চীপ সাহেব ১৮২৪ সালে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পরে অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য একে একে বন্ধ হয়ে যায়। এলাকায় মহামারী আকারে ম্যালেরিয়া দেখা দেয়। এর সঙ্গে খরা ও বন্যা একাদিক্রমে হতে থাকায় কৃষি ব্যবস্থায় ও ফসল উৎপন্নের হার দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে গ্রামে একসময় ৫০০ টি পরিবার বাস করত তা কমে মাত্র ২৪টিতে দাঁড়ায়। গ্রামবাসীরা বছরের ৬ মাসই ম্যালেরিয়ায় ভুগতেন। ছিলনা কোন কূঁয়ো। কোপায়ের জল পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

গ্রামের মোট এলাকা ছিল ৩৭৪৪.০০ বিঘা। এর মধ্যে কৃষি জমি ৪৫৭.০০ বিঘা। আরও ১০০ বিঘা মতো জমি চাষ করার যোগ্য কিন্তু করা হত না কারণ নয় চাষ করার খরচ যোগান দেওয়ার অক্ষমতা বা কোন সেচ ব্যবস্থা না থাকায়। গ্রামের বেশ বড় অংশ জঙ্গল ও খোয়াই পরিবৃত্ত যার পরিমাণ ২৭৪৮.৩৬ বিঘা। সরুল গ্রামের শ্রী দেবেন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন এই গ্রামের জমিদার। জমির মালিকানা তাঁর হাতেই ছিল এবং জমিদারী প্রথার মাধ্যমেই গ্রামের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হতো। গ্রামের লোকেদের ভাগ দখলি স্বস্ত ছিল। জমিদার নিজের হাতে ১৫৫ বিঘা চাষ করতেন। ২৩৬ বিঘা গ্রামের পরিবারগুলিকে বন্দোবস্ত দেওয়া ছিল এবং ৬৬ বিঘা গ্রামের বাইরের লোকেদের। ২৪টি পরিবারের মধ্যে ৮ টি পরিবারের হাতে (৩৩.৪%) কোন জমি ছিল না। ৯ টি পরিবার তাঁদের অধিকৃত জমি ভাগ চাষের (৫০ : ৫০) মাধ্যমে চাষ করতেন। প্রতি বিঘায় ধান উৎপন্ন হতো ৫ মণ করে, আলু ২৫ মণ আর গুড় পাওয়া যেত ২০ মণ করে। চাষ বাসের ক্ষেত্রে অন্ততঃ গ্রামের লোকেদের মধ্যে একটা সহযোগিতার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষতঃ যাদের জমি কম ছিল বা মজুর জোগাড় করা কঠিন ছিল তাঁরা 'গাতো' প্রথায় নিজেদের জমিতে চাষ বাসের কাজ সম্পন্ন করতেন। নিয়ম ছিল যিনি হাল সমেত গ্রহীতার জমি চাষে সাহায্য করেছেন তিনি গ্রহীতার কাজ থেকে ফেরত পাবেন সম পরিমাণ শ্রম, যদি গ্রহীতার হাল গরু না থাকে তবে একদিনের হাল গরু দিয়ে চাষ করার বদলে তিন দিনের শ্রম ফেরত দেবেন ; আর হঠাৎ করে দরকার হলে শ্রম বা যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করার বিনিময়ে শুধু একদিন খাবার দিয়ে ভোজের ব্যবস্থাই তৃপ্ত করত। গুড় তৈরী করার ক্ষেত্রেও পারস্পরিক সহযোগিতার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই সহযোগিতা জীবনের অন্য ক্ষেত্রে প্রসারিত ছিল না। ছিল না সুষ্ঠভাবে বাঁচার কোন উদ্যম। আগেই বলা হয়েছে গ্রামের জনসংখ্যা ৮৪ তে গিয়ে ঠেকেছিল। এর মধ্যে ৩৮ জন ছিলেন উচ্চ বর্ণভূক্ত যা আবার ৫টি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল, ব্রাহ্মণ ৬টি পরিবার,

তাঁতি ৩টি, কুমোর, নাপিত ও তাম্বুলি ১টি করে পরিবার। নিচু জাতের লোক সংখ্যা ছিল ৪৬ জন—মুচি ৭, হাঁড়ি ২ ও ডোম ৩টি পরিবার। আর একটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে মহিলারা সংখ্যায় ছিলেন ৩৮ আর পুরুষরা এর থেকে ২ জন কম ৩৬ জন। কিন্তু কম বয়সীদের মধ্যে ছেলের সংখ্যা বেশী ছিল ৪ টি পরিবারে কোন পুরুষ ছিল না।

ব্রাহ্মণরা জাত ব্যবসায় রত তো ছিলেনই কিন্তু তার সঙ্গে কুমোর, নাপিত, হাঁড়ি, বায়েন বা মুচি ও ডোমরাও নিজ নিজ জাত ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন। কজন ভাগ চাষি ছিলেন তার উল্লেখ না থাকলেও আমরা ধরে নিতে পারি যে অন্ততঃ ৯ জন ভাগচাষ করতেন ; কৃষাণি প্রথার কথা বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু কজন তাতে যুক্ত ছিলেন তার বর্ণনা নেই। ধান, আলু আর আঁখ চাষ হতো। এছাড়াও শাক সবজি ও রবি ফসল হতো। আগে তুলোর চাষ হতো এখন হয়না। সেইসময় থেকে গ্রামের বেচাকেনা যা হতো তা নিকটবর্ত্তী বোলপুর শহরে। ধান কিনতো বোলপুর শহরের চাল কলের মালিকরা। তিন ধরণের ধান চাষ হতো আউশ, কর্ত্তিকা আর বড় ধান (আমন) আউশ ধান ছিল দুরকমের লাল আর সাদা, কার্ত্তিকা ৪ রকমের (নয়ন কলমা) সবদাই শাল, কাশিফুল আর নবীন বা বকচুড়া ; আর আমন ছিল ১৩ রকমের যার অধিকাংশই মোটা দানার। প্রায় প্রত্যেকেরই হাল গরু ছিল। নদী গ্রামের পাশে থাকলেও তার জলে মাত্র ১০ বিঘা চাষ হতো। পুকুরের জলে আরও ৫ বিঘা। জমিদারের হাতে দুটি ছিল কিন্তু তা মজে গিয়েছিলো। তা সারিয়ে নিকাশি ব্যবস্থার প্রচেষ্টার কোন হেলদোল ছিল না। চাষ ছাড়াও খেজুর গাছের রস ও তার গুড় থেকেও কিছুটা আয় হতো।

গ্রামে মজুররা বা কৃষি শ্রমিকরা গ্রাম ছাড়াও গ্রামের বাইরে খাটতে যেতেন। মজুরী ছিল দিনে আট আনা করে। যা দশ বছর আগেও ছিল তিন আনা মাত্র। এই মজুরীর হার বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বলা হয়েছে বোলপুর শহরে ধান কলে অনেকেই কাজ করতে চলে যেতেন আর সেখানে কৃষি মজুরের থেকে হার বেশী ছিল। দেখা যাচ্ছে গ্রামের মোট লোকসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৭ জন শুধু তাঁদের শ্রমের ওপর নির্ভর করতেন। কিন্তু কাজের অকুলান ছিল খুবই। মাসে ৪-৫ দিন ছাড়া কাজ জুটতোনা। চালের দাম ছিল সের প্রতি ৩ আনার কাছাকাছি। এঁদের সবারই বাড়িতে গৃহপালিত জন্তু যেমন ছাগল, গরু, শুয়োর, হাঁস , মুরগি ইত্যাদি ছিল।

গ্রামের ২৪টি পরিবারের মধ্যে ২৩টি পরিবারই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঋণ পাওয়া যেত সুরুলের জমিদার, নিকটবর্ত্তী গোয়ালপাড়া গ্রামের ভট্টাচার্য

পরিবারের কাছ থেকে বা বোলপুরের কাবুলিওয়ালাদের কাছ থেকে। সুদের পরিমাণ ছিল ১২-৩০ শতাংশ কিন্তু কাবুলিওয়ালাকে দিতে হতো ১৫০-১৭৫ শতাংশ হারে। কাবুলীরা ধার দিতেন বিনা বন্ধকীতে অন্যরা জমি বা অন্য কিছু বন্ধকীর বিনিময়ে। মজার কথা উচ্চ বর্ণের সমস্ত পরিবার কিন্তু নিম্ন বর্ণের একটি পরিবার ছাড়া সবাই ঋণগ্রস্থ ছিলেন। তবে যে দুটি পরিবারের আয় ব্যয় হিসেব দেওয়া হয়েছে (৬ জন সদস্য) তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ৩০ বিঘা জমির মালিক ব্রাহ্মণ পরিবার ঋণ করেছেন তাতে তাঁদের বছরে ৭২ টাকা মতন উদ্বৃত্ত থাকলেও তাঁরা বিয়ের খরচের জন্য ৫০০ টাকা ঋণ করেছেন। অন্যদিকে ৪ জন সদস্যের একটি নিম্ন বর্ণের পরিবার যাঁর নিজস্ব জমির পরিমাণ ২৫ কাঠা মাত্র ও ভাগ চাষে ২ বিঘা চাষ করেন তাঁর কোন উদ্বৃত্তই নেই তিনি ১৫ মণ চাল (যার মূল্য ছিল ৬০ টাকা) এবং নগদে ১ টাকা ১১ আনা ঋণ করেছেন। অতএব ঋণগ্রস্তদের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য ছিল তা খুব সহজে বোঝা যাচ্ছে।

গ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। আগে টোল ছিল ১৯২৫ এর সমীক্ষার সময় তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গ্রামে সই করতে জানেন বা শিক্ষিত ছিলেন তার সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩। এদের মধ্যে দুজন মহিলা (উচ্চ বর্ণের) যাঁরা নাম সই করতে পারতেন। দুটি ছেলে দুমাইল দূরে সুরুল গ্রামে লেখাপড়া করতে যেতো। নিম্ন বর্ণের কেউ লেখাপড়া বা স্বাক্ষর ছিল না। নিজেদের আত্মীয় ছাড়া দূরে কোথাও গ্রামবাসীরা যেতেন না। শুধু শিক্ষিত কজন রোজগারের জন্য নয় বাইরে থাকতেন নয় গ্রাম থেকে যাতায়াত করতেন। শেষোক্তোর মধ্যে একজন বোলপুরের কাছে বাঁধগড়া গ্রামে দোকানে কাজ করতেন। একজন জমিদারের শেরেস্তাদারে কাজ করতেন, একজন তালতলা গ্রামের জমিদারের বাড়ীতে গৃহশিক্ষকতা করতেন।

গ্রামের সে সময়কার সামাজিক অবস্থা বর্ণণা হেমন্ত কুমার সরকার তাঁর অনুকরণীয় ভাষায় করে গেছেন এইভাবে ঃ বদ্ধ জলে পোকা জন্মে ইহা সকলেরই জানা কথা। মদ, গাঁজা ও দুর্নীতি সবগুলি মিলিয়া সর্বপ্রকার আলো বর্জিত এই পল্লীর আঁধারে কিলবিল করিত। ঝগড়া-ঝাটি একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। বাস্তবিক পক্ষে কলহের কচকচানিতেই গ্রামের লোকে খানিকটা সজীব হইয়া উঠিতেন এবং তখনই দেখা যাইত তাঁহাদের স্তিমিতপ্রায় প্রাণপ্রদীপের ধোঁয়াটে রঙিন আভা। জমিদারের গোমস্তা ছিলেন গ্রামের রাজা। তাঁহার হস্তে গ্রামের গরীব দুঃখী লোক যে কতপ্রকারের নির্যাতন সহ্য করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই (উদীচী, পৃ ৮৯, ১৩৮৬)।

উঁচু ও নীচু জাতের মধ্যে ভেদাভেদ যথেষ্টই ছিল। কিন্তু নিম্ন বর্ণের

লোকেরা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ ও খোলামন নিয়ে লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। তবে উঁচু জাতের সঙ্গে কথা বলার সময় ভয়ে ভয়ে থাকতেন। সামাজিক অন্যায় (social injustice) এর ফলে পৌরুষতা তাদের মধ্যে একেবারে শেষ হয়ে গেছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে নারী পুরুষ সকলেই মদ খেতেন। মেয়েদের বাল্য বিবাহ যা ৩ থেকে ১৩ বয়সের মধ্যে হয়ে যেত। ছেলেদের ১৬ থেকে ২৩ এর মধ্যে। সাঙা বিবাহ বা প্রথম স্বামীকে ছেড়ে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের চল ছিল। এঁদের মধ্যে বিধবা বিবাহেরও প্রচলন ছিল। গ্রামের দেবতা ছিলেন ধর্ম ঠাকুর। কার্ত্তিক মাসে সবাই মিলে কালী পূজো করা হতো।

১৯২৫ সালের পর ১৯৭৫ সালে পুনরায় বল্লভপুর গ্রামে সমীক্ষা করা হয়। কিন্তু এর অন্তবর্তী সময়ে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে যায় যার প্রতিফলন গ্রামের সমাজ জীবনে কিভাবে পড়ে তার তথ্য নেই। ঘটনাগুলির মধ্যে একটি অবশ্যই বল্লভপুর গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিপ্লবী শ্রী সুষেন ঘোষের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা শিল্প কেন্দ্র আমার কুটির। আমার কুটির শুধু শিল্পর কেন্দ্র ছিল না ছিল স্বাধীনতা আন্দোলন ও বিপ্লবী কাজের সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু। আমার কুটিরকে কেন্দ্র করে প্রায় ৩০ টি পরিবার বাইরে থেকে বাস করতে আসেন এখানে, আর ঘটেছিল একাদিক্রমে খরা (১৯২৩, ১৯২৭, ১৯৩৪, ১৯৩৫, ১৯৪০ ও ১৯৪৩) ও বন্যা (১৯৩৬, ১৯৩৯ ও ১৯৪২)। এরফলে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা একদিকে যেমন দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি কৃষি মজুরীও কমতে থাকে দ্রুত হারে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি যা সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। দ্বিতীয় ঘটনা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জমিদারি প্রথার বিলোপ ও তার পরবর্তীকালে কৃষি এলাকার সম্প্রসারণ।

এর সবগুলি বল্লভপুরের কতটা প্রভাব ফেলেছিল তা বলা কঠিন। তবে বল্লভপুর কালে কালে স্ফীত হয়েছে। লোক সংখ্যা যেখানে আগে ছিল ৮৪ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭১ এ। গ্রামের এলাকাও বেড়েছে। আগে দক্ষিণ পশ্চিমাংশে কেউ বাস করত না। এখন সেখানে অনেক পরিবার বাস করেন। দেশ বিভাগের ঢেউও লেগেছে বল্লভপুরে। ১৬টি উদ্বাস্তু পরিবার গ্রামে বসবাস করেন। বিহার থেকে কাজের সন্ধানে এসে এখানে পাকাপাকিভাবে ৯টি পরিবার বাস করেন। আগে মাত্র ৮টি জাতির বাস ছিল। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ তে। কৃষি জমির পরিমাণ ৪৭৫ বিঘার থেকে বেড়ে হয়েছে ১৮১৫ বিঘা।

ষাটের দশকে ময়ূরাক্ষী ক্যানেল বল্লভপুরের পূর্বদিকে খনন করা হয়। আগে যেখানে মাত্র ১৫ বিঘা জমিতে সেচ দেওয়া যেত সেখানে এখন ৫৬২ বিঘা জমি সেচ সেবিত। আঁখ আর আলুর চাষ অনেক কমে গেছে। তার জায়গায় গম

চাষের প্রবণতা লক্ষ করার মতো। এছাড়া সরষে, তিল, তিসি, ছোলা ও কলাইয়ের চাষও হয়। এরসঙ্গে নানারকম শাক সবজি। পুরানো অনেকজাতের ধান চাষ এখন আর হয়না। তার জায়গায় নতুন জাতের ধান চাষ হয়। ফলনও বেড়েছে। আগে যেখানে বিঘা প্রতি ৫ মণ ধান পাওয়া যেত সেখানে এখন দ্বিগুণ ধান পাওয়া যায়। গাঁতো প্রথা এখনও বিদ্যমান কিন্তু পারস্পরিক সহযোগিতা কমে গেছে। আগে মামলা মোকদ্দমা ছিলনা। এখন তা লক্ষণীয়ভাবে শুরু হয়েছে। ফৌজদারী ও দেওয়ানি দুই মামলাই আছে। বিবাদে জমিদারির সালিশি আর নেই। গ্রামের সমবায় সমিতি তার জায়গা নিয়েছে কিন্তু তা অবিসংবাদিত নয়। মোট ৪৮.৭২% পরিবারের জমি নেই। মজুরী বেড়েছে কিন্তু অন্যান্য জিনিষের দাম আরও বেশী বাড়ায় দারিদ্র বেড়েছে বই কমেনি। সমীক্ষকদের কথায়, 'সাধারণভাবে গোটা বল্লভপুর পাড়ারই এই চিত্র। মানুষের কর্মশক্তি কমেছে, দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে সমাজ। সবার মুখে এক কথা, সংসার চালানো দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। (কুলদারঞ্জন বিশ্বাস ও শৈলেশ দাশগুপ্ত, পল্লীপরিক্ষণ : বল্লভপুর ১৯৭৫) তবে ১৯২৫ সালে যেমন ২৪টি পরিবারের মধ্যে ২৩টি পরিবার ঋণগ্রস্ত ১৯৭৫ সালে তা কমে গিয়ে ৬১.৫৩% দাঁড়িয়েছে (৭৮টি পরিবারের মধ্যে ৪৮টি পরিবার)। ঋণী পরিবারগুলির শতকরা ৩২.০৫ চাষী মজুর আর বাদবাকিদের মধ্যে ব্যবসায়ী, চাকুরে উচ্চবর্ণের পরিবার সব আছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই গ্রামেও একশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে যাঁদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল। অনেকের ব্যবসা বা চাকুরি ও চাষ দুই আছে। সমীক্ষার পরিশিষ্টে ১৯২৫ সালের নাপিত পরিবারের জীবিত কর্ত্তার সাক্ষাত দেওয়া আছে। তাঁর অভিজ্ঞতায় গ্রামের সাহা পরিবার রমরমা ব্যবসা (মদের ও মুদির দোকান) করে আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো করে নিয়েছেন।

গ্রামে আর একটি লক্ষণীয় অগ্রগতি হয়েছে, সেটি হলো শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে। বিশ্বভারতীর তত্ত্বাবধানে ১৯২৬ সালে স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি গঠিত হয়। সমিতির ও বিশ্বভারতীর কর্মী, বিশেষতঃ শ্রী হেমন্ত কুমার সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমেছে। সমিতি গ্রামের ব্যবহারের জন্য কূঁয়ো করে দিয়েছে। সরকারী ব্যবস্থায় টিউবকল হয়েছে। অনেকে নিজেদের বাড়ীতেই পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছেন। শতকরা ৬০.২৬..জনের আলাদা রান্না ঘর আছে। ২৪.৩৬ শতাংশের নিজস্ব পায়খানা আছে। ১৯২৫ তুলনায় স্বাস্থ্য সচেতনা যে বেড়েছে এর থেকে বোঝা যাচ্ছে।

১৯৭৫ সালের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে শতকরা ৪৭.৭৮ জন নিরক্ষর ছিলেন। গ্রামেতেই প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি লাইব্রেরী আছে। অনেকেই

তার গণ্ডি পেরিয়ে বোলপুর, বিশ্বভারতীতে পড়তে যাচ্ছেন। নীচু জাতিদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করাদের মধ্যে ৩ জন নীচু জাতের। সাক্ষরদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেশী। ১৯৭৫ সালেও দেখা যাচ্ছে জাতপাতের প্রভেদ আছে। তবে উঁচু জাতের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে যে ভয়ভক্তি ছিল তা অনেক কমে গেছে। মহাজনি প্রথা তখনও বিদ্যমান। তবে সরকারি সংস্থা, সমবায় ব্যাঙ্ক, সমিতির কাছ থেকে ঋণ করা অনেক বেড়ে গেছে। বিশ্বভারতী একটি ধানের ধর্মগোলা স্থাপন করেছিল যার ফলে গরীব মানুষের অনেক সুবিধে হয়েছে। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে বাল্য বিবাহ উঠে গেছে। ১৫ বছরের নীচে, একটি ক্ষেত্র ছাড়া, আর কোন মেয়ের বিয়ে হয়নি।

আমাদের এই পরিক্রমা ৫০ বছরের এক অতি ক্ষুদ্র সীমাতে থেমে গেলেও বল্লভপুরের পথ চলা যে থেমে থাকেনি তা বলাই বাহুল্য। কালক্রমে আরও অনেক পরিবর্তন যে হয়েছে তা অনস্বীকার্য্য। তার মধ্যে প্রধানতমঃ পরিবর্ত্তন আর্থিক ক্ষেত্রে ঘটলেও সামাজিক ক্ষেত্রেও কম নয়। আমার কুটিরের শিল্প জগতসভায় খুব ক্ষুদ্র হলেও, স্থান করে দিয়েছে। ইঁট ভাটা হয়েছে, একটি কার্ড বোর্ড তৈরীর কারখানা, পসরা সাজিয়ে দোকানের ভীড় বেড়েছে। যে জনপদ সৃষ্টি হয়েছিল চীপ সাহেবের ব্যবসা ও এলাকার কৃষি প্রসারের মধ্যে দিয়ে তা একদিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রাণের অবসম্ভাবী কারণে তার বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। তার স্বরূপ কেমন হয়ে উঠল তাই বড় প্রশ্ন। এর উত্তর সোজা নয়। আর্থিক কাঠামোর পারদ ওঠানামার ফলে জীবনধারা পাল্টায়। বল্লভপুরে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাল্টেছে কৃষি উৎপাদন সম্পর্কিত সামাজিক সম্বন্ধ। জমিদার প্রথা, ভোগদখলি স্বত্ব গেছে, ব্যক্তিগত মালিকানা এসেছে, স্থান নিয়েছে জোতদার ও পরে বাজার নির্ভর সামাজিক ব্যবস্থা। শিক্ষিতের হার বেড়েছে, মহামারীর করাল গ্রাস দূরে সরে গেছে, স্বাস্থ্যের হাল একটু ভালো হয়েছে। কিন্তু পারস্পরিক বিদ্বেষ ও সহযোগিতায় অনীহা বেড়েছে। তবু সমবায় সংস্থা গঠিত হয়েছে এবং তা ম্রিয়মানও হয়েছে। বল্লভপুর ইতিহাসকে একথা বলতেই পারে —শতবাধা সত্বেও মানুষের সহজাত সখ্যতাকে কাজে লাগিয়ে মরু স্রোতের থেকে বেরিয়ে এসে সহযোগিতার ফল্গুধারাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।

গ্রন্থসূচীঃ

(১) কালীমোহন ঘোষ Rural Survey : Ballavpur, Visva-Bharati, ১৯২৬।

(২) কুলদা রঞ্জন বিশ্বাস ও শৈলেশ দাশগুপ্ত, পল্লী পরিক্ষণ : বল্লভপুর ১৯৭৫, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সিটিউট, কোলকাতা (অমুদ্রিত, Mimeographed)

(৩) হেমন্ত কুমার সরকার, রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংস্কারের আদর্শ, Visva-Bharati News, 1979.

৪। হেমন্ত কুমার সরকার, শ্রীনিকেতনে আমার গ্রাম সেবা : বল্লভপুর, উদীচী ১৩৮৬ ও ৮৮ (পৃ-৮৭-৯৬ ও আষাঢ় ৮৩-৯৮)।

বীরভূমের জনবিন্যাসের চালচিত্র

দী ক্ষি ত সিং হ

কথারম্ভ

কৃষি নির্ভর বীরভূম জেলার জনবিন্যাসের ওপর ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের জাল উনিশ শতকের শেষভাগে বিস্তৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব কৃশি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই পড়তে থাকে। বলতে গেলে নিদারুণ ভাবেই তা বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক, রুক্ষ অপেক্ষাকৃত কম উর্ব্বর এই অঞ্চল কৃষিকে আঁকড়ে থেকেছে। দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের যেটুকু বিস্তার হচ্ছিল তা প্রায় আরম্ভ হয়েই শেষ হয়ে গেছে। স্বাস্থ্যকর স্থান বলে চিহ্নিত এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রভাবে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে। এখানে যেমন প্রধানতঃ হিন্দুদের বাস তেমনি জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতি। ভৌগোলিক চরিত্রের প্রকারভেদ আর্থিক কাঠামো, স্বাস্থ্যের পরিমণ্ডল যেমন আর্থ সামাজিক অবস্থার হেরফের ঘটিয়েছে তেমনি তা জনগোষ্ঠীর প্রকারভেদে তার বিন্যাসও সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির ওপর প্রভাব ফেলেছে।

জনসংখ্যার ওঠানামা

বীরভূমের বর্তমান ভৌগলিক সীমানা ১৮৭৯ সালের পর থেকে পরিবর্তিত হয়নি। বীরভূমের জনসংখ্যার সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ওম্যালি (Birbhum District Gazetters : Birbhum 1910) ১৮৭২ থেকে ১৮৮১ প্রায় ৬০,০০০ লোক কমে যায়। ১৮৯১ সালে যদিও জনসংখ্যা কিছুটা বাড়ে কিন্তু জেলার দক্ষিণে জনসংখ্যা প্রায় চার শতাংশ কমে যায়। এই কমা বাড়ার প্রক্রিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর বেশ বড় সময় ধরে চলতে থাকে। ১৮৭২ - ১৮৯১ সময়ের জনহ্রাসের কারণ জেলায় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ যার প্রচলিত নাম ছিল বর্ধমান জ্বর। তার প্রকোপ চলতেই থাকে।

ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ ছাড়াও জেলার জনসংখ্যার ওপর খরা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদির ফলে মাঝে মাঝেই জেলায় দুর্ভিক্ষ বা দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা হয়েছে। এই অবস্থা ১৭৭০ সাল থেকেই চলতে থাকে। ১৭৯১, ১৮৬৫ - ৬৭, ১৮৭৪, ১৮৮৫ সালে খরাজনিত দুর্ভিক্ষের ফলে জেলায় অকাল মৃত্যু লেগেই থাকতো। এরপরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে জেলার অধিবাসীদের জীবনীশক্তি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত বীরভূম জেলার জনসংখ্যা হয় কমে গেছে বা বাড়লেও তা অত্যন্ত ধীরগতিতে বেড়েছে। নীচের সারণিতে ১৮৭২ সাল থেকে জনসংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি ধারা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা দেওয়া হলোঃ

সারণি ১ ঃ বীরভূমে জনসংখ্যার হ্রাস / বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি

ক্রমিক সংখ্যা	জনগণনার বছর	মোট জনসংখ্যা	মোট সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি	দশকে হ্রাস/বৃদ্ধি (শতাংশ)
১	১৮৭২	৮,৫৩,৭৮৫		
২	১৮৮১	৭,৯২,০৩১	-৫৯,১৯২	-৬.৯৫
৩	১৮৯১	৭৯৮,২৫৪	৬,২২৩	০.৭৮
৪	১৯০১	৯০৬,৮৯১	১০৮,৬৩৭	১৩.৬
৫	১৯১১	৯৪০,১৬০	৩৩,২৭১	৩.৬৭
৬	১৯২১	৮৫১,৭২৫	-৮৮,৪৩৫	-৯.৪১
৭	১৯৩১	৯৪৭,৫৫৪	৯৫,৮২৯	+ ১১,২৫
৮	১৯৪১	১,০৪৮,৩১৭	+১,০০,৭৬০	১০.৬৩
৯	১৯৫১	১,০৬৬,৮৯৯	১৮,৫২৭	১.৭৭
১০	১৯৬১	১,৪৪৬,১৫৮	+৩,৭৯,২৬৯	৩৫.৫৫
১১	১৯৭১	১,৭৭৫,৯০৯	+৩,২৯,৭৫১	১৮.৫৬
১২	১৯৮১	২,০৯৫,৮২৯	+৩,১৯,৯২০	১৫.২৬
১৩	১৯৯১	২,৫৫৫,৬৬৪	+৪,৫৯,৮৩৫	২১.৯৪

সারণির (১) থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ১৯৬১ সালে বীরভূমের জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয় (৩৫.৫৫%) ১৯৬১ সালে এই বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দুর্গাদাস মজুমদার (D. Mazumdar W.B. District Gazetters : Birbhum 1975) বলেছিলেন যেহেতু বীরভূম একটি কৃষি প্রধান জেলা সেইহেতু কৃষি ব্যবস্থা, বিশেষতঃ ফসলের উত্থান পতনের সঙ্গে এটি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। অশোক মিত্র যিনি ১৯৫১ সালের ভারতের জনগণনার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ছিলেন এবং ১৯৬১ সালের জনগণনার আধিকারিক দুজনেই বীরভূমকে 'little

jack harner of a district' বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এখানকার লোকেরা বেশীরভাগই ঘরকুনো, বাইরে খুব একটা যাননা। এমনকি এই জেলার থেকে বিয়ের ফলেও মেয়েরা খুব একটা বাইরে যায়নি। কাজের খোঁজে আশে পাশের জেলা বর্দ্ধমান বা মুর্শিদাবাদে যারা গিয়েছেন তাঁদের সংখ্যাও নগণ্য। অশোক মিত্র দেখিয়েছেন যে কোলকাতা কাজ পাবার জন্য অন্যান্য জেলার থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুব তীব্র সেখানে বীরভূম থেকে ১৯৫১ সালে গণনায় দেখা গেছে মাত্র ৭৭০৮ জন গেছেন (পুরুষ - ৫০২০, মহিলা - ২৬৮৮)। ১৯৫১-৬১ সালের জনসংখ্যার বৃদ্ধি জেলার বাইরে থেকে আগমনের ফলেও ঘটতে পারে। এই দশকে দেখা যাচ্ছে জেলার বাইরে থেকে ৭০,০৪২ জন ব্যক্তি এসেছেন যার অধিকাংশ মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান থেকে। ফলে এই বৃদ্ধির অধিকাংশই কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি, প্রধানতঃ ময়ূরাক্ষী সেচ ব্যবস্থার ফলে ধান উৎপাদনের হার বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে যুক্ত বলেই মনে করা হয়েছে। ১৯৬১ সালে যেখানে সদর সাব ডিভিসনের বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত বোলপুর, নানুর সাঁইথিয়া অঞ্চল যা অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর লোকসংখ্যার বৃদ্ধি সেখানে অনেক বেশী কিন্তু রামপুরহাট মহম্মদবাজার অঞ্চলে ততটা নয়।

বীরভূমের জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি বা হ্রাস জেলার সব জায়গায় সমানভাবে হয়নি। ১৮৮১ - ১৮৯১ দশকে যখন সদর থানায় জনসংখ্যা দেখা যাচ্ছে প্রায় ৪ শতাংশ হারে কমে গেছে কারণ বর্দ্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানা সংলগ্ন বোলপুর ও সাকুলি অঞ্চল ম্যালেরিয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে রামপুরহাট থানা এলাকায় জনসংখ্যা ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮৯১, ১৮৯৫, ও ১৮৯৬ সালে যদিও জেলার ফসল উৎপাদন কম হয় কিন্তু ১৮৯১ - ১৯০১ দশকে মহামারীর তাণ্ডব অনেকটাই কমে যায় যদিও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে মাঝে মাঝে কলেরার প্রকোপ যথেষ্ট ছিল। সারণি (২) এ বীরভূমের ১৯০১-৩০ পর্যন্ত বছরভিত্তিক জনসংখ্যা ও জন্ম ও মৃত্যুর হার দেখানো হয়েছে। কয়েকটি বিশেষ রোগ কিভাবে বীরভূমের ওপর প্রভাব ফেলেছে তাও দেওয়া হয়েছে। জ্বরের বা ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হয়েছে বেশী কিন্তু কলেরাও যথেষ্ট প্রভাব ফেলে ছিল তাও আমরা দেখতে পাচ্ছি এর থেকে। ১৮৯১-১৯২১ জেলার সাঁওতাল, কোঁড়া ও অন্যান্য আদিবাসীদের আগমন অব্যাহত থাকে। ঐ সময় রামপুরহাট, সাঁওথিয়া রেলওয়ে লাইনের কাজের জন্য বিহার থেকে জনসমাগম অব্যাহত থাকে। রামপুরহাট, সাঁইথিয়া অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবার ফলে ঐ অঞ্চলগুলি ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। কিছু চাল কলও এখানে স্থাপিত হয়। ফলে ১৯০১ - ১৯২১ দশকে এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা সদরের থেকে বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। যেখানে ঐ সময়ে সদরের লোকসংখ্যা ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল রামপুরহাটের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ছিল ২৯ শতাংশ। ঐ ধারা দেখা

যাচ্ছে ১৯২১-১৯৩১ শতকেও অব্যাহত আছে।

সারণি– ২ ঃ ১৯০১ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বীরভূম জেলায় জন্মমৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)

বছর	জনসংখ্যা	জন্ম		মৃত্যু		প্রতি হাজারে মৃতের সংখ্যা								
		সংখ্যা	অনুপাত	সংখ্যা	অনুপাত	প্লেগ	কলেরা	বসন্ত	জ্বর	পেটের সমস্যা	আমাশয় ও উদরাময়	রোগ	আঘাত	অন্য কারণ
১৯০১	৯০২,২৮০	৩৪,৪০১	৩৮.১২	২৮ ০৮৯	২৫ ৫৮	--	১.১৩	০.১১	১৭ ৮৯	০.০৮	০.১২	০.০১	০.২৩	৬.১২
১৯০২	৯০২,২৮০	৩৪,৩৬৭	৩৮ ০৮	২৪.১১৭	২৬.৭২	--	০ ৬৯	০ ০৭	১৯.৪৭	০.১৫	০.১৩	০.০১	০.২৮	৬ ০৩
১৯০৩	৯০২,২৮০	৩৩,৭২২	৩৭ ৩৭	২৪ ৮৮২	২৭.৫৭	০.০০২	০.৯	০.৫৭	১৯ ৫২	০ ১২	০.১০	০.০২	০.২৮	৬ ১৫
১৯০৪	৯০২,২৮০	৩৬.৭৬৮	৪০.৭৫	২৬ ১৫৬	২৮ ৯৮	০ ০০১	১ ৫	০ ৯৯	২০.৪২	০ ১২	০ ১১	০.০৩	০ ০২	৫.৬২
১৯০৫	৯০২,২৮০	৩০.৯১৮	৩৪ ৩৬	২৯.৮৭৬	৩৩ ১১	--	২ ৪২	০ ১২	২৫.০৫	০ ১০	০.১২	০.০১	০.০২	৪.৭৭
১৯০৬	৯০২,২৮০	২৭,৭১১	৩০ ৭১	৩৬ ০৪	৩৯.৯৪	--	৪.৬৬	০ ৩০	২৯ ৮৯	০ ১৬	০.১১	০.০২	০.২৮	৪ ৬৩
১৯০৭	৯০২,২৮০	২০,৪৯১	৩৩ ৬৯	৪৪ ৯০৯	৪৯.৭৭	--	৫ ৯৬	০.৭৯	৩৮.২৭	০ ২৩	০.১০	০ ০৪	০ ২৩	৪ ২৭
১৯০৮	৯০২,২৮০	২৫.৯৫৬	২৮ ৭৬	৪৪.১১৭	৪৮ ৮৮	--	১০ ১৭	১ ০১	৩৩ ৪৮	০ ৩৯	০.২০	০.০৬	০ ২৯	৩.৫৩
১৯০৯	৯০২,২৮০	৩১,৮৫৫	৩৫ ৩৩	২৫.০৯৭	২৮ ১৪	--	০.৭	০.৫২	২৩ ০১	০ ১৭	০ ১৫	০ ০২	০ ৩৩	৩.৪২
১৯১০	৯০২,২৮০	৩৬,০৫২	৩৯ ৯৫	৩৪.৮৭৯	২৭.৫৭	০ ০০১	০ ৬৭	০ ০৭	২২ ৬১	০ ১০	০ ১৬	০ ০৪	০.০৩	৩ ৭৪
১৯১১	৯৩৫.৪৭৩	৩৪,৬৮৭	৩৭ ৩৭	৩৭ ৪৪৯	২৯ ৩৯	--	০ ৭২	০.০৪	২৪ ০৫	০ ১২	০ ১১	০ ০৩	০ ০২	৪.০৮
১৯১২	৯৩৫.৪৭৩	৩২,১০৯	৩৪ ৩২	৩২ ২২৮	৩৪ ৫১	--	১ ০৫	০ ০৫	২৮ ৯০	০ ১৮	০ ১০	০ ০২	০ ০৩	৪ ০৬
১৯১৩	৯৩৫.৪৭৩	৩৩,৪১৯	৩৫ ৩৭	৩৩ ৮১১	৩২.৯৪	০ ০০৪	১ ২১	০ ০১	২৭ ৪৪	০ ১৬	০ ১০	০ ০২	০ ৪৩	৩ ৭২
১৯১৪	৯৩৫.৪৭৩	৩২.০৭৯	৩৪ ৬১	৪০.৭০২	৪৬.৭১	০.০০২	২ ৮৭	০.০২	৪০.২৩	০.১৯	০ ১২	০ ০২	০ ০৩	৩ ১২
১৯১৫	৯৩৫.৪৭৩	২২,৫৯৮	২৪ ১৫	৪১ ৬৪৯	৪৪ ৫২	০ ০০১	১ ৪৮	০ ৫০	৩৯ ৭০	০.২০	০ ১০	০ ০২	০ ২৯	২ ০৬
১৯১৬	৯৩৫.৪৭৩	৩১,২৭৬	৩৩ ৪৩	৩০.৭০৩	৩২.৮২	০ ০০২	১ ১০	০ ২৬	২৮ ১৭	০ ২১	০.১৩	০ ০৩	০.০১	২ ৭০
১৯১৭	৯৩৫.৪৭৩	৩৫,৪০৫	৩৭ ৮৫	২৪.৫৬৮	২৬ ২৬	--	০ ২১	০.১৮	২২ ১৩	০ ১৫	০ ০৮	০ ০১	০.০৪	৩.৩৩
১৯১৮	৯৩৫.৪৭৩	৩২,০০৮	৩৪.৬৩	৪৬ ৪১৮	৪৯ ৬৩	০.০০১	১ ৯	০ ০১	৪৩ ৪৩	০ ১৬	০.২০	০ ০৩	০ ০৩	৩ ৯৩
১৯১৯	৯৩৫.৪৭৩	২২,১৭৪	২৩ ৭৩	৫৮.২৫২	৬২ ৩৩	--	৬ ৮	০ ৩৩	৫১ ৬৩	০ ১৮	০.১০	০ ০১	০ ০৩	৩ ১৩
১৯২০	৯৩৫.৪৭৩	২৫.৮৩৬	২৭ ৬৩	৪৩ ৮৭৬	৪৩ ৭৩	--	০ ৪	০.৫০	৩৮ ৯৩	০ ১৬	০ ১১	০.১০	০.০৩	৩ ৬৩
১৯২১	৮৫১,৭২৫	২৮,০৪২	৩৩ ৪৩	৩২.৫৪৮	৩৮ ৪৩	০ ০০১	০ ৭	০ ২৩	৩২ ৩৩	০ ১৮	০ ১০	০ ৭০	০.০৩	৪.১৩
১৯২২	৮৫১,৭২৫	২৯,৯৭০	৩৫ ৪৩	২২.৪৩৬	২৬.৫৩	--	০.১	০ ১০	২১ ৭০	০ ১৯	০.১০	০.১০	০.০৩	৪ ০০
১৯২৩	৮৫১.৭২৫	৩১,৬৬২	৩৭ ৩০	২২.৯৬৯	২৭.১৩	--	০ ৫	০ ০১	২১ ৯০	০ ১৭	০ ১০	০ ১০	০.০০	৪ ১০
১৯২৪	৮৫১.৭২৫	৩১,০৭১	৩৭ ৫০	২৪ ২২১	২৮.৬৩	--	১ ৬	০ ১০	২১ ৯০	০.১৪	০ ১০	০ ২০	০ ০০	৪ ৪০
১৯২৫	৮৫১.৭২৫	৩৭,০১০	৪৩ ৭০	২১.০৭৬	২৪ ৯০	--	০ ১	০.২০	১৮ ৮০	০.১২	০ ১০	০ ১০	০.৪০	৫.১০
১৯২৬	৮৫১.৭২৫	৩৫.৪২৭	৪১ ৮০	২৪ ৭৮৮	২৯ ২০	--	০.৩	১ ২০	২২ ২০	০.১৩	০.১০	০ ১০	০.৪০	৪.৯০
১৯২৭	৮৫১.৭২৫	৩১,০৩৬	৩৬ ৬০	২৪.৬৬৩	২৯.১০	--	০ ৮	১ ৭০	২১ ৮০	০ ১৬	০ ১০	০ ১০	০.০০	৪ ৩০
১৯২৮	৮৫১.৭২৫	৩১.৭৬২	৩৭ ৫০	২৫.০৫৯	২৯ ৬০	--	২ ৪	০ ৪০	২১ ৯০	০ ১৩	০ ০০	০.৯০	০ ৫০	৩ ০০
১৯২৯	৮৫১.৭২৫	৩৫.২৯০	৪১.৬০	২১.৭০১	২৫.৬০	--	০ ৯	০.১০	১৯ ৬০	০ ১৫	০.৪০	১ ০০	০.৪০	২.৭০
১৯৩০	৯৪৭,৫৫৪	৩৪.৯০১	৪১.২০	২৪ ৩০৮	২৮ ৭০	--	০ ৮	০ ২০	২১.৪০	০ ১৪	০ ৬০	১ ৯০	০ ৪০	৩ ৫০

বীরভূম প্রধানতঃ গ্রাম কেন্দ্রিক জেলা। ১৯২১ দশকে গ্রামের বসবাসকারীর সংখ্যা ছিল ৯৮ শতাংশ ২০০১এ তা খুব একটা কমেনি, শতাংশের হিসেবে ৯১ শতাংশ। কিন্তু এই সময়ের বীরভূমের জনবিন্যাসের আর একটি লক্ষণীয় দিক হলো গ্রাম অপেক্ষা শহরের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে শহরগুলি জনসংখ্যা মোটামুটি স্থির ছিল। কিন্তু ১৯১১-১৯২১ দশকে

শহরের জনসংখ্যা দ্রুতহারে বাড়তে থাকে। তুলনামূলক বিচারে ১৯০১ সালের তুলনায় তা আড়াইগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯২১-১৯৩১ দশকে তা আবার কমে যায় কিন্তু ১৯৪১ এ আবার সাতগুণ বেড়ে যায়। এই বৃদ্ধির ধারা পরবর্তী দশকগুলিতেও বজায় থাকে। এইরকম একটি কৃষি প্রধান জেলায় শহরের লোকসংখ্যা বাড়া একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। এর কারণ মনে করা হয় শহরগুলির সঙ্গে ক্রমাগত আশেপাশের এলাকা যুক্ত হওয়ার জন্য হয়েছে। শহরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও নারী ও পুরুষের আনুপাতিক হার কমতে থাকে। অশোক মিত্রের মতে শহরের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে তার আর্থিক কাঠামোর পরিবর্তনের দিকে যদি তাকানো যায় তবে দেখা যাবে এই বৃদ্ধি অনেকটাই ভূয়ো কারণ শহরগুলির প্রথমদিকের বৃদ্ধি কুটির শিল্প ও ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে ঘটলেও ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মূলে কুঠারাঘাত করে। যেখানে গ্রাম আর শহরের আর্থিক ভিত্তি আলাদা হবার কথা সেখানে দেখা গেল শহরবাসীর অনেকেই তাঁদের আয়ের জন্য জমির ওপর নির্ভর করছেন। নগরকেন্দ্রীক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নয়। ফলে শহরের একাধারে পরিবেশের ক্রমোবনতি হয়েছে অন্যদিকে শহরের নারীর সংখ্যা ক্রমশ কমতে থেকেছে। কিন্তু ১৮৭০ এর দশকে এই অবস্থা ছিল না। লিঙ্গের অনুপাত সমান সমান ছিল কারণ পরিবারগতভাবেই অধিবাসীরা শহরের আর্থিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করতেন।

নারীপুরুষের হার

বীরভূম জেলার জনবিন্যাসের আরেকটি দিক হলো যে ১৯০১ এর জনগণনা থেকেই দেখা যাচ্ছে নারী ও পুরুষের আনুপাতিক হার প্রায় চল্লিশ বছর ধরে নারীদের দিকেই পাল্লা ভারী থেকেছে (সারণি - ৩)। ১৯০১ থেকে ১৯১১ পর্য্যন্ত নারীর সংখ্যা পুরুষের থেকে বেশী থেকেছে (প্রতি ১০০০ পুরুষে)।

সারণি - ৩ বীরভূম জেলায় প্রতি ১০০০ জন পুরুষে নারীর সংখ্যা

জনগণনার বছর	বীরভূমে মোট নারীর উপস্থিতি	গ্রামে	শহরে
১৯০১	১,০২৯	১০৩১	৮৪৮
১৯১১	১,০১৭	১০১৯	৮৬১
জনগণনার বছর	বীরভূমে মোট নারীর উপস্থিতি	গ্রামে	শহরে
১৯২১	১,০০৪	১০০৯	৮২৫
১৯৩১	১,০০৫	১০১০	৭৯৮
১৯৪১	৯৯৯	১০০৪	৮৬১
১৯৫১	৯৭৪	৯৮৪	৮৫১

১৯৬১	৯৭৩	৯৮৪	৮৪৪
১৯৭১	৯৬৭	-	-
১৯৮১	৯৬২	৯৬৫	৯২০
১৯৯১	৯৪৬	৯৪৭	৯২৬

১৯৩১-১৯৪১ দশকে তা সমান হয়ে এসেছে। কিন্তু ১৯৪১-৫১ দশকের পর থেকে জনসংখ্যায় নারীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমতে থাকে। অন্যদিকে গ্রামের তুলনায় শহরে পুরুষের সংখ্যাধিক্য যথেষ্ঠ চোখে পড়ার মতো। বীরভূমের নগরন্নোয়ন কৃষি কাঠামো ভিত্তিক হওয়ায় শহরের বৃত্তি বা পেশার টানে অনেকেই এসেছেন তাঁদের পরিবারের সদস্য ছাড়াই। ফলে জনসংখ্যার স্বাভাবিক নারী পুরুষের সংখ্যার ভারসাম্য হারিয়েছে। আর একটি দিক হলো বীরভূমের শহরগুলিতে নারীদের সংখ্যা ১৯০১ থেকে পালা করে বেড়েছে ও কমেছে। এর কারণ হয়ত জেলায় মহামারী আকারে কলেরা বা ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে তখন মেয়েরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। চিকিৎসা বা খাদ্যের অভাবে হয়ত তাঁদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেশী ছিল।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

জেলার অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে লোকসংখ্যার ঘনত্বর ওপরেও এর প্রভাব পড়েছে। সমস্ত জেলার তুলনায় সিউড়ি থানার ঘনত্ব ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। সাঁওতাল পরগণা সংলগ্ন এলাকা যেমন রাজনগর, মহম্মদবাজার অঞ্চলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে কম। ১৯০১ সালের থেকে ১৯৬১ পর্য্যন্ত সমস্ত জেলার লোকসংখ্যার ঘনত্ব ক্রমান্বয়ে বাড়েনি। কখনও কমেছে কখনও বেড়েছে। ১৯০১ সালে যেখানে প্রতি মাইলে ঘনত্ব ছিল ৫২০, ১৯১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩৯ তে। কিন্তু ১৯২১ সালে তা লক্ষ্যণীয়ভাবে কমে গেছে মাত্র ৪৮৯ তে ঠেকেছে। এরপর থেকে কৃষি অর্থনীতির কিছুটা উন্নতি হওয়ার ফলে জেলায় লোকসংখ্যার ঘনত্বও বাড়তে থাকে।

অনগ্রসর সমাজের চিত্র

বীরভূমের জনসংখ্যার বেশ একটা বড় অংশ তপশীলি জাতিরা অধিকার করে আছেন। মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয় অংশই তপশীলি জাতিভুক্ত। সমস্ত অঞ্চলেই তপশীলি জাতিদের দেখতে পাওয়া যায়, সংখ্যায় কোথাও একটু বেশী কোথাও একটু কম। নলহাটি, রাজনগর, সিউড়ি, ময়ূরেশ্বর, সাঁইথিয়া,

খয়রাশোল, নানুর ইত্যাদি অঞ্চলে এঁদের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। অন্যদিকে বোলপুর, শান্তিনিকেতন, সিউড়ি, রামপুরহাট, ইলামবাজার, রাজনগর, ময়ূরেশ্বর ইত্যাদি অঞ্চলে তপশীলি উপজাতি বিশেষতঃ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। তপশীলি জাতিদের মধ্যে বাগদির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী, তারপরে বায়েন, মাল, বাউরি, ডোম, কোনাই, হাঁড়ি, শুঁড়ি ইত্যাদি প্রায় পঞ্চাশটি তপশীলি জাতি বিভিন্ন সময়ের লোকগণনার সময়ে নথিভুক্ত হয়েছেন। এঁদের অনেকেই জেলার বাইরে থেকে এসেছেন, প্রধানতঃ কাজের সন্ধানে। আবার জেলাতে কয়েকটি তপশীলি জাতি আছেন যাঁদের নাম এই তালিকায় নেই। এখানে এর কারণ আলোচনা করার অবকাশও নেই। কয়েকটি বিশেষ

সারণির-৪ ঃ বীরভূম জেলার কয়েকটি বিশেষ তপশীলিজাতির ও উপজাতির জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি

ক্রমিক নং	জাতির নাম	বছর ভিত্তিক জনসংখ্যা ১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৯১
১।	বাগদী	৮৮,৩৪২	৮৭,৫৪৮	৭২.৯৬৭	৮৭.৫১৯	৬০,১০৫	৮৭,৪০৭	১,০১,৩৮৯	১,৯২,৪৮৬
২।	বায়েন	৪১,২৮২	৪২,৪৩১	৩৭,৩১৭	৪৫,৩৯৫	৪০,৩৯৭	৪৪,৩৮৪	৫৬,৬৮৮	১,২৩,২৫৬
৩।	মাল	৩৮,৬৯৭	৪২,৬৩১	৩৬,৬৯০	৪০,৯৯৯	৩৭,৪৮৬	৩৯,৬৪১	৫০,৩৮৯	৯,১৯৭
৪।	বাউরী	৩৬,২৩৫	৩৬,৮৫৫	৩৪,৭৩৪	৩৬,৯৯৮	৩৭.৭৯৭	৩৫,৯০৬	৪১,১৯৩	৭১,৬৪০
৫।	ডোম	৪০,৬৬৬	৩৮,৭৭৯	৩৫,০৪৬	৩৬.২৭৮	৩২,২৩২	৩০,৬৮৩	৩৮,৮৫২	৬২,৫৯১
৬।	কোনাই	১৫,৫০০	-	১৫,৩০০	১৪,৩৮৭	১৪,৩৯৪	১৪,৬৭২	১৭,৭৬৭	৫৬,০৭২
৭।	সুনরি	১৬,৯৪৮	১৫,৮৫৯	১৩,২৬৯	১৪,২২৬	১১,২৮৪	৪,৪৯৩	১৪,২১১	৩৫,৮১৪
৮।	হাঁড়ি	২৭,৬৩৪	২৪,৬০১	২০,৮৯৬	২২.৩২১	১৬,৭১৪	১৫,৫৩৬	১৬,৪৪০	৩৪,৬৭৫
৯।	পৌন্ডরা/পোদ	-	৩৫	২	৭,০১৯	১,৮৫৪	৫,১৮৮	৮,০৪১	২১.৭২৮
১০।	নমঃশুদ্র	১,৮৩৯	১,৬০২	১,৪৫১	১,৬৮৭	১,২২৬	২,৫৬৮	৬,৮২২	১৪,২৪২
১১।	রাজবংশী	-	৩৬৯	১,২৯২	৪,৩৫২	৪,৩৭৭	৪.২৬৫	৪,৬১৭	১৩,৩৭৬
১২।	লোহার	১১,৫০২	১,৯৪০	২,২২৯	২,৯০৯	৩,৩৩০	৩,২৭৭	২,৪২৮	১১,৪৭৮
১৩।	ভূঁইমালি	৫৪১	২,১৮৯	২,১২৮	২,২৭৩	৩,১৮২	৩,৪৩৪	৩.৯০৫	৮,১৬০
১৪।	কৈর্বত্য	২,৭৬২	৯৬১	২,৬৩৩	৬৯৭	৫,৪৬২	৫,৮৩৬	-	৭,৪১৭
১৫।	ধোবা	২,১৯৬	১,৯৬০	১,৫৫৬	১,৭৬২	১,৭১৫	১,২৮৫	-	-
১৬।	সাঁওতাল	৪৭,২২১	৫৬,০৮৭	৫৭,১৮০	৬৪,০৭৯	৬০,৯২০	৭৮.৪৪০	৯৩,৪২৬	১৭,৭৫০

সূত্রঃ বিভিন্ন সেনসাস থেকে

১৯৭১ ও ১৯৮১ দশকে জাতিভিত্তিক সংখ্যা পাওয়া যায়নি।

তপশীলি জাতি উপজাতির জনসংখ্যা কিভাবে বিভিন্ন সময়ের জনগণনায় ধরা পড়েছে তা সারণি ৪ তে দেখানো হয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে এই জনগোষ্ঠী বীরভূমের জ্বর জ্বালায় অন্যান্যদের মতোই আক্রান্ত হয়েছেন কিন্ত ষাটের দশকে পৌঁছতে এঁদের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে (উচ্চ বর্ণের সঙ্গে) ততটা বাড়েনি। কালীমোহন ঘোষের ১৯২৬-৩০ সালের মধ্যে শান্তিনিকেতনের

পার্শ্ববর্ত্তী বল্লভপুর, রায়পুর ও সুপুর গ্রামের সমীক্ষা পাওয়া যাচ্ছে। তবে সামগ্রিক বিচারে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অন্য চিত্র দেখেছি। রায় বাহাদুর বিজয় বিহারী মুখার্জী তাঁর Final Report on the Survey and Settlement operations in the District of Birbhum : 1924-1932 দেখিয়েছেন বীরভূমের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার জাতিগতভাবে ১৮৭২-১৯৩১ সমান ছিল না (পৃ ১৩-১৪)। উচ্চ জাতিদের মধ্যে এই সময়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ১৬ % যা নিম্নবর্ণের তুলনায় অনেক কম। আবার উচ্চ বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণদের বৃদ্ধির হার মাত্র ৯% কিন্তু কায়স্থদের মধ্যে তা ৪৯%। মধ্য বর্ণের হার সাধারণভাবে কমে গেছে শুধু তেলী এবং গন্ধ বণিকরা এর ব্যতিক্রম। অন্যদিকে ঐ একই সময়ে নিম্নবর্ণের জনসংখ্যার (১৮৭২ তুলনায় ১৯৩১ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৭৫ শতাংশ। আবার সাঁওতালদের জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে ৮২১.৪৭% (১৮৭২ এ ছিল ৬,৯৫৪ তা ১৯৩১ সালে হয়েছে বীরভূমে সাঁওতাল জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৪,০৭৯)। কালীমোহন ঘোষের সমীক্ষা বোলপুর অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী হওয়ায় খুব সম্ভবত অপেক্ষাকৃত গরীব নিম্নবর্ণের পরিবার জনসংখ্যার বিচারে কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অন্যদিকে বীরভূমের অন্যান্য অঞ্চলে নিম্নবর্ণের লোকেরা ততটা মহামারীতে প্রভাবিত হননি। ফলে সামগ্রিক বিচারে ও নিম্নবর্ণের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অপেক্ষাকৃতভাবে বেড়েছে। অন্যদিকে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধি এ সময়ে আবাদ যে সমস্ত অঞ্চলে কম বা কৃষি মজুরের চাহিদা ছিল সেইসব অঞ্চলে নতুন বসতি স্থাপন করার ফলে হয়েছে বলে মনে হয়।

কথাশেষ

উনিশ শতকের শেষে বা বিংশ শতকের প্রথম বীরভূমের জনসংখ্যার ওপর যে প্রভাব পড়েছিল তা ষাটের দশকের থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। জনসংখ্যারও তার বিন্যাসের ওপরে নতুন যুগের নতুন প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ইতিহাস তার প্রভাব জনবিন্যাসে রেখে গেছে তা ওপরের আলোচনাতে দেখেছি। অশোক মিত্র তাঁর ১৯৫১ সালের জনগণনা গ্রন্থে বীরভূমের জনসংখ্যার সম্বন্ধে আলোচনা করতে বলেছিলেন এই জেলার জনগোষ্ঠি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যেসব ঘটনা ঘটে তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। কেমন যেন জীবনিশক্তিহীন অবস্থা। এই চরিত্রায়ণ কতটা কালজয়ী হবে তা আগামী দিনই বলতে পারবে।

তথ্যসূত্র

1) Rai B. B. Mukherjee, Bahadur, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum, 1937.

2) Ashok Mitra : Census Report : Birbhum District Govt. of West Bengal.

3) D. Mazumdar : West Bengal District Gazetteers : Birbhum Govt. of West Bengal, Calcutta, 1975.

সাঁওতাল অভ্যুত্থান ও তার মূল্যায়ন

অরুণ চৌধুরী

সাঁওতাল অভ্যুত্থান বা হুলের ১৫০তম বার্ষিকী রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকার ভারতের কৃষক সংগ্রামের ঐ অবিস্মরণীয় অধ্যায়কে স্মরণ করার জন্য এক উদ্‌যাপন কমিটিও গঠন করেছে। তার পরিকল্পনা অনুসারে বীরভূম জেলার তুম্বুনিতে গত ৩০শে জুন ও ১লা জুলাই দুদিন ধরে নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে হুলের ১৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সূচনা করা হয়েছে। ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য ভগনাডিহি থেকে এক জাঠা এসেছিল অনুষ্ঠান স্থলে। এসেছিলেন হুলের অন্যতম নায়ক সিধো মুর্মুর পঞ্চম উত্তর পুরুষের কয়েকজন। সরকারী উদ্যোগে গঠিত দেড়শততম হুল বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি আগামী বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় হুল-কে স্মরণ করা এবং তার সম্পর্কে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হুলের চিত্রায়ন নিয়ে প্রদর্শনী প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ঐ উদ্‌যাপন কমিটি হুল-এর ইতিহাস সংক্রান্ত সরকারী ও বেসরকারী নথিপত্র প্রকাশের বিষয়েও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ঐ সম্পর্কে বিদেশ থেকেও কিছু মাইক্রো ফিল্ম আনা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পি ও বোডিং (১৮৬৫-১৯৩৮) সাঁওতালী সমাজ, সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের তথ্য সংগ্রহ, অভিধান রচনা, ঐ সমাজের সাথে বিভিন্ন বিষয়ের চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদান রেখে গিয়েছেন। তাঁর সংগৃহীত বহু মূল্যবান সম্পদ ও ঐ সম্পর্কিত নোট অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। হুল সম্পর্কিত বিবরণও তার মধ্যে রয়েছে বলে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সাঁওতালী ভাষার গবেষক এন্ডারসনের কাছ থেকে শুনেছি। তাঁর সহায়তায় ঐ সম্পর্কিত তথ্যাবলীর মাইক্রো ফিল্ম পাওয়া গিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, ঐ মাইক্রো ফিল্ম থেকে হুল সম্পর্কিত আরও তথ্যাবলী আমরা পাব।

ঐ বিষয় উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে

আরম্ভ করে সমগ্র শতাব্দীব্যাপী সাঁওতাল উপজাতির সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ--বিরোধী গৌরবময় সংগ্রামের সব তথ্য এখনও আমাদের হাতে আসেনি। কাজেই ঐসব তথ্য সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা ও তার আবশ্যিকতা এখনও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

হুলের দেড়শততম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য রাজ্য সরকার ছাড়াও আরও বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা উদ্যোগী হয়েছে। যেমন, এশিয়াটিক সোসাইটির তরফ থেকে এরই মধ্যে একটি আলোচনাসভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থা, বিশেষত পঞ্চায়েত সংস্থা ও সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে হুল বার্ষিকী উদ্‌যাপনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিবেশী বাংলা দেশেও 'একটি বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগে হুল বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। ঐ সংস্থার এক প্রতিনিধিদল গত ৩০শে জুন ভগনাডিহি হয়ে তুম্বুনির অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। ঝাড়খণ্ডের কিছু বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগেও 'হুল' বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে।

তবে, সরকারী উদ্যোগে হুল বার্ষিকী এখনও পশ্চিমবাংলা ছাড়া অন্য কোথাও হয়নি। এমনকি হুলের প্রাণকেন্দ্র ঝাড়খণ্ডের বি জে পি পরিচালিত সরকার, যার মুখ্যমন্ত্রী একজন উপজাতীয়, সেখানেও সরকারী ভাবে ভারতের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের এই গৌরবময় অধ্যায়কে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। উড়িষ্যার বি জে পি এবং বিজু জনতা দলের মিলিজুলি সরকারের কাছেও সাঁওতাল অভ্যুত্থানের দেড়শততম বার্ষিকীর কোনো গুরুত্ব স্বীকৃত হয়নি। উপজাতীয়রা ঐ রাজ্যের জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আবার তাঁদের মধ্যে সাঁওতাল উপজাতির অংশও উল্লেখযোগ্য। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, পশ্চিমবাংলার বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পার্শ্ববর্তী বালাশোর ও অন্যান্য এলাকায় সাঁওতাল উপজাতির যে সব মানুষরা বাস করেন, তাঁদের পূর্বপুরুষরা হুল-এর পরবর্তী কালে জমির সন্ধানে ঐ সব এলাকাতে গিয়েছিলেন, তাঁদের উত্তরপুরুষরাই এখন ঐ রাজ্যের বাসিন্দা।

শুধু বি জে পি এবং তাদের সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলিই নয়, কংগ্রেসের তরফেও হুল দিবস উদ্‌যাপনের কোনো উদ্যোগ কোথাও দেখা যায়নি। আমরা সবাই জানি, সাঁওতাল উপজাতির মানুষরা আসাম রাজ্যেরও বাসিন্দা। ঐ রাজ্যে সরকারের কর্ণধার কংগ্রেস দল। ওখানে যে সব সাঁওতাল পরিবার বর্তমানে বসবাস করেন, তাঁদের পূর্বপুরুষরা সাঁওতাল পরগনা এবং তার পার্শ্বস্থ বীরভূম জেলা থেকেই মূলত গিয়েছিলেন। সাঁওতাল অভ্যুত্থানের পরবর্তী কালে খ্রীস্টান মিশনারীদের সংগঠন ইন্ডিয়ান হোম মিশনের উদ্যোগে ১৮৮১ সালে বিয়াল্লিশটি পরিবারকে আসাম রাজ্যের ভূটান সীমান্তবর্তী এক অরণ্যবেষ্টিত এলাকায় নিয়ে

যাওয়া হয়েছিল। ঐ এলাকার অরণ্য সাফ করে জমি আবাদ করা ছিল মূল উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে ঐ মিশন চা-বাগানের মালিক হয়। ঐ চা-বাগানের কাজেও সাঁওতাল পরগনা থেকে নিয়ে যাওয়া মানুষদেরই শ্রমিক হিসাবে তারা নিয়োগ করেছিল। ১৯১০ সালে ঐ রাজ্যের জনসংখ্যায় সাঁওতাল উপজাতির জনসংখ্যা ছিল ৪,৪৮৬ জন। ঐ সব মানুষদের মেহনতে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সেখানে মোট ১২,২৮০ বিঘা জমি তখন পর্যন্ত আবাদ হয়েছিল। সেদিন যাঁরা পেটের দায়ে খ্রীস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে আসামের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর কবলিত এলাকায় যেতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের পশ্চাদপটে ছিল হুলের রক্তাক্ত দিনগুলি এবং তার ইতিহাস। আসামের কংগ্রেস সরকারের কাছে তার কোনো মূল্য নেই বলেই সেখানে হুল বার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্যোগ সরকারীভাবে নেওয়া হয়নি।

বলাবাহুল্য, এর পশ্চাদপটে রয়েছে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী। হুল ছিল সাঁওতাল উপজাতি-সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের গরীব মানুষদের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। ভারতের বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলি, কংগ্রেস, বি জে পি এবং আঞ্চলিক দলগুলির কাছে এ অভ্যুত্থানের ইতিহাস দেশের জনগণের কাছে যাতে গুরুত্ব না পায় এটাই তাদের লক্ষ্য, বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর কাছে ঐ ইতিহাস সম্পূর্ণভাবেই নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ--বিরোধী। অতীতের সমস্ত কৃষক সংগ্রামই বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর একান্তভাবে অনভিপ্রেত এবং তাদের শ্রেণীস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক।

তাই দেখা যায়, ১৯৫৫ সালে যখন হুলের একশো বছর পূর্ণ হলো, তখন তা এরাজ্যের কংগ্রেস সরকার বা ঐ রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসের কাছে এক বিন্দুও গুরুত্ব পায়নি।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার কৃষকরা সাঁওতাল অভ্যুত্থান-সহ আরও বহু কৃষক সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের জীবন পণ করে ও অপরিসীম দুঃখকষ্ট, অমানুষিক নির্যাতন এবং নিপীড়ন সহ্য করে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে সামগ্রিকভাবে কৃষকের অধিকার হরণকারী যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তার অবসান চেয়েছে। ঐ জগদ্দল পাথরের বোঝাকে সরিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির পথ খুঁজেছে। সাঁওতাল হুল-এর শততম বার্ষিকীর প্রাক্‌কালে পশ্চিমবাংলায় জমিদারী ক্রয় আইন ও ভূমি সংস্কার আইন পাস হয়েছিল। জমিতে মধ্যস্বত্ব লোপের কথা ঘোষিত হয়েছিল। কাকতালীয় হলেও এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, ঐ সময়কালেই হুলের একশো বছর পূর্ণ হলো। তাই, সাঁওতাল হুল সহ কৃষক সংগ্রামের মহান ঐতিহ্যের কথা ঐ আইন পাস করার সময়ে স্বাভাবিক ভাবে এরাজ্যের রাজনৈতিক জগতের, বিশেষত শাসক দল কংগ্রেসের কাছে ঐ সংগ্রামগুলির গুরুত্বের কথা

উল্লেখ প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু হুলের শততম বার্ষিকী উদ্‌যাপন ও তার স্মরণের বিন্দুমাত্র উদ্যোগ সেদিন চোখে পড়েনি।

তবে, ঐ দায়িত্ব সেদিন পালন করেছিল পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা। কৃষক সংগ্রামের মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী কৃষক সভার উদ্যোগে সেদিন বীরভূম, তার পার্শ্বস্থ সাঁওতাল পরগনা, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে হুলের শতবর্ষ যথেষ্ট গুরুত্ব ও মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপিত হয়েছিল। ঐ উপলক্ষে কৃষক নেতা কমরেড মহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনী নামক পুস্তিকা রচনা করেন ১৯৫৪ সালে। বাংলা ও বাংলা হরফে সাঁওতালী ভাষায়—এই উভয় ভাষাতেই ঐ পুস্তিকার কয়েক হাজার কপি সেদিন বিক্রি হয়েছিল। দাম ছিল এক আনা। সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনী পরে আশির দশকে পরিমার্জিত হয়ে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক কমিটির ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'কৃষক' সংগ্রাম এর সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫০ বছর পূর্তিতে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায় ঐ পুস্তিকা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে ১৯৮০ সনে সাঁওতাল হুলের ১২৫ তম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছিল বীরভূম জেলার গণপুরে। ঐ সময়েই সিউড়ির পুরানো সার্কিট হাউসে সিধো-কানহু উপজাতি সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ঐ চর্চা কেন্দ্র রাজ্যের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্রের অন্যতম শাখা হিসাবে কাজ করছে। উল্লেখিত সার্কিট হাউস (১৮০৪ সালে তৈরি) ছিল সেদিন 'হুল' দমনের জন্য শলা-পরিকল্পনা রচনার জন্য ব্রিটিশ আমলাদের প্রধান কেন্দ্র। বর্তমানে তা সাঁওতাল হুলের অমর নায়ক সিধো-কানহু-র নামাঙ্কিত সিধো-কানহু ভবন। বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে কলকাতার ঐতিহাসিক এসপ্ল্যানেড ইস্ট-এর নামকরণ হয়েছে সিধো-কানহু-ডাহার। দুর্গাপুরে সিধো-কানহুর নামে স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে। হুল-এর নায়কদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য এভাবেই বামফ্রন্ট সরকারের তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সাঁওতাল হুল-এর মূল প্রশ্ন জড়িত ছিল ভূমি ব্যবস্থার সাথে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সেদিন সুবে বাংলা ও ভারতের আরও কিছু অংশের কৃষকদের আবহমানকালের জমির মালিকানার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আবহমানকাল ভারতে কৃষকরাই ছিল জমির মালিক। কৃষকরা উৎপন্ন শস্যের একটা অংশ—সাধারণত এক ষষ্ঠাংশ রাজস্ব দিতেন। কিন্তু জমিতে রাজার কোনো মালিকানা স্বীকৃত ছিল

না। উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির এলাকাধীন জমির উপর সামগ্রিকভাবে কর্তৃত্ব ছিল ঐ গোষ্ঠীর। সাঁওতাল সমাজের গোষ্ঠীপতি বা মুস্তাগির কৃষকদের কাছ থেকে ফসলের এক ষষ্ঠাংশ নিয়ে রাজা বা সামন্তদের কাছে পৌঁছে দিত। রাজা বা সামন্তরা ঐ জমির অধিকারী ছিল না বা কৃষকের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতো না।

আরেকটি বিষয়ও লক্ষ্যণীয়। তা হলো আজকের ধরনের খাজনার অস্তিত্ব তখন ছিলনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে (১৭৯৩) খাজনা প্রথার প্রবর্তন হলো। আর সেই খাজনা দিতে হবে মুদ্রায়, তার সাথে আরেকটি বিষয়ও এলো। খাজনা পরিশোধ না করতে পারলে কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ হতে হবে। কৃষকের কোন রায়তী স্বত্ব ছিলনা। খাজনা বাকীর জন্য জমি নিলামে উঠবে। যে ব্যক্তি বেশি খাজনা দেবার কড়ারে জমি নিতে সক্ষম হবে জমি চাষের সুযোগ সেই ব্যক্তি পাবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিণামে জমি পণ্যে পরিণত হলো, তার আগে জমি কেনাবেচার সামগ্রি হিসাবে বিবেচিত হতো না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিতে কৃষকদের চিরন্তন অধিকার কেড়ে নিল এবং ঐ মালিকানা তুলে দিল নতুন সৃষ্ট জমিদারদের হাতে। ঐতিহ্য পরম্পরায় যারা জমিদার ছিল তারা ক্রমবিলুপ্ত হয়ে গেল। ইংরাজ বণিকদের সাথে ব্যবসাবাণিজ্য করে বা তাদের মুৎসুদ্দিগিরির মাধ্যমে যে ব্যক্তিরা অর্থবান হয়েছিল তারাই হলো নতুন জমিদার। বলাবাহুল্য, কৃষকদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিলনা। কৃষকদের রক্ত শোষণই হলো তাদের শ্রেণীগত ধর্ম।

নব্য জমিদাররূপী গ্রহের পাশাপাশি আরেকটি উপগ্রহ-ও দেখা দিল। নতুন জমিদারি ব্যবস্থার পরিণামেই তাদের জন্ম। ঐ উপগ্রহ হলো মহাজন। কুসীদজীবী এক দল। কৃষক যখন জমিদারদের সীমাহীন লোভে সর্বস্বান্ত হতো, তখন তাদের উদ্ধারকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়ে ঐ দল কৃষকদের ঋণের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে জমিদারদের শোষণে জর্জর কৃষকদের দেহের হাড়গোড় চিবিয়ে খেত, তাদের স্থাবর-অস্থাবর সব যেত মহাজনদের গহ্বরে। ভিটেমাটি পর্যন্ত হারাত কৃষকরা। সাঁওতাল হুলের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, জমিদারদের নায়েব-গোমস্তা, ইংরাজদের দারোগা-সিপাই-এর সাথে যুক্ত মহাজনদের ঋণের জালে আবদ্ধ সাঁওতাল কৃষকরা পুরুষানুক্রমিক গোলামী করার দাসখতে টিপসই দিয়েছে। ১৮৬০ সালে সাঁওতাল পরগনার ডেপুটি কমিশনার রবিনসন 'কামিওতি' প্রথা নামক ঐ গোলামী প্রথার অবসানের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। ঐ প্রথার বর্বরতা ও অমানুষিকতার কিছু নমুনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। একজন সাঁওতাল কৃষক এক মহাজনের কাছ থেকে পঁচিশ টাকা ধার করেছিল। ঐ ধারের দায়ে ঐ কৃষক সারা জীবন ঐ মহাজন-প্রবরের কাছে দাসত্ব শৃঙ্খলে

আবদ্ধ ছিল। তার মৃত্যুর পর ঐ দায় বর্তালো পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে পুত্রের উপর। ঐ পুত্রের জীবনাবসানে দায় বর্তালো তৃতীয় পুরুষের উপর। নাতির ঘাড়ে ঐ ঋণের বোঝা পড়ল। আর দাদুর পায়ের শিকলটাও সে উত্তরাধিকারী হিসাবে পেল। এধরনের ঘটনা আকছার ছিল। সুদের হারের কোনো সীমা ছিল না। শতকরা চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা থেকে চারশ-পাঁচশ টাকা পর্যন্ত। সুদের সুদ, তস্য সুদ, অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি হারে ঐ ঋণের মোট পরিমাণ নির্ধারিত হতো।

১৯০৬ সালে প্রকাশিত ব্রাডলে বার্ট-এর 'স্টোরিজ অব অ্যান আপল্যান্ড কান্ট্রিজ'-এ বার্ট মহাজনী শোষণের এই অমানুষিকতা ও নিষ্ঠুরতার নজির তুলে ধরেছেন বিশদভাবে[২]। দামিন-ই-কো বা পরবর্তী কালের সাঁওতাল পরগনা (১৮৫৬) বা তার পার্শ্বস্থ বীরভূম, ভাগলপুর, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, তৎকালীন মানভূম কিংবা বর্তমান উড়িষ্যা রাজ্যের বালাশোর প্রভৃতি জেলায় মহাজনী ব্যবস্থার নিষ্ঠুরতা ও অমানুষিকতার একই চিত্র ছিল। কামিওতি প্রথা বন্ধের জন্য আইন করলেও মহাজনদের করাল দংষ্ট্রা অন্য কায়দায় সাঁওতাল উপজাতি সহ তামাম গরীব মানুষদের একইভাবে রক্ত মোক্ষণ করেছে। তাদের নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর অবস্থায় নিয়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন। ব্রিটিশ শাসকরা যে সাঁওতাল পরগনায় কামিওতি প্রথার অবসান ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তা-কি নিছক মানবিকতার প্রেরণায় ? খ্রীস্টান ধর্মের মানবিক ভূমিকা দেখানোর উদ্দেশ্যেই কী ঐ ধরনের দাসত্বপ্রথা বিলুপ্ত করার জন্য ব্রিটিশ শাসকরা উদ্যোগী হয়েছিলেন, না এর পিছনে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের লগ্নি পুঁজির জন্য সস্তায় শ্রমিক পাবার তাগিদ কার্যকরী ছিল ? হুলের পরবর্তী সময়ে নবসৃষ্ট সাঁওতাল পরগনার গড্ডা মহকুমায় গ্রান্ট জমিদারী কিনে সেখানে আধুনিক ফার্মিং-এর জন্য উদ্যোগী হন। অবশ্য তিনি কতটা পুঁজি নিয়োগ করেছিলেন, তা বলা মুস্কিল। তার ঐ ফার্মিং-এর জন্য কী মুক্ত কৃষক দরকার হয়েছিল ? নীলকর সাহেবরাও ঐ সময়ে নতুনভাবে নীলচাষে পুঁজি নিয়োগ করেছিল। তাদের ঐ চাষের ক্ষেত্রেও কী মুক্ত কৃষকের প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়েছিল ? তৃতীয়ত, রেল লাইনের কাজ তখনও শেষ হয়নি। সেক্ষেত্রেও ঐ কাজের মজুর পাবার ক্ষেত্রে মহাজনদের বন্ধনমুক্ত অথচ জমিহারা কৃষক চাই। এই বাস্তবতাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হুল-এর কিছুদিন পর থেকেই চা-বাগানের জন্য কুলির চাহিদা বাড়ে, তা পেতে গেলেও কামিওতি প্রথার শৃঙ্খলে আবদ্ধ সাঁওতালদের মুক্তি চাই। ঊনিশ শতকের সত্তরের দশকে বেনাগড়িয়ার ইন্ডিয়ান হোম মিশনের ক্রেপসরুড সাহেব এখানকার সাঁওতালদের অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানোর জন্য উদ্যোগী হন। সেখানে এক সাঁওতাল কলোনী তৈরির পরিকল্পনা তাঁর ছিল।

"Skrepsrud States that many Santals in the beginning of the 1870's requested him to seek a place where they could emigrate enmasse. While he was in London in 1873, he met with Mr. Charles Goode, a Baptist Philanthropist, who having made money in Australia retired to London to look after his business there. Mr. Goode mentioned to Skrepsrud the possibility of selling Santals in the Northern Territory of South Australia and also led Skrepsrrud into contact with Mr. Francis Dutton, the agent general for the South Australian Government in Britain having discussed the matter with him, Skrepsrud wrote to the Australian Government proposing that Santals should be settled in the Northern territories. The Matter was discussed in the South Australian Parliament and Skrepsrud got an official invitation to come to Australia with the view of Preparing for Santal immigration. The invitation was signed by Mr. W.H.Brendey, Minister of justice and education, and dated January 29, 1875. However, when all this came to the knowledge of the Indian Government they objected to Skrepsrud having entered into direct negotiations with the Australian Government without their Sanction. Skrepsrud, on the advice of friends in the Indian Government hurriedly withdraw from the whole adventure, informing the Mission friends that due to the long distance between India and Australia they did not find it possible to act on the initiation of the Australian Government."

স্ক্রেপসরুড সাহেবের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সাঁওতালদের হিতৈষণার প্রেরণা সঞ্জাত নয়। অস্ট্রেলিয়ায় ঐ সময়ে ব্রিটিশ ধনাঢ্যদের যে বাগিচা চাষ প্রবর্তিত হচ্ছিল, ঐ চাষে সস্তায় মজুর হিসাবে খাটাবার জন্যই সাঁওতালদের সেখানে পাঠাবার উদ্যোগ স্ক্রেপসরুড সাহেব নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮৮১ সনে তিনিই সাঁওতালদের কতকগুলি পরিবারকে আসামে পাঠান। ইন্ডিয়ান হোম মিশন সেখানে চা-বাগান কিনে ব্যবসাও শুরু করেছিল। ১৮৯০ সনে ঐ চা-বাগান কেনা হয়। কলোনীর সাঁওতালরাই ছিল মিশনারীদের চা-বাগানের শ্রমিক।

হুল-এর কারণ ও তার ব্যাপ্তি নিয়ে এ নিবন্ধে নতুন করে কোনো আলোচনা করছি না। এর আগে ঐ বিষয়কে উপজীব্য করে কিছু প্রবন্ধাদি ও পুস্তিকা লিখেছি। পাকুড়ের আইনজীবী দিগন্বর চক্রবর্তী হুল-এর ঘটনাবলীর বিবরণ

লেখেন। তাঁর ঐ গ্রন্থেও হুল-এর বিষয়ে অনেক তথ্য জানা যায়। ১৯২৩ সনে লোকনাথ দত্ত সাঁওতাল কবিতা (বনবীর গাঁথা)—এই নামে হুল-কে উপজীব্য করে একটি কাহিনী-কাব্য রচনা করেছিলেন। তার পুনঃপ্রকাশও করা হয়েছে। এছাড়া ড. কালীকিঙ্কর দত্তের সানতাল ইনসারেকসন নামক গ্রন্থে (১৯৪০) বা পরবর্তী কালে ধীরেন নাথ বাস্কে লিখিত সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থে, অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ রচিত 'Santal village community and the Santal rebellion of 1853', ড. শুচিব্রত সেন লিখিত 'Santals of jungle Mohal' গ্রন্থে আমরা হুল সম্পর্কে বিশদভাবে জানার সুযোগ পেয়েছি। তাছাড়াও অধ্যাপক নীরদবন্ধু রায় ও আরও কেউ কেউ এ বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখেছেন।[৬] অশোক মিত্র সম্পাদিত ১৯৫১ সনের আদমসুমারির রিপোর্টের সাথে প্রকাশিত সরকারী নথিপত্র হুলের ঘটনাবলীর উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছে, এ প্রসঙ্গে আরও কিছু কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। স্বপন বসু সম্পাদিত বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ সংকলনও এ বিষয়ে অনেক তথ্য তুলে ধরেছে।

এসমস্ত গ্রন্থাদি, পুস্তিকা, সরকারী নথিপত্রে হুলের কারণ হিসাবে জমিদার ও মহাজনদের নির্মম শোষণ ও অত্যাচার নিপীড়ন, প্রতারণা ও লাঞ্ছনা এসবকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর সামন্ত্রতান্ত্রিক শোষণের পাশাপাশি রেলপথ বসানোর কাজে নিযুক্ত ঠিকাদারদের লুন্ঠন, নারীদের সম্মানের উপর বর্বর আঘাত, নীলকর সাহেবদের অত্যাচারী ভূমিকা, সর্বোপরি ব্রিটিশ শাসকদের ভূমিনীতি এবং ঔপনিবেশিক শোষণজাল—এসব সাঁওতাল উপজাতির মানুষদের জীবনকে চারপাশ থেকে অক্টোপাশের মত বেঁধে ফেলেছিল! প্রথমে প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে তার প্রতিকার খুঁজলো সাঁওতাল উপজাতির মানুষরা, কিন্তু তা তারা পেলনা। প্রতিকার করার পরিবর্তে ব্রিটিশ শাসকরা তাদের হিংস্রতা ও দমনযন্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাঁওতাল উপজাতির মানুষদের উপর। যা পরিণত হলো এক যুদ্ধে। অসম যুদ্ধ। রাইফেল, কামান, বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী, বেসামরিক সশস্ত্র ফৌজ, আর তাদের সহযোগী বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ভাগলপুর প্রভৃতি জেলার জমিদার ও নবাবের পাঠানো পাইক, বরকন্দাজ প্রভৃতি। জমিদারদের পাঠানো হাতীর পিঠে চড়ে ঐ সব বাহিনী বলা যেতে পারে সর্বশক্তি নিয়োগ করল হুল দমনে। এই বাহিনীর রসদ জোগাল জমিদার আর রেলের ঠিকাদার এবং নীল কুঠির মালিকরা।[৭]

ব্রিটিশ বাহিনীর নেতৃত্বকারী ছিল সুদক্ষ সেনাধ্যক্ষরা। লয়েড, জার্ভিস, বার্ড প্রমুখ। এ গেল ব্রিটিশ পক্ষ, কিন্তু প্রতিপক্ষ যে সাঁওতাল উপজাতির

মানুষরা তারা তো এ জাতীয় এক প্রবল যোদ্ধৃবাহিনীর সম্মুখীন হতে হবে তা ভেবে ঘর থেকে বের হয়নি, ভগনাডিহি থেকে পথে বেরুবার সময়েও এজাতীয় কোনো ভাবনা তাদের ছিলনা। সাঁওতাল উপজাতির মানুষরা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস মত তীর-ধনুক, দা-কুড়ুল-টাঙি, বল্লম বা তরবারি সাথে নিয়েছিল। এগুলো তো আদিম অস্ত্র। সেকেলে অস্ত্র। তাই নিয়েই তাদের লড়তে হলো। যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী যে শৃঙ্খলা, তাও তাদের মধ্যে ছিলনা। থাকা সম্ভবও নয়। তারা পথে বেরিয়েছিল একান্তই স্বতঃস্ফূর্তভাবে। নেতৃত্বকারীদের কারুরই আধুনিক যুদ্ধের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিলনা। তাই ব্রিটিশ বাহিনীর নৃশংসতা ও নির্মমতার শিকার তাদের হতে হয়েছে। ব্রিটিশ বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ বা বেসামরিক কর্তাব্যক্তিদের হুকুমে গ্রামকে-গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নারী-শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে কচুকাটা করেছে বলবর্দী ব্রিটিশ বাহিনী। কিন্তু এই যুদ্ধের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে হুল দমন করার জন্য আসা মেজর জার্ভিস তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন, আমরাতো যুদ্ধ করিনি, গণহত্যা করেছি। আমাদের সিপাহীরা ঐ হত্যাভিযানে প্রায় সবাই দ্বিধান্বিত ছিল।[৮]

হুলের বলি

হুল-এ ব্রিটিশ বাহিনীর নিষ্ঠুরতার বলি-র সংখ্যা কত ? এ প্রশ্ন উঠেছে। ব্রাডলে বার্ট তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে লিখেছেন যে, নিহতের সংখ্যা দশ হাজারের কম নয়।[৯] বোঝা যাচ্ছে, নিহতের সংখ্যা সম্পর্কে তাঁর মনেও সংশয় ছিল। গণহত্যা যে হয়েছে, তা তিনিও প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। নিহতের সঠিক সংখ্যা কোনো দিনই সঠিকভাবে নির্ধারিত হবে না। ঘাতক ব্রিটিশ সরকারের সামরিক বা বেসামরিক কর্তাব্যক্তিরা কতজনকে খুন করেছিল, তার তথ্য তারা নথিভুক্ত করবে—এ আশা নিরর্থক। বলা যেতে পারে, সম্পূর্ণভাবেই অসম্ভব ও অবাস্তব। তবে, পরবর্তীকালে হুল সম্পর্কে গবেষণাকারীরা অনেকেই ধারণা করেছেন যে, ঐ সংখ্যা বিশ থেকে ত্রিশ হাজারের কম নয়।[১০]

সিধো-কানহু সহ হুল-এর নেতাদের অনেককেই ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। সিধো-র ফাঁসি হয়েছিল বারহেটে। খামারি ট্রায়ালের পরে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ঐ ফাঁসির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন দামন-ই-কো-র সুপারিনটেনডেন্ট পোন্টেট সাহেব।[১১]

কানহু-কে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল ভগনাডিহি গ্রামে। ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬ সালে ঐ ফাঁসি দেওয়া হয়।[১২]

কাকে কাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল এবং কীভাবে, তার বিবরণও দুষ্প্রাপ্যই

বলা যায়। সিউড়ি, রাজনগর, দুমকা প্রভৃতি স্থানে গাছে ঝুলিয়ে গণ-ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এ জনশ্রুতি আজও বহাল। সম্ভবত, জঙ্গিপুরেও ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিল। সরকারী নথিতে এর সব বিবরণ নেই, একথা ঠিক। গণহত্যাকারীরা সব তালিকা আজকের ইতিহাস রচয়িতাদের জন্য যথাযথভাবে রেখে দিয়ে যাবে—এভাবনাও অবাস্তব। এক্ষেত্রে জনশ্রুতিরও একটা গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচারের প্রহসন করা হয়েছিল। সিধো-র ক্ষেত্রেও সামারি ট্রায়ালের পর তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, তা আগেই উল্লেখ করেছি।

একই সাথে বাইশজনকে ফাঁসি দেওয়ার এক তথ্য পাওয়া যায়। যাঁদের গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো হয়েছিল, তাঁরা হলেন ১। সিংরে মাঝি, বয়স ২৯ বছর, বাড়ি বীরভূম। ২। নফর পাল কুমার, বয়স ৪৯ বছর, বাড়ি বীরভূম। ৩। শ্যামমাল পাহাড়িয়া (৪৯), বাড়ি ভাগলপুর। ৪। পরাণ মাঝি (১৬), বাড়ি বীরভূম। ৫। চন্দ্র মানঝি (১৮), বাড়ি বীরভূম। ৬। সিংরয় মানঝি (৪০), বাড়ি বীরভূম। ৭। নাকুল মানঝি, (৩৮), বাড়ি বীরভূম। ৮। খাশকো মানঝি, (৩১), বাড়ি বীরভূম। ৯।.....মানঝি (৩৫), বাড়ি বীরভূম। ১০। কালু মানঝি (৪৫), বাড়ি বীরভূম। ১১। ধুনিয়া মানঝি (৩৭), বাড়ি বীরভূম। ১২। রুরা মানঝি (২৯), বাড়ি বীরভূম। ১৩। মোথা মানঝি (৪১), বাড়ি বীরভূম। ১৪। বাগড়ু মানঝি (৩৯), বাড়ি বীরভূম। ১৫। বিশু মানঝি (৩৬), বাড়ি বীরভূম। ১৬। কান মানঝি (২৮), বাড়ি বীরভূম। ১৭। রাজ মানঝি (৩৪), বাড়ি বীরভূম। ১৮। দোয়েল মানঝি (৫৬), ১৯। শীতল মানঝি (১৫), ২০। বীরসিং (৪৫), বাড়ি বীরভূম। ২১। কুত্তোর মানঝি (৩৫), বাড়ি বীরভূম। ২২। রামণ মানঝি, (৩৩) বাড়ি বীরভূম।

ঐ বাইশ জনের তালিকায় দেখা যাচ্ছে তিনজন কিশোরের নামও রয়েছে। তাছাড়া, অধিকাংশই চল্লিশের নীচে বয়সী যুবক, চল্লিশোর্ধ্বের চারজন। সবচেয়ে বেশি বয়স অর্থাৎ ছাপান্ন বছর একজনের। ঐ সব শহীদদের একজন ছাড়া সকলেই বীরভূম জেলার বাসিন্দা। তার সাথে আরো একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, একজন কুমোর বা কুম্ভকারও ঐ বাইশজন শহীদের তালিকায় রয়েছেন। আরেকজন অ-সাঁওতাল শ্যামমাল পাহাড়িয়ার নামও পাচ্ছি আমরা।[১৩]

এতো গেল ফাঁসি। বিচারের প্রহসন করে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষকে যাবজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে তৎকালীন ব্রহ্মদেশের আকিয়াব ও অন্য জেলে পাঠানো হয়েছিল। চাঁদ ও ভৈরো ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তালিকা সুদীর্ঘ। তাই, তাঁদের নামধাম পরিচয় দেওয়া থেকে

বিরত থাকলাম।

ব্রিটিশ সরকার আগস্ট মাসে (১৮৫৫) বিদ্রোহীদের হুঁশিয়ারি দিয়েও কোনো সুফল পেলনা। অর্থাৎ বিদ্রোহের আগুন যথারীতি জ্বলতেই লাগল। এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় ঐ আগুন ছড়াতে লাগল, সাঁওতালদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছারখার করে, নির্বিচারে হত্যা করে, গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে দিয়ে, ধৃত নেতাদের গণফাঁসি দিয়েও যখন ব্রিটিশ শাসকরা আগুন নিভাতে পারলনা, তখন ১৮৫৫ সনের নভেম্বর মাসে সামরিক আইন জারি করে বিদ্রোহ কবলিত এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনার ভার পুরোপুরি সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হলো। যার অর্থ দাঁড়াল এই যে, বিদ্রোহের প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখা নিভাবার জন্য যতখানি নিষ্ঠুর হতে পারো, তাই হও।

ব্রিটিশ পুঁজির মুখপত্র ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া তার জুলাই ও ডিসেম্বর, ১৮৫৫-এর সংখ্যায় এবং ক্যালকাটা রিভিউ তার ১৮৫৬-এর জানুয়ারি সংখ্যায় বিদ্রোহীদের সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্রিটিশ শাসকদের কাছে সুপারিশ করেছিল।

It is only be Striking terror into these blood-thirsty savages, they have respected neither age nor sex, that we can hope to quite this insurrection. It is necessary to avenge the outrages committed and to protect the cultivators of the plains from a repetition of them, the Santa's believe that they can enjoy the luxury of blood and plunder for a month without a certainty of retribution. It is absolutely necessary that this impression should be removed, or obliterated. If Government would not in these district sit on a beoynet point to achieve this end. The retribution must be complete, bearing no calculation of chances for future rioters, so striking that none may fail to know their lives and happiness are not held of light account. It is to Pegu that we would convey the Santal's, not one or two of the ring leaders, but the entire population of the infeild districts. India has not arrived at the point where armed rebellion can be treated with the contemptuous for bareness, with which an English Ministry can pardon a knot of chartist or banish a gang of Irish patriots. Let the Santal's punishment be entrusted to a special commission it was done in Canada in 1838. Or even if this expedient be too arbitrary, let the villages be fined in

an amount about equal to the plunder retained, and the sum distributed among the sufferers. To bear the punishment of the race, and restore the prestige of British authority, the mass of the Santal's should not remain unpunished."

সাঁওতাল অভ্যুত্থান ব্রিটিশ পুঁজির মালিকদের পুঁজির নিরাপত্তা, তাদের ব্যবসায়িক লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছিল। তাই তাদের গায়ে প্রচণ্ড জ্বালা ধরেছিল। তাদের মুখপত্রের সুপারিশের কড়া ভাষার মধ্য দিয়েই ঐ গাত্রদাহের স্বরূপ ধরা পড়ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে রেলপথ নির্মাণের জন্য ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের কাছ থেকে ভারত সরকার ঋণ নিয়েছিল। এভাবেই ব্রিটিশ লগ্নি পুঁজি ভারতে প্রথম এসেছিল। কাজেই, ব্রিটিশ লগ্নি পুঁজির মালিকদের দুর্ভাবনা থাকাই স্বাভাবিক। এ গেলো ব্রিটিশ লগ্নি পুঁজির মালিকদের আর্থিক স্বার্থের দিক। এর সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনৈতিক স্বার্থের দিকটাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের উপনিবেশবাদী কামধেনুকে আরও বেশি করে শোষণ করার জন্য ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা তখন সাম্রাজ্য বিস্তার করে তাকে ঐ দেশের শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছিল। তার সাথে ভারতের কৃষি ও কুটির শিল্পকে ধ্বংস করে দিয়ে এদেশের কৃষিজাত কাঁচামালকে নিজের দেশের কলকারখানা ও যন্ত্রশিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এজাতীয় এক সন্ধিক্ষণে পূর্ব ভারতের বিরাট এলাকাজুড়ে সাঁওতাল উপজাতি তথা সমাজের শোষিত বঞ্চিত মানুষদের ঐক্যবদ্ধ এই অভ্যুত্থান ব্রিটিশ শাসকদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিল। এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, এর দুবছরের মাথায় ১৮৫৭ সালে গোটা ভারতভূমিতে বিরাট এক রাজনৈতিক ভূকম্পন দেখা দিয়েছিল। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর আগে তার বাতাবরণ যে তৈরি হচ্ছিল, সুচতুর ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী তা একেবারে টের পায়নি—একথা ভাবা যায় না। দেখা যায়, ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ শাসকরা ঐ রাজনৈতিক ভূকম্পনের সাথে দুবছর আগে অভ্যুত্থিত সাঁওতাল উপজাতির মানুষদের কোনো সংযোগ আছে কিনা, তা তন্নতন্ন করে খুঁজছিল।[১৫] সন্দেহের ভিত্তিতে সাঁওতালদের মধ্য থেকেও কিছু কিছু সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জেলে পোরা হয়েছিল। সাঁওতাল পরগনার পরবর্তীকালের এক ডেপুটি কমিশনার ই জি ম্যান ১৮৬৭ সালে তাঁর রচিত গ্রন্থে লিখেছেন যে, বিদ্রোহের জের ১৮৫৮ সন পর্যন্ত চলেছিল। এই অভ্যুত্থানে ব্রিটিশ শাসকদের শাসন ও শোষণ বজায় এবং নিরাপদ রাখার জন্য কত প্রাণ বলি হয়েছিল সে বিষয়ে আগে কিছুটা আলোচনা করেছি। তাঁর উল্লেখিত গ্রন্থের বয়ানে আমরা যা পাই তা এরকম—

"I will not attempt to describe the murders Committed and heavy reprisals taken by our troops, since my knowledge is derived for there say evidence, which is seldom trustworthy. Suffice it to mention that after a guerilla warfare in which many lives were sacrificed, the war was brought to a close and the rebellion crushed by the end of 1858."

"This period found the Santals houseless and wretched with a great portion of their tribe annihilated and their accessibles, villages and crops destroyed."

ই জি ম্যানের ব্যবহৃত শব্দগুলির প্রতি আমি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তা হলো— "With a great portion of their tribe annihilaed" একজন সিভিলিয়ানের কলম থেকে বেরুনো ঐ বাক্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

কত প্রাণ ব্রিটিশ ঘাতকবাহিনীর নৃশংসতার শিকার হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে ব্যালফোরের এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইন্ডিয়ার উক্তিটি উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। ঐ ভারতীয় বিশ্বকোষে লেখা হয়েছিল—বাস্তবিক পক্ষে বিদ্রোহীদের শতকরা পঞ্চাশজন মারা পড়ে।[১৭]

কৃষক সমগ্রামগুলির প্রভাব

সাঁওতাল অভ্যুত্থানের প্রভাব দেশের কৃষক সংগ্রামগুলির উপর কিছু পড়েছিল কিনা, এ প্রশ্ন কেউ কেউ করে থাকেন। প্রশ্নটা নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক, প্রয়াত কমরেড সুধী প্রধানের কাছে শুনেছিলাম যে, ইন্ডিগো কমিশনের কাছে সাক্ষ্যদান কালে নীল বিদ্রোহে (১৮৬০-৬১) অংশগ্রহণকারী একজন সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে প্রেরণা পাবার কথা তাঁর সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছিলেন। ইন্ডিগো কমিশনের প্রতিবেদন আমি দেখিনি। তবু, কমরেড সুধী প্রধানের মতো ব্যক্তির মুখে শুনেছিলাম বলে উল্লেখ করলাম।

সাঁওতাল অভ্যুত্থানের বছর পাঁচেকের মধ্যে যশোহর-খুলনা-নদীয়া প্রভৃতি জেলার কৃষকদের ঐ ঐতিহাসিক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। নীল বিদ্রোহে নেতৃত্বকারী বা যোগদানকারীদের মধ্যে কেউ কেউ লেখাপড়া জানতো। সেদিনের সংবাদপত্রও তাঁদের কারুর কারুর কাছে যাওয়া স্বাভাবিক। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু পেট্রিয়ট, সংবাদ প্রভাকর প্রভৃতি সংবাদপত্রে সাঁওতাল অভ্যুত্থানের খবর প্রকাশিত হয়। নীল বিদ্রোহের অংশগ্রহণকারীরা ঐসব সংবাদপত্রের মাধ্যমে ওয়াকিবহাল হওয়াটা অসম্ভব নয়।

তবে, নীল বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে সাঁওতাল অভ্যুত্থানের জীবিত নেতাদের

অন্তত একজন নীল-বিদ্রোহীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন।

ঐ ব্যক্তি হচ্ছেন সুন্দর মাঝি। ১৮৫৫ সালের বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। কিন্তু তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে যান।[১৮] সুন্দর মাঝি, জুমা মাঝি এবং আরও কয়েকজন কলকাতায় লাট সাহেবের কাছে ডেপুটেশন নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেন। তাঁরা কৃষ্ণনগরের পথে কলকাতা যান। নীল বিদ্রোহীদের কাছ থেকে বিদ্রোহের কলাকৌশল শিক্ষা করা তাঁদের কলকাতার গমনপথ ভায়া রাণীগঞ্জ না হয়ে ভায়া কৃষ্ণনগর হয়েছিল। সুন্দর মাঝি এবং তাঁর সহকর্মীরা এসেছিল গড্ডা মহকুমার হেণ্ডিয়া (Hendeh) বা হেন্ডুয়া পরগণা থেকে। সেখানে তখন সাঁওতাল কৃষকরা জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলেন।[১৯]

জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধি, মহাজনী শোষণে অতিষ্ঠ সাঁওতালরা ১৮৭১-৭২, ১৮৮১-৮২ সনে আবার মাথা তোলার জন্য চেষ্টা করেছে। ঐ সময়ে আরও কিছু কিছু বিষয় জড়িত ছিল। ১৮৭১-৭২ দেশের প্রথম জনগণনারও বিরোধিতা করেছিল তারা। ঐ বিরোধিতার পিছনে চা-বাগানে ও কয়লাখনিতে এবং আসামে জমি আবাদের জন্য চালান দেওয়া, এমনকি অস্ট্রেলিয়ায় দ্বীপান্তরিত করার জন্য মিশনারী স্ক্রেপসরুড সাহেবের উদ্যোগেও (ষড়যন্ত্র) সাঁওতালরা ক্ষুব্ধ ছিল। ঐ সময়ে আবার খেড়োয়াড় আন্দোলন বা সাকাহড় আন্দোলনও মাথা চাড়া দেয়। ১৮৮১-৮২ তে সমগ্র সাঁওতাল পরগণায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষও দেখা দেয়। অনাহারে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। ঐ দুর্ভিক্ষের সময়ে ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষ থেকে কোনো সহায়তা অনশনক্লিষ্ট মানুষরা পায়নি। সব মিলিয়েই বিক্ষোভের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল। আবার সে আগুন ১৮৫৫-এর মত জ্বলে ওঠার পথ খুঁজছিল। বলাবাহুল্য, সবকিছুর পশ্চাদপটে কার্যকরী ছিল সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ।

সাঁওতাল রাজ

১৮৫৫ সনের ৩০শে জুন ভগনাডিহি গ্রামে সমবেত বিভিন্ন স্থান থেকে আসা সাঁওতাল উপজাতির মানুষদের কাছে সিধো-কানহু যে ঘোষণা করেছিলেন তাতে বলা হয়েছিল যে, দামিনে জমিদার-মহাজন থাকবেনা। জমির খাজনা হবে হাল পিছু। মোষের হাল হলে বছরে দুই আনা এবং বলদের হাল হলে বছরে এক আনা। 'হাল' কথার অর্থ হলো যে, মোষ, সাঁওতালদের ভাষাতে 'কাড়া', মোটামুটিভাবে আঠার বিঘা জমি বা তার চেয়ে কিছু বেশি চাষ করতে পারে। আর বলদ পারে বিঘা চোদ্দ। হালের হিসাবে এভাবে হয়। জমিতো ভগবান-

প্রদত্ত। সাঁওতালদের ভাষায় মারাংবুরু জমি। তাতে মারাংবুরুর সন্তান সাঁওতালদের খাজনা দিতে হবে কেন। এটাই ছিল তাঁদের কাছে বড় প্রশ্ন। গোষ্ঠী জীবনে জমির মালিকতো ছিল সমগ্র গোষ্ঠী। কাজেই, জমিদারের কোনো ধারণা সাঁওতাল সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরেই তারা জমিদাররূপী একজনকে দেখতে পেল, যে 'জমির মালিক' বলে ঘোষিত, এবং জমি চাষ করার জন্য ঐ জমিদারকে খাজনা গুনতে হবে। সিধো-কানহু সমবেত সাঁওতাল উপজাতির মানুষদের প্রাক্-চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সর্বোপরি, তাঁরা 'সাঁওতাল রাজ' কায়েমের কথা ঘোষণা করলেন। সেই রাজের সুবাদার বা সুবা হলেন ওঁরা দুই ভাই।

'সাঁওতাল রাজ' কায়েম করের কথা ঘোষণার মাধ্যমে সাঁওতাল সমাজের স্বাধীনতার ভাবনা ছিল ঠিকই, কিন্তু সেদিন তাঁদের সামনে ঐ 'রাজ'-এর কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। থাকা সম্ভবপরও ছিলনা। তাঁদের জনগোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্যের বোধই ওখানে ব্যক্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে ঐ ঘোষণাকে তুলে ধরে কেউ কেউ সাঁওতালদের জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য বা 'খণ্ড'-এর দাবিও তুলেছে। দাবি আজকের দিনে কতটা বাস্তব, কিংবা তার কতটা আবেগাশ্রিত তার বিচার সঠিকভাবে না করতে পারার জন্য আবেগতাড়িত হয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তার শিকারও হয়েছে অনেকে।

কেউ কেউ আবার সাঁওতাল অভ্যুত্থান বা হুলকে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' হিসাবেও তুলে ধরতে সচেষ্ট। এ উক্তি ইতিহাস সম্মত নয়। দেখা যায়, তিতুমীর থেকে আরম্ভ করে যে সব কৃষক-সংগ্রাম হয়েছে তাতেও এক ধরনের স্বাধীনতার কথা উঠেছে কিন্তু এগুলি সবই খণ্ড খণ্ড সংগ্রাম। তাতে কোনো সুস্পস্ট রাজনৈতিক ভাবনার স্থান ছিল না। থাকতেও পারে না। কৃষকদের চিন্তার একটা সীমাবদ্ধতা আছে—একথাও মনে রাখা দরকার সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে ভারতের স্বাধীনতা বা ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার আওয়াজ ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহেই প্রথম উঠেছিল। এটাই ইতিহাস সম্মত। কার্ল মার্কস ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহকেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[২০]

প্রশাসনিক ব্যবস্থাবলীর পশ্চাদপট

১৮৫৫ সনের সাঁওতাল অভ্যুত্থানের পশ্চাদপটে কী ছিল, তা অনুসন্ধানের কাজ ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরাই প্রথম শুরু করেছিলেন। ১৮৫৪ সন থেকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে আরও সুদৃঢ় ও সুসংহত করার জন্য ব্রিটিশ শাসকরা সচেষ্ট হয়েছিল। সেই মুহূর্তে এই ঘটনা ঘটল এমন এক স্থানে যেখানে ভারতে ব্রিটিশদের

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ও তা কায়েমের প্রথম সূচনা হয়েছিল। বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে এই বাংলাতেই। সেখানেই এই অভ্যুত্থান। কাজেই একদিকে তার কারণ খোঁজা, আর সেই অনুযায়ী প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ, এটাই ছিল ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের কাছে তথা সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর কাছে মূল প্রশ্ন।

নবগঠিত সাঁওতাল পরগনা নামক নন-রেগুলেটেড জেলার প্রথম ডেপুটি কমিশনার আসলি ইডেনকেই ঐ কারণ অনুসন্ধানের দায়িত্ব সর্বপ্রথম দেওয়া হয়। হূলের সময়ে যে সব ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরা বিদ্রোহ কবলিত এলাকায় বিদ্রোহ দমনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, আসলি ইডেন তাঁদেরই একজন। তিনি হূলের পিছনে সাঁওতালদের প্রবল ক্ষোভের মূল কারণগুলি ধরতে পেরেছিলেন।

১৮৬৭ সালে ই জি ম্যানও হূলের পশ্চাদপট বুঝেছিলেন। তাঁর রচিত 'সান্তালিয়া এন্ড দি সান্তাল' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, In the chapter on the origin of the Santhal rebellion I have given the opinion of the Santhals on it. This opinion I have inferred from their chance expressions and desultory conversation, sometimes uttered while they woe slightly under the influence of liquor, and therefore without caution in their speech. Whether their opinion is the correct one, or the contrary, I leave on an open question, but I have no doubt as to the genuinness of the expression of their feelings, and that out of the fulness of their hearts their mouths have spoken."[১১]

ঐ গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে ম্যান হূল প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ নিবন্ধে এর আগে আমি তার কিছু অংশ তুলে ধরেছি।

সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আমরা পাই হান্টারের 'এনালস অব রুরাল বেঙ্গল'-এ। পাই ও. ম্যালির গেজেটিয়ারে। তাছাড়া পাই, ব্রাডলে বার্টের গ্রন্থ 'স্টার অব এন ইন্ডিয়ান আপল্যান্ড (১৯০৬)'। তাছাড়াও সিভিলিয়ানদের পক্ষ থেকে ঐ সম্পর্কিত বিবরণ পাওয়া যায়।

ঐ সব সিভিলিয়ানরা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থারই অঙ্গ। কাজেই, তাদের রচনায় জমিদার-মহাজনদের শোষণ সম্পর্কিত বিবরণ রয়েছে। রেলপথ বসানোর কাজে নিযুক্ত ঠিকাদার ও অফিসারদের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিবরণও আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ঔপনিবেশিক শোষণের দিকটায় তারা স্বাভাবিক ভাবেই নীরব থাকা যথোপযুক্ত মনে করেছে।

ব্রিটিশ পুঁজির মুখপত্র ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া বা ক্যালকাটা রিভিউ, কিংবা নীলকরদের মুখপত্র বেঙ্গল হরকরা, অনেকে হূল-কে 'বর্বর বুনো সাঁওতালদের আদিম হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশ' হিসাবে দেখেছে ও চিত্রিত করেছে।

বলা বাহুল্য, দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতেও মোটামুটিভাবে সুর প্রায় একই ধরনের। ঐসব সংবাদপত্রেও একইভাবে সাঁওতালদের 'রক্তপিপাসু' ও 'হিন্দু বিদ্বেষী' বলে চিত্রিত করা হয়েছে। তৎকালীন বাঙালী বুদ্ধিজীবীর শ্রেণীচরিত্রের লক্ষণই ঐসব চিত্রণে পরিস্ফুট। ব্যতিক্রমের নিদর্শন খুবই কম। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের

প্রসাদপুষ্ট বাঙালী মধ্যবিত্তের চিন্তাধারার দেউলিয়াপনারই এগুলি নিদর্শন। যদিও দেশীয় সংবাদ সাময়িকীগুলিতে 'প্রজার দুর্দশা' শীর্ষক সংবাদ উনিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে কিছু কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতের উপজাতীয় সমাজের অন্যতম সাঁওতালরা যাদের সাথে বাংলার পরিচয় ও বাংলার কৃষি উৎপাদনে তাদের ভূমিকা নতুন কিছু নয়। কিন্তু তাদের হুলের সঙ্গত কারণগুলির কথা তৎকালীন দেশীয় সংবাদপত্রে প্রায় দুর্লভই বলা যায়। বলা বাহুল্য, তাদের লেখা-জোখাতেও তার অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।

সাঁওতাল উপজাতির মানুষদের মর্মবেদনা ও ব্রিটিশ শাসকদের নিষ্ঠুরতা এবং নির্মমতার কথা প্রথম তুলে ধরলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ১৩০০ সালে লেখা (১৮৯২ বা ৯৩) 'ইংরাজের আতঙ্ক' প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসকদের অমানুষিকতার কথা তীব্র শ্লেষাত্মক ভাষায় তুলে ধরেছেন।

ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"সাঁওতাল উপপ্লবে কাটাকুটির কার্যটা বেশ রীতিমত সমাধা করিয়া এবং বীরভূমের রাঙা মাটি সাঁওতালদের রক্তে লোহিততর করিয়া দিয়া তাহার পরে ইংরেজরাজ হতভাগ্য বন্যদিগের দুঃখ নিবেদনে কর্ণপাত করিলেন। যখন বন্দুকের আওয়াজটা বন্ধ করিয়া তাহাদের সকল কথা ভালো করিয়া শুনিলেন তখন বুঝিলেন, তাহাদের প্রার্থনা অন্যায় নহে"।[২২]

রবীন্দ্রনাথ ঐ কথাগুলি যখন লিখছেন তাঁরই সমকালে হুল-এর বিবরণ লিখলেন পাকুড়ের দিগম্বর চক্রবর্তী। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি হুল-এর বিবরণ লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি 'হিষ্ট্রি অব দি সাঁওতাল হুল' রচনা করেন।[২৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পাকুড়ের সাথে হুল-এরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেখানকার একজন বুদ্ধিজীবী, যিনি প্রাক্তন শিক্ষক এবং সাঁওতাল পরগনার প্রথম আইনজীবী, যা লিখেছেন তাতে সম্পূর্ণভাবেই বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতির সুস্পষ্ট ছাপ পাই আমরা। এক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ।

বাংলা ১৩০৫ সনে বীরভূমের তৎকালীন অন্যতম বুদ্ধিজীবী, যিনি একটি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং বীরভূমের প্রথম যুগের স্নাতকদের অন্যতম, সেই নীলরতন মুখোপাধ্যায় সাঁওতাল বিদ্রোহ শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখলেন। তার উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন, "গভর্নমেন্ট যদি প্রথমে সাঁওতালগণের অবস্থা জানিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এত অর্থনাশ ও রক্তপাত হইত না। প্রজার মনের অবস্থা জানা রাজার অবশ্য কর্তব্য। আবার প্রজার মনের ভাব জানিবার উপায় বন্ধ করা রাজনৈতিক মহাভ্রান্তি"।[২৪]

হুল-এর কাহিনী উপজীব্য করে বাংলা ভাষায় প্রথম কাব্য রচনা করলেন লোকনাথ দত্ত। ১৯৩২ সনে তাঁর ঐ কাব্য প্রকাশিত হয়।

হুল-এর আগুন যখনও পুরোপুরি নেভেনি তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) গেলেন সাঁওতাল পরগনার জামতারা সংলগ্ন কার্মাটারে।

কলকাতার বিদগ্ধ জনদের কাছ থেকে দূরে যাবার ইচ্ছা নিয়ে তিনি সাঁওতাল উপজাতির মানুষদের মধ্যে গিয়েছিলেন। এখানে তিনি বেশ কিছুদিন বাস করেছিলেন। সাঁওতালদের দুঃখ, দুর্দশা, অভাব-অনটন, অন্নাভাব প্রভৃতি দূরীকরণে তিনি উদ্যোগী হন। বলা যেতে পারে, সাঁওতালদের সাথে তাঁর একটা গভীর আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, যাদের প্রতি তাঁর অপরিমেয় স্নেহ ও মমতা, অল্প কিছুদিন আগে তাদের জীবনে যে মহাবিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল, বিদ্যাসাগর সেই বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেননি।

উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-১৮৯৯) সাথে দেওঘরের গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি তো তৎকালীন রাজনৈতিক জগতের সাথেও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনিও হুল সম্পর্কে নীরব। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীর রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭-১৯২৭) দেওঘর সরকারী হাই স্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। তিনিও ঐ বিষয়ে নীরব। সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২), যিনি 'দেশের কথা' নামক রাজনৈতিক গ্রন্থের রচয়িতা, তাঁর জন্মস্থানও হুল-এর সাথে জড়িত। তিনি বহু রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু ঐ বিষয়ে কোনো লেখা বা তাঁর ভাবনারও কোনো নিদর্শন আমরা পাই না। বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজের তৎকালীন ঐ সব পুরোধা ব্যক্তিদের কাছে সাঁওতাল অভ্যুত্থান কোনো গুরুত্ব পেলনা কেন এবং না পাওয়ার পশ্চাদপটে কি ছিল, আজকের প্রজন্মের কাছে সে প্রশ্ন নিরুত্তরিত।

পরিশেষে, হুল-এ যে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের আওয়াজ ধ্বনিত হয়েছে, আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে তা এক গৌরবময় অধ্যায়। ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সাঁওতাল অভ্যুত্থানের শিক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে—সে হিসাবেই হুল-এর মূল্যায়ন করতে হবে।—৭ই আগস্ট ২০০৫

তথ্যসূত্র

(১) The Seed bore fruit- by Olar Hodne, পৃষ্ঠা-৩২

(২) ঐ গ্রন্থ, পৃষ্ঠাঃ ৩১

(৩) The seed bore fruit - by Orar Hodne- পৃষ্ঠা-৩১-৩২

(৪) ঐ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩১

(৫) দিগম্বর চক্রবর্তীর লিখিত হিস্ট্রি অব দি সান্তাল হুল (রচনা ১৮৯৫-৯৬ সনে)

[১৯৮৮ সালে বর্তমান প্রবন্ধকারের সম্পাদনায় ঐ অপ্রকাশিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, ওর বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গানুবাদ করেছেন পার্থ সারথি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসেনজিৎ মণ্ডলও বঙ্গানুবাদ করেছেন।

লোকনাথ দত্ত রচিত উল্লেখিত কাব্যও বর্তমান প্রবন্ধকারের সম্পাদনায় লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক ১৯৯৮ সালে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে।

(৬) প্রয়াত অধ্যাপক নীরদবন্ধু রায় লিখিত একটি প্রবন্ধ এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে

রয়েছে। বন্ধুবর কবি শ্যামসুন্দর দে-র কাছে আমি তা দেখার ও অনুলিপি করার সুযোগ পেয়েছি।

(৭) সাঁওতাল অভ্যাত্থান ও উপজাতীয়দের সংগ্রাম - অরুণ চৌধুরী।

The Story of an Indian Upland - Birdly Birt, পৃষ্ঠাঃ - ১৮৩।

(৮) ভারতের কৃষক বিদ্রোহ - এল নটরাজন। পৃষ্ঠাঃ- ৩৩-৩৫ এবং সাঁওতাল পরগনা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার- পি সি রায় চৌধুরী। পৃষ্ঠা - ৮৩।

(৯) The Story of an Indian Upland - Birdly Birt, পৃষ্ঠা - ২০৬

(১০) ভারতের কৃষক বিদ্রোহ - এল নটরাজন। পৃষ্ঠা - ৩৫।

(১১) The Story of an Indian Upland country - Birdly Birt, পৃষ্ঠাঃ ২০৬

(১২) সংবাদ-সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ - স্বপন বসু। প্রকাশ বাংলা একাডেমি। পৃষ্ঠা - ২০২। তৎকালিক বিভিন্ন পত্রিকায় কানহু-র ফাঁসের বিবরণ। পৃষ্ঠা - ২১৯।

(১৩) তারাপদ রায়ের সাঁওতাল বিদ্রোহের রোজনামচার ভূমিকা - লেখক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মাসিক মুখপত্র শিক্ষা ও সাহিত্য - এর জুলাই, ২০০৫ - এর সংখ্যায় পুনঃপ্রকাশিত। পৃষ্ঠা - ৭০৭।

(১৪) The Santal Insurrection - Dr. K. K. Datta, পৃষ্ঠা - ৬৭

(১৫) সান্তাল পরগনা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার - পি. সি. রায় চৌধুরী, পৃষ্ঠা - ৯২

(১৬) সান্তালিয়া এণ্ড দি সান্তালস - ই জি ম্যান, পৃষ্ঠা - ১২০

(১৭) ভারতে কৃষক বিদ্রোহ - পৃষ্ঠা - ৩৫

(১৮) দি সান্তালস অব জঙ্গল মহালস্ - ডঃ শুচিব্রত সেন, পৃষ্ঠা - ১৩৪

(১৯) ঐ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩৪

(২০) ইন্ডিয়ান ফার্স্ট ওয়ার অব ইন্ডিপেন্ডস্ - কার্ল মার্কস

(২১) দি সান্তালস অব জঙ্গল মহালস্ - ই জি ম্যান - এর ভূমিকা।

(২২) রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩শ খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২৯৪

(২৩) সংবাদ - সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, সম্পাদক স্বপন বসু, বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা ২২০ - ২২৫।

(২৪) ঐ লেখাটি স্বল্পস্থায়ী 'সংসদ' নামক সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৯৯ সালে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থেকে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সংসদ প্রকাশিত হয়। ১৩০৬ সনে নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকা সেই সময়ে বীরভূম জেলার কীর্ণাহার থেকে প্রকাশিত হতো। নীলরতনবাবু কীর্ণাহার শিবচন্দ্র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

পরিশিষ্ট ঃ সাঁওতাল বিদ্রোহের ছড়া

সাঁওতাল বিদ্রোহ

১২৬২তে উত্তরেতে উৎপাত জন্মিল।
আমীর মুলুক হতে যতসব সাঁওতাল জুটিল॥
বেটাদের একান বড় মাঝি দঢ় যে যেখানে ছিল।
বারোশ গ্রামের সাঁওতাল একত্র হইল॥
করল পরামর্শ মনে হর্ষ মুলুক মারবার তরে।
ইংরেজ মারিয়া আমরা রাজ্য নোব কেড়ে॥
প্যাঁরাপিঠের পাহাড়ে সব একত্র হইল।
সাজ সাজ ডাক সাঁওতাল সেখানে হতে দিল॥
কথা ধার্য্য করে পাহাড় ঘেরে প্যাঁরাপিঠের গ্রামে।
মারাত বান্ধিব আমরা সুভবাবুর নামে॥
সুভরা তিনভাই শুনতে পাই শুন সভে ক্রমে।
সিধু কানু দিই ভাই ফাগু মাঝি নামে॥
করলে হুকুম জারি আমাদের জাতি ওর।
ডাল ঘুরিয়ে নেওতা দোব সবার ঘরে ঘরে॥
বেটাদের হাসি খুসি বসি বসি করে যন্ত্রণা।
তাই এসে পোড়াইলে নাংগুলের থাবা॥
ঢুক্‌লো বাঁশকুলি কুলি কুলি বাজিয়ে নাকড়া।
বাঁশরা, মুলুক তালবেড়ের লোক হলো ভাগোড়া॥
বাঁশকুলি কুলি কুলি বাজাবে নাকড়া।
উদাসিনী কামবাসিনী হইল ভাগোড়া॥
লুটলে বামপুর কাঠিপুর আর বেদেনাবনিপুর।
পাহার বাজার মাটি লুটলি কতদূর॥
পরেরা পুরের ঘরে ঘরে কাটিল বিস্তর।
ভান্ডিবনের গোপাল ঠাকুর ঘরে পেয়েছেন ডর॥
ঘর বাড়ী কুড়ি কুড়ি ভাংগলে দালান কোঠা।
কুমড়োবাদের লোকজনকে করলে কুমড়ো কাটা॥
দুজনা রাজপুত যমের দূত ঢাল কান্ধে করে।

আল্লা রাখ জানি মেহেরবান সিন্নী দোব কোথা।
ফুলবাগানে কাটলে এসে তৌসিলদারের মাথা॥
বেটাদের এক বুলি কুলি কুলি দেয়না ঘরের কাঠি।
সাত হাজার সাঁওতালে লুটলে মহেশপুরের মাটি॥
রাজা প্রাণভয়ে রাণী লয়ে পালায় দক্ষিণে।
সাঁওতালের হতে পুত্র ত্যজিল পরাণে॥
ও হে হরি মরি মরি ধিক আসাদের প্রাণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা গেলেন বদ্দমান॥
রক্তে ভাসালো নদী হাদি গাদি শুন সভে ভাই।
ধনুক ধরিয়ে আমরা ইংরেজ মেরে যাই॥
ইংরেজ পিছু হলো তোপ গাড়িল তোপে দিল টানা।
বারোশ গ্রামের সাঁওতাল নাইকো একজনা॥
পাঁচশো হাতি তুরুপ গাঁথি আসিল বিস্তর।
নি-সাঁওতাল করিব আজ পৃথিবীর ভিতর॥
সাঁওতাল কাটা গেলো একি হলো করে গো বিকুলি।
সাঁওতালদের ছেলেগুলো বেড়ায় কুলি কুলি॥

—সংগ্রাহক অজিত কুমার মিত্র

(সংগ্রহ শাদিপুর সাঁওতাল পরগণা গংগাধর চক্রবর্তীর কাছ হইতে,
১৩৭৫, বাংলা সাল।)

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহ ছিল ইংরেজ সরকার ও লুটেরা মহাজন ও জমিদারদের বিরুদ্ধে। ইংরেজ সরকার অমানুষিক অত্যাচার ও হত্যা করে এই বিদ্রোহ দমন করে। ইতিহাসে তা স্বাধীনতার লড়াই নামে বিখ্যাত। সেইকালে লোক রচনায় এই বিদ্রোহ সম্পর্কে জানা যায়। ১৩৫৫ বাংলা সালে সংগ্রাহক কর্তৃক এই ছড়াটি সংগৃহীত। সংগ্রাহক—অজিত কুমার মিত্র।

সাঁওতাল বিদ্রোহ বিষয়ক

সাঁওতালি গাথা

মেরম গুপি ট্যাণ্ডিরে খিলাড়
চিৎ বাহাম সিৎলে

সাফ ইদিম কনে॥
মেরেকগুপি ট্যাণ্ডি রেদ
চিৎ বাজাল এমচিকা লেদা ?
চিৎকু বাজাল মেচিকা লেদা
মেড়াম গোপী ট্যান্ডী ঘনুক
সাফ ইদিম কানে॥

ও কয় হুকুম তো বাজাল
ওজয় হুকুমতে বাজাল
ও কয় বলেতে
রূপু সিং তামুলি দম মাঃ লিদি
রূপু সিং তামুলি দম হেলেচ় লিদি
সিধো হুকুমতে নায়-গ-কানহু বলেতে
রূপু সিং তামুলি দক্র হেলেচ লিদি

তি রেতাম হাড়ি বাজাল
ডান্ডা রেতাম বেড়ি বাজাল
আমদম চালাকান বাজাল
শিদুরি হাজৎতে।
তিঃ রেতাম তিরিয়ে
জাঙ্গা বেতাম লিপুর
আমদম চালাঃ কানা শিদুরী মেলা এেন॥

বাংলায় এ গানের অর্থ এ রকম—বাজাল, মাঠে ছাগল চরাবার সময় তোকে পুলিশ ধরল কেন ? তোকেও এবার সিউড়ি নিয়ে যাবে। হাজতে পুরে দেবে। তুই নাকি খুন করেছিস ? খুন করলে তো ফাঁসি হবে ?

বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তরে কিশোর বাজাল উত্তর দেয়—আমি রূপু সিং তামুলিকে খুন করেছি।

কার হুকুমে খুন করেছিল তুই ?

সিধো কানহুর হুকুমে আমি ঐ তামুলিকে খুন করেছি।

তোর পায়ে তো ডাণ্ডা বেড়ি। হাতে তো শিকল, কী করবি এবার ?

ডাণ্ডা বেড়ি নয় গো, এগুলি আমার পায়ের মল।

আমি সিউড়ি মেলায় নাচতে যাব।

হাতে শিকল রয়েছে যে—

না ওটা শিকল নয়, ওটা আমার বাঁশি। আমি মেলায় নাচব, বাঁশি বাজাব।

—তোর তো ফাঁসি হবে ?

—হোক না ! আমি এ গাঁয়ে আবার আসব। আমি মরব না।

বাজালের গান বীরভূমের সাঁওতাল পরগণা সংলগ্ন সাঁওতাল পল্লীগুলিতে আজও শোনা যায়। আর শোনা যায় সাঁওতাল পরগণায়। এ গানে মাদল বাজে না। এ গানের সাথে বাজে বানাম ও বাঁশের বাশি। বানাম হল সাঁওতালদের নিজস্ব বেহালা।

এ গানের অপূর্ব মূর্ছনা। সে মূর্ছনায় বেজে ওঠে একদিকে বেদনার সুর। আর অন্যদিকে সংগ্রামী প্রত্যয়। বাংলায় একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি এ গানের অনেকটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়।

আপাততঃ আমার কাহিনী শেষ হল। এ কাহিনীর শেষ নেই। ছোট্ট নদী কুশকর্ণিকার এ কাহিনীর মত বহু কাহিনী আজ আড়াইশ বছর ধরে লেখা হচ্ছে ভারতবর্ষের গ্রাম নগরে। কত নদনদীর তীরে তীরে। কত পাহাড় পর্বতের অরণ্য বেষ্টিত জনপদে জনপদে। তাই বলি, এ কাহিনী অনন্ত। তার শেষ নেই।

বীরভূমের জাতীয় আন্দোলন

অরুণ চৌধুরী

১৭৫৭ খৃঃ অব্দে পলাশীর যুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হল। ঐ যুদ্ধে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দি খাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লা পরাজিত হলেন। বিজয়ী হল ক্লাইভের নেতৃত্বে পরিচালিত ব্রিটিশ বাহিনী।

পলাশীর যুদ্ধে সুবে বাংলার যে সব জমিদাররা সিরাজের পক্ষে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, রাজনগরের রাজা আজাদ-উল-জমাখাঁ ও তাঁর ভাই আলি নকি খাঁ। পলাশীর যুদ্ধের আগে সিরাজকে কলকাতায় ইংরাজদের দুর্গ আক্রমণ করার সময়েও আলি নবি খাঁ সৈন্যবাহিনী নিয়ে সিরাজ বাহিনীর সহযোগী হয়েছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পরে প্রথমে মীর জাফর আলি খাঁ নবাব হলেন। তাঁকে ইংরাজরা পদচ্যুত করার পরে নবাব হলেন মীর কাসিম খাঁ। আসাদ-উদ-জমাখাঁ তাঁর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করলেন। মীর কাসিম খাঁ ইংরাজদের সাহায্য নিয়ে রাজনগরের রাজা আসদ-উল-জামানকে শায়েস্তা করার জন্য ব্রিটিশ সেনাপতি এল. ম্যাক লিয়ন ও তকি খাঁকে পাঠালেন। যুদ্ধে আসদ-উল-জামানকে পরাস্ত হতে হল। এ ঘটনা পলাশী যুদ্ধের সাতবছর পরের। প্রকৃতপক্ষে ১৭৭০ সন পর্যন্ত বীরভূমের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ডামাডোল ছিল। সামগ্রিকভাবে সুবে বাংলাতেই ডামাডোল ছিল। এখানেও তাই। এখানকার ডামাডোলের প্রধান কারণ হল যে, রাজনগরের রাজা আসদ-উল-জামান বৃটিশদের কাছে হার মানতে চাননি। শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল।

এলো মন্বন্তর। ১৭৭০-৭১ সনে সর্বনাশা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। বাংলা ১১৭৬ সনে ঐ মন্বন্তরের সূত্রপাত। তাই, ঐ নাম। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার অনেক স্থানের মত বীরভূম শ্মশানে পরিণত হয়। তার মর্মস্পর্শী বিবরণ রয়েছে এই গ্রন্থেরই ই. জি. ড্রেক-ব্রুকম্যানের 'নোটস্ অন দি আর্লি এডমিনিস্ট্রেশন অব দি ডিস্ট্রিক্ট অব বীরভূম' নিবন্ধে। ১৮০৮ সনে ঐ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

১৭৭১ সনে বীরভূমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত সুপার ভাইজার মিঃ হিগিনসন লিখেছেন—মন্বন্তরের ক্ষয়ক্ষতি ভয়াবহ, বহু গ্রাম জনশূন্য। জমিতে চাষ করার লোক নেই। তাই, চাষ হচ্ছে না। জমি পতিত পড়ে রয়েছে। নগরেও তিন চতুর্থাংশ ঘরে মানুষ নেই। তিনি প্রজাদের এই দুর্গতির দিনে খাজনা আদায় বন্ধ রাখার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তাদের কাছে (কাউন্সিল) আর্জি জানালেন। কিন্তু সে আর্জি মঞ্জুর হল না।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও একটা অনিশ্চয়তা। ১৭৬৫ সনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানীর কর্তৃত্বের সনদ নিয়ে এলো। ঐ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তারা ভূমি রাজস্বের আদায় বাড়াবার উপর মন দিল। মন্বন্তরের সময়েও তারা জোর জুলুম করে খাজনা আদায় করল।

এদিকে রাজনগরের রাজ পরিবার ক্রমশ কোনঠাসা হচ্ছে। ইংরাজরা তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও প্রশাসনিক ক্ষমতা উভয়ের রাশ টেনে দিল। রাজার সামরিক বাহিনীর লোকজনকে ছাটাই করা হল। ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনের নামে ঘাটোয়াল ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষক, যোদ্ধাদের দেওয়া 'খালসা' জমি, 'চাকরাণ' জমি প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করা হল। জমির পরিবর্তে নগদ টাকায় বেতনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল।

চাকুরীচ্যুত ঘাটোয়াল ও যোদ্ধারা রাজার জমিদারির সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। রাজার জমিদারি ছিল সুবিস্তৃত। বর্তমান ঝাড়খন্ড ও সাঁওতাল পরগণার দেওঘর বা বৈদ্যনাথ ধাম পর্যন্ত পশ্চিমসীমা আর পূর্বে কেতুগ্রাম থানা পর্যন্ত, দক্ষিণে বর্তমান রামপুরহাট মহকুমা, উত্তরে বর্ধমানের জঙ্গল মহল হয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে ধানবাদ পর্যন্ত। অর্থাৎ বিষ্ণুপুরের মল্লরাজদের জমিদারির কাছাকাছি পর্যন্ত। তৎকালীন সুবে বাংলার সর্ববৃহৎ জমিদারির মালিক ছিলেন রাজনগরের রাজা।

চাকুরীচ্যুত ঘাটরক্ষক ঘাটোয়াল। যোদ্ধা বাহিনীর লোকজন ঐ সময়ে বিদ্রোহের পথে পা বাড়াল। তাদের সাথে যুক্ত হল দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মানুষেরা। অভাবী কৃষকরা। ঐ বিদ্রোহের কর্মপদ্ধতি ছিল ডাকাতি ও সম্পদশালীর সম্পদ লুঠ প্রভৃতি। কিন্তু তার শরিক সমাজের নীচু তলার বিপুল সংখ্যক মানুষ। তাই, পরিণত হল গণ বিদ্রোহে। নেতৃত্বে সাধারণ ঘরের সন্তানেরা। তাঁদের মধ্যে 'জীবনে ডাকাত' বা জীবন বাউড়ির কথা সরকারি নথিতে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর ফাঁসি হয়েছিল।

জঙ্গল মহল থেকে আরম্ভ করে রাজনগর 'রাজের' জমিদারির প্রায়

সর্বত্রই তখন অসন্তোষ ব্যাপকভাবে বর্তমান। তা থেকে অশান্তি ও অরাজকতা।

পুরানো ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর পরিণতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের ছয় 'শতাধিক মণ্ডল' রাজস্ব আদায়ের অধিকার চ্যুত হল। ফলে, এই গণ বিদ্রোহের পৃষ্ঠপোষক হল ঐ মণ্ডলেরাও।

এই সময়ে উত্তর বঙ্গের বিখ্যাত সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-৭৮) ফকির বিদ্রোহেরও প্রভাব পড়ল বীরভূমের বিভিন্ন স্থানে। রাজনগরের রাজপরিবার ছিল সুফি মতবাদে বিশ্বাসী।

ঐ সূত্রধরে রাজনগরে ফকিরদের আনাগোনা ছিল। এখানকার গণবিদ্রোহের সাথে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও ফকির বিদ্রোহের কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা, তা গবেষণার বিষয়, কিন্তু ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের প্রারম্ভিক পর্বে গোটা সুবে বাংলায় যে কৃষক সমাজের প্রতিরোধ সংগ্রাম ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দিয়েছিল, এ ইতিহাস আজ অনেকখানি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার ব্যাপক অঞ্চলে প্রায় পঞ্চাশ বছর গণবিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বলেছে। এই সব গণ বিদ্রোহের শরিক ছিল বাংলার দরিদ্র, সামন্ততান্ত্রিক শোষণজর্জর নানাভাবে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত কৃষক সমাজের মানুষরা, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সাথে সোনায় সোহাগা হয়েছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাকাতদের ব্যবসার নামে লুণ্ঠন ও অত্যাচার। এটা সেদিনের বাংলায় ছিল সার্বিক। সেদিনের বৃহত্তর বীরভূম সেই গণবিদ্রোহের পুরোপুরি শরিক হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের ভিৎ এ জেলায় জয় করতে পলাশীর যুদ্ধের পরে কমপক্ষে বছর ত্রিশেক লেগেছিল।

লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) সুবে বাংলার ভূমি ব্যবস্থার আমূল রূপান্তর ঘটাল। জমিতে কর্ষণকারী যে কৃষকের মালিকানা স্বত্ব মান্ধাতার আমল থেকে ছিল, তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বরবাদ হয়ে গেল। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ব্রিটিশ বণিকদের সংগঠন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্নেহধন্য ও প্রাসাদ পুষ্ট মুৎসুদ্দি ও বেনিয়ানরা জমিদারে পরিণত হল। পুরানো সামন্ত-পরিবারগুলির অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। রাজনগরের 'রাজপরিবার' তাঁদের অন্যতম। সেখানে বীরভূমের নতুন জমিদার হলেন আসাদ-উল-জমার্খার 'রাণী' লালবিবিব রসুই বাঁকুড়া থেকে আগত হেতমপুরের বাসিন্দা রাধানাথ চক্রবর্তী। তিনি হেতমপুরের জমিদার পরবর্তীকালে রায়বাহাদুর-রাজা-মহারাজা চক্রবর্তী পরিবারের ভাগ্যতরীর প্রথম সুযোগ্য কর্ণধার। ব্রিটিশ শাসকদের সার্বিক সহায়তাকারী, একান্ত বশংবদ ও খয়ের খাঁ হিসাবেই রাধানাথ-নন্দন-বিপ্রচরণ সাঁওতাল হাঙ্গামা দমনে ব্রিটিশ শাসকদের ঐকান্তিক সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য সাঁওতাল অভ্যুত্থানোত্তর কালে ছোটলাট কর্তৃক 'রায়বাহাদুর' উপাধির শিরোপা পান।

'মেজো জমিদার' মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা থেকে বোলপুরের রায়পুরে আগত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'গড়ার কাপড়ের' উৎপাদন ও ব্যবসায়ের দালাল লাল চাঁদ সিংহের পরিবার। আর কিছুটা বর্ধমানের রাজ পরিবার। এছাড়া নীলামে কলকাতার মুৎসুদ্দি ও বেনিয়ানরা কেউ কেউ কিনেছিলেন, যাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকা নাথ ঠাকুর অন্যতম।

পরবর্তীকালে তালুকদার, পত্তনীদার, দর-পত্তনীদার প্রভৃতি বহুবিধ মধ্যস্বত্বভোগী দেখা দিল। ও ম্যালির গেজেটিয়ার অনুযায়ী (১৯১০) ১৯০৮-০৯ সনে সরকারী কোষাগারে সরাসরি রাজস্বে পরিশোধকারী মোট মধ্যস্বত্বভোগী এস্টেট ছিল ১,০৫৮ টি। তাদের মধ্যে ১,০৫২ টি ছিল চিরস্থায়ী প্রকৃতির।

ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানী নীলকর ও তাদের প্রসাদপুষ্ট সামন্ত শ্রেণীর নির্মম শোষণ, লুণ্ঠন ও তার সাথে অমানুষিক অত্যাচার ও নিপীড়নে এজেলার আখ চাষী, নীলচাষী, তন্তুবায়, লাক্ষা চাষী, রেশম চাষী, তসর গুটির উৎপাদক উপজাতীয় ও সমাজের নীচুতলার মানুষরা তথা সামগ্রিকভাবে কৃষকসমাজ ও কুটির শিল্পীদের জীবনের ব্যাথা ও বেদনা ছিল অপরিসীম।

এইসব শোষণ, নিপীড়ন, নির্মম লাঞ্ছনা ও অবিচারের বিরুদ্ধে বাংলার কুটির শিল্পী, কৃষক সমাজের নীচুতলার অংশ, উপজাতীয় ও উপজাতি সদৃশ অনগ্রসর সমাজের মানুষরা এ জেলাতেও বাঁচার তাগিদে নিঃসন্দেহে মাথা তোলার জন্য প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ায় তৎপর হয়েছে। কিন্তু তার ইতিহাস আজও অনুদঘাটিত এবং অবর্ণিত।

বীরভূমের কৃষক সমাজের প্রথম অভ্যুত্থান ঘটল ১৮৫৫ সালে। যা ইতিহাসে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' বা সাম্রাজ্যবাদীদের ভাষায় 'সাঁওতাল হাঙ্গামা' নামে আখ্যাত। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের (১৮৫৭) প্রাককালে বীরভূমের উপজাতীয় কৃষক ও তাঁদের সহযোগী অ-উপজাতীয় গরীব কৃষক, বিধ্বস্ত তাঁতশিল্পের শিল্পী জোলা সম্প্রদায়, লোহার পিণ্ড সংগ্রাহক ও উৎপাদক কামার লোহার প্রভৃতি মানুষরা, গোয়ালা সম্প্রদায়ের মানুষরা, ঐ বিদ্রোহের শরিক হলেন, প্রাণ দিলেন। নিষ্ঠুর কারাদণ্ড ভোগ করলেন। তাঁদেরও ঘরবাড়ি পুড়ল, যার বিবরণ অন্যত্র প্রবন্ধকারে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহকারে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে।

তাই, তথাকথিত সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল অভ্যুত্থান পরবর্তীকালে গঠিত সাঁওতাল পরগণা সহ বৃহত্তর বীরভূমের এক গণসংগ্রামের অমর কাহিনী।

কৃষকদের সংগ্রাম নতুনরূপ নেয় বিশ শতকের বিশের দশক থেকে। তার

আগে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের (১২৫০-১৩১৬) নেতৃত্বে লাভপুর থানায় 'লাঘোষা প্রজা সমিতি' গঠিত হয় (১৮৮২)। ঐসময়ে লাভপুর থানার দাঁড়কা সংলগ্ন কিছু গ্রামে দাঁড়কার জমিদারদের দ্বারা প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজা আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর কোনো বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি। কেবল ভারত সভার (প্রতিষ্ঠা ১৮৭৬) কার্য বিবরণীতে প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে ছোট লাট ইডেন প্রস্তাবিত টেনান্সি বিলের সমর্থনে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে লাঘোষা প্রজা সমিতির কথা উল্লেখিত রয়েছে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন

বিশ শতকের গোড়ায় হল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। তাতে বীরভূমেও আলোড়ন হয়েছিল। যদিও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালিক জাতীয় বুর্জোয়ার প্রতিনিধিরা। যাঁরা মূলত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। শিক্ষিত পেটি বুর্জোয়াদেরও ঐ সময়কার জাতীয়তা উদ্দীপক আন্দোলন তথা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

বীরভূমে তখনও জাতীয় বুর্জোয়ার জন্ম হয়নি। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পেটিবুর্জোয়ার সংখ্যাও ছিল খুবই সীমিত। বলা যায়, তাঁদের সংখ্যা হাতে গোণা যেত। ১৯০৮-০৯ সনে বীরভূমের দশম শ্রেণী যুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ১৬১০ জন। আর একটি মাত্র কলেজ—হেতমপুর রাজ কলেজে ১৯০৯ সনের ৩১শে মার্চ তারিখে মোট ছাত্র ছিল (সহশিক্ষা ছিল না) মোট ৪৬ জন। ১৯০১ সনে সাক্ষরের হার ছিল শতকরা ৭.৭ জন।

কাজেই, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতে তখনও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরবর্তী প্রথম আলোর বিন্দুমাত্র আভাস ফুটে ওঠেনি। বলা যায়, তখনও তমসাচ্ছন্ন গভীর রাত্রি।

জাতীয় আন্দোলনে এ জেলার যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অন্যতম প্রয়াত সুরেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর আত্মকথা- আমার কথায় লিখেছেন, "১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, রাখীবন্ধন উৎসবে আমি উপবাস করি এবং মা ও দিদি এই উপবাস হইতে নিরস্ত করিতে না পারিয়া বাড়ীতে অরন্ধনও সফলতার সহিত প্রতিপালিত হয়"।

সুরেন বাবুর উল্লেখিত 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' আসলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। তিনি তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তিনি আরও লিখেছেন—"প্রখ্যাত দেশ সেবক, বাগ্মী ও কংগ্রেস কর্মী শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ মহাশয়দ্বয় দুবরাজপুর জনসভায় বক্তৃতা দিতে আসিলে

আমি কয়েকজন সহপাঠীসহ দুবরাজপুরে যাই এবং অন্যান্যদের সহিত বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের গাড়ী টানিবার সৌভাগ্য লাভ করি"।

বীরভূমে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন জয়দেবের মোহান্ত প্রয়াত দামোদর ব্রজবাসী। তাঁর কথাও সুরেন সরকার তাঁর ঐ বই-এ লিখেছেন— "জয়দেবের মোহান্ত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেও বিলাতি দ্রব্য বর্জনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। হস্তী পৃষ্ঠে আরূঢ় অবস্থায় স্বেচ্ছাসেবকগণের সহযোগিতায় স্বদেশ সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে তাঁহার গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিক্রমণ যে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করিত তাহাই নয়, প্রত্যুত জনমানসে উহা উল্লেখযোগ্য স্বতস্ফূর্ত সাড়া জাগাইতে সক্ষম হইত। মহিলারা কাঁচের চুড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। কেহ কেহ বিলাতি বস্ত্রের বহ্ণুৎসব করিয়া গর্ববোধ করেন। বলা বাহুল্য, আমিও এই আন্দোলনে কি এক প্রেরণায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম"।

ভারতে অস্ত্র আইনে দন্ডিতা প্রথম নারী প্রয়াত দুকড়িবালা দেবী (১৮৮৭--১৯৭০) তাঁর আত্মজীবনী আমার কথা ও নিবারণের কথায় লিখেছেন— "১৩১২ সালে ৩০শে আশ্বিন বঙ্গচ্ছেদ হয় এবং গ্রামে গ্রামে একেবারে হৈ চৈ ব্যাপার আরম্ভ হয় এবং ১৩১২ সালে ২৭শে আশ্বিন আমার বড় ছেলে কানুর জন্ম হয় কোজাগরি পূর্ণিমার দিনে। আমার স্বামী তখন আসানসোলে রেলওয়ে টেলিগ্রাফি চাকরি করিতেন। ২রা কার্তিক তিনি কর্ম্মস্থলে চলে যান। পৌষ কিংবা মাঘ মাসে তিনি কাজে ইস্তফা দিয়ে নিজে কিছু অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন এবং এসেই আমার বিলাতি কাপড়ের বাক্সর উপর নজর দেন এবং কয়খানি শান্তিপুরী শাড়ি ছাড়া ১০/১২ খানি শাড়ি নিয়ে তাহা পোড়াইবার বন্দোবস্ত করেন। আমি অনুনয় করে তাহা আমার ছেলের কাঁথা করিব বলি, কিন্তু তিনি পোড়াইতে বদ্ধ পরিকর। আমার ৺পূজনীয়া শাশুড়ি ঠাকুরাণী ও ৺মাতা ঠাকুরাণী ও ৺পিসিমাতা ঠাকুরাণীর সকলের অনুরোধে তিনি নিরস্ত হলন। কিন্তু গোপনে আমার তাঁহার পা ছুঁয়ে দিব্য করানযে জীবনে কখনও বিলাতি কাপড় ব্যবহার করিব না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কাহার কাছে প্রতিজ্ঞা করিলে ? আমি উত্তরে বলি আমার দেবতার কাছে, মৃত্যু পর্যন্ত একথা ভুলিব না। এই আমার স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা"। (আগুনের পরশমণি,—সম্পাদনা অরুণ চৌধুরী পৃষ্ঠা ২৫ ও ২৬)

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় (১৮৯৮ -১৯৭১) তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন যে বঙ্গভঙ্গের দিনে মা তাঁর হাতে রাখী পরিয়েছিলেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও রাখী পরার কথা লিখেছেন। সম্ভবত ছোঁয়া লেগেছিল মুর্শিদাবাদে।

ঐ আন্দোলন এ জেলাতেও কিছু ঢেউ তুলেছিল, সেযুগের তিনজন

প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির লেখার উদ্ধৃতিগুলি থেকে তা বোঝা যায়। তবে, ব্যাপক ঢেউ যে কিছু ওঠেনি তাও পরিষ্কার। কারণতো আগেই বলেছি যে, বীরভূমের সমাজে তখনও জাতীয় বুর্জোয়ার জন্ম হয়নি। আধুনিক শিক্ষাও খুব সীমিত সংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। যাঁরা লেখাপড়া শিখেছিলেন তাঁরা মূলত মধ্যস্বত্বের প্রসাদভোগী সামন্ত পরিবারের সন্তান। লেখাপড়া শিখে সরকারি চাকুরি বা আইন ব্যবসায়—উকিল বা মোক্তার হওয়া ছিল জীবনের মূল লক্ষ্য। বীরভূমে সেদিন যাঁরা মাধ্যমিক শিক্ষক বা কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই পদ্মাপারের সন্তান। কিংবা মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুলগী থেকে আগত। তাই, বস্তুগত পরিস্থিতি ও মন্ময় পরিস্থিতি অর্থাৎ অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ কণ্ডিশন দুটোই ছিল সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত।

উদ্ধৃত অংশগুলি থেকে দেখা যায়, দুকড়িবালার স্বামী স্বদেশপ্রেমের ছোঁয়া এনেছিলেন আসানসোল থেকে। দামোদর ব্রজবাসী গোরক্ষপুরের সন্তান। প্রয়াত সুরেন সরকারের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল কয়লাখনি অঞ্চলের সাথে। আর তাঁর পরিবারের বিশেষ কোনো জমিজমা বা মধ্যস্বত্ব ছিলনা। এটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্করের জননী ছিলেন ভাগলপুরের প্রবাসী বাঙালীর দুহিতা। স্বদেশ মন্ত্রের ছোঁয়া সেখান থেকেই। তারাশঙ্করের মাতুল পরিবার চাকুরীজীবী ছিলেন। ভূমিজীবী ছিলেন না। প্রবাসী বাঙালীরা নোক্‌রি নিয়েই বঙ্গভূমির গ্রাম ত্যাগ করেছিলেন।

বীরভূমে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের ঢেউ প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পৌঁছায়নি। অন্তত পৌঁছাবার কোনো নজির নেই। রিভালবার নিয়ে প্রথম খেলা খেলেছিলেন এক বীরভূম নন্দিনী। আবার বধূও। বীরভূমে পরিচিত পরিবারগুলির মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন কেবল মুসলিম পরিবারের বৈশিষ্ট্য নয়। হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ উভয় অংশেই সেদিন ছিল।

দুকড়িবালা কীভাবে স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন, তাঁর জবানবন্দীতে আমরা তা পাচ্ছি। আর বিপ্লব মন্ত্রের দীক্ষাদাতা তাঁর বোন্‌পো—নিবারণ ঘটক (১৮৯১--১৯৬০)। শিয়ার-সোলের সন্তান। কবি নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু। বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলির ছাত্র এবং বিপ্লবী জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষের সহযোদ্ধা।

দুকড়িবালা তাঁর পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় নলহাটি থানার ঝাউপাড়া গ্রামের নিবাস থেকে কয়েকটি বড় কোম্পানীর ৫০টি মশার পিস্তলও কয়েকশত কার্তুজ সহ ১৯১৭ সনের ৮ই জানুয়ারি গ্রেপ্তার হন। একই দিনে গ্রেপ্তার হলেন নিবারণ ঘটকও। তাঁকে ধরা হল শিয়ারশোলে।

বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের মূল্যোৎপাটনের জন্য তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার

কর্তৃক এঁদের বিরুদ্ধে আনীত রাজনৈতিক মামলাই বীরভূমে প্রথম রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলা। ওঁদের বিচার হল স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালে। বিচারে উভয়েই দোষী সাব্যস্ত হলেন। দুকড়িবালার হল দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। আর নিবারণ ঘটক পাঁচবছর মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছে যথাক্রমে ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালে। মাঝখানের ইতিহাস অজ্ঞাত ও অনুদঘাটিত। তবে, অনুশীলন দলের প্রতুল গাঙ্গুলি যুগান্তর দলের নরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি শ্রীসংঘের রেবতী বর্মন (১৯০৫-৫২) প্রভৃতি সংগঠকদের এ জেলার সাথে সংযোগ ছিল। তারও আগে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে প্রয়াত কামদা কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৬-১৯৮৬) সাথে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীদের সম্পর্ক আছে এই সন্দেহে কামদাকিঙ্করকে গ্রেপ্তার করে ব্রহ্মদেশের মৌলমেন জেলে বন্দী হিসাবে পাঠানো হয়। অবশ্য, জেলায় তিনি গান্ধীবাদী হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। তাঁকে ধরা হয়েছিল শ্রীরামপুরে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জাতীয় কংগ্রেস মডারেট ও চরমপন্থী ধারার ক্ষেত্রে এ জেলায় কতটা কি ছিল বলা মুস্কিল। তবে, এই পর্বে রামপুরহাটের অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাদেশিক স্তরেও অনেকখানি সামনের সারিতে চলে এসেছিলেন। অনুমাণ করা যেতে পারে যে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীরাও এ জেলায় তখন আনাগোনা করতেন। আর রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও তার আশেপাশে এবং নলহাটিতে এই যোগাযোগ ছিল, একথা মনে করার অনুকূলে কতগুলি বিষয় আছে। শান্তিনিকেতনে কালী মোহন ঘোষ ছিলেন তখন অন্যতম যোগসূত্র। দুকড়িবালা নিবারণ ঘটকের গ্রেপ্তার তো এই সময়কালেই।

প্রথম যুদ্ধোত্তর পরে অসহযোগ আন্দোলনে এজেলায় ব্যাপকভাবে কিছু ঘটেনি। তবে, অধ্যাপক জিতেন্দ্র লাল, রায়পুরের ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৬-১৯৮৯) শরডাঙ্গার আবদুল হালিম (১৯০৩-১৯৬৬) রামপুরহাটের শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, গোপিকা বিলাস সেন প্রমুখ কিছু রাজনৈতিক কর্মী অসহযোগ আন্দোলনে কারাবরণ করেন। ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় ও কমরেড আবদুল হালিমের কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক। তাঁরা বীরভূমের সন্তান। পরবর্তী জীবনে ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় জেলায় আসেন। কমরেড আবদুল হালিম অসহযোগ আন্দোলনে জেল খাটার পরে জেলায় এসে কিছুদিন জিতেন্দ্রলালের সহকর্মী হিসাবে রাজনৈতিক কাজকর্ম করেন। ১৯২২ সনে তিনি কমরেড মুজফ্ফর আহমদের (১৮৮৯-১৯৭৩) অন্তরঙ্গ সহকর্মী ও সহযোদ্ধা হিসাবে কমিউনিষ্ট আন্দোলন গড়ার কাজে সর্বভারতীয় স্তরে কাজ করেছেন। তবে জেলার সাথেও

তাঁর সম্পর্ক ছিল। কমরেড আবদুল হালিমের অগ্রজ কমরেড সামসুদ্দিন হুসায়ণ (১৮৯২-১৯২৬) মূলত কলকাতা-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। তবে জেলায় প্রজা সংগঠন ও আন্দোলন গড়ার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ উদ্যোগ ছিল। এক্ষেত্রে বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের অনুসারী অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮১--১৯৪০) নেতৃত্বে সংগঠিত যে প্রজা আন্দোলনের পাশাপাশি বামপন্থীদের উদ্যোগে সংগঠিত প্রজা আন্দোলন, তার শেষোক্ত ধারায় প্রজাদের সামন্ততন্ত্র বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে সংগঠিত করার জন্য কমরেড সামসুদ্দিন হুসায়ণ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্রখ্যাত আইনজীবী অতুল চন্দ্র গুপ্ত, ঔপন্যাসিক নরেশ সেনগুপ্ত, হেমন্ত কুমার সরকার, কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতির উদ্যোগে ও পারস্পরিক সহযোগিতায় জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ যে কৃষক মজুর সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯২৫) তিনি তাঁর অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। অল্পদিন পরেই তিনি মারা যান। তিনি জোড়া সাঁকো ঠাকুর বাড়ির সন্তানদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। শ্রীনিকেতন (১৯২১-২২) গঠিত হলে সেখানে যোগদান এবং সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কালীমোহন ঘোষের অন্যতম সহযোগী ছিলেন।

ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে ১৯২০ সন পর্যন্ত দুটি মূলধারা ছিল। (এক) সংস্কারবাদী ধারা। ঐ ধারাই পরবর্তীকালে গান্ধীবাদী ধারা হিসাবে দেশ-বিদেশে সুপরিচিত (দ্বিতীয়) এ ধারা হল চরমপন্থী ধারা বা বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী ধারা।

সম্রাট জারশাসিত রুশদেশে নভেম্বর বিপ্লবের (১৯১৭) পরে বিশ্বের বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দেশে একদিকে যেমন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের তীব্রতা ও গতিবেগ বাড়ে, তার পাশাপাশি শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব সংগঠনের ধারাও যুক্ত হয়। বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দেশে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও গঠিত হয়। তার সাথে সাথে ব্রিটিশ ভারতেও কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা সংযুক্ত হয়। এভাবে এলো তৃতীয় ধারা। এই সংযোজনের গুপুত্ব অপরিসীম।

সমাজের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে মার্কসবাদী চিন্তার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অনুপ্রবেশ ঘটে। বীরভূমের দুই কথা সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) সৃষ্টিরাজিতে ঐ ভাবধারার পরোক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট।

বীরভূমের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে এ জেলার রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল ১৯৩০ ও ১৯৩১ সনের আইন অমান্য আন্দোলন। এই সময় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অংশেরও প্রসার ঘটে। তবে, তা যে খুব বেশি নয়, তা বলা বাহুল্য।

জেলা গেজেটিয়ার বীরভূম, সম্পাদক দুর্গাদাস মজুমদার (ডিসেম্বর, ১৯৭৫) এ শিক্ষিতদের যে সংখ্যা পাই তাতে দেখা যাচ্ছে, ১৯২০-২৯ এই দশ বছরে ম্যাট্রিকুলেট ও তদূর্দ্ধ পুরুষ মোট ৭,০৯৬ এবং নারী ৬৪০ জন। শতকরা হার ৬.১% এবং নারী ০.৫%। আশ্চর্যের বিষয় হল বাস্তবতা হল ১৯৩০-১৯৫৯ এই বিশ বছরে গড় ম্যাট্রিকুলেট ও তদূর্দ্ধ নরনারীর গড় হল—পুরুষ ৭,০০০ এবং নারী ৩১০। অর্থাৎ কমে গেল শতকরা হার ৩.২ এবং ০.২।

বীরভূমে ব্রিটিশরাজের বৈরিতা

একী তেতাল্লিশের মন্বন্তরের জীবনান্তক করাল থাবার পরিণাম ? এরমধ্যে বারোবছর তো স্বাধীনতা উত্তর পর্ব। তবু, এত অন্ধকার !

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যার স্বল্পতার পাশাপাশি আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। জেলায় জমিদার থেকে আরম্ভ করে ১৯২৪-৩২ সাল পর্যায়ে যে প্রথম সার্বিক জরিফ হয় এবং যা বি. বি. মুখার্জ্জীর প্রতিবেদন হিসাবে পরিচিত, তাতে দেখা যায় বিভিন্ন ধরণের মধ্যস্বত্ব ভোগীর সংখ্যা ছিল মোট ১,৯১০ জন। তাঁদের মধ্যে, জমিদার ১,১০৪ জন। এঁদের মধ্যে সাড়ে সাতগণ্ডার জমিদারের সংখ্যা কম ছিলনা। তাঁরাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মকথায় তাঁদের দুর্গতি ও আর্থিক দৈন্যের কথা লিখেছেন।

১৯২৯ সনের আন্তর্জাতিক মন্দার আঘাতে এই সামন্ততন্ত্রের ভাঙ্গা দেউলে নতুন যুগ চেতনার সূর্যের প্রথম আলোর অনুপ্রবেশ করল। অবশ্য, ঔপনিবেশিক দেশের কোমরবাঁকা ও সামন্ততন্ত্রের মোহাচ্ছন-মাখা জাতীয় বুর্জোয়ার সেই দৃঢ়তা নেই তার চরিত্র—এক ঠ্যাং লটর পটর এক ঠ্যাং খোঁড়া/বাবা বদ্যিনাথের ঘোড়া। যার জন্য নানা দোদুল্যমানতা তার চরিত্রে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েও তার পিছনের টান সামন্ততন্ত্রের প্রতি। নভেম্বর বিপ্লব পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক দেশের জাতীয় বুর্জোয়ারা নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থরক্ষার তাগিদে এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সামন্ততন্ত্রের সাথে গাঁটছড়া বাঁধে।

১৯২৮ সনে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে কমরেড স্তালিন তাঁর রিপোর্টে ভারতবর্ষ ও চীনের জাতীয় বুর্জোয়ার চারিত্রিক এই বৈশিষ্ট্যের দিক বিশেষভাবে উদ্‌ঘাটন করেছিলেন।

বীরভূমের জায়মান জাতীয় বুর্জোয়ার এই চারিত্রিক দুর্বলতার মধ্যেই তাঁদের এক অংশ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি ছিলেন ভাঙ্গা সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি। এজাতীয় আরও কিছু সংখ্যক শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানরা ছিলেন। যাঁদের প্রায় সবাই মধ্যস্বত্বভোগী ঘরের সন্তান। তাছাড়া,

চাকুরিজীবী কিছু পরিবারের সন্তান। কিছু মাঝারি ও দরিদ্র কৃষক ঘরের সন্তান ঐ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেন।

এই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে কারাভোগকারীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন জেলে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী ও চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের অন্যতম নায়ক অম্বিকা চক্রবর্তীর দ্বারা প্রভাবিত হন। ঐ বিদ্রোহের পরে তাঁকে সিউড়ি জেলে বন্দী রাখা হয়েছিল। সেখানেই ঐ যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

বীরভূমে অনুশীলন দল, যুগান্তর দল প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কাল থেকে এ জেলায় যাতায়াত করতেন। দুকড়িবালা ও নিবারণ ঘটককে অভিযুক্ত করে প্রথম রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলার পরে ঐ বিষয়টা কিছুটা সামনে চলে আসে। বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলির দুবরাজপুর সন্নিহিত গড়গড়া গ্রামের বিপ্লবী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, লাভপুরে অবস্থান করা বিপ্লবী নরেন বন্দ্যোপাধ্যায় (গণদেবতার ডেটিনিউ বাবু), অনুশীলন দলের প্রতুল গাঙ্গুলি, শ্রীসংঘের রেবতী বর্মন এই সময়কালে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী চিন্তা দিয়ে এজেলার স্কুল-কলেজ পড়া কিছু যুবককে প্রভাবিত করেন।

'যুগান্তর দল' ও শ্রীসংঘের কর্মীদের যুক্ত প্রচেষ্টায় সিউড়ি জেলে আটক অম্বিকা চক্রবর্তীকে জেল ভেঙ্গে মুক্ত করার একটা পরিকল্পনা রচিত হল। কিন্তু তা আকস্মিকভাবে ফাঁস হওয়ায় অম্বিকা চক্রবর্তীকে রাতারাতি মেদিনীপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হল। ঐ সাথে আরও কয়েকজন মেদিনীপুরে স্থানান্তরিত হলেন।

এই সময় সিউড়ি জেলে গান্ধীবাদী নেতা নির্মল কুমার বসু থেকে আরম্ভ করে লীনা রায়, আশালতা সেন, রেবতী বর্মন, গোপাল ঘোষ, অমলেন্দু দাশগুপ্ত প্রমুখ বেশ কয়েকজন প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী সিউড়ি জেলে বিনা বিচারে বন্দী জীবন যাপন করছিলেন। এ জেলার সত্যনারায়ণ চন্দ, ধরণী রায়, দেবেন রায়, জগদীশ ঘোষ, নরেন ব্যানার্জি, কংগ্রেস নেতা ডাঃ শরৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হংসেশ্বর রায়, রজত দত্ত, প্রভাত কুসুম ঘোষ, সত্যেন গুপ্ত, উমাশঙ্কর কোঙ্গার, প্রাণ গোপাল মুখোপাধ্যায়, কামদা কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, লাল বিহারী সিংহ, সমাধিশ রায়, সত্যবালা দেবী, হারাণ চন্দ্র খাঙ্গার, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, গোপিকা বিলাস সেন, প্রমুখ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীরা সিউড়ি জেলে বন্দী ছিলেন। এঁদের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দুটো ভাগ ছিল। একদল গান্ধীবাদী। দ্বিতীয় অংশ বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী।

বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীদের সাথে কমরেড বিনয় চৌধুরী, কমরেড রনেশ দাশগুপ্তেরও সম্পর্ক ছিল। সম্পর্ক ছিল সরোজিনী দেবীরও।

এঁদের আসামী করেই ১৯৩৪ সনে বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলা হল। মোট

৪২ জনকে ঐ মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। এই ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত মোট ১১ জনকে আন্দামানের সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। তাঁরা হলেন– (১) রজত ভূষণ দত্ত (২) প্রাণ গোপাল মুখোপাধ্যায় (৩) প্রভাত কুসুম ঘোষ (৪) বিজয় কুমার ঘোষ (৫) কালী প্রসন্ন রায়চৌধুরী (৬) হারাণ চন্দ্র খাঙ্গার (৭) উমাশঙ্কর কোঙ্গার (৮) প্রদ্যুৎ কুমার রায়চৌধুরী (ওরফে সাগর) (৯) হরিপদ ব্যানার্জি (১০) ধরণীধর রায় (১১) সমাধিশ রায়।

তাছাড়া, আরও কয়েকজন বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এই ষড়যন্ত্র মামলার দ্বিতীয় পর্বে আরও ছয়জন বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ডে দণ্ডিত হন। তাদের মধ্যে চারজন তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের মানুষও ছিলেন। এটা একটা নতুন দিক। বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সাধারণত এর নিদর্শনের অভাব। ঐ আন্দোলন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল।

ত্রিশের দশকে বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী ও অমর সরকার অনুশীলন দলের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা মূলত মুর্শিদাবাদ জেলায় নিরঞ্জন সেন ও সতীশ পাকড়াশির সাথে যুক্ত ছিলেন।

বীরভূমের দুজন সন্তান জ্যোতির্ময় রায় ও ভবেশ হাজরা ঝরিয়ায় কলিয়ারির চাকুরে ছিলেন। সেখানে তাঁরা অন্তর রাজ ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন। জ্যোতির্ময় রায় আন্দামানের সেলুলার সেলে বন্দী জীবন যাপন করেন। ভবেশ হাজরা বন্দী জীবন কাটান ভাগলপুর জেলে।

বীরভূমে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পর্ব থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত এ জেলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এ জেলায় প্রজা আন্দোলনেরও অন্যতম স্রষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক। তিনি কখনও গান্ধীবাদী, কখনও স্বরাজী। আবার কখনও স্বতন্ত্র চিন্তাধারার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তবে, প্রজাদের স্বার্থরক্ষায় তিনি সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থ তাঁকে পিছু টানতে পারেনি। সংসদীয় রাজনীতিতেও তিনি গোটা প্রদেশে প্রথম সারির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জেলার স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রেও তিনি জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৪০ সনে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন।

প্রজা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালিত হয়েছে রামপুরহাট মহকুমায়। ১৯২১-২২ সনে পাইকরে ইউনিয়ন রেট যা ট্যাক্স বিরোধী

আন্দোলন সংগঠিত করেন রাজেন সিংহ। একই সময়ে ট্যাক্স বিরোধী আন্দোলন হয় সদর মহকুমার গামার কুণ্ডু গ্রামে। নেতৃত্ব দেন তারিণী সিংহ, অংশ নেন বীরসিং মুর্মু, কেদার রুইদাস প্রমুখ। গোটা গ্রাম অংশ গ্রহণ করে। বিশেষত সাঁওতাল উপজাতির মানুষরা এবং রুইদাস ও বাগ্দীরা।

ইউনিয়ম রেট বা ইউনিয়ম বোর্ডের ধার্য্য ট্যাক্সের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তার প্রাণশক্তি কৃষক সমাজ। স্বাভাবিকভাবেই মধ্যস্বত্বাধিকারীরা সাধারণভাবে ঐ আন্দোলনের বিরোধী। তাঁদের মধ্য থেকে উঠে আসা কোনো ব্যক্তি বিশেষ ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন বা খাজনা বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের সংগঠক বা সমর্থক হলেও শ্রেণীগতভাবে জমিদাররা ঐ আন্দোলনকে যথাশক্তি বাধা দিয়েছেন। তাঁরা ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষেই দাঁড়িয়েছিলেন। সামন্ত স্বার্থ বা জমিদারদের স্বার্থ আগাগোড়াই ব্রিটিশ রাজশক্তির পূজারী ও অনুগামী। কৃষক বিদ্রোহগুলিতে তার প্রভূত নিদর্শন আছে।

বীরভূমে প্রজা আন্দোলনে অধ্যাপক জিতেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদর্থক ভূমিকার কথা আগেও উল্লেখ করেছি। তাঁর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের পাশাপাশি প্রজাদের উপর সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রজা আন্দোলন, যা নিঃসন্দেহে ত্রিশের দশকের শেষার্ধে গড়ে ওঠা সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের অগ্রদূত। তার বার্তাবহ। শেষোক্ত অধ্যায়ে নেতৃত্ব দেন মার্কসবাদ – লেনিনবাদে তথা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ও ঐ রাজনৈতিক দর্শনের অনুগামী রাজনৈতিক কর্মীরা। ওঁরা আবার প্রায় সবাই ছিলেন অতীতের বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী কর্মী। কেউ আন্দামান বন্দী। আন্দামানের বন্দীশালায় কমিউনিজমের চিন্তাধারায় দীক্ষিত। কেউ বা রাজপুতানার থর মরুভূমির দেউলি বা হিজলির বন্দী শিবিরে আটক থাকা বিপ্লবী। ত্রিশের দশকের শেষার্ধে তাঁরা কারামুক্ত হয়ে জেলায় ফিরে আসেন। সেখানেও তাঁদের প্রায় সবাই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ও দীক্ষিত হয়েছিলেন। জেলার বিভিন্ন থানায় আটক বা অন্তরীণ রাজনৈতিক কর্মীদের কেউ কেউ কারামুক্তির পরে এ জেলায় থেকে যান। যেমন, বরিশালের সুরেশ পাল। ইনি তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সমর্থক ছিলেন। খয়রাশোলে অন্তরীণ পান্নালাল দাশগুপ্তও এঁদের অন্যতম। তিনি ট্রটস্কিপন্থী ও আন্তর্জাতিকের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুরের অনুগামী ছিলেন।

শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠিত করার মাধ্যমে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে এঁদের সহযোগী হয়ে ছিলেন কালীপদ বশিষ্ঠ, মন্মথ দে, সুরেন ব্যানার্জি, কেশব দাস, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ বিপ্লবীরা। এঁদের অধিকাংশই বিপ্লবী সুরেন মুখার্জি প্রতিষ্ঠিত 'আমার কুটিরে' এসেছিলেন।

প্রজা আন্দোলন গড়ার ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ও পরে পৃথক কৃষক-শ্রমিক দলের (১৯২৫) কর্মীদেরও ভূমিকা ছিল। কমরেড আব্দুল হালিমের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শরডাঙ্গার কমরেড সামসুদ্দিন হুমায়ুন, স্বরাজ্যদলের হেমন্তকুমার সরকার প্রভৃতির উদ্যোগে ১৯২৫ সালে লাভপুরের লাঙ্গলহাটা ও কীর্ণাহারে কৃষক সম্মেলন (আসলে প্রজা সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রখ্যাত উপন্যাস গণদেবতা ও পঞ্চগ্রামে এই প্রজা আন্দোলন। নতুন ধার্য করা এডুকেশন সেসের বিরুদ্ধে এবং খাজনা বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের বিশেষ উল্লেখ পাই। ঐ উপন্যাসের নায়ক প্রাথমিক শিক্ষক দেবনাথ ঘোষ ওরফে দেবু পণ্ডিত ঐ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন মহামহোপাধ্যায়ের নাতি 'কমিউনিষ্ট বিশ্বনাথ'। বর্তমান সাঁইথিয়া থানা। বোলপুর থানাতেও ঐ আন্দোলন প্রসারিত হয়েছিল।

তবে, আগেই উল্লেখ করেছি যে ট্যাক্স-বিরোধী ও খাজনাবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের প্রসার বেশি হয়েছিল রামপুরহাট মহকুমার নলহাটি থানা, মুরারই থানা, ময়ূরেশ্বর থানা এলাকায় রাজনগর থানার গামারকুণ্ডু ও নলহাটি থানায় তা প্রতিরোধ সংগ্রামেরও রূপ নিয়েছিল। রামপুরহাট মহকুমার জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (ময়ূরেশ্বর বাদে বাকী তিনটি থানায়) মুসলিম। তাঁরা মূলত কৃষক ও প্রজা। জমিদাররা রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদের। যথা–নাটোরের রাণী ভবানীর এস্টেট, মুর্শিদাবাদের কান্দীর সিংহ পরিবার, জিয়াগঞ্জের মোহান্ত পরিবার, বীরভূমের বরলা গ্রামের জমিদার প্রভৃতি। তাঁদের অমানুষিক শোষণ ও নির্যাতনে প্রজাদের জীবনযন্ত্রনা ছিল অবর্ণনীয়। তাই, একে কেউ কেউ সাম্প্রদায়িক খাতে বহাতে চাইলেও এই আন্দোলন ছিল মূলত কৃষকদের সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম।

সদর মহকুমায় সাঁইথিয়া, বোলপুর থানা দুবরাজপুর থানা ও বর্তমান ইলামবাজার থানায় ট্যাক্স বিরোধী ও খাজনা বৃদ্ধি আন্দোলন প্রসারিত হয় ১৯৩০ সালে। এক্ষেত্রে জয়দেব-কেন্দুলির মোহান্ত দামোদর ব্রজবাসীরও সহায়ক ভূমিকা ছিল। তারই জেরে তিনি আততায়ীদের হাতে নিহত। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের এক লেখা থেকে জানা যায় যে এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে হেতমপুর রাজ পরিবারের হাত ছিল। জেলার তৎকালীন পুলিশ সুপারও ঐ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

জেলার সংগঠিত কৃষক আন্দোলন, যার মূল সংগঠকরা হয় তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুগামী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও সমর্থক কিংবা ট্রটস্কি অনুগামী চতুর্থ আন্তর্জাতিকের সমর্থক সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কমিউনিস্ট লীগের সদস্য বা সমর্থক। পূর্বোক্ত আমার কুটিরে এই দুই চিন্তা ধারার অনুগামীরাই

ছিলেন। ১৯৪০ সালে তাঁরা আলাদা হয়ে যান। তার পূর্ব পর্যন্ত কৃষক সংগঠন ও আন্দোলন গড়ার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা ছিল। যেমনি, ১৯৩৮-৩৯ সালে বোলপুর থানার দর্পশিলার অত্যাচারী জমিদার ডাঃ গোলোক বিহারি ঘোষ প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে চার-পাঁচখানা গ্রামের কৃষকরা প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হন। এই আন্দোলনের সমর্থনে জনসভা করতে এসেছিলেন কমরেড আব্দুল হালিম, কমরেড রেবতী বর্মন, ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ প্রাদেশিক স্তরের নেতৃবৃন্দ। গান্ধীবাদী নেতা গোপিকা বিলাস সেনও আন্দোলনকারী কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। দাঁড়িয়েছিলেন রায়পুরের গান্ধীবাদী নেতা ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বভারতীর কালী মোহন ঘোষ, শোনা যায়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ঐ আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। কৃষকদের জমির গাছকাটার জন্য তালতোড়ের জমিদার ঘোষ পরিবার উদ্যোগী হলে প্রতিবাদী ভূমিকা নেন রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)। একথা শুনেছি সর্বানন্দপুরের প্রয়াত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের কাছে। ১৯২৬--১৯৩০ সনে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনকালে প্রমথ চৌধুরী লিখিত 'রায়তের কথা' কথার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ রায়তের জমিতে গাছের অধিকারী সংশ্লিষ্ট প্রজা, রবীন্দ্রনাথ এ অভিমত দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তা পেরেছিলেন কি ? এক কথায় বলা যায়, তাঁর এই বাসনা চরিতার্থ হয়নি। এর পশ্চাদপটে বহু কারণ আছে। নৈব্যক্তিক দৃষ্টিতে বলা যায় যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই প্রকারান্তরে এর অন্তরায় ছিলেন। তিনি কালী মোহন ঘোষ থেকে আরম্ভ করে মনীন্দ্রনাথ রায়, প্রভাত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তিনাথ বসু, রাণী চন্দ, শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী সহ অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনে ঠাঁই দিয়েছিলেন। প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু ও বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় এবং কলাভবনের বিশিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রী প্রভাস সেন, শঙ্খ চৌধুরী, দিনকর কৌশিক, এলা দত্ত, নন্দিতা সেন প্রমুখতো ১৯৪২ সনের 'ভারত ছাড় আন্দোলনে' ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বিনোদ বিহারী বিশ্বভারতীর চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে কেনগড়িয়া গ্রামের মসজিদ প্রাঙ্গণে আস্তানা করেন। সঙ্গী প্রভাস সেন সহ ছাত্র ও ছাত্রীরা। তাঁরা বিশ্বভারতী ত্যাগ করার আগে কলাভবনের ছাত্র তালিকা থেকে নিজেদের নাম কাটিয়ে নিয়েছিলেন। একথা লিখেছেন শঙ্খ চৌধুরী, সাক্ষাৎকারে বলেছেন প্রয়াত প্রভাস সেন পুলিশের খাতায় এঁরা সবাই আগস্ট বিপ্লবী হিসাবে নথিভুক্ত আছেন। শঙ্খ চৌধুরী ও দিনকর কৌশিক তো কারাবরণও করেছেন।

জেলায় সংগঠিত কৃষক আন্দোলন ও শ্রমিক সংগঠন গড়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন কালীমোহন ঘোষ। তিনি চালকল শ্রমিকদের সংগঠিত

করে ইউনিয়ন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন নিশাপতি মাঝি। তিনি এম. এল. এ. ও স্বাধীনতার পরে ডাঃ বিধান রায়ের মন্ত্রিসভার পার্লামেন্টারি সেক্রেটারিও হয়েছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পোস্টার এঁকেছেন। বুলেটিন গোপনে সাইক্লোস্টাইল করেছেন।

বীরভূমে কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী দলের মূল কেন্দ্র ছিল শ্রী নিকেতন ও শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকা অবস্থাতেই তা সংগঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশপ্রেমিক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী যুবক-যুবতীদের আন্তরিকভাবে সমর্থন করতেন, ১৯৩৬ সনের এক ঘটনায় তা সুপ্রমানিত। অত্যাচারী গভর্ণর এন্ডারসন শান্তিনিকেতন দেখতে আসবেন। তার সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে ঐদিন শান্তিনিকেতনে না থাকার জন্য বীরভূমের পুলিশ সুপার বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে জানান। ঐ ধৃষ্টতার জবাবে রবীন্দ্রনাথ ঐদিন সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শ্রীনিকেতনে চলে গেলেন। মহামান্য (!) ছোটলাট রবীন্দ্রনাথবিহীন ও শিক্ষার্থীবিহীন শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করে ফিরে গেলেন।

বোলপুরের শিক্ষাগার জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা ও নেতৃত্ববিদ অধ্যাপক ডঃ নির্মলকুমার বসু বোলপুর শহরে ঐ প্রতিষ্ঠান গড়ে দোলেন। বাংলার বেশ কিছু সংখ্যক গান্ধীবাদী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী এখানে তপশীলভুক্ত সমাজের মানুষদের মধ্যে সাক্ষরতার প্রসার ও উৎপাদনমূলক কাজে শিক্ষাদানের কাজে এই প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছিল। বিয়াল্লিশের আন্দোলন পর্যন্ত এখানে রাজনৈতিক কর্মীরা থেকে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে রাজনৈতিক কাজ কর্ম করেছেন। এখানে স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিস্মরণীয় নেতা আব্দুল গফুর খানও বাস করেছেন।

জেলার গান্ধীবাদী আন্দোলনের আরেকজন বিশিষ্ট কর্মী ও সংগঠক ছিলেন লাল বিহারি সিং। তিনি জাজিগ্রামে এক গান্ধী আশ্রম স্থাপন করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে ঐ আশ্রমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁর প্রথমা স্ত্রী সন্ধ্যারাণী সিং- -এর এক্ষেত্রে ভূমিকা ছিল।

গান্ধীবাদী নেতা মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৮৬) ১৯৩৭ সনে এজেলায় আসেন। তিনি তাঁতিপাড়ায় তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি এক কর্মী বাহিনী তৈরি করেছিলেন। বলরাম রুজ, অমিয়ানন্দ দাস, গোলাম দাস, বিপিন দাস, বংশীধর দত্ত, অহল্যা দাসী (পিসিমা), তাঁদের অন্যতম।

গান্ধীবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে রামপুরহাটে একটি কেন্দ্র প্রথম যুদ্ধোত্তর (১৯১৪-১৮) পরে গড়ে ওঠে। অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও অকালে প্রয়াত শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় সহ কয়েকজন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করেন।

মল্লারপুর ও তার সংশ্লিষ্ট এলাকাতেও জাতীয় আন্দোলনের একটি বিশেষ কেন্দ্র ১৯৩০ সালে গড়ে ওঠে। শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, ধরনী রায়, দেবেন রায়, সমাধিশ রায়, সত্যবালা দেবীর নাম আগে উল্লেখ করেছি। তাঁরা ত্রিশের দশকের শেষভাগে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। উলকুণ্ডার সত্য নারায়ণ চন্দ ও আরোকয়েকজন মল্লারপুর সংলগ্ন গোয়ালা ও দামড়া গ্রামের কয়েকজন, কাঠগড়ার নব কুমার দত্ত প্রভৃতি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাঁইথিয়া থানার দ্বারিকানাথ রায়, রাধাকিঙ্কর পাল, সুধাকর মণ্ডল প্রভৃতি জাতীয় আন্দোলনে অংশ নেন। রাধাকিঙ্কর পাল ওরফে কিঙ্কর পাল, সুধাকর মণ্ডল প্রভৃতি সামন্ততন্ত্র বিরোধী আন্দোলনেও বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

সিউড়ী থানার কড়িধ্যা এলাকার আশুতোষ চক্রবর্তী গোবিন্দপুরের নরহরি দত্ত নগরীর ডাঃ শরদীশ রায়, সুধীন্দ্র কুমার রায়, জগদীশ রায়, জ্যোতির্ময় রায় এর নামও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুবরাজপুরের মেটেলা গ্রামের শ্রীপতি পাতরের নামও স্মরণীয়।

বোলপুর শহরে হংসেশ্বর রায় ছাড়াও যতীন্দ্র সিংহ, তারাপদ রায়, শান্তি সরকার, তারাপদ ঘোষ, শ্রীমতী আল্লারাখা, বালেশ্বর ভকর, ভূপেন্দ্র নারায়ণ সেন, সৌরীন্দ্র নারায়ণ সেন, ধূর্জটি চক্রবর্তী, অধীর ব্যানার্জী (শ্রীনিকেতন), অনিল চক্রবর্তী, শ্রীমতী মমতা রাও, শান্তি কুমার চ্যাটার্জী, বিশ্বনাথ রাও, চেরকা মাঝি, জটা সরেন (শহীদ হন), শান্তি দাশগুপ্ত (শান্তিনিকেতন) প্রমুখ নাম উল্লেখযোগ্য।

সুরুলের শক্তিপদ সরকার, সুমিত্রানন্দন সিংহ, আমার কুটির এর মনোরঞ্জন দত্ত, খোকা ভট্টাচার্য, রুপপুরের শৈলজাকান্ত মিত্র প্রভৃতি অন্যতম। আমার কুটির-এর উদ্যোগে রামপুরে 'সাম্যসদন' নামে সংগঠন গড়ে ওঠে।

আগষ্ট আন্দোলনে 'আমার কুটির'-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

সদর মহকুমার খয়রাশোলে সুরেন্দ্রনাথ সরকারকে কেন্দ্র করে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। তাতে নাকড়াকোন্দা, গোপালপুর, পাচড়া প্রভৃতি গ্রামেও সংগঠন গড়ে ওঠে। এখানে চতুর্থ আন্তর্জাতিকের প্রভাবযুক্ত কৃষকদের সংগঠনও গড়ে ওঠে। ১৯৩৮ সালে দুবরাজপুরে কমিউনিস্ট লীগের উদ্যোগে একটি কৃষক সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। একই মাসে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুগামীদের উদ্যোগে লাভপুর থানার লাঙ্গলহাটা গ্রামেও কৃষক সম্মেলন হয়। কংগ্রেস নেতা ডাঃ শরৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়

প্রমুখ গান্ধীবাদীরাও যোগ দেন। সম্মেলনে আলাদা আলাদা ভাবে তেরঙ্গা পতাকা ও লাল পতাকা উত্থিত হয়।

লাভপুর ও নানুর থানায় কৃষকদের সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন ডাঃ রাধানাথ চট্টরাজ। ডাঃ চট্টরাজ ত্রিশের দশকের শেষভাগ থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগী ও সমর্থক ছিলেন। পার্টি সদস্য হন চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি। ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৯ সনে তিনি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও পরে সি. পি. আই (এম) মনোনীত প্রার্থী হিসাবে বিধায়ক হয়েছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে লাভপুর থানার বিভিন্ন গ্রামে কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে ওঠে। স্বাধীনতা আন্দোলনেও ঐ এলাকার বিশেষ ভূমিকা ছিল, সামন্ত বিরোধী সংগ্রামও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ঐ এলাকায় অভিন্ন হয়েছিল।

রামপুরহাট মহকুমায় পাইকর ছাড়াও গোড়শা, কোপা ও যোগাই, জাজিগ্রাম এলাকা স্বাধীনতা আন্দোলনে বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। রাজেন সিংহ ও লালবিহারি সিং এর কথা আগে উল্লেখ করেছি। যুগল দাস, গঙ্গাধর মুখার্জি, অম্বিকা চ্যাটার্জি, দুর্গাচরণ ব্যানার্জি, বিশ্বনাথ দাস, গোপাল চক্রবর্তী, ক্ষীরোদ মজুমদার, পাইকরের কালীদাস শীল, নকড়ি ফুলমালী, রামশতি রুইদাস (লোকারাম রুইদাস) পশুপতি মাল প্রমুখ ব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেন। কোপা-যোগাই এলাকায় এবং জাজিগ্রামে সমাজের নিম্নশ্রেণি.র মানুষদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ তাৎপর্যপূর্ণ।

রামপুরহাট শহরে কুমকুম মুখার্জি (সৌরীন্দ্র) কালী শঙ্কর চ্যাটার্জী, মহঃ আলম (শ্রমিক আন্দোলন করতেন), মায়া ঘোষ, নীহারিকা মজুমদার, রমেশ চন্দ্র মিত্র, কুসুম্ব রামনাথ সরকার, হরিনন্দন গান্ধী, বৈদ্যনাথ পাঁজা, ভাগবত প্রসাদ ভকত প্রভৃতি উল্লেশযোগ্য।

কৃষক সংগঠন ও আন্দোলনের কথা আগে কিছুটা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেছি। ঐ সাথে শ্রমিক সংগঠন, মহিলাদের সংগঠন, ছাত্র সংগঠন প্রভৃতি গণসংগঠনের কথাও উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুগামী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এ জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৮ সনের আগস্ট কী সেপ্টেম্বর মাসে বোলপুরে প্রাক্তন বিপ্লবী অমর সরকারের বাসাবাড়িতে। তাতে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা মূলত পূর্বতন বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী। তাছাড়াও ছিলেন ডাঃ রাধানাথ চট্টরাজ ও রাজনগরের সুবোধ দে।

প্রথম সংগঠনী কমিটির সম্পাদক হন অমর সরকার। ১৯৪০ সনে দায়িত্ব নেন কালীপদ বশিষ্ঠ। অমরবাবুর সাথে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ১৯৪২

সনে ছিন্ন হয় জ্যোতির্ময় রায়ের সাথে ঐ পার্টির সম্পর্ক। উভয়েই কংগ্রেসে যোগ দেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম যুগের সংগঠক ও কর্মীদের নাম আগেই বিভিন্ন প্রসঙ্গে করেছি। তাঁদের সাথে পরে যুক্ত হন লেবার পার্টি থেকে আসা কীর্ণাহারের চিত্তরঞ্জন রায়, সিউড়ির দেবী নিয়োগী ও খয়রাডিহির কলিম সরাফি। বর্তমানে বাংলাদেশের বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়ক। উভয়েই আগস্ট বিপ্লবের বন্দী হন। নগরীর জগদীশ রায়ও তাই। তিনি তার আগে কমিউনিস্ট লীগে ছিলেন। শ্রীনিধিপুরের দ্বারিক ব্যানার্জি, সুধীর সাহা, মহোদরীর আদিত্য পাল, নগরীর খাঁদা মাল, মালা মাল ও অন্যান্যরা, রাজনগরের বিজয় দে, মনসা দত্ত, হারাণ খাণ্ডার, সরোজিনী দেবী (দিদি) প্রমুখের নাম ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, হারাণ খাণ্ডার আন্দামান-বন্দীদেরও একজন।

সিঙ্গির প্রদ্যোৎ মণ্ডল, শ্রীনিকেতনের সুনীল কুমার সেন, রামপুরহাটের ব্যোমকেশ রায় (শেষোক্ত দুইজন) ছাত্র সংগঠন ও আন্দোলন করতেন।

কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষক সংগঠন ও আন্দোলন সামন্ততন্ত্র বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রসারিত ও ভিৎ দৃঢ় করেছিল।

শ্রমিকদের সংগঠনও গড়ে উঠেছিল। বীরভূমে শিল্প বলতে মূলত ধানকল ও তেলকল; আর বিড়ি বাঁধা শিল্প। এর সাথে যুক্ত শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে কালীমোহন ঘোষও এগিয়ে এসেছিলেন একথা আগে লিখেছি তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুগামীরাও এই ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেন। বোলপুর, দুবরাজপুর, মল্লারপুর, রামপুরহাট প্রভৃতি স্থানে ঐসব শ্রমিকদের সংগঠন গড়ে উঠেছিল। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। স্বাধীনতার সংগ্রামের শিকড় সমাজের শ্রমজীবী মানুষদের গভীরে প্রোথিত হয়েছিল।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি (১৯৪৩) গড়ে ওঠে। তার নেতৃত্বে দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীদের সেবা ও রিলিফ কাজসহ নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে ওঠে সিউড়ি, রাজনগর, মল্লারপুর, বোলপুর, রামপুরহাট প্রভৃতি স্থানে মহিলাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে ওঠে। সত্যবালা দেবী, সরোজিনী দেবী, বীণা মজুমদার, পারুল মজুমদার, শান্তি ঘোষ, উষা ভৌমিক, জাহনারা বেগম প্রমুখ মহিলা এগিয়ে আসেন।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বাংলার ছাত্র আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তবে, যতদূর জানা গিয়েছে, তাতে দেখা যায়, বীরভূমে

সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের প্রথম সূচনা আগস্ট আন্দোলনের সমকালীন, নরহরি দত্ত, দ্বারকেশ মিত্র (পরে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা, শেষে কংগ্রেস নেতা), শরদীশ রায়, প্রভাত কুসুম ঘোষ, (দুজনেই প্রবেশিকা উত্তর পরে বর্ধমানে পড়াশুনা করেছেন) নৃসিংহ সেনগুপ্ত, বিমল দাস, মিলন বন্দ্যোপাধ্যায়, তেজারত হোসেন, বিনয় ব্যানার্জি (ইকড়া), দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, নেপাল মজুমদার প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, আগষ্ট আন্দোলনে জেলার মোট ১২টি বিদ্যালয়ের (তার মধ্যে শ্রীনিকেতনের গুরু ট্রেনিং স্কুলও ছিল) ছাত্ররা ছাত্রধর্মঘট হয়েছিল) এই শ্রীনিধিপুর এম. ই স্কুল মিলিটারি গুড়িয়ে দেয় ও তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন বীরভূমের বোলপুর, সিউড়ি, রামপুরহাট, হেতমপুর, দুবরাজপুর, মুরারই, পাইকর, জাজিগ্রাম, গোপা-যোগাই রামপুরহাটের বসোয়া বিষ্ণুপুর, সাঁইথিয়া প্রভৃতি স্থানে বিশেষভাবে ছড়িয়ে ছিল। লক্ষ্যণীয় যে লুপ লাইনের সবকটি ষ্টেশন ও তার সংলগ্ন এলাকায় বিয়াল্লিশের আন্দোলন ছড়িয়ে ছিল। আগেই উল্লেখ করেছি, বিশ্বভারতীর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন, বল্লভপুরের আমার কুটির, শিক্ষাগার, জাজিগ্রামের গান্ধী আশ্রম, তাঁতিপাড়ায় অবস্থিত মিহির লাল চট্টোপাধ্যায়ের স্বদেশি আশ্রম প্রভৃতিও বিশেষভাবে অংশ নেয়।

ঐ আন্দোলনের আগে থেকেই জেলায় দুর্ভিক্ষ জনিত পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৮ সালে জেলায় অনাবৃষ্টির কারণে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হল। ফলে মজুতদারী আরও বৃদ্ধি পেল। জমিদার, জোতদার, মিলমালিক ও আড়তদাররা ধান-চাল মজুত করে খাদ্য সংকট আরো বাড়িয়ে দিল। হু হু করে খাদ্যের দাম বাড়তে লাগল।

মার্কিনী সৈন্যদের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে জেলা থেকে খাদ্যশস্য বাইরে নিয়ে যাবার কাজ শুরু হল। সোনায় সোহাগা হল জমিদার-জোতদার-মজুতদার ও মিল মালিকদের পৌষ মাস। এদিকে কৃষক সহ সাধারণ স্তরের সমস্ত মানুষদের হল সর্বনাশ, শুরু হল খাদ্যের দাবীতে আন্দোলন, মজুত উদ্ধারের দাবীর আন্দোলন।

১৯৪২ সালের ২৯শে আগষ্ট বোলপুর ষ্টেশনে যে খণ্ডযুদ্ধ হল তাতে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে সাঁওতাল উপজাতীয় মানুষদের উপস্থিতি ছিল সর্বাধিক সংখ্যক। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর কমান্ডার বা রেলওয়ে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট সহ মোট ৯ জন মিলিটারী, পুলিশের নিহত হলেন। তাদের গুলিতে শহীদ হলেন তারাপদ গুঁই ও জটা সরেন। আরেকজন সাঁওতাল কৃষকও নিহত হয়েছিলেন বলে অংশ গ্রহণকারীরা বলেন। আহত হয়েছিলেন তেরো জন। বোলপুর ষ্টেশনের

জমায়েত ছিল মূলত জেলা থেকে খাদ্য বাইরে নিয়ে যাবার প্রতিবাদে। তাতে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, কমিউনিষ্ট লীগ মুখ্যভূমিকা পালন করেছিল। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের কর্মীরা ও কংগ্রেস দলের কিছু সংখ্যক কর্মীও ষ্টেশনের জমায়েতে সামিল হয়েছিলেন।

জেলার খাদ্য বাইরে পাঠাবার বিরুদ্ধে জেলার বিভিন্ন ষ্টেশনেই সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ জমায়েতে সামিল হয়েছিলেন। মুরারই থেকে বোলপুর এবং অণ্ডাল-সাঁইথিয়া লুপলাইন, নলহাটি-আজিমগঞ্জ লাইন সর্বত্রই বিক্ষোভ জানিয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। কোর্ট ও ডাকঘর দখল ও সরকারী প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ঘটনা ঘটেছে। দুবরাজপুর শহরে ঐ ঘটনা ঘটেছে। তাঁতিপাড়া, বসোয়া-বিষ্ণুপুর, চাতরা, পাইকর, রাজগাঁ প্রভৃতি স্থানেও বিক্ষোভ সমাবেশ ও ষ্টেশন দখল হয়েছে।

প্রাদেশিক সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট গ্রেপ্তার হয়েছেন ২৭০ জন। তাঁদের মধ্যে ২০০ জন দণ্ডিত হন। পাইকারী জরিমানা ধার্য ও আদায় হয়েছে বোলপুর, দুবরাজপুর ও হেতমপুর ইউনিয়ন, বসোয়া - বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন সহ আরো কয়েকটি স্থানে। (এ তথ্য পাচ্ছি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট, ১৯৪২ নামক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে)।

তবে, বীরভূমের গোয়েন্দা দপ্তরের ফাইল অনুযায়ী মোট ১৪৯১ জন। দণ্ডিত হল ৭৬৩ জন। (জাতীয় আন্দোলন ও জেলা বীরভূম, ডঃ অমিয় ঘোষ। পৃষ্ঠা - ২৩৯)। ১৯৪৩ সালে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বীরভূমবাসীর উপর ধার্য জরিমানার পরিমাণ ছিল ২৯,৩০০ টাকা। (ঐ পৃষ্ঠা ১৮৩)। এই সময়ে গুটিকয়েক নির্মীয়মান বিমান ঘাঁটি তৈরির কাজ সাঁওতালরা বয়কট করেছিল। (ঐ পৃষ্ঠা ১৮০)

বিশ শতকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে জমিদার-জোতদার-মজুতদার-মহাজন-মিল মালিক বিরোধী তথা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এ জেলায় গণ আন্দোলন ও সংগ্রামের সেদিন পর্যন্ত সর্ববৃহৎ ঘটনা ছিল বিয়াল্লিশের আন্দোলন ও সংগ্রাম।

হিটলারের নাজী বাহিনী ১৯৪১ সনের ২২শে জুন সমাজতান্ত্রিক সভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গুণগত পরিবর্তন ঘটল। কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় কংগ্রেস উভয়েই এতদিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' হিসাবে বর্ণনা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অসহযোগীতা করছিল। কমিউনিষ্টদের আওয়াজ ছিল : না এক পাই, না এক ভাই। কংগ্রেসও এই নীতি অনুসরণ করছিল। কেবল অন্যমত ছিল সুভাষ চন্দ্র বসু ও তাঁর নেতৃত্বে গঠিত

সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক দলের। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে (১৯৩২) তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তিনি ঐ বছর জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিপদে দ্বিতীয় বারের জন্য বিপুল ভোটাধিক্যে পুনর্নির্বাচিত হন। গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরা ঐ পদে পট্টভি সীতারামাইয়াকে চেয়েছিলেন, কিন্তু জয় হল সুভাষচন্দ্রেরই।

কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক দল সুভাষচন্দ্রকেই সমর্থন জানালেন। তাতে ক্ষিপ্ত হলেন গান্ধীজী। তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে অসহযোগিতার পন্থা নিলেন। এই অবস্থায় জাতীয় কংগ্রেসে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হল। সুভাষ চন্দ্র অস্বস্থিতে পড়লেন। তিনি কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। ১৯৪০ সনের কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনে তিনি বামপন্থীদের এক সমন্বয় কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিলেন। ডাকলেন আপোষ বিরোধী সম্মেলন। ঐ সম্মেলনে গঠিত হল সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক নামক নতুন রাজনৈতিক দল।

এযাবৎ কমিউনিস্টরা সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন জানাচ্ছিলেন। বীরভূমে তাঁর পাশে কমিউনিস্টরাই মূলত দাঁড়িয়েছিলেন। আর ছিলেন অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি খুন হওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ঐ সময় ঐ জেলায় ফরোয়ার্ড ব্লক গঠিত হল না। প্রকৃতপক্ষে তা গঠিত হল স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৫২ সনের নির্বাচনকালে। একমাত্র দ্বারকেশ মিত্র ছাত্রব্লকের প্রাদেশিকনেতা ছিলেন। কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতায়।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন নাজী বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হবার পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্টরা আন্তর্জতিকভাবেই জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করল। শুরু হল ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম। গঠিত হল সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি। সিউড়িতে তার জেলা সম্মেলন হল ৩রা জুলাই, ১৯৪২। প্রধান বক্তা ছিলেন তরুণ কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতিবসু। রাজনগর ও আরও জায়গায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মেলন হল। জ্যোতির্ময় রায় ও দেবী নিয়োগী সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির জেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক হলেন।

এইপর্বে দুর্ভিক্ষ বিরোধী সমাবেশ, মিছিল ও ডেপুটেশন প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানে হতে থাকে। কমিউনিস্টরাই তার মূল উদ্যোক্তা ও সংগঠক। জেলার কয়েকটি স্থানে মজুত উদ্ধার আন্দোলনে কৃষকরা অংশ নেন। রাজনগর থানায় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরাও ঐ আন্দোলনে সামিল হন। কমিউনিস্ট লীগও মজুত উদ্ধার আন্দোলনে অংশ নেয়, ফলে কমিউনিস্ট, কমিউনিস্ট লীগ, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা কয়েকটি স্থানে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন।

ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ফরোয়ার্ড ব্লক, কমিউনিস্ট লীগ (আর. সি. পি. আই-এ রূপান্তরিত হল) কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা কমিউনিস্টদের

বিরুদ্ধে আক্রমণ, অফিস পোড়ানো, কুৎসা প্রচার করলেও জনগণের মৌলিক প্রশ্ন যে খাদ্য, কাজ, দুর্ভিক্ষ ত্রাণ নিয়ে আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন কমিউনিস্টরা, যারফলে জনগণের সাথে জলে মাছের মত তাঁরা মিশে থেকে নিজেদের সংগঠনের বৃদ্ধি ঘটান। যার মাধ্যমে জেলার গণ আন্দোলনে ও গণ সংগঠনে চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট রাই প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের যে জোয়ার আসে জেলায় তারও প্রথম সারিতে দাঁড়ায় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি।

জেলার সামন্তশক্তির সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ বর্ণ হিন্দু। দুবরাজপুর, সিউড়ি ও খয়রাশোল থানা এক বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। প্রথম সার্বিক জরিপের আধিকারিক বিজয়ভূষণ মুখার্জি (১৯২৪-৩০)। তাতে দেখা যায়, ঐ তিন থানার জমিজমার সিংহভাগের মালিক হলেন ব্রাহ্মণরা। তিনটি থানারই এক ছবি। একই ধরণ ছিল গোটা জেলায়। এই সব ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেত্তর বর্ণ হিন্দু পরিবারগুলি মূলত রক্ষণশীল। আর তাঁদের মধ্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির স্বাভাবিক প্রাধান্য ছিল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হিন্দু মহাসভা (১৯১০) জেলায় প্রভাব বিস্তার করে। লাভপুরের জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের নিত্য নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সিউড়ির আইনজীবী শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ হিন্দু মহাসভার মূল সংগঠক ও নেতা ছিলেন। নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রজা সমিতিরও নেতা হয়েছিলেন। ত্রিশের দশকে নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলতানপুরের শিল্পপতি ও বড় জোতদার রায়বাহাদুর অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রজা সমিতির কর্মকর্তাদের মধ্যে স্থান পান। প্রজা সমিতি বা সম্মিলনী এভাবে সামন্তশক্তির পকেটস্থ হয়ে যায়।

আমার এ আলোচনার উপজীব্য প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব। হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতিভূ হিন্দু মহাসভা স্বাধীনতার কয়েকমাসের মধ্যে বীরভূম কেন্দ্রের সাধারণ আসনের আইনসভা সদস্য মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে যে উপনির্বাচন হয়, তাতে প্রার্থী ছিলেন স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর প্রতিপক্ষে ছিলেন জাঁদরেল হিন্দুমহাসভা প্রার্থী আইনজীবী শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল ঘোষ বিজয়ী হন। কিন্তু কংগ্রেসের হৃদকম্প দেখা দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি প্রাদেশিক স্তরের নেতৃত্বসহ জেলার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে না পড়লে কী দাঁড়াত তা বলা মুস্কিল। হিন্দু মহাসভা জেলার কয়েকটি থানায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাবার জন্য ১৯৪৬ সনের ১৬ই আগষ্টের পর থেকে উঠে পড়ে লেগেছিল। তাকে ঠেকাতে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার

জন্য কমিউনিস্টরাই সর্বাধিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক ভাবনা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অঙ্গের ভূষণ। তার মগজ খণ্ডিত ভাবধারায় পুষ্ট। পরিবারগত, গোষ্ঠীগত, পাড়াগত, থানাগত, মহকুমাগত, জেলাগত, সর্বশেষে রাজ্য বা প্রদেশগত ধারণাতে সে শিরোধার্য করে চলে। সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবনার উৎস এখানে।

১৯১০-১১ সালে মর্লি-মিন্টো রিপোর্ট ও শাসন সংস্কার সাম্প্রদায়িকতার বীজ এদেশের মাটিতে যত্নসহকারে পুতল। তা বর্ধিত হল, – মন্টেগু চেমস্ ফোর্ড এর শাসন সংস্কারে (১৯১৯)। দ্বৈতশাসন প্রবর্তিত হল। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় দু-ইরাকি কে হিন্দ, কে মুসলিম, কে এ্যাংলো, কে খ্রীষ্টান, তা চিহ্নিত হল। বৌদ্ধ-জৈন-পারসিকরা গেল পৌত্তলিকতাবাদীদের কোঠায়। ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন ও প্রাদেশিক শাসন আইনে সাম্প্রদায়িক ভাবনা ডালপালা, ফুল ও নতুন বীজ সবই জন্মাল। তার পূর্ণাভিষেক ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগে।

সাম্প্রদায়িকতার রোগ এ জেলায় ছিল। ক্রমশ তা বাড়ল। হিন্দুত্ববাদী চিন্তা ও ঐশ্লাসিক চিন্তা উভয় চিন্তাই ক্রমানুসারে বাড়ল। বাড়ল হিন্দুমহাসভার প্রভাব ; আবার মুসলিম লীগের প্রভাব। তবে তা চাকুরি-বাকরি, স্বায়ত্বশাসনমূলক সংস্থার ক্ষমতা দখল, প্রশাসনিক কর্তৃত্বের মধ্যেই মূলত সীমিত ছিল।

তবে এরই মাঝে আলোক রেখাও পাই আমরা, তা এরকম – স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অংশ গ্রহণ ছিল প্রজা আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে। ১৯২১ সনের অসহযোগ আন্দোলনে কমরেড আবদুল হালিম, তাঁর অগ্রজ সামসুদ্দিন হুসায়ন, নিমড়ার এক আবদুল রহমান অংশ গ্রহণ করেন। তবে, তখন স্কুল কলেজের পড়ুয়া বা সরকারী চাকুরীজীবী মুসলিম খুবই কম ছিল। কাজেই, অসহযোগে অংশগ্রহণের প্রশ্ন অবান্তর। ঐ সময়ে জেলা কংগ্রেস কমিটিতে একমাত্র রামপুরহাটের মৌলবী মদশ্বর হোসেনের নাম পাওয়া যায়।

১৯৩২ সনে জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটিতে পাই সিউড়ির আব্দুল সৈয়দ ও নুরুল আবসারের নাম। শেষোক্ত ব্যক্তি উকিল ছিলেন।

বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তদের তালিকায় কোনো মুসলিমের নাম নেই। তবে, বিয়াল্লিশের আন্দোলনে কলিম সরাফি, শ্রীমতী আল্লারাখা, দাউদ খানের নাম পাওয়া যায়।

তবে, প্রজা আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন ও কমিউনিষ্ট আন্দোলনে মুসলিমদের অংশ নিতে দেখা যায়। এ জেলার কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সংগঠনে ডাঃ মারুফ হোসেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রাণী চিকিৎসক

ছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনে মহঃ আলম, ছাত্র আন্দোলনে তেজারত হোসেন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সংগঠনে কয়েকজন মুসলিম মহিলাও অংশ গ্রহণ করেন।

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকালে গণবিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৪) দিয়ে যে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল, ১৯৪৭ সনের দ্বিখণ্ডিত দেশ ও দ্বিখণ্ডিত বাংলায় তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটল।

বীরসা মুণ্ডার জন্মদিন, ১৫ই নভেম্বর, ২০০৫।

নন্দলাল বসুর আঁকা 'ভারতছাড়ো' আন্দলনের পোষ্টার—১
(সূত্র ঃ জেলা গোয়েন্দা বিভাগ)
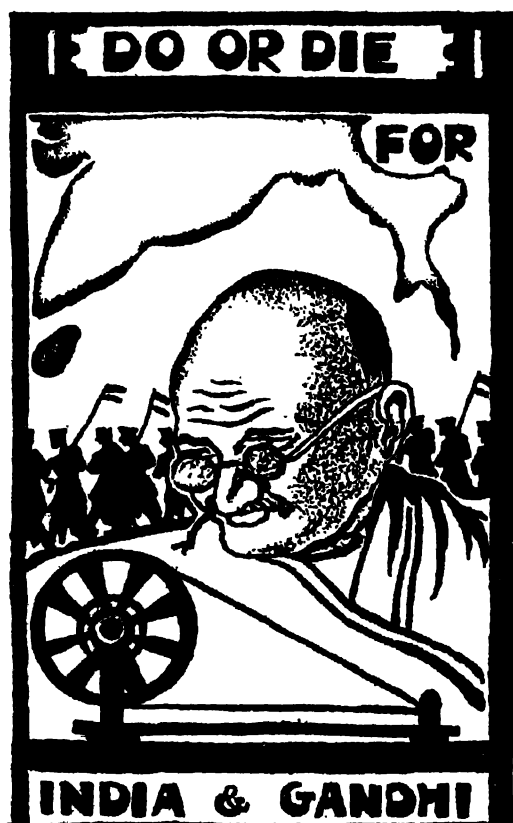
নন্দলাল বসুর আঁকা 'ভারতছাড়ো' আন্দলনের পোষ্টার—২
(সূত্র ঃ জেলা গোয়েন্দা বিভাগ)

('জাতীয় আন্দোলন ও জেলা বীরভূম' - অমিয় ঘোষের বই হতে।)

বীরভূমের জনবিন্যাস ও জনসংস্কৃতি

অ রু ণ চৌ ধু রী

আমার সামনে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক নামক একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পত্রিকার অক্টোবর ১৯৯৯ এর 'মিলেনিয়াম সাপ্লিমেন্ট'। দি ইউনিভার্স এর ৭৩ পৃষ্ঠা খোলা আছে। ঐ পৃষ্ঠায় যা লেখা হয়েছে তাই দিয়েই এ প্রবন্ধের শুরু করতে চাই। ঐ প্রবন্ধে লেখা হয়েছে – "The first Indians? Partha p. Mazurmdr of the Indian Statistical Institute is using DNA from blood samples taken from 30 different enthinic groups, including members of the ancient arean tribe, to built a model for the peopling of the subcontinent. His data suggest that the first pap...... arived from Africa, then rapidly expanded and diversified."

উল্লেখিত ওঁরাও উপজাতির মানুষরা এজেলার মহম্মদবাজার থানার রাসপুর নামক গ্রামের বাসিন্দা। এই উপজাতীর ওঁরাও সম্প্রদায়ের নরনারী মহম্মদবাজার থানা ছাড়াও সিউড়ী, ইলামবাজার, লাভপুর, বোলপুর প্রভৃতি কয়েকটি থানাতে রয়েছে। ওঁরাওরা নৃতাত্বিক বিচারে মানবসমাজের দ্রাবিড়ী ধারার অন্তর্ভূক্ত।

ডঃ পার্থ পি মজুমদারের ঐ মূল্যবান গবেষনা ও তার গবেষনা প্রসূত যে তথ্য তার ভিত্তিতে বলা যায় যে – আদিম মানব সমাজ এ জেলায় প্রবেশ করেছিল। তবে, কখন প্রবেশ করেছিল এবং কীভাবে তা বলা দুরূহ।

এ জেলা অক্ষাংশ উত্তর ২৩.৩৩′ হতে ২৪.৩৫′ এবং দ্রাঘিমাংশ পূর্ব ৮৭.০২′ তে অবস্থিত। এর ভূসংস্থান প্রমাণ করে যে বর্তমান বীরভূম জেলা ছোটনাগপুর মালভূমিরই অংশ বিশেষ। এ জেলার পশ্চিমাংশের ভূ-সংস্থানে তার প্রমাণ বিদ্যমান। কাজেই এ জেলার ভূ খণ্ডের প্রাচীনত্ব অনস্বীকার্য।

অতীতকালে এই ভূখণ্ডের নাম কী ছিল, "সুম্ম" না "রাঢ়" - এই নিয়ে পণ্ডিতী বিতর্কে আমি এই মুহূর্তে যাব না। নাম যাই থাকুক, গঙ্গার পশ্চিমাংশে অবস্থিত বর্তমান বীরভূম একটি সুপ্রাচীন ভূখণ্ড। অরণ্যবেষ্টিত, কাঁকুরে মাটি,

পশ্চিমাংশে বড় বড় পাথরের চাং। দুবরাজপুরের 'মামাভাগ্নে পাহাড়' যার অন্যতম নিদর্শন, এটাই বীরভূমের স্বাভাবিক ভূ-সংস্থান। তবে কিছুটা পার্থক্য লক্ষিত হবে উত্তরাংশের কয়েকটি থানায়। কিংবা দক্ষিণাংশের নানুর (পুরানো সাকুলিপুর) থানায়। একটা অংশ গঙ্গার পলি মাটিতে গঠিত। আরেকটি অংশ অজয় নদের পলিমাটিতে গঠিত। বোলপুর থানাও তার মধ্যে পড়ে। পড়ে ইলামবাজার ও লাভপুর বা দুবরাজপুর থানার কিছু অংশ, সবটা নয়।

এই ভূখণ্ডে যে আদিম মানুষরা বিচরণ করেছিল এবং অজয়, কোপাই, ময়ূরাক্ষী, দাঁড়কা, ব্রাহ্মনী, বাঁশলই - এই সব নদীর অববাহিকাতেই যে তাদের প্রথম বসবাস তার অনেক নিদর্শন আদিম অস্ত্র ও অন্যান্য নজির পাওয়া যায়।

কারা আদি বাসিন্দা

এখনকার আদি বাসিন্দা কারা ? এ প্রশ্নের উত্তর সুকঠিন। নৃতাত্বিকেরাতো নিগ্রোবটুদের সর্ব প্রাচীন জনগোষ্ঠী হিসাবে ভেবেছেন। বীরভূমে কী নিগ্রোবটুদের বসবাস ছিল ? এ প্রশ্নের উত্তরদানও নিঃসন্দেহে সুকঠিন তবে, অনুমান করা যেতে পারে যে বীরভূমের এই ভূখণ্ডে আফ্রিকার সেই মানব গোষ্ঠীর কোনো ধারা ঘুরতে ঘুরতে চলে আসা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়।

নিগ্রোবটুদের উত্তরাধিকারিত্ব এ জেলার কোনো গোষ্ঠীর বহন করা নিয়ে নিঃসংশয় না হতে পারলেও, এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে প্রোটো অস্ট্রলয়েড জনগোষ্ঠী ও দ্রাবিড়ী জনগোষ্ঠীর মানুষররা সুদূর অতীতে এখনকার অরণ্যে বিচরণ করেছে। নদনদীর তীরে তারা বসতি স্থাপন করেছে, গ্রামপত্তন করেছে। বন্য প্রাণী আর নদনদী ও জলাধারের মাছ, কচ্ছপ প্রভৃতি জলচর প্রাণী শিকার করে তারা জীবিকা নির্বাহ করেছে। ক্রমশঃ চাষবাস শিখে ফসল ফলিয়েছে। জমি তৈরী হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়েছে। গৃহপালিত প্রাণীরাও তাদের জীবনধারণে সহায়তা করেছে। এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর সাথে পারস্পরিক ভাব বিনিময় করেছে। এক গোষ্ঠীর ভাষার সাথে অন্য নৃগোষ্ঠীর ভাষার মিশ্রন ঘটেছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানব মানবীরাও গোষ্ঠীগত বিধিনিষেধের জাল ছিন্ন করে মিলিত হয়েছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক গোষ্ঠী গায়ের জোরে অন্য গোষ্ঠীর নারীকে 'জয়' করেছে।

বীরভূমের বর্তমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ী - উভয় জনগোষ্ঠীর

উত্তরপুরুষ অনেকগুলো সম্প্রদায়। যেমনি সাঁওতাল জনগোষ্ঠী অস্ট্রিক; আবার ওরাও, কোড়া, মাহালি - এরা দ্রাবিড়ী জনগোষ্ঠীর উত্তরপুরুষ। হিন্দু সমাজের নিম্নকোটির মধ্যেও এই দুই নৃ-ধারার উভয় অংশের মানুষরা রয়েছে। মাল, বাগদী, দাস(মুচি), ডোম, রাজবংশী বা রাজবংশী মাল, লেট(বাগদীদের অংশ) প্রভৃতি অধিকাংশই দ্রাবিড়ী ধারার উত্তরপুরুষ।

অবশ্য, ব্যবহৃত ভাষার (বাংলাভাষা) মধ্যে অস্ট্রিকরাও দ্রাবিড়ী, উভয় ভাষার উপাদানই রয়েছে। এর কোনটা বেশী, কোন্টা কম, তার অনুসন্ধান ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানো দুরূহ কাজ। সে ক্ষেত্রে এ ভূল হয়ে যাবার সম্ভাবনাই সমধিক। ডঃ সত্যনারায়ণ দাস বাংলা ভাষায় দ্রাবিড়ী শব্দের অংশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। (বাংলার দ্রাবিড়ী শব্দ) ঐ সব শব্দ এজেলায় ব্যবহৃত বাংলা ভাষাতেও প্রচলিত। এ জেলায় কথ্য ভাষায় অনেক অস্ট্রিক বা মুণ্ডারি ভাষা গোষ্ঠীর অনেক শব্দ রয়েছে।

আর্য্যায়নের সূচনা ও বিস্তার

এ জেলায় 'আর্য্যায়ন' কখন থেকে শুরু হয়েছে, তা সঠিকভাবে বলা সুকঠিন। তবে, হাজার খৃষ্টাব্দের আগেই যে এজেলায় 'আর্য্যায়ন' শুরু হয়েছিল, তা বলা যেতে পারে। ঐ 'আর্য্যায়ন' ব্রাহ্মণদের দ্বারাই হয়েছিল। নতুন আগন্তুক ব্রাহ্মণরা সম্ভবত উড়িষ্যা (উৎকল) থেকে এসেছিল! আবার মগধের (পাটালিপুত্র, চম্পা বা ভাগলপুর) পথেও হতে পারে। অর্থাৎ পশ্চিম দিক দিয়ে বর্তমান মেদিনীপুরের মধ্যদিয়ে বা বাঁকুড়ার পথে কিংবা শকবিগলির পথে, গঙ্গার পথেও হতে পারে। এক্ষেত্রে হাজার খৃঃ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ভবদেব ভট্টের নাম পাওয়া যায়। তিনি নাকি উৎকলের পথে এসেছিলেন। বীরভূমের সিদ্ধলগ্রামে (বর্তমান লাভপুর থানার শীতলগ্রাম বলে শোনা যায়) তিনি বসবাস করতেন। অনুমান করা যেতে পারে যে এর পরবর্তী সময়ে আরও অনেকে এসেছেন। "সেন রাজাদের' সাথে ব্রাহ্মণদের আসা স্বাভাবিক। 'সেনবংশী' 'রাজা' বা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন।

'সেনবংশের' অন্যতম আদিপুরুষ সামন্ত সেন 'রাঢ়ভূমি'তে এসে ছিলেন। সেনরা বর্ণাশ্রম ধর্মের পদ্ধতি অনুযায়ী 'ব্রাহ্মণ' তবে, ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করে সামন্ত হন। পরে রাজা হন।

সামন্তসেন-এর পরে বীরভূমের ক্ষেত্রে সেন বংশীয় রাজাদের মধ্যে লক্ষণসেনের নাম শোনা যায়। অজয় নদের তীরে তাঁর 'রাজধানী' ছিল। বর্তমান রাজনগরের পুরানো নাম, লক্ষুর কথিত যে লক্ষণ সেনের নামেই ঐ নামকরণ হয়েছে। পাইকরের পুরানো ইতিহাসের সাথেও লক্ষণ সেনের স্মৃতি বিজড়িত।

মোটের উপর বলা যায় যে বর্তমান বীরভূম তাঁর শাসনাধীন এলাকা ছিল।

রাজা লক্ষ্ণণ সেনের (দ্বাদশ শতক) শক্তিপুর শাসনের উল্লেখ অনুযায়ী বর্তমান ময়ূরেশ্বর থানার ঢেকা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারপুর দক্ষিণ বীথির অন্তর্ভূক্ত একটি 'চতুরক' ছিল। ঐ চতুরকের (কুমারপুর) পাঁচটি পাটক। যথা, - বারহকোনা, বল্লিহাটা, নিমা, রাঘবহট্ট, ডামরবড়াকন্ধ, বিজহারপুর পাটক। মোর নদীর (বর্তমান ময়ূরাক্ষী) উল্লেখ থেকে গ্রামগুলোকে চেনা যাচ্ছে। শক্তিপুর শাসনে গ্রামগুলিকে ঐ নদীর দক্ষিণতীরস্থ বলা হয়েছে। ঐ পাঁচটি পাটকের উত্তর সীমা হিসাবে মোর নদীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখিত পাটকগুলি পরস্পর সংলগ্ন আর চতুঃসীমাও একই।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে উল্লেখিত গ্রামগুলি এখনো রয়েছে। পুরানো নাম অনেকখানি বজায় আছে। যেমনি, নিমা, জে. এল নং-১০৯, বল্লিহাটি বর্তমানে বেলুটি, জে. এল নং -১০৮, বারহকোনা বর্তমান বহরা গ্রাম, মৌজা চকবরা, জে. এল নং ১০৭। বিজহারপুর কী বেজা ?

ঐ সময়ে গ্রামগুলো 'মোরনদীর' দক্ষিণতীরস্থ ছিল। নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে এখন নিমা, বেলুটি, চকবরা সবই নদীর উত্তরে অবস্থিত। নদীর গতি পরিবর্তনের প্রসঙ্গ অন্য। উল্লেখিত শক্তিপুর শাসনের সাক্ষ্য অনুসারে দ্বাদশ শতকে ঐ এলাকায় ব্রাহ্মণদের বসবাস ছিল। এক ব্রাহ্মণকে বসতি স্থাপনের জন্য জমিদানই ছিল ঐ 'শাসনের' মুখ্য বিষয়। ব্রাহ্মণরা আগন্তুক। তাদের বসবাস ও জীবিকার্জনের জন্য বাস্তুজমি ও কৃষিকার্যের উপযোগী জমি প্রয়োজন তাই, তারই ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এভাবেই বীরভূমে 'আর্য্যায়ন' ঘটেছিল। তবে, আগন্তুক ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি বা তাদের দেখা দেখি স্থানিক ব্রাহ্মণের জন্ম হয়েছিল। এখানে বসবাসকারী প্রাক্ আর্য জনগোষ্ঠীগুলোর পূজার্চনা যারা করত, তাদের জন্ম ঐ সব সমাজেই। বিশেষ ধরণের কাজ করার জন্য তাদের আলাদাভাবে দেখা হত। চণ্ডীপূজা, ভূতপূজা, রাক্ষসপূজা, বৃক্ষপূজা, ষষ্ঠীপূজা, আখ্যানপরব, পাথরপূজা – এসব কাজ ঐ সব ব্রাহ্মণরাই করত। বিয়ে ছেরাদ্দ বা শ্রাদ্ধ অর্থাৎ পারলৌকিক কাজও তারাই করত। মনে রাখা দরকার মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হিসাবেই বিশ্বের সর্বত্র মানব সমাজে বিভিন্ন বিশ্বাস ও সামাজিক অনুশাসনাদির জন্ম হয়েছে এবং তার পরিচালনার দায়িত্ব থেকে পুরুতদের আবির্ভাব হয়েছে।

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ৩য় খণ্ডে (প্রকাশকাল ১৯২৭) বীরভূমের জনজীবনের অনেকগুলো মূল্যবান দিকের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তার অন্যতম হল হিন্দু সমাজের নিম্নকোটির

ডোম সম্প্রদায়ের বিয়ে অনুষ্ঠান। মধু ডোমের মেয়ের বিয়ে। কন্যার পিতার পক্ষ থেকে তার সম্বন্ধী লেখক কে বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রন জানাতে এসেছিল। সেই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখেছেন - 'মধু ডোম নিজে আসিতে পারে নাই, কন্যা সম্প্রদানে বসিয়াছে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধী আসিয়াছিল। সে ব্যক্তি যাহা বলিতে লাগিল তাহাতে যদিচ বুঝা গেল ইহাদের ব্রাহ্মণ নাই, নিজেরা নিজেদের পুরোহিত, তথাপি রাখাল পণ্ডিত তাহাদের ব্রাহ্মণেরই সামিল । কারন, তাহার গলায় পৈতা আছে এবং সে তাদের দশকর্মা করায়। এমনকি, সে তাহাদের ছোঁয়া জল পর্যন্ত খায় না। সুতরাং এত বড় সাত্বিকতার পরে আর প্রতিবাদ চলে না। অতএব, আসল ও খাঁটি ব্রাহ্মণের সহিত অতঃপর যদি কোন প্রভেদ থাকে তো সে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।'

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রেরর উল্লেখিত মন্তব্যে ঐ সত্যই প্রতিভাত। ধারণা করা যেতে পারে যে গোষ্ঠী জীবনে যে সব ব্যক্তি তুকতাক, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি শিখেছিল (তুলনীয় সাঁওতাল সমাজের জানগুরু) তারাই আর্য্যায়নের পরবর্তীকালে 'প্রকৃতব্রাহ্মণ'দের দেখে পৈতা পড়তে শুরু ক'রে 'ব্রাহ্মণ' হয়। এখনও একই ঘটনা ঘটছে। রামপুরহাট থানার সুলুঙ্ধা গ্রামের 'সাঁওতালী দুর্গাপূজা'র পুরুতদের যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে প্রথম পূজারী একজন ভুঁইয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। ভুঁইয়ারা হিন্দু সমাজের নিম্নকোটির মানুষ। অব্রাহ্মণতো বটেই। জলচলও নয়। পরবর্তী পূজারী সুখলাল মূর্মু ('মুর্মু'রা সাঁওতাল সমাজের পুরুত), তৃতীয় পূজারী ফিলিপস মুর্মু, এখন রাবেন টুডু। রাবেন দুর্গাপূজার পাঁচদিন পৈতাধারী হয়ে যায়। তখন সে ব্রাহ্মণদের মতো পোষাকাদি পরে ও দৈনিক জীবন যাপন করে।

সিউড়ী থানার মালিগ্রামের (পায়রা ডাঙা) প্রবীন খুড়িয়া মুর্মুর গলায় পৈতা আছে। সে পূজা করে নিজের বাড়িতে। এসব ঘটনায় ঐ সত্যই প্রতিভাত হয়। বীরভূমে এখনও 'মালের বামুন', 'বাগদীর বামুন', 'হাড়ির বামুন' (এদের হেড়ো বামুন বলা হত) প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের দেখা যায়। ব্রাহ্মণদের 'উচ্চকোটি' সমাজে এদের প্রবেশাধিকার ছিলনা। তাদের সমাজ আলাদা। বিয়ে আলাদা।

১৮৭৮ সালে তৎকালীন ডিস্ট্রিকট কালেক্টর আর. ডি. হাইম লাভপুর থানার কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। ঐ তথ্যানুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে সেই সময়ে বামুনদের সমাজেও বিভাগ ছিল। বামুনদের আবার দুভাগ (তাঁর ভাষায় দু শ্রেণী) করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে ব্রাহ্মণরা আছেন। আর তাদের সাথে আছেন কায়স্থ ও বৈদ্য (চিকিৎসক)। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে রয়েছে দুই ধরণের ব্রাহ্মণ, যথা অগ্রদানী, বড়ুয়া ব্রাহ্মণ, চিতাকর, ভাট, দৈবজ্ঞ ও সন্ন্যাসী।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে হিন্দু সমাজেও সব ব্রাহ্মণের সামাজিক মর্যাদা

ও স্থান সমপর্যায়ের নয়। সেখানেও পার্থক্য আছে। বলা বাহুল্য, এ পার্থক্যের উৎস তাদের নিজ নিজ সূত্রে এবং কিছুটা আর্থিক কৌলিন্যে, কাঞ্চনের জোরে ও তার মহিমায় কেউ কেউ কখনও কখনও যে নীচের থাক থেকে উপরের থাকে উত্তীর্ণ হয়নি, তা নয়। যেমনি, তারাশঙ্কর 'গণদেবতা' (১৩৮৯) ও 'পঞ্চগ্রাম' (১৩৫০) উপন্যাসে সদগোপ সমাজের 'ছিরুপালে'র শ্রীহরি ঘোষে রূপান্তরিত হবার কাহিনী লিখেছেন। সিউড়ী থানার নগরী ইউনিয়নের (বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েত) বাতাসপুর গ্রামের 'চারুমোড়ল' ওরফে শ্রী চারু চন্দ্র মণ্ডল কিছু তালুকদারী কিনে শ্রী চারুচন্দ্র ঘোষ লিখতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) সমকালে এ ঘটনা ঘটে। বর্তমানে এর বহু নিদর্শন আছে।

ইসলামের পদসঞ্চার

বীরভূমে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীদের আগমন কখন, এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া মুস্কিল। তবে ধরা যেতে পারে চৌদ্দশতক। রাজনগর বা লক্ষুরের ক্ষমতা দখল করলেন আফগান যোদ্ধা ভ্রাতৃদ্বয়.। বলা বাহুল্য ঐ সময় থেকেই তাঁদের সূত্রধরে অনেক ইসলামধর্ম প্রচারক বীরভূমে আনাগোনা শুরু করেন। তাঁরা এ জেলায় বিভিন্ন স্থানে নিজেদের আস্তানা গড়ে তোলেন। তবে, আমার মনে হয়, রাজনগরে আফগান কর্তৃত্ব স্থাপনের আগে বীরভূমের উত্তরাংশে আফগান যোদ্ধাদের আগমন শুরু হয়েছিল। আর তার সাথে ফকির দরবেশদের আসা-যাওয়া শুরু হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বীরভূমে ইসলামধর্মীদের 'পাঠান' নামে অভিহিত করা হয়। এ থেকে এ ধারণাই করা যায় যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আফগানরাই প্রথমে আসেন। আর বহিরাগত ফকির দরবেশ বা পীররাও চেহারায় একই রকম। ভাষাও প্রায় একই রকম। বীরভূমের মানুষ তখন ওদের পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারেনি।

ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ যাঁরা এসে ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। যেমনি 'আর্য্যায়ন'-এর যাঁরা 'খাঁটি ব্রাহ্মণ' এসেছিলেন, তাঁরাও ছিলেন সংখ্যাল্প। তাঁরা যেমনি বীরভূমের জনবিন্যাসে খুব পার্থক্য বা পরিবর্তন ঘটাতে পারেন নি। তেমনি আগন্তুক ইসলাম ধর্মাবলম্বী যোদ্ধারা বা ধর্মপ্রচারক ফকির-দরবেশ পীরদের আসার পরেও জনবিন্যাসে একই রকম ঘটনা ঘটল।

বীরভূমের বর্তমান জনসংখ্যার শতকরা কুড়িভাগ ইসলামধর্মাবলম্বী। কিন্তু তাঁরা 'পাঠান' নামে অভিহিত হলেও তাঁদের মধ্যেই খুব কম পরিবারই আফগানিস্তান বা পারস্য কিংবা তুরস্ক থেকে আগত। অবশ্য, সিউড়ী থানায় তুরুখ বরিহাট গ্রাম আছে। রামপুরহাট থানায় আছে তুরুখডিহি গ্রাম।

বীরভূমের বর্তমান ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের বড় অংশ এ জেলার

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ধর্মান্তরিত মানুষ। তাঁদের ধর্মীয় পরিচয় আলাদা হলেও জনগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যগুলোতো খুব পাল্টায়না। ভারতের বাইরে থেকে আসা জাতি গোষ্ঠীগুলোর সাথে সংঘর্ষের ফলে কিছুটা হয়ত অদলবদল ঘটেছে। কিন্তু মানবদেহের মৌলিক পরিবর্তন খুব ঘটেনি। ওটা সহজে ঘটেনা। আদৌ ঘটে কিনা, তাও বলা কঠিন।

তেমনি বলা যায় ইউরোপাগত ব্রিটিশ বা অন্য জাতি গোষ্ঠীগুলোর কথা। ১৯৫১ সনের আদমসুমারির রিপোর্টে বিভিন্নধর্মীয় জনগোষ্ঠীর যে বিবরণ আছে, তাতে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা আছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এ্যাংলোইণ্ডিয়ান কেউ ছিলেন কিনা, তা জানার উপায় নেই। তবে ইহুদি দুইজনের (একজন নর, একজন নারীর) কথা উল্লেখিত আছে। দুই-একজন চাইনিজও আছেন। অবশ্য, আমি স্থায়ী বাসিন্দাদের কথা বলছি। যেমনি, বিশ্বভারতীতে পড়াশুনার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পড়ুয়ারা আসেন, আসেন গবেষকরা। আমি তাঁদের এখানে ধর্তব্যের মধ্যে আনছিনা। তাঁরা সাময়িক বাসিন্দা। স্থায়ী বাসিন্দা কেউ থাকলে, বীরভূমের জন বিন্যাসে তা গ্রহণীয় এবং আলোচ্য। নেপাল থেকে আসা কিছু মানুষ আছেন। ওঁরা এখানে স্থায়ীভাবে আছেন। এ জেলার মানুষদের সাথে তাঁদের বিয়ে সাদিও যে হয়নি তা নয়। মোটামুটিভাবে বীরভূমের জনবিন্যাসের এ হল এক সংক্ষিপ্ত রূপরেখা।

এ জেলার জনসংস্কৃতি বাংলার সংস্কৃতিরই অঙ্গ

এবার জন সংস্কৃতির দিকে তাকানো যাক। বীরভূমের জনসংস্কৃতির সাথে সামগ্রিক ভাবে বাংলার যে সংস্কৃতি, তার সাথে খুব পার্থক্য নেই, কিছু পার্থক্য, কিছু বৈশিষ্ট্য, এগুলো থাকবেই। সমগ্রের খণ্ডাংশেও ঐসব পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

জনসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক

উপজীবিকায় এ জেলার মানুষ কৃষিজীবি, কৃষিকার্যই তাঁদের জীবনধারনের মূল অবলম্বন। তাই, কৃষিব্যবস্থাকে কেন্দ্রকরে যে সব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তা এখানে বিদ্যমান। ঘরবাড়ী, গ্রামপত্তন, ভাবভঙ্গী, বিশ্বাস ও সংস্কার, আচার আচরণ, খাওয়া-পরা, চাষের উপকরণ সামগ্রী, ফসল তোলা ও রাখার ব্যবস্থা, এর একটা সামগ্রিক রূপ গোটা বাংলাদেশেই লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্য করা যায় কৃষি কেন্দ্রিক সমাজ ও সভ্যতার স্রষ্টা কৃষক, মৎস্যজীবি ও সমাজের নানাবিধ পেশায় নিযুক্ত মানুষদের জীবনধারার নানা দিক, এখানেও তা লক্ষ্য করা যায়। বিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশ এবং ঐ শতাব্দীর শেষ দশকের বৈশ্বায়নিক

অভিযান সত্ত্বেও বীরভূমকে এখনও একটি কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রোটো টাইপ বলে গ্রহণ করতে পারা যায়।

এক কালে অরণ্য ছিল। 'বীরভূম' নামতো তা থেকেই এসেছে। অস্ট্রিক ভাষায় 'বীর' শব্দের অর্থ অরণ্য। বীরভূমবাসী নিজেদের বীর বা শক্তিশালী হিসাবে মনে করে বুকের ছাতি ফুলিয়ে দিতে চাইলেও তা যে বিভ্রান্তি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এখন অরণ্য প্রায় সাফ। বনকেটে বসতি হয়েছে। জমি হয়েছে। বহু গ্রামে 'বনের মাঠ' আছে। অন্তত পশ্চিম ভাগেতো বটেই। বন্য প্রানীর নামাঙ্কিত অনেক কৃষিজমিও আছে। ভালুকসুন্দি নামক গ্রামও আছে। জমির নাম 'বাঘশুলি'। তা থাকলেও এখন বীরভূমের ভূসংস্থানের শতকরা সাড়ে তিন ভাগ মাত্র অরণ্য। তবে, আরণ্যক সভ্যতার কিছু কিছু নিদর্শন এখনও যে নেই তা বলা যাবে না। আছেন বৃক্ষ দেবতারা। উপজাতীয়দের 'জাহের থান' আছেন গ্রামদেবীরা। আছেন অনেক 'চণ্ডী' দেবী। বরাহ চণ্ডী, বাঘরাই চণ্ডী, সোনাই চণ্ডী আরন্যক মানুষদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই সাক্ষ্যবাহী।

ঘরবাড়ীর প্রধান উপকরণ, মাটি, বাঁশ, কাঠ, খড়, শর এই সব প্রাকৃতিক সম্পদ। আবার যেখানে পাথর পাওয়া যায় সেখানে তারও ব্যবহার আছে। আছে কাঁকরের ব্যবহার। তবে, মাটির ব্যবহারই সর্বাধিক, গৃহের অলঙ্করণও মাটির। খড়িমাটি বা অন্যান্য বিশেষ ধরণের মাটি। গ্রাম সংস্থানও মূলত উপজাতীয় মাঝখানে পথ। দুপাশে ঘরবাড়ী, ঐ পথের নাম 'কুলি'। কথাটা এসেছে। 'কুলহি' (অস্ট্রিক শব্দ) থেকে। বীরভূমের বহুগ্রামের গৃহবিন্যাসে এর ছাপ এখনও আছে। আগে উচু যায়গায় ঘর করা হত। 'টিকর' বিশেষত নদীর কিনারে ঐ ব্যবস্থা ছিল। 'টিকর' শব্দের ব্যবহার এখনও আছে। 'টিকরবেতা', ধলটিকুরি, কুশটিকুরী, খড়কে টিকুরী এসব গ্রামের নাম ঐ ইতিহাসই বহন করছে।

ইটের ব্যবহার সাধারণত মানুষের বা কৃষকদের ঘর তৈরীতে ছিল না। জমিদারী বিলোপ আইন (১৯৫৩) প্রবর্তনের আগে কোনো প্রজা পোড়ামাটির বাড়ী তৈরী করার অধিকারী ছিল না। ওটা ছিল জমিদার তালুকদার পত্তনিদার প্রভৃতি সামন্তদের একচেটিয়া কর্তৃত্বাধীন। জোতদাররাও অধিকারী ছিল না। আজকে একথা কৃষক সমাজের অধিকাংশেরই জানা নেই যে কোনো প্রজা পাকাবাড়ি করতে চাইলে জমিদার বা তালুকদার বা পত্তনিদারের অনুমতি নিতে হত। তাই, ইটের বাড়ি তখন বিরল ছিল। সামন্ত শ্রেণীর বাইরে তার অস্তিত্ব ছিল না।

মাটির বাড়ির অলঙ্করণ পদ্ধতিও ছিল মূলত লৌকিক রীতি অনুযায়ী যা উপজাতীয় সমাজের অবদান। বাড়িগুলোর মধ্যে মধ্যবিত্ত আংশের মাটির

বাড়িতে সুশোভন কাঠের কাজ ছিল। বাড়ি তৈরির ধরন ছিল 'চিরায়ত' বাংলা পদ্ধতি। আটচালা বা চারচালা পদ্ধতি ব্যবহৃত হত। তার ছাপ মন্দিরেও পড়েছে। মন্দিরগুলোও ঐ পদ্ধতিতে তৈরী। বৈষ্ণবদের সমাধির বা হিন্দুদের মঠ তৈরিতেও ঐ পদ্ধতি অনুসৃত হত। মসজিদে কিছুটা পারস্য সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। কিন্তু সেখানেও পোড়ামাটির কাজ ব্যবহৃত হত। অবশ্য হিন্দু বা বৈষ্ণব মন্দিরে পোড়া মাটির কাজের উপজীব্য হিন্দুপুরাণ বা লৌকিক জীবন আর মুসলিম সমাজের মসজিদে প্রকৃতির চিত্রায়ন। পার্থক্য এখানে তবে, মুসলিম সমাজের বসতবাড়িতে পুরানো বাংলারীতির প্রয়োগই লক্ষ্য করা যায়। সেখানে ইসলামীকরণের কোনো লক্ষণ নেই।

মূর্তি তৈরীতে মাটির ব্যবহারই বেশী। পাথরের ব্যবহার নেই তা নয়। তবে, বীরভূমে যে পাথর তা গ্রানাইট পর্যায়ের। তাতে খোদাইকরা মূর্তি হয়না। মূর্তির জন্য যে পাথর তা এসেছে বাইরে থেকে। মূলত উৎকল বা বর্তমান উড়িষ্যা থেকে মনে হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে নরসিংহদেব বীরভূম দখল করার পর পাথুরে মূর্তির প্রচলন বেশি হয়। মন্দির তৈরি রীতিও পাল্টায়। রেখ দেউল তৈরি শুরু হয়। রাজনগর থানার কবিলাশপুরের মন্দির, ভাণ্ডীরবনের শিবমন্দির প্রভৃতি মন্দির তার সাক্ষ্যবাহী। তবে, বীরভূমের অধিকাংশ প্রাচীন মন্দিরই বাংলা রীতিতে নির্মিত। রাজনগরের প্রাচীন মতিচুর মসজিদ (পঞ্চদশ শতক) পারস্য পদ্ধতিতে নির্মিত।

প্রাচীন দালান বাড়ির নিদর্শন হিসাবে রাজনগরের পুরাকীর্তিগুলোকে ধরা যায়। সেখানে উড়িষ্যারীতি এবং পরবর্তীকালে পারস্যরীতি উভয়ের নিদর্শন লক্ষ্যনীয়। গ্রীসীয় পাশ্চাত্যরীতিতে প্রথম কোর্ট কাছারি তৈরি হয় সিউড়ী শহরে – ব্রিটিশ যুগে তৈরি সরকারী কিছু পুরানো বাড়ি, পুরানো সার্কিট হাউস, জিলা শাসকের বাংলো প্রভৃতি এর অনুকরণ লক্ষ্য করা যায় হেতমপুর রাজ-এর বাড়িতে। বলাবাহুল্য, এগুলো উচ্চকোটির সমাজের সংস্কৃতির অঙ্গীভূত। সাধারণ জীবনে এর প্রভাব পড়েনি।

পোষাক পরিচ্ছদ

পোষাক পরিধেয় ও পোশাকেও এখন পর্যন্ত পুরানো প্রভাব রয়েছে। খাটো কাপড়, উড়ানি (চাদর) এই ছিল পুরানো দিনে পুরুষদের পোশাক। গরীবরা গামছা, আরও দুর্গতিরা 'ভগুয়া' ব্যবহার করত। মেয়েরা খাটো শাড়ি ব্যবহার করত। বাচ্চারা 'ফানারি'। সদরে যাবার জন্য গরীব পুরুষরা একটা গেঞ্জি (বিশশতক থেকে) ব্যবহার করত। মাঝারি গেরস্তরা ফতুয়া, নিমা প্রভৃতি ব্যবহার

করত। পুরুষরা অধিকাংশ সময় উদম (খালিগা) থাকত। উচ্চকোটির অবস্থাপন্ন নরনারীদের পরিধেয়ে পার্থক্য ছিল। পুরুষরা অবশ্য খাটো কাপড় ও 'উতুরি' (উত্তরীয়) ব্যবহার করত। সেক্ষেত্রে তসরের বা সিল্কের ব্যবহার ছিল। নারীরা গরদের কাপড় উৎসবে পরলেও শাড়ির চলনই বেশী ছিল। সাঁওতাল উপজাতির মানুষরা 'পঞ্ছি' ব্যবহার করত। নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি জাতীয় কাপড় পরত। পরবর্তীকালে (বিশশতকে) লুঙ্গির ব্যবহার বেড়েছে। লুঙ্গি এখন অমুসলিম সমাজেরও আটপৌরে পরিধেয় মধ্যবিত্ত সমাজে নিমা-র জায়গা নিয়েছে। হাফ হাতার সার্ট (হাফ সার্ট), সার্ট ও পাঞ্জাবি। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও পাঞ্জাবি ব্যবহার করে। বিশ শতকের শেষ দশকে ফুলপ্যান্ট ও বুশ সার্টের ব্যবহার বেড়েছে। এখন এটা সমাজের নীচের অংশে ধর্মনিরপেক্ষভাবে পৌঁছে গিয়েছে। লেখাপড়া জানা অংশে এর ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। মেয়েদের মধ্যে সায়া-ব্লাউজ ও ফ্রকের প্রচলন ব্যাপকতা অর্জন করেছে। উপজাতীয় অংশ ও কৃষক পরিবারের স্কুলে যাওয়া তরুনীরাতো বটেই গরীব ঘরেও এর প্রচলন সাম্প্রতিক কালে লক্ষ্যনীয়। ধুতি-পাঞ্জাবী পরা মধ্যবিত্তের সংখ্যা ক্রমশঃ সীমিত হচ্ছে। মোটের উপর পরিধেয়ের ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটছে।

খাদ্যপদ্ধতি

পরিবর্ত্তন হচ্ছে খাদ্যবস্তুতেও, ভাতের অধিকাংশ মানুষ। তবে গরম ভাতের ব্যবহার বেড়েছে বিশেষত মধ্যবিত্ত অংশে। নীচের ,তলাতেও পান্তাভাত দ্রুত বিলুপ্ত হচ্ছে। গ্রীষ্মের দিনে 'আমানি' ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য। পোস্তারি আছে, আছে মাছের টক। তবে, ভোজ বারিতে উচ্চকোটির ভোজে পাকারুই কাতলা মাছের টক দ্রুত বিলীয়মান। চুনোমাছের টক খাওয়াও কমে যাচ্ছে। চুনোমাছ পাওয়া কঠিন। জমিতে পোকামারা ওষুধ প্রয়োগে বা রাসায়নিক সার প্রয়োগে কাঁকড়া, গুগলি (শামুক), চুনোপুটি নিঃশেষিত। রুই-কাতলার স্বাদ মিটাচ্ছে তেলাপিয়া, সিলভার কাপ। 'জাল মাছ' (ছোট চিংড়ি) অমিল। মাংসের জগতে মুরগির চাহিদা বাড়ছে। এখন বহু বামুন বাড়িতেও 'রামপাখি' সগৌরবে ঢুকে পড়েছে। শহরের মধ্যবিত্ত (এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার অভাব নেই) সমাজের বিয়ে অন্নপ্রাশন জন্মদিন বিয়ের বার্ষিকীতে রামপাখির মাংস আকছাড় চলছে। হাতে 'বিপদতারিনী'র তাগা বাঁধা উচ্চকোটীর হিন্দু নারীরাও নির্দ্ধিধায় তা খাচ্ছেন। বাড়িতেও চলছে। আরামবাগ হ্যাচারি জেলায় বেশ কয়েকটি বিক্রয় কেন্দ্রও স্থাপন করেছে। শহরের মধ্যবিত্ত হিন্দু যুবক-যুবতীরা 'ধর্মনিরপেক্ষ' হয়ে শীতের দিনে শূয়োরের মাংসের চপও খাচ্ছেন। বন নেই। খরগোশও নেই। সাঁওতাল সমাজে শিকার করা মাংস খাওয়া কমে যাচ্ছে। কৃষক সমাজে প্রাতরাশে মুড়ি-

খই-চিড়ার প্রচলন আছে। শহরেও আছে, তবে শহরে খই-এর ব্যবহার কম। শহরে ফার্স্ট ফুডের প্রচলন হচ্ছে। গ্রামে চপ-মুড়ি-ঝালবড়ার দোকান এখনও চালু। গঞ্জগুলোতেও ঐ খাদ্যের কাটতি ভালোই।

বাতাসা-কদমা-খাসবালুসাই-জিলিপি-গজার ব্যবহার কমছে। তবে, রসগোল্লা-সন্দেশের প্রচলন বাড়াছে। রাজনগরের বিখ্যাত 'রাজভোগ' আর নেই। তবে রাজভোগের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে বড় আকারের রসগোল্লা। কোথাও কোথাও তার নাম 'বাম্পার'।

ঠাণ্ডাপানীয় এখন বিশ্বায়নের বিজয় পতাকা উড়িয়ে গ্রামের প্রান্ত দেশে পৌঁছে গিয়েছে। তবে, সাধারণ কৃষক সমাজে গ্রীষ্মে 'আকাশগঙ্গা' বা 'আকাশপানি'র প্রচলন আছে। পচুই কমছে। চোলাই মদের প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট। 'বিলিতি মদের' ব্যবহারও বাড়ছে। তার সাথে নানা জাতীয় টেবলেটের (ড্রাগ) ব্যবহার স্কুল-কলেজে পড়া যুবকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। যুবতীরাও ঐ বস্তু একেবারে ছুঁচ্ছে না, একথা বলা যাবে না। ধূমপানের ধরণ পাল্টেছে। তামাক-চিটেগুড় হুকো কলকি এখন প্রদর্শনীর বস্তু। বিড়ি চুটি খইনির ব্যবহার থাকলেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অংশে সিগারেটের প্রচলন বেশী। টিকেপড়া উঠে গিয়েছে। পানের ব্যবহার আছে। বাইরে থেকে চালান আসা পান। পানের বরোজ ক্রম বিলুপ্ত। 'পান পাতা বাউড়ি তিন নিয়ে শিউড়ী' - এ প্রবাদ থাকলেও সিউড়ির বারুইরা (পানচাষী) কেউ এখন পান চাষ করে না। ময়ূরেশ্বর থানার কিছু পানের বরোজ এখনও দেখা যায়। মধ্যবিত্ত ঘরের পানের বাটা পাওয়া যাবে না।

'ধম্মকম্ম' ও তার অনুসারীরা

এবার 'ধম্মকম্মে'র জগতে তাকানো যেতে পারে। জনবিন্যাসে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারপর মুসলিম। এককালে বৌদ্ধ ধর্মের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। এখন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা খুবই কম। ১৯৯১-তে ৯১ জন। জৈনদের প্রভাবও এককালে ছিল। এখন তাঁদের সংখ্যা ১৯৯১-তে ১৮১২ জন। বাইরে থেকে ব্যবসাকরতে আসা মাড়োয়াড়িদের মধ্যে একাংশ জৈন ধর্মাবলম্বী, শিখ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ১৯৯১-এ ১০১ জন। খ্রীষ্টান ১৯৯১-তে ৪২৬৮জন।

তবে, জেলার জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৬ ভাগ উপজাতীয়। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রাণবাদীর (এনিমিস্ট) সংখ্যা সর্বাধিক। ১৯৯১ সনে জনগণনা পর্যন্ত ঐ অংশকে আলাদা করে দেখানো হত। ১৯৯১ সাল থেকে 'এনিমিস্ট' ক্যাটাগরি তুলে দিয়ে তাদের হিন্দু পর্যায়ে ধরার ফলে ঐ অংশকে আলাদা করে ধরা যাবে না। তবে, ঐ অংশে বৃক্ষপূজা, পাথরপূজা এখনও বলবত।

ধর্ম ও সংস্কৃতি

'ধম্মকম্ম'-এর কথা উল্লেখ করলাম এই কারণে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একসময়ে ধর্মীয় ধ্যান ধারণার প্রভাব ছিল। সামাজিক উৎসবগুলো প্রকৃতিকেন্দ্রিকভাবে শুরু হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তার একটা ধর্মীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা ব্রাহ্মন্যবাদীরা করেছেন। এখানে ধ্যানধারনার সমন্বয়ও ঘটেছে। হিন্দু সমাজের উৎসবগুলোর ঐ রূপান্তর হলেও উপজাতীয়দের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো এখনও বজায় আছে। তাদের উৎসব, বিবাহাদিতে সেই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। অবশ্য সেখানেও বৃক্ষ বা পাথর - দুই এর পূজা আছে।

মুসলিম জনজীবনের অনুষ্ঠান সামাজিক কার্যকলাপে ধর্মীয় অনুশাসন প্রবল। সেইভাবেই তা প্রতিফলিত হয়, তবে, সুফিদের প্রভাব থাকায় পীরদের উরসে মেলা, শিরনি বাতাসা খাজা প্রভৃতির প্রভাব আছে। এখানে ধর্মের বেড়া ডিঙিয়ে একটা সাংস্কৃতি সমন্বয় ঘটেছে।

হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রভাব হচ্ছে দুর্গোৎসবের। তারপর কালীপূজা সরস্বতীপূজার। তবে বীরভূমে ধরমপূজার প্রভাব এখনও প্রবল। হিন্দু সমাজের নিম্নকোটির মানুষদের কাছে যে সাংস্কৃতিক জীবন ও ধ্যানধারণা তাতে এখনও সর্বজনীনত্বের দাবীদার 'ধরম ঠাকুর'।

দূর্গোৎসব আগে ছিল হিন্দু সমাজের মুষ্টিমেয় অভিজাত পরিবার গুলোর (জমিদার -তালুকদার-পত্তনিদার-মহাজনীকারবারী বা ব্যবসায়ী) মধ্যে সীমাবদ্ধ। বর্তমানে সর্বত্রই 'সার্বজনীন দুর্গোৎসব' লক্ষ্য করা যায়। রামপুরহাট থানার মাসড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সুলুঙ্গা গ্রামে সাঁওতাল উপজাতির নিজস্ব দুর্গোৎসব আছে। তেমনি লাভপুর থানার শীতল গ্রামের 'বাজিকর'দের নিজস্ব দুর্গোৎসব উল্লেখযোগ্য।

কালীপূজার প্রচলনও বেড়েছে। তবে, অধিকাংশই সর্বজনীন। পারিবারিক বা গ্রামোওয়ারীও আছে। উপজাতীয়দের মধ্যে কালীপূজার প্রচলন উনিশ শতকেও কিছু ছিল। বিশ শতকেও সে-ধারা প্রবহমান। তবে, বর্তমানে নানা সামাজিক কারণে বিশেষত উপজাতীয়দের হিন্দু প্রতিপন্ন করার যে উদ্যোগ তা ঐ বৃদ্ধির মূল প্রেরণা হিসাবে বিবেচ্য।

মধ্যবিত্ত সমাজের বেকারি, হতাশা, অবক্ষয়ী চিন্তার প্রভাব প্রভৃতির ফলে সামগ্রিকভাবেই ধর্মের প্রতি আকর্ষন বেড়েছে। তারপর হিন্দুত্ববাদীদের প্রচেষ্টাও এক্ষেত্রে মদত যোগাচ্ছে। পথে ঘাটে শিবমন্দির, কালীমন্দির তারই নিদর্শন।

লেখা পড়ার প্রচলন বাড়ার ফলে সরস্বতী পূজার প্রভাবও বেড়েছে। উপজাতীয় পল্লীতেও ক্লাব গঠিত হচ্ছে। আর তার অন্যতম কাজ সরস্বতীপূজা।

এক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মধ্যবিত্ত সমাজের প্রভাব ও অনুকরণ কার্যকরী।

সাঁওতাল উপজাতির 'সরহায়' বা বাধনা উৎসব সবচেয়ে বড় উৎসব। তবে. বাহাপরব (বসন্তোৎসব), করম, ছাতাপরব, প্রভৃতিও আছে।

অন্যান্য উপজাতীয়দের এসব থাকলেও ক্রমবিলুপ্ত সেগুলো।

বিয়ের উৎসব (বাপলা) সব উপজাতিরই আছে। আছে বাপ্‌লা সেরেঞ্চ (বিয়ের গান)।

বিয়ের উৎসব অ-উপজাতীয় সমাজেও আছে। মুসলিমদের মধ্যেও আছে বিয়ের গান।

বৈষ্ণব সমাজের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের বিয়ে, মৃতের সমাধি ও শ্রদ্ধানুষ্ঠানেও বৈশিষ্ট্য আছে। তবে. কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঐ বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হচ্ছে।

লোকনৃত্য ও লোকসংগীত

লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত এর সাথে সাঁওতাল উপজাতি ও অন্যান্য উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোর জীবন যতখানি জড়িত অ-উপজাতীয় সমাজে ততটা নয়। সমস্ত ঋতুর সাথেই জড়িত আছে উপজাতীয়দের নাচগান, মূলত তা অরণ্য ও কৃষি ভিত্তিক। বামফ্রন্ট সরকারের সৌজন্যে ঐগুলো অনেকাংশে ক্রমবিলুপ্তির কবল থেকে বেঁচেছে। তবে, বৈশ্বায়নিক প্রভাবের ধাক্কা আসছে।

কৃষকসমাজে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে লোকসঙ্গীত আছে। তবে, নৃত্যের প্রচলন খুব কম। উপজাতীয় নরনারী উভয়ে মিলে যৌথ নৃত্যে অংশ নেয়। অ-উপজাতীয়দের মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। ভাদুগানে বালিকা ভাদুমনিকে কখনও কখনও পাওয়া যায়। অন্যথায় পুরুষ ভাদুমনির বেশ গ্রহণ করে বিকৃত ভঙ্গিমায় নাচে। খেমটা নাচের অনুসরন ছাড়া কিছু নয়।

মুসলিম সমাজে নৃত্যগীত নিষিদ্ধ। তবু মেয়েদের বিয়ের গান আছে। তাছাড়া মহরমে রননৃত্য আছে। পুরুষরাই করে, নারীরা অংশীদার নয়। ফকিরী গান আছে। কাওয়ালী আছে। ঢোল ও কাঁসি সানাই মুসলিম সমাজ থেকে হিন্দু সমাজও গ্রহণ করেছে। ঐ তিন বাদ্যযন্ত্র এখন ধর্ম নিরপেক্ষ। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে উপজাতীয়দের মাদল, লাগড়া (নাকাড়া), জয়ঢাক প্রভৃতি প্রচলিত। তবে, ঢাক এখন হিন্দুদের পূজার্চনায় – ধর্মপূজা, দুর্গোৎসব, কালীপূজা প্রভৃতি সর্বত্র প্রচলিত। সেখানে ঢোলের সাধারণত প্রবেশাধিকার নেই। বৈষ্ণবদের খোল মাদলেরই এক সংস্কৃত রূপ বলা যায়। বৈষ্ণবরা গোপীযন্ত্র ব্যবহার করে। ব্রিটিশদের সুবাদে

ব্যাণ্ড ও তার সাথে জড়ানো রনবাদ্য এসেছে। তারও প্রচলন হয়েছে। সাপুড়েরা ডুগডুগি ব্যবহার করে। বাউলরা ব্যবহার করে একতারা। এখন অবশ্য, প্রযুক্তির উন্নতির যুগে নানারকম বৈদ্যুতিন বাদ্যযন্ত্রও দেখা দিয়েছে।

গানে কবিগান, লেটো-আলকাপ, যাত্রা, ভাদুগান, বোলান, বাউলগান, ফকিরিগান, প্রভৃতি বীরভূমের জনসমাজে আদরনীয়। মুসলিম সমাজে জারি গানের প্রচলন আছে। 'মাদারি'দের কসরৎ আছে। তেমনি আছে রায়বেঁশে নৃত্য। যা অন্যতম রননৃত্য হিসাবে পরিচিত। তার সাথে রণপা নৃত্যও প্রচলিত। এগুলো বীরভূমের লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতের অন্যতম সম্পদ।

বৈষ্ণবদের দ্বারা প্রবর্তিত কীর্তনেরও প্রচলন ছিল বীরভূমে। ময়নাডাল ছিল তার অন্যতম কেন্দ্র। প্রভাব কমলেও তার অস্তিত্ব আছে। কীর্তনের আসরে আজও ব্যাপক লোকসমাবেশ হয়। বহুরূপী ও বীরভূমের অন্যতম লোকরঞ্জক আঙ্গিক। 'শ্রীনাথ বহুরূপী'দের অনুষ্ঠান আজকে দর্শকমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করে।

বীরভূমের জনসংস্কৃতির এ হল সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ঐ জনসংস্কৃতির প্রবাহে এক অত্যন্ত বেগবতী ধারা সংযুক্ত করা জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ(১৮৬১-১৯৪১)। ঐ বেগবতী ধারার সাথে বীরভূমের জনসংস্কৃতির প্রবাহিনী কতটা মিশেছে তার মূল্যায়ন আজও হয়নি। সে আলাদা প্রসঙ্গ আজতা' থাকল।

বীরভূমের উপজাতি এবং তাঁদের সমাজ ও সংস্কৃতি

অরুণ চৌধুরী

ভারতের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় আটভাগ নরনারী বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবাংলাতেও মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা সাতভাগ উপজাতীয় নরনারীর বাস। এই সব উপজাতীয় নরনারীরা অল্প বিস্তর সব জেলাতেই রয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা মোট আটত্রিশ। বীরভূম জেলার জনসংখ্যারও প্রায় সাতভাগ নরনারী উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মোট এগারোটি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ এজেলার অধিবাসী। তবে, তাঁদের মধ্যে সাঁওতাল, কোড়া, মাহালি, ওঁরাও—জনসংখ্যার হিসাবে এঁরাই বেশি। তাছাড়া যেসব উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ এ জেলার বাসিন্দা তাঁদের জনসংখ্যা খুবই কম। যেমন, মুন্ডা, মালপাহাড়িয়া, মগ, হো, খেবিয়া (লোবা), চাকমা, ভূমিজ

উপজাতীয়দের সংখ্যাগত চালচিত্র

২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী এজেলার উপজাতীয় নরনারীর সংখ্যা ২,০৩,১২৭ জন। ব্লকওয়ারি হিসাব এরকমঃ

মুরারই ১নং-৭,৫৮৬, মুরারই ২ নং- ৬৬৩,
নলহাটি ১ নং-৯০৯৩, নলহাটি ২ নং ৩৪১,
রামপুরহাট ১ নং পৌরএলাকাসহ- ২২,০২৯,
রামপুরহাট ২ নং-৬৬৫, ময়ূরেশ্বর ১ নং-৯০৬৫,
ময়ূরেশ্বর ২ নং-৭,৫৫৩, মহম্মদবাজার-২৬,৮০০,
সাঁইথিয়া পৌরসভাসহ-২১,৭৪৭,
দুবরাজপুর পৌরএলাকাসহ- ৯,১৪৯, রাজনগর-১০,৫২৪,
সিউড়ি ১নং পৌরএলাকাসহ-৯,০৫৮, সিউড়ি ২নং- ৯,৭৫৩,
খয়রাশোল- ২,২২২,

বোলপুর-শ্রীনিকেতন পৌরএলাকাসহ- ৩২,৯৯৭,
লাভপুর- ৭,৩১৬, নানুর- ৩,৮৩৪,
ইলামবাজার- ১২,৭০৭।

এ হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে বোলপুর থানা এলাকাতেই এজেলার সর্বাধিক সংখ্যক উপজাতীয় মানুষ বাস করেন। দ্বিতীয় স্থানে মহম্মদবাজার ব্লক। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে পৌরএলাকাসহ রামপুরহাট ১ নং ব্লক এবং পৌরএলাকাসহ সাঁইথিয়া ব্লক।

সাঁওতাল উপজাতি সংখ্যা গরিষ্ঠ

এইসব উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সাঁওতাল উপজাতির সংখ্যাই সর্বাধিক। যদিও বর্তমান আদমসুমারিতে উপজাতি–ওয়ারি জনসংখ্যার কোনো বিভাজন পাওয়া সম্ভবপর নয়। ১৯৬১ সন পর্যন্ত উপজাতি–ওয়ারি বিভাজন আমরা পেয়েছি। তখনকার হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে সাঁওতাল উপজাতির জনসংখ্যার সাথে এজেলার বাসিন্দা অন্যান্য উপজাতীয় জনগোষ্ঠীগুলির সংখ্যাগত পার্থক্য বিস্তর। যেমন, ১৯৬১ সনে এ জেলায় উপজাতীয় জনসংখ্যা ছিল মোট ১,০৬,৮৬০ জন। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭.৩৯ ভাগ। তাঁদের মধ্যে সাঁওতাল উপজাতির নরনারীর সংখ্যা ছিল ৯৩,৪২৬ জন। দ্বিতীয় স্থানে কোড়া উপজাতির সংখ্যা, তা হল ৫,৫১৪ জন আর সকলেরই জনসংখ্যা হাজারের নীচে। মাহালি ৮৭৩ জন, ওঁরাও ২৬৯ জন, মালপাহাড়িয়া ৩৫৭ জন, মগ-৯৩ জন, মুন্ডা-১৫ জন, হো-৪২ জন, চাকমা -২ জন, ভূমিজ-১ জন। এ হিসাবে আরো দেখা যায় যে কয়েকটি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা খুবই নগণ্য।

এবার অতীতের হিসাবের দিকে তাকিয়ে দেখা যেতে পারে, সাঁওতাল উপজাতির মানুষদের দিয়েই শুরু করা যাক। ১৮৭২ সনে দেশের প্রথম জনগণনা হয়েছিল। সেখান থেকেই শুরু করছি। ১৮৭২– ৬,৯৫৪, ১৮৮১– ৭২৬, ১৮৯১-- ২১,৭৭০, ১৯০১– ৪৭,২২১, ১৯১১– ৫৬,০৮৭, ১৯২১– ৫৭,১৮০, ১৯৩১– ৬৪,০৭৯, ১৯৪১– ৬০,৯২০, ১৯৫১– ৭৮,৪৪০, ১৯৬১–এর হিসাবে আগেই উল্লেখ করেছি।

কোড়া উপজাতি

এবার কোড়া উপজাতির হিসাব দেওয়া যাক।

১৮৭২– ৩,৭৭৬, ১৮৮১– হিসাব পাওয়া যায়নি, ১৮৯১– ১০,২৬৭, ১৯০১– ১১,৯০২, ১৯১১– ৯,৬৮০, ১৯২১– ৬,১০০, ১৯৩১– ৮,৯৯৩, ১৯৪১-- ৪,৬৮৫, ১৯৫১– ৪,৬৮৫, ১৯৬১– এর হিসাব আগে দিয়েছি।

অন্যান্যরা

মাহালিদের জনসংখ্যার কোন হিসাব ১৮৭২, ১৮৮১, ১৮৯১ এই তিনটি জনগণনায় পাওয়া যায়নি, ১৯০১-৭৯২, ১৯১১-৬০৬, ১৯২১-হিসাব পাওয়া যায়নি, ১৯৩১-৬৪১, ১৯৪১-৯৫৫, ১৯৫১-৭৯০।

মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার হিসাব ১৯০১ থেকে পাওয়া যায়। ১৯০১-২১৭, ১৯১১-১৫৭, ১৯২১-১০১৮, ১৯৩১-৭০৭, ১৯৪১-১০৫, ১৯৫১-১৭৫

ওঁরাওদের ক্ষেত্রেও ১৯০১-এর আগেকার কোনো হিসাব পাওয়া যায়নি। ১৯০১-৯৪, ১৯১১- ৪৩৩, ১৯২১-১৮৭, ১৯৩১-৭৫, ১৯৪১- ৪৭, ১৯৫১-৮০২।

মালপাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা - ১৯০১-এর আগে পাওয়া যায়নি। ১৯০১-৫৯৭, ১৯১১- ১৭৯, ১৯২১ ও ১৯৩১-এর হিসাব পাওয়া যায়নি। ১৯৪১-২৭৯, ১৯৫১- ২০৯।

আগমনের কালপঞ্জী

বর্তমান বীরভূম জেলায় এইসব উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মানুষদের আগমন মূলত উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিশেষত, সাঁওতালউপজাতির মানুষরা বর্তমান বীরভূম জেলায় এসেছেন ১৮৫৫ সনের সাঁওতাল বিদ্রোহের পর থেকে। তবে কোড়া বা ওঁরাও উপজাতির কিছু মানুষ হয়ত তার আগেই কাজের সন্ধানে এ জেলায় এসেছিলেন। সম্ভবত নীলচাষের জন্য তাঁদের ছোটনাগপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে নীলকররা নিয়ে এসেছিল।

বলাবাহুল্য, উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর ঐ সব মানুষরা এজেলায় মূলত এসেছেন জমি ও খাটুনির সন্ধানে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে নবসৃষ্ট জমিদাররা, বলা যেতে পারে ছোটনাগপুর, সিংভূম থেকে আরম্ভ করে সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্ববর্তী বৃহত্তর বীরভূম (সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে ১৮৫৬ সালে তৎকালীন বীরভূম জেলার একটি অংশ নিয়ে সাঁওতাল পরগণা নামক ননরেগুলেটেড নতুন জেলা গঠিত হয়) প্রভৃতি জেলা থেকে ব্যাপকভাবে কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে শুরু করে। তারই পরিণতিতে উচ্ছিন্ন কৃষকরা জমি ও খাটুনির সন্ধানে বাংলার সমতল ভূমির দিকে আসতে শুরু করেন। ঐ সব আগন্তুক ভূমিহারা কৃষকদের কাজে লাগিয়ে এই অংশের জমিদাররা পতিত ও অনাবাদী জমি আবাদ করে জমিদারদের আয় বাড়াবার পথ প্রশস্থ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের দেয় রাজস্ব সুনির্দিষ্ট ছিল। পতিত বা অনাবাদী জমি আবাদ করে সেখানে প্রজা বসিয়ে নিজেদের আয় বাড়াবার যে সুযোগ জমিদারদের ছিল তা তারা ভালোভাবেই কাজে লাগাল।

এ প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে ঐসব জমিদাররা যেসব কৃষকদের শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঐ ভাবে জমি আবাদ করালেন সেই সব কৃষকরা কিন্তু আবার ভূমিহীনে পরিণত হলেন। জমিদাররা ঐ সব আবাদী জমি থেকে আবাদকারী কৃষকদের (যাঁদের অধিকাংশই ছিল উপজাতীয় কৃষক) জমি ছলে বলে কৌশলে কেড়ে নিলেন। যার পরিণতিতে সাঁওতাল উপজাতির কৃষকদের ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) ঘটেছিল।

আগেই উল্লেখ করেছি যে বর্তমান বীরভূম জেলায় নতুন তৈরি সাঁওতাল পরগণা জেলা বা ছোটনাগপুর মালভূমির বিভিন্ন এলাকা থেকে উপজাতীয় কৃষকরা বর্তমান বীরভূম জেলায় দলে দলে আসার সূচনা সাঁওতাল বিদ্রোহের পর থেকে।

বর্তমান বীরভূম জেলার পশ্চিম ও উত্তর সীমান্ত নতুন তৈরি সাঁওতাল পরগণার লাগোয়া। কাজেই, সাঁওতাল পরগণা থেকে আসা ঐসব উপজাতীয় মানুষরা প্রথম এসেছিলেন বীরভূমের মুরারই, নলহাটি, রামপুরহাট, তৎকালীন মৌড়েশ্বর, বর্তমান মহম্মদবাজার, তৎকালীন সিউড়ি থানার অন্তর্গত বর্তমান রাজনগর থানা এলাকায়, পরবর্তীকালে ঐ সব আগন্তুকরা জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে এগোতে থাকেন। বর্তমান বোলপুর থানা (তখনকার কসবা থানা), সাঁইথিয়া থানা, লাভপুর থানা ও ইলামবাজার থানাতেও ঐসব আগন্তুকরা বসতি স্থাপন করেন।

সর্বত্রই কিন্তু জমিদাররা ঐসব আগন্তুক উপজাতীয় কৃষকদের—যাঁদের অধিকাংশই ছিল সাঁওতাল উপজাতির মানুষ, পতিত বা অনাবাদী জমি আবাদ করার কাজে লাগিয়ে ছিলেন। জঙ্গল সাফ করে নতুন জমি তৈরীর কাজেও ঐসব আগন্তুকদেরই মূল ভূমিকা ছিল।

১৯০৮ সনে ব্রিটিশ সরকার বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও উত্তর বালাসোর জেলার (বর্তমানে উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত) সাঁওতাল উপজাতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য এম. সি. ম্যাকআলপিনকে নিযুক্ত করে। ম্যাকআলপিন যে প্রতিবেদন পেশ করেন. তাতে দেখা যায় যে ১৮৭২ সনের আদমসুমারির পরবর্তীকালে ১৯০১ সনের আদমসুমারি পর্যন্ত বর্তমানে বীরভূম জেলার সাঁওতাল উপজাতির জনসংখ্যা কয়েকগুণ বেড়েছে। ১৮৭২ সনে এ জেলায় সাঁওতাল উপজাতির জনসংখ্যা ছিল যেখানে ৬,৯৫৪ জন তা বেড়ে হয়েছে ৪৭,২২১ জন।

ঐ প্রতিবেদনে এঁদের এজেলায় আসার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে দুটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সাঁওতাল পরগণার

জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ওঁরা ঐ এলাকা ত্যাগ করে নতুন এলাকার দিকে পা বাড়িয়েছেন কিংবা জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা জমিচ্যুত হবার ফলে তাঁরা নতুন জমির সন্ধানে পূর্বাভিমুখী হয়েছেন। একটা অংশ উত্তরাভিমুখী হয়ে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়ে মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর প্রভৃতি জেলায় চলে গিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ গেলেন চা বাগানের শ্রমিক হিসাবে কাজ করার জন্য।

ওঁদের সাঁওতাল পরগণা ত্যাগের পিছনে শেষোক্ত কারণটাই আসল হিসাবে গণ্য বলে মনে হয়।

পূর্বোক্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ১৯০১ সনে এ জেলার সাঁওতাল উপজাতির জনসংখ্যা দুটি মহকুমার মধ্যে এভাবে বিন্যস্ত ছিল। রামপুরহাট মহকুমার বিন্যাস ছিল এরকম—

থানা	মোট জনসংখ্যা	সাঁওতাল উপজাতির সংখ্যা	শতকরা হার
মুরারই	৮৬,১৮২	৩,১০৮	৩.৬%
নলহাটি	৮৩,৫২১	৪,১১০	৪.৯%
রামপুরহাট	১,০২,৮১০	৮,২২০	৮.০%
মৌড়েশ্বর	৯৩,৮৩৯	৬,৭৯১	৭.২%

সদর মহকুমার বিন্যাস ছিল এরকম—

থানা	মোট জনসংখ্যা	সাঁওতাল উপজাতির সংখ্যা	শতকরা হার
সিউড়ি	১,৪০,০৩৩	১২,১৯৫	৮.৭%
বোলপুর	১,১৫,৮৪৯	৮,৭৮১	৭.৬%

সদর মহকুমার তৎকালীন অন্য থানাগুলিতে সাঁওতাল উপজাতির জনসংখ্যা ছিল এরকম—

থানা	মোট জনসংখ্যা	সাঁওতাল উপজাতির সংখ্যা
লাভপুর	৬৪,২৮১	১,২৫৪
দুবরাজপুর	১,৩৮,০২৬	২,৩০৪
সাকুলিপুর (বর্তমান নানুর)	৭৭,৭৪০	৪৫৮

ঐ সময়কালে (১৯০১) রামপুরহাট মহকুমার চারটি থানায় সাঁওতাল উপজাতির গ্রাম সংখ্যা ছিল এরকম—

থানা	মোট গ্রাম	সাঁওতাল উপজাতির গ্রাম
মুরারই	২৬০	৩৫
নলহাটি	২৬৫	৪৪
রামপুরহাট	৩০৭	৮০
মৌড়েশ্বর	৪২৬	৪৪

সদর মহকুমার চিত্রটা এরকম—

থানা	মোট গ্রাম	সাঁওতাল উপজাতির গ্রাম
মহম্মদ বাজার ফাঁড়ি	১৮২	২৮
সিউড়ি ও রাজনগর (ফাঁড়ি)	১৬৮	৬৮
খয়রাশোল ও দুবরাজপুর ফাঁড়ি	৩২৫	৬
ইলামবাজার ফাঁড়ি	৯৭	৩
বোলপুর	৩০৩	৩৭

ম্যাকআলপিন তাঁর ঐ প্রতিবেদনে বোলপুরের সাঁওতাল জনবসতি সম্পর্কে লিখেছেন যে, এই থানা সরাসরি সাঁওতাল পরগণার সংলগ্ন নয়। এখানকার সাঁওতাল জনবসতির প্রতিষ্ঠাকাল বছর চল্লিশের বেশি নয় অধিকাংশ জনবসতি বছর কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে গড়ে উঠেছে। কোনো কোনো জনবসতি মাত্র বছর দশেক আগে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ উনিশ শতকের নব্বুই-এর দশকে।

ম্যাকআলপিন তাঁর ঐ প্রতিবেদনে ঐ সময়ে বীরভূমের আরেকটি উপজাতীয় জনগোষ্ঠী কোড়াদের সম্পর্কেও যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় ঐ জনগোষ্ঠীর মানুষরাও এজেলার অনাবাদী ও পতিত জমি, জঙ্গল প্রভৃতি সাফ করে নতুন জমি বা আবাদী জমি করার কাজ করেছিলেন। ১৯০১ সনে এজেলায় কোড়া উপজাতির জনসংখ্যার হিসাব ছিল এরকম—

মুরারই ৭২৭, নলহাটি - ৭২৩ রামপুরহাট ৪৪৮
মৌড়েশ্বর ২,৮৪১, সিউড়ি–২,৮২৭, বোলপুর-৬২৫,
দুবরাজপুর- ১,২৫৭।

অর্থনৈতিক জীবন

সামগ্রিকভাবে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মানুষরা অধিকাংশ ভূমিহীন। কৃষি মজুর, খনি ও কলকারখানার মজুর, ইঁটভাটার মজুর ঘরবাড়ি তৈরির মজুর প্রভৃতি দৈহিক শ্রমের কাজই উপজাতীয়দের উপজীবিকার মূল অবলম্বন। পশ্চিমবাংলার সংগঠিত কৃষক আন্দোলন, ১ম ও ২য় যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কারের ফলশ্রুতিতে এই রাজ্যে ভূমিহীন কৃষক,

বর্গাদার ও গরীব কৃষকদের অর্থনৈতিক জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষক সমাজের অন্যতম অংশ উপজাতীয় অংশও বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন তার ফলে ঐ অংশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

এ জেলায় ঐ ভূমি সংস্কারের চিত্রে যাবার আগে এ জেলার উপজাতীয়দের পেশাগত ক্ষেত্রে অতীতের অবস্থাটা কী ছিল সে বিষয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরছি। অবশ্য, যে চালচিত্র আমি তুলে ধরতে চাচ্ছি তা স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কার প্রথম যে আদমসুমারি অর্থাৎ ১৯৫১এর আদমসুমারি থেকে প্রাপ্ত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য পরবর্তীকালে জনগণনায় আলাদা করে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীগুলির পেশাগত জীবনের কোনো পৃথক চালচিত্র সংগৃহীত হয়নি. এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে উপজাতীয় মানুষরা জমির সাথেই সবচেয়ে বেশি জড়িত। তাঁদের উপজীবিকার মূল উৎস জমি। অন্যান্য কিছু পেশা তাঁদের থাকলেও তা খুবই গৌণ। জমিই তাঁদের জীবনে মুখ্যস্থানাধিকারী।

১৯৫১-এর চালচিত্রটা এরকম—বীরভূমে মোট উপজাতীয় জনসংখ্যা- ৭৯,৪১৭। পুরুষ-৩৯,০৪৬, নারী–৪০,৩৭১।

নিজস্ব জমিতে চাষবাসকারী ও তাঁদের পোষ্যবর্গ মোট ২০,০৭৯ জন। পুরুষ- ১০,০৬৮ জন। নারী- ১০,০১১ জন। পরের জমিতে চাষবাসকারী ও তাদের পোষ্যবর্গ- মোট ২৫.৩৩৬ জন। পুরুষ- ১২,৩৩৬ জন, নারী - ১৩,০০০ জন। কৃষি শ্রমিক ও তাদের পোষ্যবর্গ– ৩৯,৬৯৬ জন। পুরুষ- ২০,০১৭, নারী- ১৯,৬৭৯ জন। মধ্যস্বত্বভোগী- মোট ২২ জন। পুরুষ- ৮ জন, নারী - ১৪ জন।

পঞ্চাশ বছরে ঐ চাল চিত্রের পরিবর্তন যে ঘটেছে তাতো আগেই উল্লেখ করেছি। ঐ পরিবর্তন ঘটার পিছনে রয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের রাজনৈতিক ভূমিকা এবং ঐ সরকারের জনমুখীন কার্যক্রম। বিশেষত, ভূমি সংস্কার। বর্গাদারদের অধিকার প্রতিষ্ঠা। ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে সরকারে ন্যস্ত খাসজমি বিনামূল্যে বন্টনের ব্যবস্থা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ গ্রামোন্নয়ণের কাজ।

তার সাথে উপজাতীয় সমাজের সামাজিক জীবনের উন্নতিসাধনের লক্ষ্য নিয়ে তাঁদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, সমাজের ঐ অংশের মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি, যা আমাদের লোকসংস্কৃতির অন্যতম মূল্যবান সম্পদ, তার বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপজাতীয়দের মধ্যে

সংখ্যাগরিষ্ঠ সাঁওতাল উপজাতির নিজস্ব ভাষা সাঁওতালীর নিজস্ব লিপি 'অলচিকি'র স্বীকৃতি, ঐ লিপিতে সাঁওতালী ভাষার বিদ্যালয় পাঠ্য বই তৈরি করে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রভৃতিও এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষণের ফলশ্রুতিতে উন্নয়ণমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সমাজের ঐ অংশের মানুষদের মধ্যে নতুন প্রত্যয়, আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়েছে। আজ রাজ্যের অন্যান্য অংশের সাথে এ জেলাতেও তার স্বাক্ষর সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে।

উপজাতীয় সমাজের জীবনধারার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে জমি, দেখা যাচ্ছে বিগত বছর পর্যন্ত এজেলার ২৮,৪৪২ জন উপজাতীয় কৃষককে সেই জমি বিনামূল্যে মোট ৯,৮০০.২৭ একর তুলে দেওয়া হয়েছে। এটা হল চাষযোগ্য জমির হিসাব। একইভাবে ৬,৪১৪ জন মোট ১,১২,১৬৯ একর অকৃষিজমি পেয়েছেন।

যে সব উপজাতীয় কৃষকরা পরের জমি বর্গা প্রথায় চাষ করেন গত বছর পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে ১৭,৩৪১ জনের ঐ চাষের জন্য, যার পরিমাণ ১৯,৯৬৬.২৯ একর তা বর্গাদার হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। ৪,৪৩৯ জন উপজাতীয়ের বাস্তভিটা রেকর্ড ভূক্ত করা হয়েছে। রেকর্ডভূক্ত বাস্তজমির পরিমাণ ১৬৮.৩২ একর।

ভূমি সংস্কারের ফলশ্রুতিতে ব্যাপক অংশের উপজাতীয় কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জমির অধিকার প্রতিষ্ঠার উপজাতীয়দের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যথেষ্ট পড়েছে।

শিক্ষাগত চালচিত্র

সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে তার অন্যতম উপাদান হল শিক্ষা। অশিক্ষার অন্ধকার উপজাতীয় সমাজের সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রবল বাধাস্বরূপ থেকে গিয়েছে। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটানো সামাজিক বিকাশ ঘটাবার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক।

এজেলার উপজাতীয়দের শিক্ষার হার কতটা বাড়ল। তার কোনো সঠিক চিত্র পাওয়া যাচ্ছে না। তবে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, উপজাতীয়দের মধ্যে শিক্ষার হার বেড়েছে। সমাজের ঐ অংশের বর্তমান প্রজন্মের সন্তানদের মধ্যে বিদ্যালয়মুখীনতা ও শিক্ষালাভের আগ্রহ আগেকার যে কোনো সময়ের তুলনায় বহুগুণে যে বেড়েছে, একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়।

দেখা যাচ্ছে যে ২০০৪ সালে এ জেলার প্রাথমিক স্তরের মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৩,৪০,২০১ জনের মধ্যে উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোট ২৭,৯২২

জন। ছাত্র ও ছাত্রী হিসাবে বিভাজন এরকম—ছাত্র ১৪,৬০১ জন। ছাত্রী- ১৩,৩২১ জন। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, উপজাতীয় কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তানদের যাঁরা বিদ্যালয় পড়ুয়া তাদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। এটা নিঃসন্দেহে অগ্রগতির লক্ষণ। বিশেষত, উপজাতীয় নারীদের মধ্যে শিক্ষাহীন মাত্রা যথেষ্ট। সেক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রী ২০০৪-২০০৫ সালে মোট ৬,২৮২ জন। এদের মধ্যে ৮১০ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনা করছে।

ঐ তথ্যের আলোকে, একথা বলা যায় যে উপজাতীয়দের শিক্ষাহীনতার যে বরফ যুগযুগান্ত ধরে জমাট ছিল, তা গলতে শুরু করেছে।

সমাজ ও সংস্কৃতির কিছু দিক

উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক সংগঠন মূলত গোষ্ঠীভিত্তিক এবং সমাজের বিকশিত অংশ থেকে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট। আরও একটি বিষয় এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিটি গোষ্ঠীরই সামাজিক সংগঠন আবার পৃথক পৃথক ধরণের। তার সাথে সাথে সংস্কৃতিগত পার্থক্যও রয়েছে। প্রত্যেকেরই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এরা সবাইতো প্রাক্-আর্য ভারতের বাসিন্দা। এদের মধ্যে কোনো কোনো জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিলুপ্তপ্রায়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের নানা পরিবর্তনের ধাক্কায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে এবং এখনও হারাচ্ছে।

উপজাতীয়দের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাঁওতাল উপজাতির মানুষরা এখনও নিজেদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনেকখানি ধরে রাখতে পেরেছেন। তবে, সমাজ বিকাশের নিয়মে সেখানেও যে তাঁদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি অটুট ও অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে, তা বলা যাবে না। বিশেষত ধনতন্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে বৈদ্যুতিন প্রচার যন্ত্রের শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের আক্রমণে সংস্কৃতি জগতের সমস্ত লৌকিক উপাদানগুলির বিপর্যয় ঘটছে। তাদের অস্তিত্বের সংখ্যা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। বিশ্বায়ণের অক্টোপাস বাঁধনে লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক অস্তিত্বই আজ বিপন্ন।

সংস্কৃতিতো উপরিকাঠামো। লোকসংস্কৃতির ধারক-বাহক যে জনসমাজ সামগ্রিকভাবেই তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন আজ বিপন্ন। কাজেই তাদের সংস্কৃতির উপরেও আঘাত অবশ্যম্ভাবী। তারই দুর্লক্ষণ ক্রমশ পরিস্ফুট হচ্ছে।

প্রসঙ্গত একটা কথা মনে রাখা দরকার যে ধনতন্ত্র তার বিকাশের নিয়মে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের অনেক কিছুরই পরিবর্তন ঘটায়। এর কতকগুলি

ইতিবাচক দিকও আছে। তবে আজকে যেভাবে তা ঘটছে তা তার সবদিকটা আশঙ্কামুক্ত নয়।

ধনতন্ত্রের বিকাশের সাথে উপজাতীয় সমাজের পরিধেয়, তাদের আচার--অনুষ্ঠান, ব্যবহার আসবাবপত্র সহ জীবনধারার সাথে যুক্ত অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চল্লিশ বছর আগেও উপজাতীয় সমাজের নারীদের যে পরিধেয় ছিল, তার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। উপজাতীয় সমাজের যেসব কন্যাসন্তানরা স্কুল কলেজে পড়ছে, তারা বিদ্যালয়ের পোষাক ব্যবহার করছে। ছাত্ররা প্যান্ট সার্ট পরছে।

উপজাতীয়দের বিয়ে সংক্রান্ত রীতিরও দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা এখন আর আগেকার মত গোষ্ঠীর নিয়ম অনুযায়ী বিবাহযোগ্য পাত্রপাত্রীর অভিভাবকদের উপস্থিতিতে মেলা বা কোনো প্রকাশ্য স্থানে বিয়ে ঠিক করার (চলতি ভাষায় মনামনি) যে রীতি, তাতে আপত্তি জানাচ্ছে। উপজাতীয় সমাজের চাকুরীজীবী অংশের মধ্যে অগ্রসর সমাজের জীবনধারার অনুকরণের আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিচ্ছে। সেখানে মধ্যবিত্ত মানসিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট হচ্ছে। এই অংশের মধ্যে নগরবাসী হবার ঝোঁকও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বোলপুর, সিউড়ি, রামপুরহাট শহর সংলগ্ন এলাকায় বেশ কিছু সংখ্যক চাকুরীজীবী উপজাতীয় পরিবার বাসিন্দা হচ্ছেন। এঁদের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সংখ্যক, সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা রয়েছেন। সংখ্যাগতভাবে খুব বেশি না হলেও ধনতন্ত্রের বিকাশধারায় নগরায়নের যে ঝোঁক তার প্রভাব স্বাভাবিক নিয়মে জনজাতীয় সমাজের উপরেও যে পড়ছে তা অনস্বীকার্য।

শেষকথা

আরেকটি দিক উল্লেখ করে আমার এ নিবন্ধে ইতি টানতে চাই। সাঁওতাল বিদ্রোহ ও পরবর্তীকালের অনেক কৃষক সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী এজেলার উপজাতীয় কৃষক সমাজ সামগ্রিকভাবেই বামপন্থী রাজনৈতিক চেতনার অধিকারী। পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন নির্বাচনে তারই ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

বীরভূমের উপজাতীয় সমাজও আজ নবজীবনের অভিযাত্রী। নতুনকালের ভেরী নিনাদ তাঁদের কানেও পৌঁছেছে।

প্রাচীন বীরভূমের শিক্ষা প্রসঙ্গে দুটি লেখা

অরুণ চৌধুরী

এডামের চোখে সেকালের বীরভূমের শিক্ষার চালচিত্র

ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য কায়েম হবার পরে, বিশেষত উনিশ শতকের প্রথম থেকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। এদেশে শিক্ষার মাধ্যম কী হবে, তখন এটাই ছিল প্রধান প্রশ্ন। সেক্ষেত্রে দুটো মত ছিল। ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য ধরণের আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে একদল ছিলেন। ব্রিটিশ শাসকরা তাঁদের প্রশাসনিক কাজকর্মের প্রয়োজনে ইংরাজি জানা লোকদের সমাদর করেছিলেন। ইংরেজ বণিকদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য ইংরাজি জ্ঞান সম্পন্ন লোকের চাহিদা দেখা দিয়েছিল। বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) তাঁর বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন যে, ইংরাজি জানা লোকেদের ইংরাজদের হৌসে (হাউস) চাকুরীর সুযোগ ছিল, তাই ঠাকুরদাস তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী সংস্কৃত না শিখে কলকাতা এসে চলনসই ইংরাজি শিক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ইংরাজি শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলকাতায় হিন্দু কলেজ (১৮১৬) প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম।

আরেক দল মাতৃভাষা বাংলাভাষার মাধ্যমে পক্ষে ছিলেন।

এই বিতর্ক চলার সময় উইলিয়ম এডাম নামক এক খ্রীষ্টান মিশনারী বাংলা প্রেসিডেন্সীর প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। তার ভিত্তিতে তিনি একটি প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন।

এডাম সাহেব তৎকালীন বীরভূম জেলার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কেই

তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বীরভূম জেলার ভৌগলিক সীমা তখন সাঁওতাল পরগণার দেওঘর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে সাঁওতাল পরগণা আলাদা জেলায় পরিণত হয়। এডাম সাহেব ঊনিশ শতকের ত্রিশের দশকে ঐ তথ্য সংগ্রহের কাজ করেন। তাঁর তৃতীয় প্রতিবেদনে (১৮৩৭) তৎকালীন বীরভূম জেলায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিবরণ পাই আমরা। সেই বিবরণ নিয়েই আমার নিবন্ধ।

এডামের প্রতিবেদন অনুযায়ী বীরভূম জেলায় তখন মোট ৫৪৪টি বিদ্যালয় ছিল। এর মধ্যে ৪০৭টি বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা পড়ানো হত, সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোলের সংখ্যা ছিল ৫৬টি। ফার্সী শেখা যাইত ৭১টিতে, হিন্দী শেখাবার বিদ্যালয় ছিল ৫টি, আরবী শিক্ষার বিদ্যালয় ১টি। তখন এ জেলায় ইংরাজি শিক্ষার জন্যও স্কুল তৈরী হয়েছে তার সংখ্যা ছিল ২টি। বালিকাদের জন্য ইংরাজি শিক্ষারও একটি স্কুল ছিল।

এডাম সাহেব তাঁর প্রতিবেদনে কোন থানায় কটি বিদ্যালয় ছিল তার বিবরণও দিয়েছেন। নাঙ্গুলিয়া থানায় বাংলা পড়ানোর বিদ্যালয় ছিল ৩০টি, সংস্কৃত পড়াবার চতুষ্পাঠী বা টোল ২টি, ফার্সী পড়াবার বিদ্যালয় বা মক্তব ৪টি, খড়বোনা থানায় ছিল বাংলা ২৩টি, সংস্কৃত ১টি, ফার্সী ৪টি, দেওঘরে বাংলা ৬টি, হিন্দী ৫টি। সাহানায় বাংলা ১০টি, সংস্কৃত ১টি। সাকুলিপুরে (বর্তমান নানুর) বাংলা ৩৬টি, সংস্কৃত ৩টি, ফার্সী পড়াবার বিদ্যালয় ৪টি, উপরবান্ধে বাংলা ২টি, বরোয়ার বাংলা ২৯টি, সংস্কৃত ১টি, ফার্সী ৮টি, আরবী ২টি, আরজলনুরে বাংলা ৩৭টি, সংস্কৃত ২টি, ফার্সী ২টি। নলহাটিতে বাংলা ১০টি, সংস্কৃত ১টি, ফার্সী ১টি। সিউড়িতে বাংলা ২৭টি, সংস্কৃত ১০টি, ফার্সী ১২টি, ইংরাজি বালক ১টি, বালিকা ১টি। ভরতপুরে বাংলা ৩৪টি, সংস্কৃত ৭টি, ফার্সী ১১টি, কেতুগ্রামে বাংলা ২১টি, সংস্কৃত ১৫টি, ফার্সী ৭টি। কসবা (বর্তমান বোলপুর) বাংলা ৩৪টি, সংস্কৃত ৬টি, ফার্সী ৬টি, ইংরাজি ১টি। লাভপুরে বাংলা ১৭টি, সংস্কৃত ৭টি ফার্সী ৫টি, কৃষ্ণনগরে বাংলা ২২টি, ফার্সী ২টি, দুনিগ্রামে বাংলা ৭টি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তখনকার যে থানা ছিল তার সাথে বর্তমান থানার বিবরণ মিলবে না। আগেই উল্লেখ করেছি যে বর্তমান সাঁওতাল পরগণা তখন বীরভূমের অন্তর্গত ছিল। দ্বিতীয়ত মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশ তখন বীরভূমের এলাকা ছিল। আবার বর্তমান বীরভূমের কিছু অংশ তখনকার মুর্শিদাবাদের মধ্যেই ছিল। যেমন বর্তমান মুরারই ও রামপুরহাট থানা।

এই বিবরণ অনুযায়ী 'ভার্নাকুলার' বা আঞ্চলিক মাতৃভাষার বিদ্যালয় ছিল মোট ৪১২টি। বাংলা ৪০৭ টি, হিন্দী ৫টি প্রকৃতপক্ষে মাত্র ১টিতে কেবলমাত্র

হিন্দী পড়ানো হত। বাকী ৪টি ছিল দ্বিভাষী বিদ্যালয়। অর্থাৎ বাংলা ও হিন্দী এই দুটি আঞ্চলিক মাতৃভাষাই সেখানে পড়ানো হত।

ঐসব বিদ্যালয়গুলির গ্রামভিত্তিক বন্টন ছিল এ রকম—৮টি গ্রামে ৩টি করে আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষার বিদ্যালয় ছিল ২টি করে বিদ্যালয় ছিল ১৫টি গ্রামে, ৩৮৫ টি গ্রামে বিদ্যালয় ছিল ১টি করে।

ঐসব ৪১২টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ১জন ছিলেন খ্রীষ্টান, ৪জন মুসলমান, বাকী ৪০৭ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তাঁদের বয়সের গড় ৩৮.৩ বছর।

হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিক্ষকদের আবার সম্প্রদায়গত বিভাগ ছিল এরকম—কায়স্থ-২৬ জন, ব্রাহ্মণ-৮৬, সদ্‌গোপ-১২জন, বৈষ্ণব-৮জন, গন্ধবণিক-৫জন, ভাট-৪জন, কৈবর্ত্য-৪জন, ময়রা-৪জন, গোয়ালা-৩জন, বৈদ্য-২জন, আগুরি--২জন, যুগী-২জন, তাঁতি-২জন, কলু-২জন, শুঁড়ি-২জন, স্বর্ণকার-১জন, রাজপুত--১জন, নাপিত-১জন, বারুই-১জন, ছত্রী-১জন, ধোবা, মালো ও চন্ডাল ১জন করে।

শিক্ষকদের সম্প্রদায়গত পরিচয়ে লক্ষ্য করা যায় যে হিন্দু সমাজের 'অচ্ছুৎ' পর্যায়ভুক্ত যথা—ধোবা, মালো, চণ্ডাল, কলু ও শুঁড়ি সম্প্রদায়েরও শিক্ষক ছিলেন। তৎকালীন সমাজে হিন্দু সমাজের এই অংশের লেখাপড়া শেখার কোন অধিকার ছিল না। সেই জাতীয় সামাজিক বাতাবরণে কীভাবে ঐ সমাজ থেকে আসা ব্যক্তিরা শিক্ষক পর্যায়ভুক্ত হতে পারলেন তা নিসন্দেহে ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। একজন খ্রীষ্টান শিক্ষকের কথা পাই আমরা। ঐ ব্যক্তি মিশনারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন।

ঐ শিক্ষকদের মধ্যে ১১জন কোনো অর্থ গ্রহণ করতেন না। তাঁদের সকলের বেতনও বিভিন্ন দপ্তরী মিলিয়ে মোট মাসিক প্রাপ্য ছিল ১২৯৭ টাকা ৪ আনা ৯ গণ্ডা। মাথাপিছু দাঁড়ায় ৩ টাকা ৩ আনা ৯ গণ্ডা। শিক্ষকেরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কিছু করে দপ্তরী পেতেন।

বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশরই নিজস্ব বাড়িঘর বলতে কিছু ছিল না। এক বিদ্যালয়ের বাড়ি শিক্ষকের উদ্যোগে তৈরী হয়েছে। জঙ্গল থেকে কাঠ সংগৃহীত হয়েছে, আর অর্থব্যয় হয়েছে ১ টাকা ৪ আনা। আরেকটি বিদ্যালয়ের বাড়ি পড়ুয়াদের অর্থানুকূল্যে তৈরী হয়েছে, তারা নিজেদের শ্রম দিয়েছে। আর দেড় টাকা নগদ খরচ করেছে। ঐসব বাড়ির চালে তালপাতার ছাউনি। গ্রামের অভিভাবকরাই মূলত বিদ্যালয়ের ঘর তৈরি করে দিতেন। কোথাও কোথাও গ্রামের বিত্তশালীদের বৈঠকখানা, জমিদারদের কাছারি, গোলাঘর, বারান্দা, কারুর দোকানঘর বা মন্দির ছিল বিদ্যালয় বসার জায়গা।

৪১২টি বিদ্যালয়ের মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৬,৩৮৩ জন। বিদ্যালয় পিছু গড় ১৫.১৪ জন। পড়ুয়াদের বয়সের গড় ছিল ১০.০৫ বছর। ভর্ত্তি হওয়া ও শেষ করার বয়সের কোন সুনির্ধারিত সময়সীমা ছিল না।

পড়ুয়াদের মধ্যে ৩জন ছিল ধাঙর, ৩ জন সাঁওতাল। এডাম ওদের উপজাতীয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ২০জন খ্রীষ্টান পড়ুয়া ছিল। এরা ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান (নেটিভ)। ঔ পড়ুয়ারা মিশনারীদের স্কুলে পড়ত। মুসলিম সম্প্রদায়ের পড়ুয়া ছিল ২৩২ জন। বাকী ৬,১২৫ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

এডাম হিন্দু ধর্মাবলম্বী পড়ুয়াদের সম্প্রদায়গত বিভাগও উল্লেখ করেছেন।

ঐ বিভাগ নিম্নরূপ—ব্রাহ্মণ-১,৮৫৩ জন, গোয়ালা-৫৬০ জন, গন্ধবণিক--৫২৯ জন, কায়স্থ-৪৮৭ জন, সদ্‌গোপ-২৯০ জন, কলু-২৫৮ জন, ময়রা-২৪৮ জন, তাঁতী -১৯৬ জন, সুবর্ণবণিক -১৮৪ জন, শুঁড়ি -১৬৪ জন, তাম্বুলী-- ১২৭ জন, কামার -১০৯ জন, কৈবর্ত্য-৮৯ জন, নাপিত -৭৯ জন, বৈদ্য-৭১ জন, রাজপুত -৬৮, বারুই-৬২জন, স্বর্ণকার-৫৩ জন, ক্ষত্রিয়-৫২জন, ছুতার--৫০জন, কামার-৪৩জন, তেলি-৩৮জন, তিলি-৩৫জন, আগুরি-২৮জন, ধোবা--২৮জন, ছত্রী-২৪জন, পুঁড়ো-২৩জন, ডোম-২৯জন, দৈবজ্ঞ-১৭জন, কেওট-১৫জন, বাগদি-১৪জন, বাইতি-১৩জন, হাড়ি-১৩জন, মাল-১২জন, বৈশ্য-১১জন, শঙ্খবণিক-৯জন, ভট্ট (ভাট ?)-৯জন, নেট (?)৮জন, শরাক-৭জন, কুর্মি-৭জন, লাহারি-৫জন, মালি-৪জন, বহিলা-৪জন, মুচি-৪জন, ভুঁইয়া-২জন, ধানুক-২জন, কোঁড়া-২জন, গঁড়ার-২জন, মটিয়া (মেটে বাগদি ?)-২জন, অগ্রদানী--১জন, মগধ (?)-১জন, সন্ন্যাসী-১জন, হালুইকর-১জন, বাউড়ী-১জন, দুলিয়া (দুলে বাগদি ?)-১জন, জালিয়া-১জন, ব্যাধ-১জন, চণ্ডাল-১জন।

এডাম ঐ প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে তথ্য সংগ্রহকালে সর্বপ্রথম এই জেলাতেই বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের বিষয়ে ও আর্থিক দিকের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পড়ুয়াদের সম্প্রদায়গত বিবরণ দিতে গিয়ে এডাম মন্তব্য করেছেন যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পড়ুয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঐ সম্প্রদায়গত জনসংখ্যার আধিক্য প্রমাণ করে। প্রতিবেদনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন যে ব্রাহ্মণরা তাঁদের সম্প্রদায়গত পেশার (পুরুতগিরি, গুরুগিরি এইসব) বাইরে রোজগারের পথ খুঁজেছিলেন বলে প্রতিবেদকের অনুমান।

পড়ুয়াদের মধ্যে কলু ও শুঁড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত সংখ্যা কলু-২৫৮জন, শুঁড়ি--১৬৪জন দেখে বিস্মিত হয়েছেন, তখন সমাজে এই দুই সম্প্রদায়ই ব্রাহ্মণদের কাছে 'অচ্ছুৎ' হিসাবে বিবেচিত হত। সমাজে জলচল ছিল না তারা। তাছাড়া, ঐ দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষালাভের কোন অধিকার তৎকালীন হিন্দু সমাজে স্বীকৃত

ছিল না। পড়ুয়াদের মধ্যে ডোম, কেওট, হাড়ি ও অন্যান্য অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের পড়ুয়ারাও রয়েছে দেখে এডাম অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, হিন্দু সমাজের ঐসব অংশের মানুষদের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষণ ফুটে উঠেছে। তবে সমাজের এই অংশের শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত নয় বলে এডাম মন্তব্য করেছেন।

পড়ুয়াদের সম্প্রদায়গত পরিচয় দিতে গিয়ে এডাম প্রশ্ন তুলেছেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এডামের অনুমান যে ব্রাহ্মণ সমাজ বর্ণাশ্রমবর্ণিত পেশার লক্ষণরেখা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দুই সমাজের যে অংশ অস্পৃশ্য ও অন্তেবাসী তাদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহের উন্মেষ হয়েছে। শিক্ষকদের সম্প্রদায়গত যে পরিচিতি এডাম লিপিবদ্ধ করেছেন তাতেও শুঁড়ি, কলু এমনকি মালো (মাল ?), ধোবা, চণ্ডাল এইসব অন্ত্যজ ও অচ্ছুৎ পর্যায়ের শিক্ষক ছিলেন, এটাও তাৎপর্যপূর্ণ। তাহলে ব্রাহ্মণ শাসিত অচলায়তন হিন্দু সমাজের প্রাচীরে কি সেদিন ফাটল ধরেছিল ? সামন্তশক্তির প্রবল আদিপত্য যে বীরভূমে স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও অর্থাৎ বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও দেখা গিয়েছে, তাতে ঊনিশ শতকের ত্রিশের দশকে ঐ ভাঙনের ইঙ্গিত দেখে কিছুটা অবাক হতে হয়।

শিক্ষার উপকরণ হিসাবে হিন্দী বিদ্যালয়ে কাঠের বোর্ড এডাম দেখেছিলেন। এদিকে পড়ুয়ারা কেউ তালপাতায় বা কলাপাতায় লিখত। তালপাতায় লিখত ৩,৫৫১ জন, শালপাতায় লিখত ৯৮ জন। তবে কাগজেও একটা অংশ লিখত, তার সংখ্যা ছিল ২০৪৪জন। এক্ষেত্রে যে প্রশ্ন মনে জাগে তা হল এ কাগজ কী তুলোট কাগজ না বিদেশ থেকে আমদানী করা কাগজ ?

পাঠ্য বিষয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে এডাম লিখেছিলেন যে ১টি বিদ্যালয়ে 'খ্রীষ্টীয় পদ্ধতিতে' শেখানো হত। সেখানকার পাঠ্য বিষয়ের কোন বিবরণ এডামের প্রতিবেদনে উল্লেখ নেই। ৩৫টি বিদ্যালয়ে ব্যবসার হিসাব শেখানো হত। ৪৭টি বিদ্যালয়ে চাষবাসের হিসাব শিক্ষণীয় ছিল, ৩১৬টি বিদ্যালয়ে ব্যবসা ও চাষবাসের দুটোর হিসাবই পাঠ্য ছিল, ৭টি বিদ্যালয়ে শুভঙ্কর পাঠ্য ছিল। ১টিতে সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ শেখানো হত। তাছাড়া, সংস্কৃত শব্দরূপ ও ধাতুরূপ পাঠ্য ছিল। চাণক্য শ্লোকও পড়ানো হত।

সংস্কৃত বিদ্যালয় ছিল ৫৬টি, একটি বিদ্যালয়ে ৫টি ও ১টি তে ৩টি, চারটি গ্রামে ২টি করে এবং ৪০ টি গ্রামে ১টি করে বিদ্যালয় ছিল। শিক্ষক ৫৮ জন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে ৫৩জন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও ৪জন বারেন্দ্র, ১জন মাত্র বৈদ্য সম্প্রদায়ের। শিক্ষকদের গড় বয়স ছিল ৪৫.৬ বছর। এঁদের মধ্যে ৫৪জন বছরে সর্বসাকুল্যে ২৮৮৯ টাকা ৮আনা পেতেন। বাকী ৪জন কোন অর্থ নিতেন না।

একজন নিজস্ব জমিজমার আয় থেকে চতুষ্পাঠীর সব খরচ বহন করতেন, বাকীরা সামাজিক দানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

পড়ুয়ারা সংখ্যা ৩৯৩ জন। তাঁদের মধ্যে ১জন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ। দৈবজ্ঞ বা গ্রহাচার্যরা ব্রাহ্মণ সমাজে অপাংক্তেয়, ৩জন বৈষ্ণব, ৯জন বৈদ্য সম্প্রদায়ের। বাকী সবাই ব্রাহ্মণ সজ্জন। ছাত্রদের গড় বয়স ছিল ২০.৭ বছর। ঐসব ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করত। তবে, ব্যাকরণের পড়ুয়াই বেশি ছিল। মোট ২৭৪ জন।

ফার্সী শেখানো হত ৭১টি মক্তবে এবং ২টি তে আরবী পড়ানো হত। প্রত্যেকটি মক্তবে ১জন করে শিক্ষক (মৌলবী) ছিল। তবে শিক্ষকদের মধ্যে ৬৬জন মুসলমান এবং ৫জন হিন্দু। ৫ জনের মধ্যে ৩জন ব্রাহ্মণ, ১জন কায়স্থ, ১জন দৈবজ্ঞ (গ্রহাচার্য)। এঁরা ফর্সী পড়াতেন। আরবী শেখানোর মক্তবে সবাই মুসলমান ছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উনিশ শতকের ত্রিশের দশকেও এদেশের আইন-আদালতে এবং সরকারী কাজকর্মে ফার্সী ব্যবহৃত হত, তাই হিন্দু সমাজের লোকেরাও ফার্সী পড়তেন। রামমোহন রায় এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ফার্সী সরকারী ভাষা হওয়ায় ঐ ভাষা শেখার ক্ষেত্রে ধর্মসম্প্রদায়গত কোন পার্থক্য ছিল না।

ফার্সী ও আরবী শেখাবার মক্তবের শিক্ষকদের মধ্যে ৭জন কোনো বেতন নিতেন না। বাকী ৬৬ জন সর্বসাকুল্যে মাসে ৪১১ টাকা ও ৪ আনা ৬ গণ্ডা গড়ে পেতেন। মাথাপিছু মাসিক প্রাপ্য ছিল ৬ টাকা ৬ আনা ১ গন্ডা।

ফার্সী ও আরবী শেখাবার বিদ্যালয়ে মোট ৪৮০ জন পড়ুয়া ছিল। বিদ্যালয় পিছু গড় ৬.৭ জন। ফার্সী বিদ্যালয়ে পড়ত ৪৮৫ জন। আরবী শিখত ৫ জন। ঐসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সন্তানেরা ছিল। ফার্সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সন্তানেরা ছিল। ফার্সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুসলিম ৪০ জন, ২৪৫ জন হিন্দু সন্তান। দেখা যাচ্ছে হিন্দু সন্তানের সংখ্যাধিক্য। আগেই উল্লেখ করেছি যে ফার্সী রাষ্ট্রভাষা হবার কারণেই হিন্দুঘরের সন্তানরাও ফার্সী শিখত। হিন্দু সমাজের পড়ুয়াদের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বেশি ১১১ জন। কায়স্থ ৮৩ জন, কৈবর্ত ১১জন, বৈদ্য ১০ জন, সুবর্ণবণিক ৮ জন, সদ্‌গোপ ৬ জন, গন্ধবণিক ৪ জন, কামার ৪ জন, বৈষ্ণব ২ জন, গোয়ালা ২জন, শুঁড়ি ২জন, আতরি ১, স্বর্ণকার ১, একটি ফার্সী বিদ্যালয়ে কোরাণও পাঠ্য ছিল।

এডাম তাঁর প্রতিবেদনে ৩টি ইংরাজি শিক্ষার স্কুলের কথা লিখেছেন।

১টি কসবা থানার রায়পুর গ্রামে। সিউড়ির দুটি বিদ্যালয়ের ১টি ছিল বালকদের জন্য দ্বিতীয়টি ছিল বালিকাদের। সিউড়ির ওই বিদ্যালয় দুটি ব্যাপটিস্ট মিশনের উদ্যোগে হয়েছিল। রেভারেণ্ড জেমস্ উইলিয়াম ঐ বিদ্যালয়ের সুপারিনটেন্ডেন্টও ছিলেন। তিনি দিনে দুই-তিন ঘন্টা পড়াতেন। অবশ্য কোন বেতন নিতেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তাঁর স্ত্রীও ওই বিদ্যালয়ে পড়াতেন। স্ত্রী ছিলেন সিউড়ি জেলখানার চিকিৎসক। উইলিয়াম দম্পতি ঊনিশ শতকের ত্রিশের দশকের প্রথমভাগে ভারতে আসেন। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনের উইলিয়াম কেরি ঐ দম্পতিকে এ জেলায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য পাঠান। খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে শিক্ষা-বিস্তারও ঐ মিশনের কর্মপন্থার অন্যতম দিক ছিল। কেরি সাহেব দিনাজপুর জেলায় থাকার সময় থেকে শিক্ষা বিস্তারের দিকে নজর দিয়েছিলেন।

এডাম সাহেব তাঁর প্রতিবেদনে ঐ স্কুল পড়ুয়ার সংখ্যা বলেছেন ৫৭ জন। পড়ুয়াদের মধ্যে ১০জন দেশী খ্রীষ্টান ঘরের সন্তান। বাকীরা সবাই হিন্দু সমাজের শেষোক্ত শিক্ষার্থীদের সম্প্রদায়গত বিভাগ এরকম--ব্রাহ্মণ-২৩ জন, সুবর্ণবণিক–৮জন, কায়স্থ-৬জন, সদ্‌গোপ-২জন, বৈষ্ণব-২জন, বৈদ্য ২জন, গন্ধবণিক-১জন, তাঁতি-১জন, মুচি-১জন, ধোবা-১জন।

লক্ষণীয় যে ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্য থেকেই ইংরাজি শিক্ষার এই স্কুলে বেশী ছাত্র এসেছিল। আরেকটি বিষয়ও লক্ষ্য করার মত ঐ শিক্ষার্থীদের মধ্যে হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ বলে চিহ্নিত অংশের সন্তানরাও ছিল।

শিক্ষার্থীদের বয়সের গড় ছিল ১৬.৬ বছর। এ স্কুলের পড়ুয়াদের বেতন দিবার নিয়ম ছিল। তবে খ্রীষ্টান পরিবারের ১০জন, এবং হিন্দু সমাজের ৩৪জন অবৈতনিকভাবে পড়ত। অন্যদের মধ্যে ৮জন মাসে ৮ আনা বেতন দিত। ২ জন দিত ১ টাকা করে, ৩জন দিত ৪ আনা হিসাবে। সব মিলিয়ে মাসে আয় হত ৬টাকা ১২ আনা। বেতন পাওয়া অর্থ স্কুলের গৃহ সংস্কার ও দুঃস্থ ছাত্রদের বই কিনে দেবার জন্য খরচ হত। উইলিয়াম সাহেব কলকাতা থেকে বই আনিয়ে দিতেন, স্কুলের খরচ চলত চাঁদা তুলে। ১৮৩৪ সালে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৫ সনে মোট ১৬০ টাকা চাঁদা উঠেছিল। স্কুলগুলিতে 'সর্দার পোড়ো' প্রথা চালু ছিল। পাঠ্য বিষয় ছিল বানান শেখা, পড়া ও লেখা, ব্যাকরণ, ভূগোল, নীতিশাস্ত্র এবং ধর্ম।

সিউড়িতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় মিশনারীদের স্কুল। পরে তা সিউড়ি গার্লস স্কুল নামে ঐ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত টিকে ছিল। বলা বাহুল্য জেলাতেও এটিই প্রথম বালিকা বিদ্যালয়।

কসবা থানার (বর্তমান বোলপুর) রায়পুরে সিংহ পরিবারের জগমোহন

সিংহ ঐ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ২৫০ টাকা ব্যয়ে স্কুলবাড়ি তৈরী করেন। কলকাতা থেকে রসিকলাল ঘোষ ঐ স্কুলের শিক্ষক হয়ে এলেন। তিনি রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ইংরাজি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছিলেন। তার মাসিক বেতন ছিল ৪০টাকা। ঐ স্কুলে মোট ১৬ জন পড়ুয়া ছিল। তাদের মধ্যে ১২ জন কায়স্থ সম্প্রদায়ের, ৪ জন ব্রাহ্মণ সন্তান। ১২ জন কায়স্থ সন্তানের মধ্যে ৪ জন সিংহ পরিবারের। এই স্কুলের পড়ুয়াদের কোন বেতন দিতে হতো না।

পড়ুয়ারা ৩ অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশের ছিল মুরের স্পেলিং বুক। এদের চেয়ে অগ্রসরদের পাঠ্য ছিল উলাস্টনস্ গ্রামার তার সাথে স্পেলিং বুক। তারচেয়ে অগ্রসরদের পড়তে হত ক্লিকটস্ জিওক্রনি, গ্রীসের ইতিহাস এবং ইংরাজি কবিতার বই এবং মুরের বড় গ্রামার।

এডাম এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে প্রতিষ্ঠাতা নিজ পরিবারের সন্তানদের ইংরাজি শিক্ষা দিবার প্রয়োজনেই এই বিদ্যালয় করেছিলেন। এই বিদ্যালয় বছর চার পাঁচ টিকেছিল।

এডাম সাহেবের প্রতিবেদনে বয়স্কদের শিক্ষারও বিবরণ পাই কেবল লিখতে ও পড়তে পারা বয়স্কের সংখ্যা ছিল ৫৯৩ জন। তাদের মধ্যে ৫৮৬ জন হিন্দু এবং ৭ জন মুসলিম। যারা পড়তে ও নিজের নাম সই করতে পারত, তাদের মোট সংখ্যা ছিল ৬২০ জন। তাদের মধ্যে ৬০১ জন হিন্দু এবং ১৯ জন মুসলিম।

ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামকাজিক জীবনের সন্ধিক্ষণে এডামের এই প্রতিবেদন মূল্যবান এক ঐতিহাসিক দলিল।

বীরভূমে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাতকাল

বীরভূমের লোকেরা ইংরাজী কবে থেকে শিখতে লাগল ? এ প্রশ্নের উত্তর সুকঠিন। কারণ ইংরাজ সাহেবরা এদেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরে অফিস আদালতে ইংরাজী জানার প্রয়োজনটা ক্রমশ দেখা দিতে লাগল। যদিও প্রথম দিকে সরকারী ভাষা পুরনো দিনের ফার্সীই ছিল। তবু, ইংরাজ সাহেবরা তো ইংরাজী বলতেন। তাঁদের কথাবার্ত্তা বোঝা এবং তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার করা, বিশেষ করে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁদের সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য ইংরাজী তো দরকার হবেই। কাজেই, কিছুলোক ইংরাজী আনুষ্ঠানিকভাবে না শিখলেও হ্যাট্, ম্যাট্, ক্যাট্, থ্যাংক্-ইউ ভেরি গুড- প্রভৃতি নিশ্চয় কিছু শিখে ফেলেছিল। ভাষার

একটা নিজস্ব গুণ প্রত্যেক ভাষারই আছে। ভাষার কাজ পারস্পরিক লেনদেন। ঐ লেনদেনের তাগিদ অনুভূত হলে লেনদেনকারীদের পরস্পরের ভাষা কিছু-না-কিছু পরস্পর শিখবেই। সাহেবরা বাঙালীদের ব্যবসাবাণিজ্যের কাজে লাগাচ্ছিল। সাহেবদের তো "দালাল" চায়। দালালী করার জন্য তো সাতসমুদ্র পাড়ি দিয়ে কোট্ হ্যাট্ পরা সাদা চামড়ার সাহেবরা আসবে না। সে কাজ করবে দিশি লোকেরা। সে জন্য দিশি লোক চাই। সেদিন স্বাভাবিক নিয়মেই দিশি লোক জুটেছিল। চীফ সাহেবের তসর ও রেশমের ব্যবসার দালালী করার জন্যই তো রায়পুরের সিংহ পরিবারের পূর্বপুরুষ এলেন মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থেকে। ঐ বংশের লোকদের তো দিনরাত সাহেবদের সাথে কথাবার্ত্তা বলতে হ'ত। কাজেই, প্রয়োজনের তাগিদেই ইংরাজী কিছু-না-কিছু শিখতে হবে। আবার সাহেবরাও আমাদের পূর্বপুরুষদের হাবভাব চালচলন কথাবার্ত্তা তথা মনের ভাব বোঝার জন্য বাংলা শিখত। ওদের আগ্রহটা অবশ্য বেশি ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষদের মনের মধ্যে ইংরাজী ভাষাটার প্রতি কিছুটা বীতরাগ ছিল। ইংরাজরা ম্লেচ্ছ। কাজেই তাদের মুখের ভাষাও ম্লেচ্ছ, অচ্ছুৎ । ম্লেচ্ছরা অচ্ছুৎ ! ঐ ভাষা শিখলে হিন্দুত্ব চলে যাবে। জাত যাবে। জাত যাবার ভয়, ভীষণ ভয়। এখান থেকেই বীতরাগ। তাছাড়া, শিখাবার প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অভাব ছিল। তবু, নিজেদের রুজি-রোজগার এবং কিছু সুযোগ সুবিধা সাহেবদের গা ঘেষে বাগিয়ে নেবার জন্য কিছু লোক নিশ্চয়ই চলনসই ইংরাজী কথাবার্ত্তা শিখেছিল।

পুত্রদের ইংরাজী শেখাবার জন্য কসবা থানার রায়পুরে এক স্কুল করলেন নবোত্থিত জমিদার জগমোহন সিংহ। তাঁর পুত্রদের ইংরাজী শেখাবার জন্যই রায়পুরে ঐ স্কুল হল ; ২৫০ টাকা খরচ করে স্কুল ঘর হল। কিন্তু মাষ্টার কোথায় পাবেন ? মাষ্টার হয়ে গেলেন কলিকাতার রসিকলাল ঘোষ। মাসিক মাইনে চল্লিশ টাকা।

স্কুলে ছাত্র সোলো জন। তাদের মধ্যে কায়স্থ ১২জন, ব্রাহ্মণ তনয় ৪জন। তবে, কায়স্থদের মধ্যে জমিদার পুত্র ৪জন, বাকী ১২জন অন্য পরিবারের ; তারা পড়তো বিনা পয়সায়।

রসিকলাল ঘোষ রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ইংরাজী শিখেছিলেন।

এ সময় কিন্তু বোলপুর ছিল ঝোপঝাড় জঙ্গলে ঢাকা আর খানা কন্দরে ভরা এক এঁদো গ্রাম। সেখানে তখন অনন্ত অন্ধকার; থানাও ছিল কসবায়।

বীরভূমের দুটি ইংরাজী স্কুল তখন। তা'র একটি হ'ল রায়পুরে। মফস্বলে। শহরে বা জিলাকেন্দ্রের কী অবস্থা ?

এখানে এক স্কুল করলেন খ্রীষ্টান পাদ্রী রেভারেণ্ড জন্ উইলিয়ামসন্।

তিনি সুপরিন্টেন্ডেন্ট হলেন নতুন ধরনের স্কুলের। তিনি ছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশনের লোক। বিনা পয়সায় দিনে ঘন্টা দুই তিন ঐ ইংরাজী স্কুলে পড়াতেন তিনি। ১৩০ টাকা খরচ করে স্কুল বাড়ী তৈরি হল । তবে, রেভারেণ্ড সাহেব নারী সমাজের শিক্ষার জন্য ঐ স্কুল করেছিলেন প্রথম। ১৮৩৪সনে তিনি মেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্য প্রথম স্কুল করেন। কিন্তু পড়ুয়াদের একজন খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়ায় গোল বাধল। ঐ সাথে সাথে আরও দুইজন খ্রীষ্টান হতে চাইল। তা'নিয়ে ভীষণ হই-চই । এ দেখে কেউ আর মেয়েদের পাঠাতে চাইল না। স্কুলে আর ছাত্রী হলনা। সাহেব একটা বাংলা স্কুলও করেছিলেন। সেখানে ছেলেরা পড়ত। পড়তে এসে তারাও যীশুভজনা সুরু করল। ফলে, ছেলেদের অভিভাবকরাও রেগে বোম্। দু'টো স্কুলই উঠে যেতে বসল। ছেলেদেরটা কোনও রকমে টিকে গেল। সেখানে ইংরাজী শিক্ষাও যুক্ত করা হল। মেয়েদের মধ্যে কেবল দেশীয় খ্রীষ্টানদের মেয়েরা ছাত্রী রইলো। এ রকম ছাত্রী ছিল ১১জন; দেশী খ্রীষ্টান শিক্ষক। ছাত্রী পিছু মাসিক দুই আনা বেতন। সর্বসাকুল্যে হত এক টাকা ছয় আনা।

বয়েজ স্কুলে ছাত্র ছিল ৫৭জন। তাদের মধ্যে দেশী খ্রীষ্টানদের ঘরের ছেলেপুলে ১০জন। ৪৭জন হিন্দু। হিন্দুদের মধ্যে বামুন ২৩জন, সোনার বেনে ৮, কায়স্থ ৬, সদগোপ ২, বৈষ্ণব ২, বৈদ্য ২, গন্ধবেনে ১, তাঁতি ১, মুচি ১, ধোবা ১।

ছাত্রদের গড় বয়স ১৬.৬বছর। ছাত্র বেতন ছিল ভরসা। কিন্তু ১০ জন খ্রীষ্টান-নন্দন এবং ৩৪ জন হিন্দু পড়ুয়া কিছু দিতনা। বাকী হিন্দু ছাত্রদের তিনজন মাসে চার আনা, আটজন মাসে আট আনা, দু'জন এক টাকা করে দিত। এ নিয়ে স্কুলের মাসিক আয় ছিল মোট ৬টাকা ১২ আনা। ঐ টাকায় ঘর সংস্কার হত। আর যারা বই কিনতে পারত না তাদের জন্য বই কিনে দেওয়া হত। রেভারেণ্ড সাহেব কলকাতা থেকে বই আনিয়ে দিতেন। দামের উপরে আনার খরচ যুক্ত করতেন।

এ ভাবেই চলত রেভারেণ্ড সাহেবের স্কুল। ইংরাজী শেখাবার প্রথম পর্বের সুরু এভাবেই। বীরভূমের দুই প্রান্তের দুই স্কুলে এভাবে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম পর্বের সুরু হল।

অখন্ড সংস্করণের

চিত্র সংযোজন

চিত্র-১ । শিবরতন মিত্র প্রতিষ্ঠিত রতন লাইব্রেরী

চিত্র–২ । তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত 'ধাত্রীদেবতা'
(সৌঃ শুকদেব সাহা)

চিত্র–৩ । খুষ্টিগিরীর হজরত কেরমানীর মার্জার শরীফ
(সৌঃ সৈয়দ শাহ্ বজলে রহমান কেরমানী)
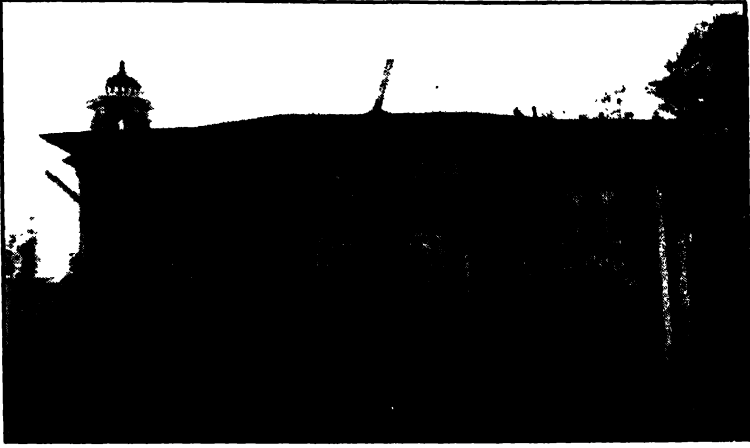
চিত্র-৪ । হজরত দাতা মহবুব শাহ্ মার্জার, পাথরচাপুড়ি
(সৌঃ পুলক সিন্‌হা)

চিত্র-৫ । বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুত কেন্দ্র
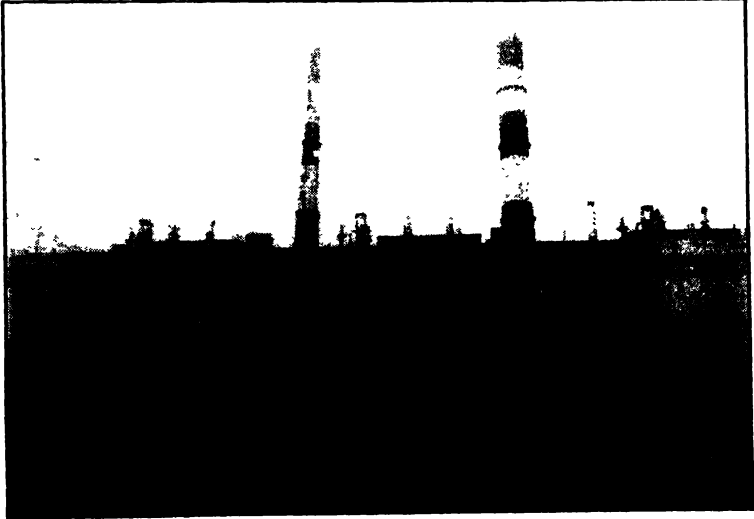
(বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বীরভূম তথা রাজ্যের গর্ব। প্রথম পরিকল্পনাকালে ১৯৮৮ সনে পশ্চিমবঙ্গে ভারীশিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে এর ভিত্তিস্থাপিত হয়। পাঁচটি বর্বে ২১০ মেগাওয়াট করে মোট ১০৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য সাধনে এর যাত্রা শুরু। বর্তমানে ৩টি পর্বের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম পর্বের সূচনাও হয়েছে।)

চিত্র-৬ । মহঃবাজারে বার্ণ কোম্পানীর
ইস্পাত কারখানার চিমনি

১৮৫৪ সনে ভারত তথা এশিয়ার প্রথম ইস্পাত কারখানা তৈরি হয় বীরভূম জেলার মহম্মদবাজারে। তৈরি করেছিলো ব্রিটিশ মালিকানাধীন বার্ণ এণ্ড কোং। তারই সাক্ষ্য এ চুল্লি। বড় চুল্লিটি হাইরোড তৈরির সময় ভেঙে ফেলা হয়!
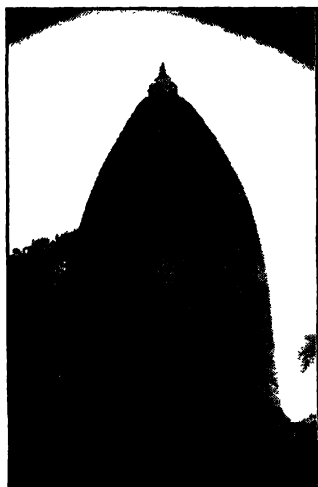
চিত্র-৭ । ভান্ডেশ্বর শিবমন্দির, ভান্ডীরবন
(সৌঃ পুলক সিন্‌হা)
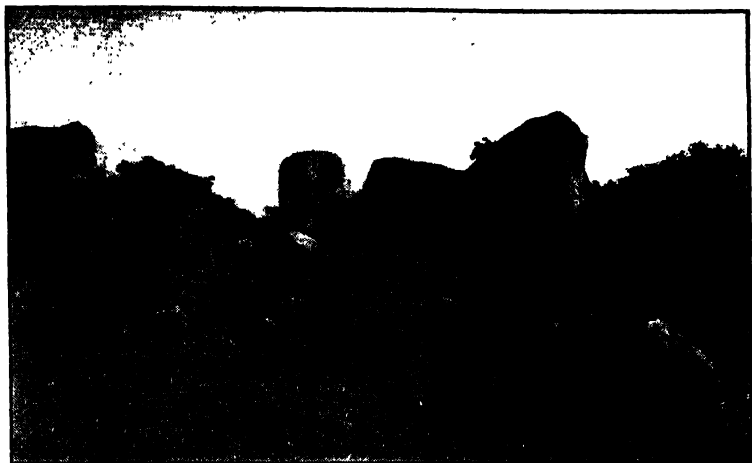
চিত্র–৮ । দুবরাজপুরের মামাভাগ্নে পাহাড়

চিত্র–৯ । খগেশ্বর শিব মন্দির

চিত্র-১০ । মতিচূড় মসজিদের ভগ্নাবশেষ

চিত্র-১০ । ইমামবাড়ার ভগ্নাবশেষ, রাজনগর
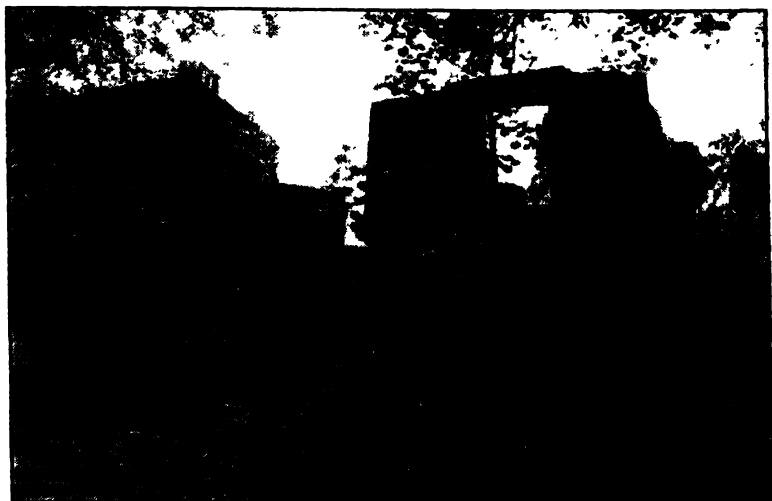
চিত্র–১২ । গনুটিয়ায় রেশমকুঠির ধ্বংসাবশেষ ২০০৫
(সৌঃ শুকদেব সাহা)
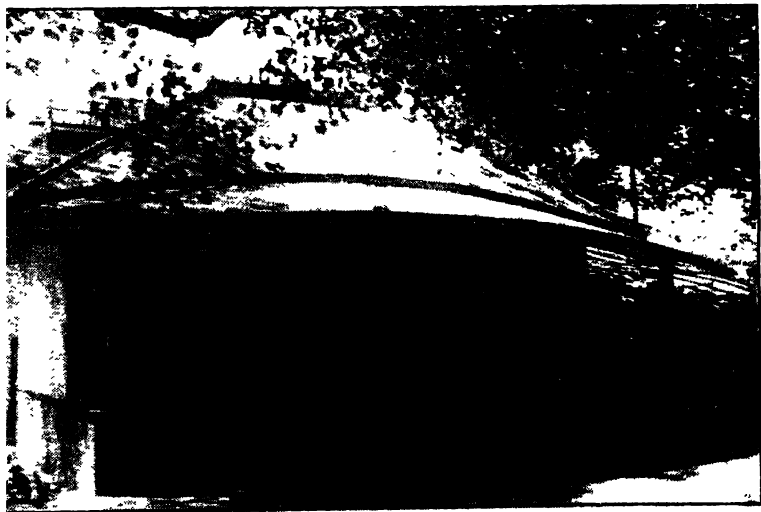
চিত্র–১৩ । হারাণ পন্ডিতের পাঠশালা, বীরচন্দ্রপুর
(সৌঃ পুলক সিন্‌হা)
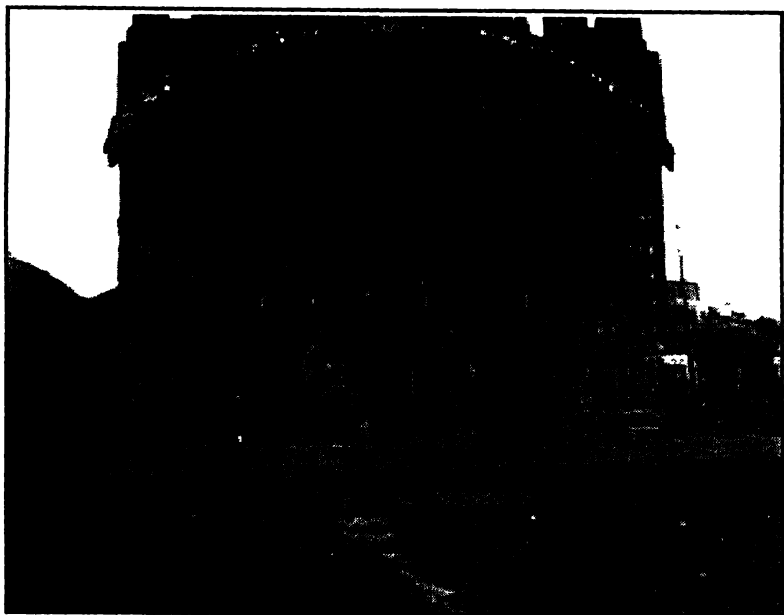
চিত্র-১৪ । রাধাবিনোদ মন্দির, জয়দেব
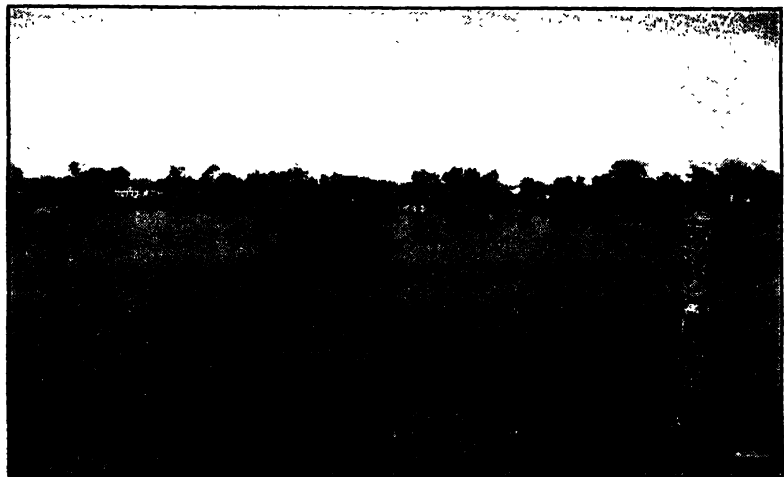
চিত্র-১৫ । কালীদহের বিরামকুঞ্জ, রাজনগর
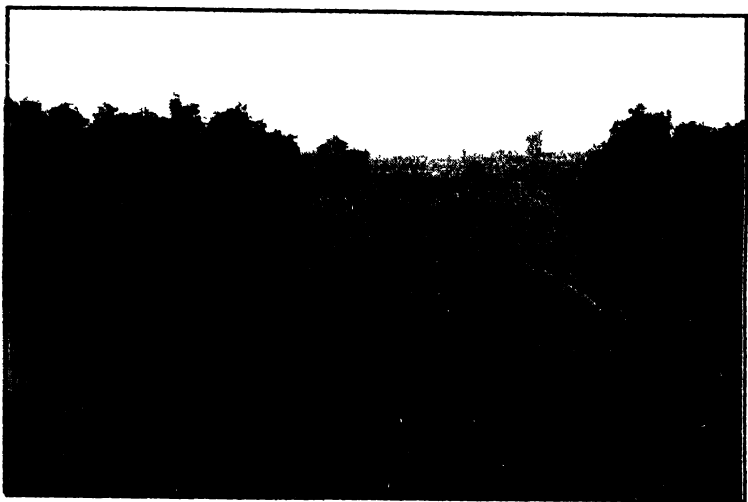
চিত্র–১৬ । ঘাটদুর্লভপুবের ঘাটি

চিত্র–১৭ । বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার, সিউড়ী